আধুনিক ভারত ঃ ঔপনিবেশিকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ

বিপান চন্দ্র

অনুবাদ ও সম্পাদনা

শক্তি রাহা, সৈকত রুদ্র,
হিমাচল চক্রবর্তী ও গণেন বন্দ্যোপাধ্যায়

পাল পাবলিশার্স
২০৬ বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

Adhunik Bharat :
Oupanibesikatabad O Jatiyatabad
by : Bipan Chandra
Bengali Translation of
Nationalism & Colonialism
in Modern India

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ১৯৬০

প্রকাশক
মদন ভট্টাচার্য
পার্ল পাবলিশার্স
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

মুদ্রক
পরিমল বসু
বসুশ্রী প্রেস
১৮৯ অরবিন্দ সরণি
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ
অজয় গুপ্ত

ভূমিকা

আধুনিক ভারত ইতিহাসের প্রবাহ প্রধানত যে দুটি বিন্দুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে, সে দুটি হল ঔপনিবেশিকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ। নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলিতে আমি ঐ দুটি বিষয়ে আলোচনার চেষ্টা করেছি। প্রবন্ধগুলিতে এ ব্যাপারে কিছুটা অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে, এ রকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আরও বিশদ অনুশীলনের উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধগুলিকে আমার দ্বিধাগ্রস্ত পদক্ষেপ, প্রাথমিক খসড়া বলা যেতে পারে। সুস্পষ্ট বা বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এগুলি রচিত হয়নি। এই সব প্রবন্ধ পড়ে পাঠকের যদি মনে হয় যে উত্থাপিত প্রবন্ধগুলি তাৎপর্যপূর্ণ এবং পরিস্ফুট দৃষ্টিভঙ্গির সার্থকতা আছে, এগুলি একত্র করে প্রকাশ করার উদ্দেশ্য তাহলে আমার সফল হয়েছে বলতে হবে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন, রাজনৈতিক ঘটনাবলী এবং মননশীল উদ্যোগ-সমূহকে একত্রে, পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত করে দেখলেই কেবল এ সব উদ্যোগ নেওয়ার মানে হয়, এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেও এই প্রবন্ধগুলি রচিত। রাজনীতি, অর্থনীতি, ও মতাদর্শের মধ্যে, রাষ্ট্রীয় কাঠামো, সরকারি নীতি, ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যের মধ্যে, কোন আন্দোলন, তার সামাজিক ভিত্তি, তার উদ্দেশ্য, তার ভাবধারা, ও তার নেতৃত্বের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঔপনিবেশিকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে যত স্পষ্ট ও সার্থকভাবে অনুশীলন করা সম্ভব হয়েছে, এমন আর কোথায়ও হয়নি।

নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন দেখা দিল আরও এই কারণে যে গত প্রায় দেড়শ বছর ধরে ঔপনিবেশিক ভাবনায় ইতিহাস রচয়িতাদের অধিকাংশ রচনাই মূলত এই দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে লেখা। এঁদের মধ্যে অনেকেই ভারতীয় হওয়া সত্ত্বেও ব্যাপারটার খুব একটা হেরফের হল না। এই চিন্তাধারার প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে ক্ষীণ একটা কণ্ঠস্বর অবশ্য শোনা গিয়েছিল, কিন্তু তা শুধু জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত অনুশীলনের ক্ষেত্রেই। কিন্তু এই শেষোক্তরা আবার জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের গুণগান করেই কেবল ক্ষান্ত হলেন, বা আন্দোলনের প্রধান প্রধান নেতাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও কার্যকলাপ অনুশীলনেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আন্দোলনের সামাজিক চরিত্র, তার উৎস এবং বিকাশের নানা পর্যায়, সমাজের মধ্যে তার প্রতি সমর্থন এবং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের চরিত্র, আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্ভাবিত ও ব্যবহৃত বিভিন্ন নীতি ও কৌশল, এমন কি এই আন্দোলনের প্রকৃত মননগত ইতিহাসও যথাযথ ভাবে অনুশীলন করা হয়নি। ব্যতিক্রম অবশ্যই কিছু কিছু ছিল; যেমন, ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে এ. আর. দেশাই, আর. পাম দত্ত, এবং আরও কয়েকজন অর্থনীতিবিদের রচনা। কিন্তু গত ক' বছরেই কেবল কিছু কিছু ভারতীয়, সোভিয়েত ও জাপানি গবেষক সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কিছু কিছু প্রশ্ন উত্থাপন

করছেন। ব্রিটিশ ও মার্কিন গবেষকদের কলম থেকেও অনেক নতুন ও প্রয়োজনীয় লেখা বেরিয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, শেষোক্ত রচনাগুলির বেশির ভাগই ঔপনিবেশিকতাবাদের বাস্তবতাকে অস্বীকার করার দোষে দুষ্ট, কাজে কাজেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কদর্য অপব্যাখ্যাও এসব লেখায় ঘটেছে।

ঔপনিবেশিকতাবাদ নিয়ে গবেষণার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, কারণ তা না হলে যে সব দেশ আগে উপনিবেশ ছিল, সেগুলিতে উন্নয়ন প্রক্রিয়া শুরু করার, উন্নয়নের নানা নীতির মধ্য থেকে বাছাই করার, ফলত ঐ সব দেশের অনগ্রসরতার অন্তর্নিহিত কারণ অনুধাবন করার প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রায়শই এই সব দেশে উন্নয়নের পথে বাধাগুলিকে ঐ সব দেশের প্রাক-ধনতান্ত্রিক, প্রাক-ঔপনিবেশিক বা চিরাচরিত অনগ্রসরতার অবশেষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এমন কি, এ সব বাধাকে যখন "ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে" বিচার করা হয়, তখনও ঔপনিবেশিকতাবাদের ভূমিকা সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে ওঠে। তাছাড়া, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক রচনায় নতুন এক প্রবণতা লক্ষ্য করা গেল, দেখা গেল ঔপনিবেশিকতাবাদের সাফাই গাওয়াই তাঁদের কাজ। এ ধরনের কিছু কিছু লেখক ঔপনিবেশিকতা-বাদকে আধুনিকীকরণের উদ্যোগ বলে চিত্রিত করেছেন, ফলে অতীতের, চিরা-চরিত অনগ্রসরতার ভারে সে উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে গেল। (এই গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধ—"উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় অর্থনৈতিক ইতিহাসের পুনর্ব্যাখ্যা"-য় এ জাতীয় জনৈক লেখক, মরিস ডি. মরিসের মতামত আলোচনা করা হয়েছে।) অনুরূপভাবে অন্যরা আবার ঔপনিবেশিক কালকে আধুনিকতায় উত্তরণের যুগ বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

নিঃসন্দেহে ঔপনিবেশিক যুগে ভারতবর্ষের মৌলিক রূপান্তর ঘটেছে। এবং এটা ঘটেছে ঠিক যে কারণে সেটা এই নয় যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পর যে সব প্রাথমিক অবস্থা থেকে দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া শুরু হল সেগুলি তার প্রাক-উপনিবেশ অতীতের জের মাত্র। সেগুলি আসলে ঔপনিবেশিক যুগেরই অবদান। সুতরাং ভারতবর্ষে উপনিবেশবাদ ঠিক যে ভাবে কার্যকরী হয়েছিল তার কৌশলের উপর এবং এই কৌশলকে চূর্ণ করার ও পরিবর্তন করার যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল সে সম্পর্কে পূর্ণতর জ্ঞানের ভিত্তিতেই কেবল সার্থক কোন উন্নয়ন নীতি নির্ধারণ করতে হবে। আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ, "ঔপনিবেশিকতা ও আধুনিকীকরণ"-এ*, ঔপনিবেশিকতাবাদকে একটা সুনির্দিষ্ট কাঠামো হিসাবে এবং বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এই কাঠামোর বিবর্তন প্রক্রিয়া বিচার করার সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে, দেখান হয়েছে যে আধুনিক ভারতীয় ইতিহাস অনুশীলনের কাঠামো হিসাবে এই যুক্তি

অনেক বেশি সার্থক। গবেষকরা এই দিকে সুদীর্ঘ প্রচেষ্টা সবে শুরু করেছেন। ফলে এই কাঠামোকে পুরোপুরি বোঝবার এবং অসংখ্য রক্ত সঞ্চালক শিরা ও ধমনীর মত বহুমুখী যে সব পথ ও যোগসূত্রের মধ্য দিয়ে তা সঞ্চারিত হয় সেটা বোঝার মত মেধাগত সম্পদ এখনও সঞ্চিত হয়নি। সুতরাং, এ ব্যাপারে সন্দেহ বোধহয় আর নেই যে ঔপনিবেশিক নানা স্বার্থ ও নীতি, রাষ্ট্র ও তার নানা প্রতিষ্ঠান, সংস্কৃতি ও সমাজ, ভাবধারা ও মতাদর্শ, এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ঔপনিবেশিক কাঠামোর নানা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ক্রিয়াশীল। উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই আবার ঐ কাঠামোর সবটা নির্ধারিত হয়।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গোড়ার দিকের জাতীয়তাবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদী লেখক ও প্রশাসকগণ ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ এবং ভারতে ঔপনিবেশিক নীতির চেহারা এবং কাম্য সংজ্ঞা ও অর্থনৈতিক বিকাশের কর্মনীতি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। তৃতীয় প্রবন্ধ, "ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি (১৮৮৫-১৯০৫): ব্রিটিশ ও ভারতীয় ধারণা"-য় বলা হয়েছে যে চিরায়ত উপনিবেশ হিসাবে ভারতের রূপান্তর ঘটল আধুনিকীকরণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং প্রয়োজনমত বিদেশী পুঁজির সাহায্যে শিল্প ও কৃষিতে পুঁজিবাদের ভিত রোপণের ভেতর দিয়ে। জাতীয়তাবাদী লেখকরা বিকাশ সম্পর্কে সমসাময়িক ঔপনিবেশিক তত্ত্বগুলির তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং ঔপনিবেশিকতাবাদের সার্বিক মূল্যায়নের লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ করেছেন। স্পষ্টতই, জাতীয়তাবাদী সমালোচনা এক্ষেত্রে একলাফে অনেক দূর এগিয়ে গেছে এবং সেটা যদি রূপায়িত হত তাহলে উপনিবেশবাদ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের আরও বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ আমরা পেতাম। সাথে সাথে এটাও পরিষ্কার যে এটুকুই আজ আর যথেষ্ট নয়। একে আজ অতিক্রম করে যেতে হবে, অবশ্য ঔপনিবেশিক ইতিহাস বিজ্ঞান বা অর্থনীতির কেঁচে গণ্ডূষ করে তা আর করা যাবে না।

চতুর্থ প্রবন্ধ, "ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনের উপাদান: আদি জাতীয়তাবাদী ক্রিয়াকলাপ"-এ আমি ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের মৌলিক নিরবচ্ছিন্নতা, এবং বিশেষ করে তার চাপ-আপস-চাপ (চা-আ-চা) নীতি এবং পর্যায় থেকে পর্যায়ান্তরে দীর্ঘস্থায়ী বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করেছি। আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে তার সামাজিক চরিত্রও পরীক্ষা করা হয়েছে।

ভারতীয় সমাজ বিকাশের অন্যতম যে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের ফলে অন্যান্য ঔপনিবেশিক দেশের বিকাশের সঙ্গে তার স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত হয়েছে সেটি হল স্বাধীন এক পুঁজিপতি শ্রেণীর উত্থান ও বিকাশ। এই শ্রেণী ব্রিটিশ পুঁজির মুৎসুদ্দি বা অধীনস্থ মিত্র হিসাবে গড়ে ওঠেনি। জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই ঘটনার ফলাফল অপরিসীম। একদিকে, বিশেষ করে ১৯১৮-র পর, শক্তিশালী এই শ্রেণীটি জাতীয় আন্দোলনকে সমর্থন করা শুরু করল; অন্যদিকে, এই ঘটনার ফলে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের রক্ষণশীল অংশটি পরিপুষ্ট হল, চাপ-

আপস-চাপ নীতি বা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের অবৈপ্লবিক পন্থার আধিপত্য বিস্তারে সহায়ক হল। সাম্রাজ্যবাদ এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে পুঁজিপতি শ্রেণীর ভূমিকা "ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদ : ১৯৪৭ সালের আগে" এবং "জওহরলাল নেহরু ও পুঁজিপতি শ্রেণী : ১৯৩৬ সাল"—এই প্রবন্ধ দুটিতে আলোচিত হয়েছে। জাতীয় আন্দোলনের মূল নীতির প্রশ্নে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের মধ্যে বামপন্থী চ্যালেঞ্জকে রোখার প্রশ্নে এই শ্রেণীর নেতৃত্ব কিভাবে সফল হলেন শেষোক্ত প্রবন্ধটিতে তাও আলোচিত হয়েছে। জাতীয় আন্দোলনের মূলগত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা বা প্রত্যক্ষ বিদেশী নিয়ন্ত্রণের হাত থেকে পুঁজিপতি শ্রেণীর মুক্তি, ১৯৪৭-পরবর্তী সমাজ বিকাশের উপর সাধারণভাবে এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রতি সরকারী নীতির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল। "আধুনিক ভারত ও সাম্রাজ্যবাদ" প্রবন্ধে এই ব্যাপারটিই মোটামুটি আলোচনা করা হয়েছে।

জাতীয় আন্দোলনের যথাযথ সামাজিক বা শ্রেণীগত বিশ্লেষণ এখনও করা হয়নি। কিন্তু এ আন্দোলনের গোড়া থেকেই গা না ঘামানোর একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়—জাতীয় আন্দোলনকে "মধ্যবিত্ত শ্রেণী" বা সমাজের "বাছাই শ্রেণী"-র (এলিট্) একটা ষড়যন্ত্র হিসাবে, নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয়তাবাদকে কাজে লাগানোর একটা ফন্দি হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়। অপূর্ব এই 'তত্ত্ব'টি প্রথম যাঁরা বাজারে ছেড়েছিলেন ভারতবর্ষের বড়লাট (১৮৮৪-৮৯) ডাফরিন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এই আজব তত্ত্বের ধর্মপিতা তাঁকেই বলা যেতে পারে। এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য "লর্ড ডাফরিন ও ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের চরিত্র" প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। "১৯২০-র দশকে উত্তর ভারতে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী : আদর্শগত বিকাশ", "লেনিন ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন", এবং অংশত "জওহরলাল নেহরু ও পুঁজিপতি শ্রেণী : ১৯৩৬ সাল" প্রবন্ধগুলিতে আমি জাতীয় আন্দোলনের এমন কয়েকটি বিকল্প মতাদর্শ এবং পন্থার বিকাশ নিয়ে আলোচনা করেছি, বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে যেগুলি পরিণতি লাভ করতে পারল না।

বিংশ শতকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ব্যর্থতা হল বিভেদকামী সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অসাফল্য, যদিও আন্দোলনের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ধর্মনিরপেক্ষ। "ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা" শীর্ষক প্রবন্ধে এই ব্যর্থতার কিছু কিছু কারণ আলোচিত হয়েছে।

১৯৪৭ সালের আগে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বকে বড় বড় যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে, জাতি এবং জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে কৃষক সমাজের সংহতি সেগুলির মধ্যে অন্যতম। যে কায়দায় এই কাজটি সম্পাদন করার চেষ্টা হয়েছিল, "কৃষক সম্প্রদায় ও জাতীয় সংহতিঃ সমকালীন ভারতবর্ষ" প্রবন্ধে তা

আলোচিত হয়েছে। ১৯৪৭ সালের পরবর্তী সময়ে কৃষক সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ফারাক দারুণ রকম বেড়ে যাওয়ায় কৃষক আন্দোলনের সংগঠকদের যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে এই প্রবন্ধে তাও আলোচনা করা হয়েছে।

দুটি পুস্তক সমালোচনাও আলোচ্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে: প্রধান ও ভগবৎ কৃত তিলকের জীবনী এবং ব্যারিংটন মুর কৃত 'সোস্যাল অরিজিনস অব ডিক্টেটরশিপ অ্যান্ড ডিমক্রেসি'। প্রথম বইটিতে তিলকের রাজনৈতিক ভূমিকার কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, নচেৎ এ নিয়ে খুব বেশি রকম ভুল বোঝাবুঝি হয়। ভারতবর্ষ, চীন, এবং অন্যান্য উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিকতাবাদের ভূমিকার ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনুধাবন করতে সদাভিপ্রায়সম্পন্ন সমাজ-বিজ্ঞানীরাও যে ব্যর্থ হয়েছিলেন দ্বিতীয় বইটিতে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বহুকাল ধরেই আমি বহু বন্ধু ও ছাত্রের কাছ থেকে সাহায্য পাচ্ছি, প্রবন্ধগুলি রচনার বিভিন্ন পর্যায়ে এঁদের সঙ্গে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। আমি বিশেষ করে সাহায্য পেয়েছি রোমিলা থাপার, মোহিত সেন, রণধীর সিং এবং হরবন্‌স্ মুখিয়া-র কাছ থেকে। সব কটি প্রবন্ধেরই প্রথম খসড়া এঁরা দেখে দিয়েছেন এবং মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রতিটি প্রবন্ধ যতবার সংশোধন করা হয়েছে, আমার স্ত্রী উষা প্রত্যেকবারই সেগুলি পড়ে ঠিক করে দিয়েছেন, তাছাড়া প্রতিটি পর্যায়ে সব রকম ভাবেই তিনি সাহায্য করেছেন।

বিপান চন্দ্র

বিষয়সূচী

ঔপনিবেশিকতা ও আধুনিকীকরণ

ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক অনগ্রসর অবস্থা কিভাবে কাটিয়ে ওঠা যায়, সেই সমস্যা নিয়ে গত তেইশ বছর ধরে বিদগ্ধ মহলে এবং তার বাইরেও প্রভূত আগ্রহ সঞ্চার হয়েছে, যথেষ্ট আলোচনাও হয়েছে। অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানীদের সঙ্গে ঐতিহাসিকেরাও এই আলোচনায় তাঁদের কিছু অবদান রাখার প্রয়োজন বোধ করেছেন। যদিও ঐতিহাসিক হিসাবে আমরা বর্তমানে তেমন কোনো প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে পারিনা, তবু যাঁরা বর্তমানকে গড়ে তোলার কাজে ব্রতী আছেন, তাঁদের কাছে এই অবস্থার সূত্রপাত কিভাবে হয়েছিল এবং এর মধ্যে নিহিত বিবিধ সম্ভাবনাকে ব্যাখ্যা করে তাঁদের কাজে সহায়তা করতে পারি।

উন্নয়নের সমস্যার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আজ ব্যাপকভাবে, সম্ভবতঃ সর্বজনীনভাবেই, স্বীকৃত। এইদিক থেকে আধুনিক ভারতীয় ইতিহাস অনুশীলনের গুরুত্ব দেখা দেয় নিম্নোক্ত তথ্য থেকে ঃ স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের (ধনতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক) অর্থনৈতিক বিকাশের প্রক্রিয়া ও প্রকৃতি বহুলাংশে নির্ভর করে তার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অনগ্রসরতার কাঠামো বা প্রকৃতির উপরে এবং সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কৌশল বা নীতির উপরে। এগুলি আবার প্রভাবিত হয় ঐ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কাঠামোটির দ্বারা। ঐতিহাসিক হিসাবে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে ঃ কি কি সেই অর্থনৈতিক রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি ১৯৪৭ সালের আগে পর্যন্ত যেগুলি অর্থনৈতিক বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল? কি ভাবে ঘটেছিল সেই সব শক্তির উদ্ভব বা উৎপত্তি? অন্যভাবে বলা যায়, কি তাদের ইতিহাস?[1] সুতরাং ভারতের উন্নয়নের জন্য কোনো ফলপ্রসূ কর্মনীতি ও কর্মসূচী প্রণয়নের আগে চাই তার অনগ্রসরতা সম্পর্কে ঐতিহাসিক অনুশীলন।

তবু, বড়ই বিস্ময়ের কথা এই যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে অনগ্রসর দেশগুলির, এবং সেই সঙ্গে ভারতেরও, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা নিয়ে যে গভীর আলোচনা চলে, তা শুরু থেকেই কেমন যেন একটা অনৈতিহাসিক মোড় নিয়েছে। যেসব দেশ আজ অর্থনৈতিক দিক থেকে অগ্রসর, স্বাধীনতার সময়কার ভারতের অবস্থার সঙ্গে সেই সব দেশের প্রাক-ধনতান্ত্রিক বা প্রাক-শিল্পতান্ত্রিক পর্যায়ের সঙ্গে ভারতের প্রাক-স্বাধীনতা অবস্থার তুলনা করা এই আলোচনার প্রধান ঝোঁক হয়ে ওঠে। এই ধরনের তুলনার মানে দাঁড়ায় এই যে ভারতের অনগ্রসরতার চরিত্র যেন তার ঐতিহ্যগত কিংবা তার প্রাক-ব্রিটিশ ঐতিহ্যেরই অবশেষ মাত্র।

অর্থাৎ, আজ ভারত যে অবস্থায় আছে, বর্তমানের অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশগুলিও একসময়ে ঠিক সে রকমই অনগ্রসর বা পশ্চাদ্‌পদ ছিল—এই অনুমানের ভিত্তিতেই উপরোক্ত যুক্তি খাড়া করা হয়েছে। তারপরে বলা হয় যে, এখন তাহলে কর্তব্য হল কোনো একটি সফল দেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ভারতের অর্থ-নীতির আধুনিকীকরণ। বাস্তবিক পক্ষে, কোন কোন লেখক এমন ইঙ্গিতও করেছেন যে, ঔপনিবেশিক শাসনকর্তারাও ভারতকে আধুনিক করতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাতে যে তাঁরা বিশেষ সফল হতে পারেননি, তার কারণ এদেশে ঐতিহ্যের জগদ্দল ভার। তাঁদের মতে, এই অসাফল্যের পরিণতিতেই ঘটে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব এবং স্বাধীনতার আবির্ভাব। তাঁরা বলেন, ব্রিটিশেরা আধুনিকীকরণের যে কর্মকাণ্ড অসমাপ্ত রেখে গিয়েছে, তা সমাপ্ত করতেই ভারত সরকার এখন ব্যাপৃত। স্বভাবতই, তাঁরা বলে থাকেন, ভারত বর্তমানে রয়েছে আধুনিকযুগে উত্তরণের পর্যায়ে।

কখনো কখনো অবশ্য দুটি পরিস্থিতির মধ্যেকার পার্থক্যকে স্বীকার করে নেওয়া হয়, কিন্তু দুয়ের মধ্যে মূল কাঠামোগত কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করা হয় না; এবং ধরে নেওয়া হয় যে, সাম্প্রতিক ইতিহাসের সঙ্গে এই পার্থক্যগুলির সম্পর্ক অকিঞ্চিৎকর। মাথাপিছু আয় কিংবা মানুষ-জমি অনুপাতের ক্ষেত্রে পার্থক্যের মত ব্যাপারগুলিকে আপতিক, পরিস্থিতিগত বা "প্রাক-আধুনিক" ঘটনা হিসাবে দেখা হয়। সেগুলি কেবল সংখ্যার বা মাত্রাগত পার্থক্য, পশ্চাদপদতার হার বা তীব্রতার পার্থক্য—আকার, প্রকার, কাঠামো বা 'গুণ'গত পার্থক্য নয়।[২] ফলতঃ, সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রচনায় ভারতকে প্রাক-ধনতান্ত্রিক, বা প্রাক-শিল্পতান্ত্রিক বা ঐতিহ্য-অনুসারী বা, বড় জোর, একটি দ্বৈতসমাজ হিসাবে গণ্য করা হয়, গণ্য করা হয় এমন একটি সমাজ হিসাবে 'আন্তর্জাতিক অর্থনীতি'র সঙ্গে যার যোগাযোগ ছিল ক্ষীণ।

এই মতটি কিন্তু মূলগত ও ইতিহাসগত দিক থেকে ভ্রান্ত, কেননা ১৯৪৭ সালের ভারত প্রাক-ধনতান্ত্রিক, ঐতিহ্য অনুসারী বা দ্বৈত প্রকৃতিসম্পন্ন ছিল না। এটা ধরে নেওয়া ভুল হবে যে, ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ভারত কোনো মৌল রূপান্তরের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেনি, কিংবা তা মূলতঃ সনাতন ভারতই থেকে গিয়েছিল। আঠারো শতকের মধ্যকাল থেকে এবং বিশেষ করে, উনিশ শতকের সূচনা থেকে ভারত ক্রমে ক্রমে আধুনিক ধনতন্ত্রের জগতের সঙ্গে সংবদ্ধ হয়ে যায়, যদিও সে জগতে তার অবস্থান ছিল পরবশ বা ঔপনিবেশিক।

অতএব, বৃটেনের অধীন ভারত মূলগতভাবে মুঘল ভারতের অনুরূপ ছিল না; তার পশ্চাদপদতাও মুঘল ভারতের পশ্চাদপদতার মত ছিল না, কেননা মুঘল ও ব্রিটিশ যুগের অন্তর্বর্তী বছরগুলিতে ভারত ঔপনিবেশিক আধুনিকীকরণের এক দীর্ঘ ও পূর্ণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে।[৩] ব্রিটেনের অধীন ভারত আজকের অগ্রসর দেশগুলির প্রাক-ধনতান্ত্রিক পর্যায়ের মতও ছিল না, কেননা সেই দেশগুলি ভারতীয় ধরনের কোনো ঔপনিবেশিক

আধুনিকীকরণের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেনি। তা ছাড়া, ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষকে প্রাক-শিল্পতান্ত্রিকও বলা চলে না, কেননা এ দেশ শিল্প-ধনতন্ত্রের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে অনুভব করেছে, যদিও সেই প্রক্রিয়ায় নিজে শিল্পায়িত হয়নি। অধিকন্তু, ভারতবর্ষের নিজেরও একটি শিল্প-পুঁজিপতি শ্রেণী ছিল। এখানে মনে রাখতে হবে যে, ভারতে ঔপনিবেশিকতা ব্রিটেনে ধনতন্ত্রের মতই একটি আধুনিক ঐতিহাসিক ঘটনা—বস্তুতপক্ষে দুটি বিকাশলাভ করেছিল একই সঙ্গে।[4] উপরন্তু, ভারতের ঔপনিবেশিক অর্থনীতিও ছিল অনুরূপভাবে বিশ্ব ধনতন্ত্রের একটি অংশ – আর এই বিশ্ব-ধনতন্ত্রকে দেখতে হবে একটি অভিন্ন বিশ্বব্যাপী ব্যবস্থা হিসাবে, ঔপনিবেশিক অর্থনীতিগুলি সে ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটির ফলে এই ঔপনিবেশিক সংবন্ধন, কিংবা এই ধাঁচের আধুনিকীকরণ সংঘটিত হল, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে দেখা দিল ভারতের বিকাশের ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা কিংবা আঁদ্রে গুন্ডের ফ্রাঁক-এর সারালো কথাটির সঠিক ও সতেজ ভঙ্গিতে যাকে বলা যায়, "অনগ্রসরতার বিকাশ।"

কখনো কখনো প্রশ্ন তোলা হয়ঃ যদি ঔপনিবেশিক শাসনের হস্তক্ষেপ না ঘটত, ভারতে কি তাহলে অধিকতর বিকাশ ঘটত না? এই প্রশ্নটিতে বিপুল পরিমাণ ঐতিহাসিক কৌতূহল নিহিত থাকলেও বর্তমান আলোচনায় তা অপ্রাসঙ্গিক।[5] যে প্রশ্নটি এখানে তাৎপর্যপূর্ণ, তা এই নয় যে, মুঘল আমলে কেন ধনতন্ত্রের স্বয়ংসাধিত বিকাশ ঘটেনি; প্রশ্নটি বরং এই যে, প্রায় ২০০ বছর ধরে সে সময়ের সর্বাধিক শিল্পায়িত দেশের দ্বারা শাসিত হওয়া সত্ত্বেও এখানে ধনতন্ত্রের কোনো প্রণোদিত বিকাশ ঘটল না কেন। আসলে শিল্প-বিপ্লব তো ঘটেছিল একটি মাত্র দেশে; অন্যান্য দেশকে তা 'সৃষ্টি করতে' হয়নি, তারা কেবল তা "ধার করেছিল"। ঐতিহাসিকের পক্ষে এই প্রশ্নটি আরো প্রাসঙ্গিক কেননা এই পর্যায়ে ব্রিটিশ শাসকেরা আবার একবার অন্যমনস্কতার বলি হননিঃ অন্যত্র আমি যেমন দেখিয়েছি,[6] বিশ্ব-ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সঙ্গে ভারতের মূলগত সংবন্ধন, দৃষ্টান্তস্থানীয় উপনিবেশ তথা দৃষ্টান্তস্থানীয় অনগ্রসর দেশে তার রূপান্তরণ ইত্যাদি ঘটেছিল উনিশ শতকে আধুনিকীকরণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ধনতন্ত্র রোপণের পতাকাতলেই।[7]

ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতীয় অর্থনীতির চরিত্র নিরূপণে যে ভুল করা হয়, তার উদ্ভব ঘটে অংশতঃ এই বিশ্বাস থেকে যে, ব্রিটিশ ভারত অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে পশ্চাদ্‌পদ ছিল বলে সে ছিল স্বতঃই অনাধুনিক, ঐতিহ্য-অনুসারী, প্রাক-ধনতান্ত্রিক। কিন্তু পশ্চাদ্‌পদতার বৈশিষ্ট্যগুলি কেবল ঐতিহ্য-অনুসারী ভারতীয় সমাজেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং মুঘল আমলের মধ্যাহ্নে ভারতীয় সমাজ সমসাময়িক মান অনুযায়ী ছিল যথেষ্ট অগ্রসর। এই বৈশিষ্ট্যগুলি একটি আধুনিক সাম্রাজ্য-বাদী দেশের একটি আধুনিক উপনিবেশের চরিত্র-চিহ্নও বটে। অন্যভাবে বলা

যায়, ব্রিটিশ ভারতের অর্থনীতির পশ্চাদ্‌পদ দিকগুলি কেবল তার বিশাল ইতিহাসের মহোৎসবের পরে পড়ে থাকা আবর্জনা মাত্র নয় বরং সেগুলি আধুনিক ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সুবিন্যস্ত অংশসমূহ। দেশকে শিল্পায়িত করতে দেশজ ধনতন্ত্রের অক্ষমতা মানে এই নয় যে তা ছিল গতানুগতিকতার অনুসারী বা ঐতিহ্যের ভারে জর্জরিত, পরন্তু এই অক্ষমতা ছিল সেই একই ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ার ফল, যে প্রক্রিয়া থেকে ভারতে এই ধনতন্ত্রের জন্ম হয়েছিল।

মূল ঘটনা এই যে, একই সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া, ব্রিটেন অর্থাৎ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে যা শিল্প বিকাশ এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ঘটিয়েছিল, ভারতে অর্থাৎ উপনিবেশে তাই আবার অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পশ্চাদ্‌বর্তিতা প্রথমে সৃষ্টি এবং পরে সংরক্ষণ করেছিল। দুটি দেশ পরস্পরের সঙ্গে প্রায় দু শতাব্দী ধরে অঙ্গাঙ্গী বন্ধনে আবদ্ধ ছিল এবং এক অভিন্ন, সংবদ্ধ বিশ্ব-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করেছিল। যদিও দুয়ের ক্ষেত্রে তার ফলাফল ঘটেছিল ভিন্ন প্রকারের, বাস্তবিক পক্ষে বিপরীত প্রকারের। এই ফলাফলগুলি আপতিকও ছিল না, কিংবা কোন ব্রিটিশ বড়লাটের বিশেষ শয়তানির পরিণামও ছিল না, কিংবা ভারতীয় জনগণের বা প্রথা-প্রতিষ্ঠানের কোন বিশেষ ধরনের জড়তা বা ঐতিহাসিক প্রবণতার ফলও ছিল না। ধনতন্ত্রের এই অসম বিকাশ—এক অংশের বিকাশ, আরেক অংশের অনগ্রসরতা এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুফল সমূহের অসম বণ্টন—এটাই হচ্ছে আধুনিক ধনতন্ত্রের একটি মূলগত বৈশিষ্ট্য। একেবারে শুরু থেকেই ধনতন্ত্র বিকাশলাভ করেছে তার অগ্রগতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দেশগুলির অর্থাৎ উপনিবেশগুলির সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগমনের পায়ে শৃংখল হয়ে। সুতরাং, ধনতন্ত্রের একটিও সুফল ভোগ না করেও, শিল্প বিপ্লবে কোনো প্রকার অংশ গ্রহণ না করেও, ভারত যে বিশ্ব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল, এটা কোন আপতিক ঘটনাও নয় কিংবা কোনো ঐতিহাসিক ব্যতিক্রমও নয়। একই সঙ্গে ঘটেছিল তার আধুনিকতার এবং অনগ্রসরতার বিকাশ।

বস্তুতঃ পক্ষে, অনগ্রসরতা বা পশ্চাদ্‌পদতার মাত্রা বা গভীরতা এবং বিকাশের সম্ভাবনাগুলিকে সংকীর্ণভাবে না দেখে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর (শেষোক্তটির মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের পদ্ধতিকেও ধরা হয়েছে) সামগ্রিকতায় দেখা হলে বোঝা যায় যে এই অনগ্রসরতার মাত্রা এবং বিকাশের সম্ভাবনাগুলি ঠিক এই সংবন্ধন ও ঔপনিবেশিক আধুনিকীকরণের মানের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। তার মানে দাঁড়ায় এই যে, বিশ্ব-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে সংবন্ধনের এই রূপটি কতটা মাত্রায় চূর্ণ হল, তারই উপরে নির্ভর করে বিকাশের ক্ষমতা। বোধহয় এই দুটি কারণের জন্যই দৃষ্টান্ত স্থানীয় এবং স্বাধীনতার প্রাক্কালে ঔপনিবেশিক দেশগুলির মধ্যে সর্বাধিক বিকশিত উপনিবেশ

এই ভারতকে অনেক কম সংহত এবং সেই কারণেই আপাতদৃষ্টিতে অনেক কম বিকশিত আধা-উপনিবেশ চীনের তুলনায় শিল্প-বিপ্লবের পথে "অগ্রসর" হতে গিয়ে ঢের বেশি কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। স্বাধীনতার মর্যাদায় "শান্তিপূর্ণ উত্তরণ"-এর সুবাদে ভারত তার পূর্বতন এবং সেই সঙ্গে নবতন কেন্দ্রীয় দেশের ('মেট্রোপলিস'-এর) সঙ্গে "বন্ধুত্বপূর্ণ" সম্পর্ক বজায় রেখেছিল। পক্ষান্তরে, চীন[৪] ১৯৪৯ সালে ধনতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার বন্ধন সম্পূর্ণ ছিন্ন করে বেরিয়ে যায় এবং সমাজতান্ত্রিক পথ অনুসরণের সিদ্ধান্ত নেয়।

অতএব, আমি সবিনয়ে বলতে চাই যে, আধুনিক ভারতীয় ইতিহাস অনুধাবনের যে পদ্ধতিটির রূপরেখা উপরে দেওয়া হয়েছে—অর্থাৎ বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এবং বিভিন্ন দিক থেকে তার বিবর্তনের এবং বিশ্ব-ধনতন্ত্রের সঙ্গে তার সংহতির এবং সেই সঙ্গে সেই ব্যবস্থার বিরোধিতার ফলে উদ্ভূত শক্তিসমূহের অভ্যুদয়ের একটি প্রক্রিয়া হিসাবে দেখানো হয়েছে, তা সাধারণভাবে ঐতিহাসিক গবেষণার আরও সার্থক কাঠামো হিসাবে এবং বিশেষ করে ভারতের অনগ্রসরতার প্রকৃতি ও ঐতিহাসিক মূল অনুধাবনের পক্ষে প্রয়োজন।

উন্নয়নের বর্তমান নীতিসমূহের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গির তাৎপর্য সুদূর-প্রসারী। ইউরোপীয় ধনতন্ত্রের ক্ষেত্রে পূর্বশর্তগুলি যেখানে আরোপিত হয়েছিল সামন্ততন্ত্র ও প্রাক্ ধনতন্ত্রের দ্বারা, বর্তমান ভারতের ক্ষেত্রে সেখানে পূর্বশর্ত-গুলি মুঘল ভারতের দ্বারা আরোপিত হয়নি, হয়েছে ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ও সমাজের দ্বারা। আর সেগুলি ছিল বিশ্ব-ধনতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অন্যভাবে বলা যায়, ভারতের বিকাশ ও বৃদ্ধি লাভের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির শুরু হয়েছে এই ঔপনিবেশিক 'মডেল' থেকেই, ঐতিহ্য আধুনিকীকরণের 'মডেল' থেকে নয়।

আমাদের ঐতিহাসিক গবেষণা বর্তমানে যে স্তরে আছে, ঔপনিবেশিকতা সম্পর্কে পূর্ণ ও বিশদ বিশ্লেষণের পক্ষে তা আদৌ পর্যাপ্ত নয়। কিন্তু ঔপনিবেশিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আমরা অন্ততঃ সঠিক প্রশ্নগুলি উত্থাপন করতে সক্ষম হব। এই দৃষ্টিভঙ্গির দৃঢ়ভিত্তি স্থাপন করে গিয়েছেন দাদাভাই নওরোজি, এম জি রানাডে, জি ভি যোশী এবং আর সি দত্তর মত জাতীয়তাবাদী ভারতীয় লেখকরা। আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে যাঁরা ঔপনিবেশিক রূপান্তরণের এ রকম এক সামগ্রিক ধারণা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে এঁরাই পুরোধা।[৯] বর্তমান শতাব্দীর চল্লিশের দশকে আর. পাম দত্ত ঔপনিবেশিক ভারত সম্পর্কে অনুশীলনের জন্য এই ব্যাপক বিশ্লেষণাত্মক কাঠামোটিকে আরো উন্নত করেন।[10] কিন্তু এই 'মডেল'টিকে আরো সমৃদ্ধ এবং পরীক্ষামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক অনুশীলনের মাধ্যমে আরো বিকশিত ও উপযোজিত না করে, ১৯৪৭ সালের পর থেকে ভারতীয় গবেষকরা ক্রমেই বেশি বেশি করে উপেক্ষা করে আসছেন।

আমি অবশ্য এ কথা বলছি না যে, ভারতীয় অর্থনীতি ও সমাজের এবং সেই সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনগুলির অভ্যন্তরীণ কাঠামো ও প্রতিষ্ঠান সমূহের বিবর্তন ঐতিহাসিক এবং সেই সঙ্গে সমকালীন উন্নয়নমূলক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয়। যাই হোক, এই বিবর্তন কেবল সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে নিরন্তর ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে এবং তার বহুশীর্ষ আধিপত্যের অধীনেই ঘটেনি, ঘটেছে ঔপনিবেশিকতার বিকাশ-প্রক্রিয়ার একটি ওতঃপ্রোত অঙ্গ হিসাবেই। ঔপনিবেশিকতার মূল কাঠামো অনুধাবন না করে তার সঠিক অনুশীলন সম্ভব নাও হতে পারে।[11] বস্তুতঃ পক্ষে সমাজের অভ্যন্তরীণ কাঠামোও ঔপনিবেশিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। সর্বোপরি, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ঔপনিবেশিকতা যদিও বিকাশের পথে একমাত্র প্রতিবন্ধক ছিল না, তা হলেও সেটাই ছিল গত দু শতাব্দীর ইতিহাসের সর্বপ্রধান দ্বন্দ্ব। অন্য ভাবে বলা যায়, ঔপনিবেশিক কাঠামোর উচ্ছেদ সাধন অর্থাৎ ঔপনিবেশিক উপাদানকে বাদ দিয়ে অর্থনীতি ও সমাজের পুনর্গঠন ছিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের পক্ষে একটি আবশ্যিক শর্ত, যদিও পর্যাপ্ত শর্ত নয়।

আমি এটাও বলতে চাই না যে আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের প্রত্যেকটি সমস্যার আলোচনাতে ঔপনিবেশিকতা অবশ্যই প্রধান ভূমিকা অধিকার করবে, কিংবা, এমনকি, তা সর্বত্রই অনধিকার প্রবেশ করবে। আমি যা বলতে চাই তা এই যে ঐ আমলের উপরে সমস্ত ঐতিহাসিক চর্চাই হবে ঔপনিবেশিকতার প্রেক্ষাপটে, কেননা বড় আকারের প্রত্যেকটি ঘটনাই ঔপনিবেশিকতার কাঠামোর মধ্যে ঘটে থাকে। আর সাম্প্রতিক ইতিহাসের কোনো বড় সমস্যা আলোচনা কোনো ক্ষেত্রেই আমরা ঔপনিবেশিকতার ভূমিকাকে বাদ দিয়ে করতে পারি না। অন্যথা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এক ধরনের গবেষণার সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি, যাতে প্রশাসনিক কর্মনীতি এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রধান উৎস হিসাবে দেখা হয় সংরক্ষণশীলতা, উদারনীতিকতা, প্রগতি-বাদিতা, জাতীয়তা এবং যাবতীয় আধুনিকীকরণ-এর বেশির ভাগ ভাবনা ও ভাবাদর্শ-গুলিকে। এ ধরনের গবেষণার কাজই আমাদের চালিয়ে যেতে হবে।

ঔপনিবেশিকতার অনুশীলন করতে হলে স্বভাবতঃ আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের প্রত্যেকটি বিভাগ নিয়েই তা করতে হবে। ঔপনিবেশিক আধুনিকী-করণ কেবল ভারতীয় অর্থনীতিকেই প্রভাবিত করেনি, সেই সঙ্গে সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের রূপকেও প্রভাবিত করেছে। একটা গোটা জগৎ হারিয়ে গেল, একটা সমগ্র সামাজিক কাঠামো ভেঙে গেল এবং একটা নতুন সামাজিক কাঠামোর জন্ম হল। শেষোক্ত এই সামাজিক কাঠামো ছিল এমন এক সামাজিক কাঠামো যেটা তার জন্মলগ্নেই ছিল স্থাণু এবং ক্ষয়িষ্ণু। একটা সুপরিচিত কথাকে ঘুরিয়ে বললে যা দাঁড়ায়, ভারত একটি পূর্ণাংগ "সাংস্কৃতিক বিপ্লব"-এর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করল। আমি অবশ্য ঔপনিবেশিকতার

কয়েকটি অর্থনৈতিক দিকের মধ্যে নিজেকে নিবদ্ধ রেখেছি—অংশতঃ স্থান ও কালের দাবি অনুসারেই, অংশতঃ বুদ্ধিবৃত্তিক সুবিধার কারণে এবং অংশতঃ, ফার্নিভাল যেমন বলেছেন, "ঔপনিবেশিক সম্পর্কসমূহ মুখ্যত অর্থনৈতিক" সে কারণে। কিন্তু ভারতীয় ইতিহাসের ঔপনিবেশিক গঠন বিন্যাসের অপরাপর ক্ষেত্রেও অনুরূপ এক বিশ্লেষণ প্রয়োগ করা যায়।

দৃষ্টান্ত হিসাবে, অর্থনৈতিক নয় এমন কয়েকটি কৌতূহলোদ্দীক সমস্যা আমি উল্লেখ করতে পারি, যেগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ এখনো বাকি : যেমন, নতুন এক মর্যাদাগত স্তরভেদ ব্যবস্থার বা ক্রমোচ্চতর "সাফল্য-সূচক সোপানশ্রেণী"র উদ্ভব ; প্রশাসনিক যন্ত্রের মধ্যে দুর্নীতির সন্নিবেশ এবং সাধারণ মানুষের প্রতি একটা অবহেলা, বিরুদ্ধতা ও নিপীড়নমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ; চিরাচরিত আনুগত্য মূল্যবোধের ভাঙন এবং তার ফলে ক্রমবর্ধমান সামাজিক অণু-বিভাজন ও অনিয়ম (বা নীতিহীনতা) ; একটি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের উদ্ভব, যে সম্প্রদায় একদিকে ছিল ঔপনিবেশিক সমাজে অন্যতম আশার আলো এবং তার পুনর্গঠনের এক মুখ্য সঞ্চালক। আর অন্য দিকে সে সম্প্রদায় গ্রহণ করেছিল সাম্রাজ্যিক কেন্দ্রের এক বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসঙ্গীর ভূমিকা। এমনকি যখন অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল তখনো সে ভূমিকা অক্ষুণ্ণ ছিল।

বস্তুতঃ পক্ষে, অর্থনৈতিক নয় এমন ক্ষেত্রগুলিতে এই ধরনের বিশ্লেষণের গুরুত্ব আরও অধিক, যেখানে ঐতিহ্য-আধুনিকীকরণের 'মডেল' আরও একটু অগ্রসর হয়েছে।

২

অতীতে যা কিছু শিল্পবিকাশ ভারতে ঘটেছে, কেবল বাণিজ্য ও মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে বিশ্ব-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতীয় অর্থনীতির সংবন্ধনের ফল হিসাবেই তা ঘটেছে—নিম্নোক্ত অতি কৌতূহলকর ঐতিহাসিক ঘটনাটি দ্বারা এই বক্তব্য খণ্ডিত হয় : ভারতীয় অর্থনীতিতে বড় বড় ঘটনা ঘটেছিল ঠিক সেই সেই সময়ে যখন বিশ্ব-ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সঙ্গে তার ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক সংযোগগুলি সাময়িকভাবে দুর্বল বা বিপর্যস্ত হয়েছিল। অন্য দিকে এই সংযোগগুলি শক্তিশালী হবার ফলেই পশ্চাদ্পদ ও অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বৈদেশিক মূলধনের প্রবেশ বিংশ শতকে তিন বার হ্রাস পায় বা বাধাপ্রাপ্ত হয় : দুটি বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এবং ১৯২৯-৩৪ সালের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার কালে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই উৎপাদন ব্যাহত হওয়া দূরের কথা, তা

আরো বৃদ্ধি লাভ করে; বস্তুত পক্ষে, শিল্প-পুঁজিবাদী শ্রেণীর শিকড়গুলি আরো গভীরে প্রবিষ্ট হয়।[12] অপরপক্ষে, যখন 'আন্তর্জাতিক অর্থনীতি' সেই সংযোগগুলি আবার গড়ে তোলে, তখনই ভারতীয় ধনিক শ্রেণীর লাভ বিপন্ন হয়েছে এবং সে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সমর্থন করার জন্য দ্রুত এগিয়ে এসেছে; সে সময়ে এই আন্দোলন উপরোক্ত সংযোগগুলি ভেঙে ফেলার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল।[13]

সংক্ষেপে ভারতের উপরে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের ফলাফল ছিল এই রকম:[14] বৈদেশিক বাণিজ্য, যাকে বলা হয় 'অগ্রগতির বৃহৎ ইঞ্জিন', তা দারুণ ভাবে হ্রাস পেয়েছিল;[15] তার ফলে, স্বদেশের বাজার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় শিল্পগুলির অধিগত হল এবং সরকারও সাধারণ এবং যুদ্ধকালীন প্রয়োজনের দ্রব্যসম্ভারের একটা বড় অংশ ভারতেই ক্রয় করতে বাধ্য হয়েছিল। কৃষিজাত দ্রব্যাদির রপ্তানি কমে যাওয়ায় কাঁচামালের দামের তুলনায় শিল্পজাত সামগ্রীর দাম অনেক বেশি বাড়ল।[16] ব্রিটিশ মূলধন আমদানির হার সাময়িক ভাবে কমল। তার উপরে ১৯১৯ থেকে ১৯২২ সাল অবধি চলল অসহযোগ আন্দোলন যার কর্মসূচী ছিল স্বদেশী গ্রহণ ও বিলাতী বর্জন; আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গে এই আন্দোলনকে বিশ্ব-ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সঙ্গে ভারতীয় অর্থনীতির বন্ধনকে শিথিল করে দেবার সহায়ক কারণ হিসাবে দেখা যায়।

এর ফল দাঁড়ালো এই যে, এমনকি অন্যথা দুর্বল ভারতীয় ধনতন্ত্র কেবল যে সতেজে এগিয়ে যেতে পারল তাই নয়, উপরন্তু এ কথাও বলা চলে যে, এই সময়েই ভারতীয় ধনতন্ত্রের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হল। যাই হোক তা কিন্তু পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নিতে সক্ষম হল না; এই ব্যর্থতার কারণ ভারতীয় ধনতন্ত্রের আরেকটি মূল দুর্বলতা ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের সঙ্গে সংবন্ধনের দরুণ তার কাঠামোর মধ্যে বিন্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। সেই দুর্বলতাটি হচ্ছে এই যে, দেশে কোনো মেশিন নির্মাণ কারখানা ছিলনা এবং যে যুদ্ধ অগ্রগতির সুযোগ মুক্ত করে দিল, সেই যুদ্ধই আবার কারখানার যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সহায়ক উপকরণের আমদানির পথ রুদ্ধ করে দিল।[17] এর ফলে, শিল্পক্ষেত্রে অগ্রগমনের রুদ্ধ আবেগ যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই কোম্পানি সংস্থাপনের উন্মত্ত তৎপরতায় আত্মপ্রকাশ করল।

ভারতীয় পুঁজিপতিদের কর্মতৎপরতার উপরে যুদ্ধের মূল প্রভাব 1 নং সারণীতে প্রদর্শিত হল।[18]

এই বছরগুলিতে ভারতীয় ধনিকেরা পাহাড় পরিমাণ মুনাফাও অর্জন করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১৯১৫ থেকে ১৯২২ সালের মধ্যে তুলা-বস্ত্র শিল্প গড়ে শতকরা ৫৩ ভাগ লভ্যাংশ বন্টন করে।

ক্রমে ক্রমে ব্রিটেন এবং পুঁজিবাদী দুনিয়া যুদ্ধজনিত ক্ষয়ক্ষতি সামলে উঠল এবং ভারতের সঙ্গে তাদের বন্ধনগুলিও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। বৈদেশিক

সারণী 1

	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
শিল্প (সংখ্যা)	495	484	482	478	475	619	717	740
শিল্প : মূলধন লগ্নী (কোটি টাকা)	309	314	331	353	367	395	485	648
খনি (সংখ্যা)	207	210	2[illegible]2	240	270	336	366	386
খনি : মূলধন লগ্নী (কোটি টাকা)	123	118	118	124	135	151	167	317
সূতা (দশ লক্ষ পাউণ্ড)	652	723	681	661	615	636	660	694
তুলাজাত বস্ত্র * (ঐ)	277	352	378	381	350	384	368	403
লোহ (হাজার টন) * *	235	242	245	248	247	317	311	368
ইস্পাত (ঐ) * *	67	76	93	114	130	134	113	125
কাগজ (ঐ)	28·7	30·4	31·9	31·9	31·4	30·9	29·4	28·7
সিমেন্ট (ঐ)	1	18	39	74	84	87	91	133
কয়লা (দশ লক্ষ টন)	16.5	17·1	17·3	18·2	20 7	22·6	18·0	19 3
পাট শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচা পাট (দশ লক্ষ মণ)	24·0	28·1	27·6	26·5	25·0	25·4	27·3	21·20
ভারতীয় জয়েন্ট স্টক ব্যাঙ্কে লগ্নী (কোটি টাকা)	18·36							80 16

সূত্র : শাস্ত্রী, কেবলমাত্র শেষ লাইনটি বিমল সি. ঘোষ-এর 'এ স্টাডি অফ দি ইণ্ডিয়ান মানি মার্কেট, 1943, পৃ 17 থেকে গৃহীত।

* বস্ত্র শিল্পের এই অংশে 1910 থেকে 1914 কার্যত বন্ধ্যা অবস্থা ছিল। বাৎসরিক উৎপাদনের হার ছিল যথাক্রমে 246 (1910), 267 (1911), 267 (1912), 274 (1913)। শাস্ত্রী, পৃ 91।

** শিল্পে উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার হয়। মেশিন আমদানির অভাবের জন্য সম্ভবতঃ শিল্পের খুব বেশি প্রসার হয়নি। তবুও এই শিল্পে প্রচুর মুনাফা হয়েছিল। যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই শিল্পে উৎপাদন ক্ষমতা গড়ে তোলা হয় এবং তারপরই আর্থিক সমস্যার উদ্ভব হয়।

বাণিজ্য পুনরুজ্জীবিত হল ১৯২১ সালের পরে,[19] এবং ভারতীয় শিল্পগুলির বিপুল মুনাফা ব্রিটিশ মূলধনকে বিরাট আকারে আকর্ষণ করল—এটাই আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ।[20] অধিকন্তু, আমদানি প্রসারের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ মূলধন টাকা ও পাউন্ড স্টার্লিং-এর মধ্যে বিনিময় হার উঁচুতে বেঁধে দিল। তার ফলে ব্রিটিশ অর্থনীতির সঙ্গে সংবন্ধন এবং বৈদেশিক আধিপত্যের শক্তিবৃদ্ধি ভারতীয় শিল্পোদ্যমকে ব্যাহত করল। আপেক্ষিক অচলাবস্থার পুনরুদ্ভবের ফলে ভারতীয় অর্থনীতি আধুনিক বলে অভিহিত হবার বদলে আবার 'উত্তরণকালীন' বলে অভিহিত হতে থাকল।[21] শিল্পোৎপাদনে এই আপেক্ষিক অচলাবস্থা 2নং সারণীতে দেখানো হল।

ভারতে রেজিস্ট্রিকৃত নতুন কোম্পানীসমূহের সূচক সংখ্যাও দারুণ হ্রাস পেল।[22]

মন্দা বিশেষভাবে আঘাত করল তুলা-বস্ত্র শিল্পকে,[23] তখন পর্যন্ত তাই ছিল ভারতীয় ধনতন্ত্রের প্রধান উদ্যোগ। উৎপাদনে ঊর্ধ্বমুখী ধারা অব্যাহত রইল, যদিও প্রভূত উৎপাদন ক্ষমতা (ক্যাপাসিটি) অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছিল।[24] তার উপরে, মুনাফাও দারুণ ভাবে হ্রাস পেল।[25] এই পর্বের সূচনায় লৌহ ও ইস্পাত শিল্প কার্যতঃ ধ্বংস হবার মুখে গিয়ে পড়ল।[26] কেবল সংরক্ষণ-মূলক শুল্ক ব্যবস্থা মঞ্জুর হবার পরেই এই শিল্প আরোগ্য লাভ করে। দেখা যাচ্ছে বিশ্ব-ধনতন্ত্রের সঙ্গে সংহতি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে যুদ্ধ চলাকালে অর্জিত গতিবেগই কেবল বিনষ্ট হল না, যুদ্ধকালীন লাভগুলি পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যাবার বিপদ দেখা দিল। ফলে ভারতীয় ধনিক শ্রেণী এবং ঔপনিবেশিক শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্রতর হল। শক্তিশালী এক জাতীয়তাবাদী গণ-আন্দোলনের মুখোমুখি হয়ে ঔপনিবেশিক শক্তি দ্বিধান্বিত সংরক্ষণ ও অন্যান্য সুবিধা দানের নীতির সাহায্যে ভারতীয় পুঁজিপতিদের তুষ্ট করতে চেষ্টা করল।

১৯২২-১৯২৯ সালের অচলাবস্থার সঙ্গে মন্দাকালীন অবস্থার পার্থক্য প্রবল। আন্তর্জাতিক অর্থনীতি তখন সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে যায় এবং তার দৈবীমূর্তি স্বরূপ স্বর্ণমান চিরতরে অন্তর্হিত হয়ে যায়। ভারতীয় অর্থনীতির উপরে ব্রিটিশ কব্জা আরো একবার শিথিল হল। ভারতের বিদেশ বাণিজ্য দারুণ ভাবে হ্রাস পেল এবং স্বদেশের বাজার ভারতীয় শিল্পগুলির কাছে উন্মুক্ত হল। সে বাজার অন্যথা সংকুচিত হয়ে যাচ্ছিল।[27] বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগ হ্রাস পেল এবং ১৯৩১ সালের পরে বৈদেশিক মূলধনের নীট বহির্গমন ঘটল।[28] সাম্রাজ্যিক কেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ শিথিল হয়ে যাওয়ায় আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল ফলল। বাণিজ্যিক মূলধন, বিনিয়োগের পরিধি অকস্মাৎ সংকুচিত হয়ে গেল—তা ছিল সাম্রাজ্যিক সংযোগের ফল এবং তা বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। একই ভাবে তেজারতি কারবারে বিনিয়োজিত যে মূলধন তারও বিনিয়োগের পথ কৃষিতে সংকটের দরুণ সংকুচিত হল।

সারণী 2

	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929
শিল্প (সংখ্যা)	740	755	748	739	738	738	741	754	761
শিল্প : মূলধন লগ্নী (কোটি টাকা)	648	726	747	742	726	722	714	720	716
খনি (সংখ্যা)	386	374	364	358	344	338	330	327	335
খনি : মূলধন লগ্নী (কোটি টাকা)	317	402	418	416	418	420	400	402	396
সুতা (দশ লক্ষ পাউন্ড)	694	706	617	719	686	807	809	648	834
তুলাজাত বস্ত্র (ঐ)	403	405	402	459	465	539	568	446	562
লোহ আকর (হাজার টন)	368	320	490	673	880	920	1140	1052	1392
ইস্পাত * (ঐ)	125	112	151	248	320	360	429	726	412
কাগজ (ঐ)	28.7	23.9	26.0	25.7	28.6	32.1	33.9	38.1	40.8
সিমেন্ট (ঐ)	133	151	244	264	361	388	478	558	561
কয়লা (দশ লক্ষ টন)	19.3	19.0	19.7	21.0	20 9	21.0	22.1	22.5	23.4
চিনি (হাজার টন)	75 4	74.1	94.7	67.4	91 4	120.0	119.8	99.1	111.0
পাট শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচা পাট (দশ লক্ষ মণ)	21·2	23.1	25.0	27.6	26 7	26.8	28.2	29.4	31.2
ভারতীয় জয়েন্ট স্টক ব্যাঙ্কে লগ্নী (কোটি টাকা)	80 2	65.0	47.7	55.2	57 9	63.2	64.3	66.4	66.3

সূত্র : শাস্ত্রী, কেবলমাত্র শেষ লাইনটি সুব্রহ্মনিয়াম ও হমফ্রে-র 'রিসেন্ট সোশ্যাল অ্যান্ড ইকনমিক ট্রেন্ডস ইন ইন্ডিয়া 1946' থেকে গৃহীত।

* 1924 সালে লোহ ও ইস্পাত শিল্পে শুল্ক মকুব হয়।

অনুরূপ ভাবেই তা ছিল ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক কাঠামোর ফল স্বরূপ। জমিতে আরও বিনিয়োগের আকর্ষণ রইল না। অতএব, সাম্রাজ্যিক কেন্দ্রের অর্থনৈতিক বন্ধনের শিথিলতা বাণিজ্যিক ও তেজারতি মূলধনকে শিল্পে সরে যেতে বাধ্য করল, যদিও শিল্পে সুদের হার ছিল কম। বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে বৈদেশিক বাণিজ্যের ভূমিকা খর্ব হয়ে যাওয়ায়, শিল্পপতিরা উপস্থিত শিল্পগুলি থেকে প্রাপ্ত মুনাফাকে পুনর্বিনিয়োগ করতে বাধ্য হলেন।

এই সময়ে শুল্ক নীতিতে পরিবর্তন ঘটল। মন্দার দ্বারা দারুণভাবে ক্লিষ্ট কৃষকেরা যাতে ভারতে উদীয়মান বামপন্থী আন্দোলনে যোগ না দেয়, সরকার সেজন্য চিনি ও তুলা বস্ত্র শিল্পে সংরক্ষণ চালু করল। একই ভাবে, শিল্প ও বাণিজ্যিক বুর্জোয়ারা যাতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে আরো সক্রিয় সাহায্য না দেয়; চিনি, বস্ত্র এবং আরো কয়েকটি শিল্পেও সেজন্য একই ভাবে সংরক্ষণের সুযোগ দেওয়া হল।[৩৯] অধিকন্তু, মন্দাকালীন জরুরী বছরগুলিতে স্বদেশী শিল্পসমূহ স্বদেশী গ্রহণ ও বিলাতি বর্জনের সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী কর্মসূচী থেকে সামাজিক সংরক্ষণ লাভ করতে আরো একবার সক্ষম হল। কৃষিজাত কাঁচামালের দাম শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রীর দামের তুলনায় ঢের বেশি পড়ে গিয়েছিল।[৪০] কয়েকটি শিল্প এই ঘটনা থেকেও সাহায্য পেল।

মন্দা ও পড়তির বছরগুলির শিল্পোৎপাদন 3 নং সারণীতে প্রদত্ত হল।

এই ভাবে, মন্দার বছরগুলিতে, গোটা পুঁজিবাদী দুনিয়ায় শিল্পোৎপাদন যখন ধ্বসে পড়ছিল এবং স্বদেশের বাজার এমন সাংঘাতিক ভাবে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছিল যে মানুষ বাধ্য হচ্ছিল তাদের রূপার ও সোনার গয়নাপত্র জলাঞ্জলি দিতে[৪১] স্বদেশের বাজারের উপরে নির্ভরশীল ভারতীয় শিল্পগুলি তখন মন্দার সবচেয়ে কুফলগুলি থেকে কেবল রক্ষাই পেল না, নতুন নতুন ক্ষেত্রে শাখা বিস্তার করতেও সক্ষম হল। কোন বিচারেই এটা তুচ্ছ সাফল্য নয়। অধিকন্তু, নতুন শিল্পের প্রধান প্রধান এলাকায় মূলধনের সংস্থান করল ভারতীয়রা নিজেরাই।[৪২] ব্যাংক ও বীমার ক্ষেত্রেও প্রধানতঃ ভারতীয় মূলধনেরই অগ্রগতি ঘটেছিল।[৪৩] একথাও উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই বর্তমান শতাব্দীর ত্রিশের দশকেই চিনি, সিমেণ্ট, দেশলাই, এমনকি ইস্পাত শিল্পেরও দৃঢ় প্রতিষ্ঠা সংঘটিত হয়েছিল। বাস্তবিক পক্ষে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যদি ভারতীয় ধনতন্ত্রের দৃঢ় ভিত্তি রচনা করে থাকে, তা হলে মন্দার বছরগুলিতে তা সাবালকত্ব লাভ করে একথা বলা চলে। এ সময়ে তা সাম্রাজ্যিক কেন্দ্রের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে এবং নিজেকে শক্তিশালী করে তোলে। এই বছরগুলিতেই আধুনিক ভারতীয় ধনিকদের বেশ কয়েকটি গোষ্ঠী, যেমন, বিড়লা, ডালমিয়া, জৈন, সিংহানিয়া, থাপার প্রমুখ শিল্পক্ষেত্রে প্রবেশ করল। এ কথাও উল্লেখ করা যায় যে,

সারণী 3

	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937
শিল্প (সংখ্যা)	761	764	786	790	845	874	924	—	—
শিল্প ঃ মূলধন বিনিয়োগ (কোটি টাকা)	716	677	684	700	701	689	671	—	—
খনি (সংখ্যা)	335	333	331	325	384	391	399	—	—
খনি ঃ মূলধন বিনিয়োগ (কোটি টাকা)	386	388	390	390	406	399	404	—	—
সুতা (দশ লক্ষ পাউণ্ড)	834	867	966	1016	921	1001	1058	1054	1160
তুলাজাত বস্ত্র (ঐ)	562	590	672	695	646	737	761	782	864
লৌহ আকর (হাজার টন)	1392	1175	1056	913	1058	1320	1452	1540	1621
ইস্পাত * (ঐ)	412	434	450	427	531	604	646	667	660
কাগজ (ঐ)	40.8	39.8	40.7	40 6	43.4	44.5	47 6	48.5	57.1
সিমেণ্ট (ঐ)	561	570	583	586	642	748	886	997	1170
চিনি (ঐ)	111	152	228	370	515	617	982	1131	947
কয়লা (দশ লক্ষ টন)	23 4	23.8	21.7	20.2	19.8	22.1	23.0	22.6	25.0
পাট শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচা পাট (দশ লক্ষ মণ)	31.2	22.2	20.8	21.2	21.0	22.2	24.4	29 5	32.6
ভারতীয় জয়েণ্ট স্টক ব্যাঙ্কে লগ্নী (টাকা কোটি)	66.3	67.7	66.2	76.2	76.4	81.9	89.7	103 6	108.6
ভারতীয় বীমা কোম্পানীতে নতুন বীমা (টাকা কোটি)	17.3	16.5	17.8	19.7	24.8	28.9	32 8	37.8	41.7

সূত্র ঃ শাস্ত্রী, কেবলমাত্র শেষ দুই লাইন সুব্রহ্মনিয়াম ও হমক্লে থেকে গৃহীত।

* ব্রিটেন থেকে আমদানী করা ইস্পাতের উপর 1927 সালে আমদানী শুল্ককমিয়ে এবং ঐ বছরই টাটাকে প্রদত্ত ভরতুকী প্রত্যাহার করে রাজকীয় সুবিধাদানের ফলে ইস্পাত শিল্পে প্রদত্ত সামান্য সুবিধাগুলিও অবলুপ্ত হয়। 1934 সালে বর্ধিত শুল্ক চালু হয়, কিন্তু এর আগেই ইস্পাত উৎপাদনের উন্নতি হয়।

যেসব শিল্প রপ্তানি বাজারের মালের যোগান দিত, তাদের ভাগ্য কিন্তু হয়েছিল সম্পূর্ণ আলাদা। মন্দার পূর্ণ প্রকোপে তাদের ভুগতে হয়েছিল।[৩৪]

4নং সারণীটিতে দেখা যাবে যে ভারতীয় শিল্পগুলিকে মন্দা পরবর্তী অচলাবস্থার দুর্ভোগ পোহাতে হয়নি।[৩৫] তার কারণ এই যে ১৯৩৪ সালের পরে বিশ্ব-ধনতন্ত্র পুরোপুরি আরোগ্য লাভ করেনি এবং তা দ্রুত পড়তির অবস্থায় গিয়ে পড়ে। তা ছাড়া, প্রধান প্রধান ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিগুলি অচিরে এক অস্ত্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। বিশেষ করে, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যিক এবং কৃষিজাত দ্রব্যাদির দামে মন্দার ভাব কাটে না। এর ফলে তার শিল্প বাণিজ্য. ফটকা ও তেজারতি ব্যবসাগত মূলধনের পক্ষে শিল্পের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পথ অব্যাহত থেকে গেল। মূলধনের আমদানিও থেকে গেল নগণ্য।

একটি মাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বাকি অবস্থাগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আবার পুরোপুরি আত্মপ্রকাশ করেছিল। সেই ব্যতিক্রমটি এই যে দ্রব্যসম্ভারের ক্রয়, বিদেশী সৈন্য মোতায়েন এবং ভারতীয়দের নিয়োগের মাধ্যমে যুদ্ধ প্রচেষ্টার আয়তন ঢের বেশি বড় আকার ধারণ করেছিল।[৩৬] অধিকন্তু তখন জাপান ছিল না যে বাজারের একটা অংশ দখল করে নেবে। কেবল যে নতুন কোনো ব্রিটিশ মূলধনের প্রবেশ ঘটেনি তাই নয় উলটে কিছু ব্রিটিশ মূলধন স্বদেশে ফেরৎ গিয়েছিল। কিছু কালের জন্য আন্তর্জাতিক যোগাযোগ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ফল কি হয়েছিল, তা সুপরিজ্ঞাত। শিল্পোৎপাদনে যে-প্রেরণা সঞ্চারিত হয়ে ছিল, 4নং সারণীতে তা প্রদর্শিত হল।

সারণী 4

			1938		1944
তুলাজাত বস্ত্র (দশ লক্ষ পাউন্ড)			864		1,200
সুতা	(ঐ)	(1937 এর হিসাব)	1,160		1,651
ইস্পাত	(দশ লক্ষ টন)	(1937 ,,)	.726		.923
সিমেন্ট	(ঐ)		1.512		2.044
চিনি	(দশ লক্ষ হন্দর)		13.360		22.439
কাগজ	(ঐ)		1.184	(1943)	2.001
বিদ্যুৎ শক্তি (দশ লক্ষ ইউনিট)		(1939)	2.533		3.823
ভারতীয় জয়েন্ট স্টক ব্যাঙ্কে লগ্নী (কোটি টাকা)			106.81	(1943)	359.89
ভারতীয় বীমা কোম্পানীতে নতুন বীমা (কোটি টাকা)			46.68	(1943)	65.23

সূত্র : সুব্রহ্মানিয়ম ও হমড্রে। পৃ 42-44, 56। সুতা বস্ত্র ও সুতার 1937 সালের হিসাব শাস্ত্রী থেকে নেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় ধনিকরা বিপুল মুনাফা করল।[৩৭] উপরন্তু ভারতীয়

পুঁজিপতিশ্রেণী তার আর্থিক বনিয়াদকে দারুণভাবে জোরদার করে তুলল এবং এই দিক থেকে ব্রিটিশ মূলধনকে অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল।[38] হিসাব করে দেখা গিয়েছে, যে ভারতীয় অর্থনীতিতে বিনিয়োগ জাতীয় আয়ের সাত বা আট শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।[39]

এই ভাবে ভারতীয় ধনিক শ্রেণী যুদ্ধোত্তর যুগে প্রবেশ করল বৃহত্তর শক্তি এবং সেই সঙ্গে বৃহত্তর প্রতিশ্রুতি নিয়ে। এক দিকে, সে নতুন নতুন বিনিয়োগের সুযোগ সন্ধানে সাহসিক পদক্ষেপ করল। ১৯৪৩-৪৪ সালে প্রায় সমস্ত প্রধান শিল্প পুঁজিপতি মিলে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিল, তা থেকেই এটা সুস্পষ্ট। অন্য দিকে তার এই আশংকাও ছিল যে সাম্রাজ্যিক কেন্দ্রের সঙ্গে ভারতের অর্থনীতির সংবন্ধন আরো বৃদ্ধি করে ব্রিটিশ মূলধন চেষ্টা করবে ভারতের স্বার্থের বিনিময়ে তার ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থানের প্রতিকার সাধন করতে।[40] সুতরাং ভারতীয় ধনিক শ্রেণী ভারি শিল্পের জন্য নিজস্ব দাবি উত্থাপন করল, এমনকি যদি তার ফলে রাষ্ট্রীয় মালিকানার ব্যবস্থা উদ্ভব ঘটে, তবু সে দাবি করল, রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা এবং তার সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ পোষকতা, এমনকি তার ফলে যদি শক্তিশালী রাষ্ট্রায়ত্ত এলাকার উদ্ভব ঘটাতে হয়, তা হলেও ভারতীয় পুঁজিপতিরা তাতে রাজি ছিল।[41] ব্রিটিশ মূলধনের নতুন করে প্রবেশের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ করল এবং যে ফাঁস তাদের গলায় আগে থেকেই বসে 'আছে' তা শিথিল করার দাবি জানাল। যেমন জি ডি বিড়লা দাবি করলেন, "সমস্ত ব্রিটিশ মূলধনকে স্বদেশে ফেরৎ পাঠাতে হবে[42] এবং ভারতীয় বণিক সমিতির সভাপতি এম এ মাস্টার হুঁশিয়ারি দিয়ে বললেন, "ভারত বরং শিল্পবিকাশ ব্যতিরেকেই চলবে কিন্তু এই দেশে নতুন নতুন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পত্তন হতে সে দেবে না, কেননা তা হবে ...তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পরিপন্থী।"[43] বম্বে পরিকল্পনায় প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের কোনো সংস্থান ছিল না; তার মোট বিনিয়োগের মাত্র ৭ শতাংশ বৈদেশিক ঋণের মাধ্যমে সংগ্রহের সংস্থান ছিল।[44]

ভারতে শিল্প-পুঁজিপতি শ্রেণীর বিকাশের এই সমীক্ষা থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, বিদেশী মূলধন বিনিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থনৈতিক আধুনিকীকরণের যে শক্তিগুলি প্রতিনিধিত্ব করে, তাদের দ্বারা এই বিকাশ সংঘটিত হয়নি। ধনতন্ত্রের বিশ্বব্যাপী-ব্যবস্থা হিসাবে এই শক্তিগুলি তখন ব্রিটেনে এবং অস্ট্রেলিয়া ও ক্যানাডার মত খাস-উপনিবেশ দুটিতে কেবল বিকাশের অগ্রগতি ঘটিয়েছিল কিন্তু ভারতে ঘটিয়েছিল বিকাশের অনগ্রগতি। বরং ভারতে এই ধরনের বিকাশের অগ্রগতি কেবল তখনি ঘটেছিল যখন ঔপনিবেশিক আধুনিকীকরণের শক্তিগুলি দুর্বল হয়ে পড়েছিল।[45] ভারতীয় ধনতন্ত্রের বিকাশ অবশ্য হয়েছিল ব্যাহত ও সীমিত।[46] সামগ্রিক ঔপনিবেশিক সম্পর্কের পরিবেষ্টনের মধ্যে বিকাশ ঘটার কারণেই এটা সম্ভব হয়েছিল। দুটি যুদ্ধ এবং মন্দা সাম্রাজ্যিক কেন্দ্রের সঙ্গে বন্ধনকে শিথিল

করেছিল মাত্র; কিন্তু বন্ধন ছিল সব সময়েই প্রকট এবং বিদ্যমান। ঔপনিবেশিকতার কাঠামোগত দিকগুলি কোনো পর্যায়েই চূর্ণ কিংবা রূপান্তরিত হয়নি। ফলে শিল্পোন্নয়ন হয়েছিল সত্য, শিল্প-বিপ্লব কিন্তু ঘটেনি।[47] দেশ অনগ্রসর অর্থনীতির চিরায়ত 'মডেল'ই থেকে গেল।

সেই সঙ্গে এই সীমাবদ্ধ শিল্পোন্নয়নের কল্যাণে দেশের অর্থনীতির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলির একটি চিত্র আভাসিত হয়ে উঠল। সুযোগ যখন এল, শিল্পোদ্যোগীর অভাব তখন হল না; প্রচলিত মূল্যবোধ ('আধ্যাত্মিকতা', 'বৈরাগ্য' ইত্যাদি), জাতিভেদ, যৌথ পরিবার, আধা-সামন্ততান্ত্রিক বিনিয়োগের প্রতি ভারতীয়দের তথাকথিত স্বভাবসিদ্ধ প্রবণতা, শিল্প-শ্রমিকের অভাব এবং এই ধরনের অন্যান্য প্রতিবন্ধকগুলিও (যেগুলিকে অতীতে প্রায়ই ব্যবহার করা হত অনগ্রসরতার কৈফিয়ৎ হিসাবে এবং এখনো মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হয় ঐ একই ভাবে) বাধা সৃষ্টি করল না।

৩

ভারতের মত দেশগুলির অনগ্রসরতার প্রকৃতি অনুধাবনের একটি কৌতূহলকর পদ্ধতিকে বলা যায়, "প্রারম্ভিক পরিস্থিতি"-গত দৃষ্টিভঙ্গি। ঔপনিবেশিক অবস্থার মর্মে উপনীত হবার জন্য আমি এই দৃষ্টিভঙ্গিটির একটি বিচারমূলক পর্যালোচনা ব্যবহার করব। এই দৃষ্টিভঙ্গির অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক ভাষ্যটি উপস্থিত করেছেন সাইমন কুজনেৎস। একদিকে স্বাধীনতার পরে অনগ্রসর দেশগুলি (ভারতসহ) যে সমস্ত মূল অর্থনৈতিক নির্দেশক বৈশিষ্ট্য বা প্রারম্ভিক অবস্থা থেকে তাদের উন্নয়নমূলক কর্মসূচী শুরু করতে বাধ্য হয়েছিল এবং অন্যদিকে উপস্থিত অগ্রসর দেশগুলির শিল্পবিকাশের প্রাক্কালীন প্রারম্ভিক পরিস্থিতি—এই দুয়ের মধ্যকার পার্থক্যগুলিকে এই দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরে।[48] এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রারম্ভিক প্রতিশ্রুতি বিপুল। দুটি প্রারম্ভিক পরিস্থিতির মূলগত ভাবে বিসদৃশ দিকগুলিকে তা তুলে ধরতে চেষ্টা করে। এর ফলে বোঝানো যায় যে, অগ্রসর দেশগুলি অতীতে যেসব নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করেছে, সেই সব নীতি ও পদ্ধতি অনগ্রসর দেশগুলির পক্ষে পুরোপুরি প্রযোজ্য নয়; এই দেশগুলির বিশেষ ধরনের উন্নয়নমূলক মূলনীতি এদের নিজেদেরই তৈরি করে নিতে হবে।[49] এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা ডবলু ডবলু রস্টাউ ও অন্যান্যদের তীব্র সমালোচক; তাঁরা ধরে নেন যে অগ্রসর দেশগুলি এক কালে যে সব পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এসেছে, সেই সবেরই কোন না কোন পর্যায়ে অনগ্রসর দেশগুলি বর্তমানে রয়েছে এবং সেই কারণেই এঁরা

বিশ্বজনীন প্রতিকারে দাওয়াই প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেন।[৫০] যাই হোক, এটা আশ্চর্যের কথা যে দু ধরনের প্রারম্ভিক পরিস্থিতির মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে তাঁরা তাঁদের নিজেদের মূল্যায়নকে কেবল কারিগরি-অর্থনৈতিক (কার্যসম্পাদনগত) বা পরিমাণগত দিকগুলির মধ্যে সীমাবন্ধ রাখেন।[৫১] কাঠামোগত পার্থক্য, মূলগত বৈসাদৃশ্য এবং এই সমস্ত পার্থক্যের ঐতিহাসিক উৎসগুলি খুব কদাচিৎ উল্লেখ বা আলোচনা করা হয়। তাঁদের প্রতিশ্রুতি অস্বস্তিকর ভাবে অপূর্ণই থেকে যায়। এবং তার পরে, হঠাৎ হাত ঘুরিয়ে অনগ্রসর দেশগুলির বর্তমান অবস্থার কারণ হিসাবে দুটি পরিস্থিতির পার্থক্যগুলিকে খোলাখুলি বা আভাসে ইঙ্গিতে তুলে ধরা হয়। কেউ কেউ এই প্রারম্ভিক পরিস্থিতির উপাদানগুলিকেই অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক বলে আলোচনা করেন; বোঝাতে চান যে এই কারিগরি-অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকগুলির কোনো সাম্প্রতিক ইতিহাস নেই, এগুলি নিজেরাই নিজেদের কারণ কিংবা 'সনাতন' বা আদিম অনগ্রসরতার অভিব্যক্তি।[৫২] কুজনেৎস ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের উপরে গুরুত্ব আরোপ করেন সত্য, কিন্তু ঔপনিবেশিকতার ভূমিকা সম্পর্কে একটা সঠিক উপলব্ধি তাতে স্থান পায় না। আলেক্‌জাণ্ডার গেরশেনক্রন প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি প্রারম্ভিক পরিস্থিতি ও 'অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে' অনুশীলন করবেন, কিন্তু তাঁর পরিপ্রেক্ষিত অনগ্রসরতার মাত্রা ছাড়িয়ে যায় না।[৫৪]

ভারতের অনগ্রসরতার কাঠামোর ঐতিহাসিক বিবর্তন, তার কার্যকারণ ও অর্থনৈতিক ভিত্তি নিরূপণের উৎস হিসাবে তা অনুধাবনের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রারম্ভিক পরিস্থিতি দুটিতে পার্থক্যের প্রশ্নটি ভুল ভাবে উত্থাপন করা হয়েছে। অর্থপূর্ণ ফল লাভ করার জন্য এবং ইতিহাস থেকে আরো অর্থপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে সক্ষম হবার জন্য, এক দিকে ব্রিটিশ পূর্ববর্তী অতীতের এবং ঔপনিবেশিক যুগের সূচনার প্রারম্ভিক পরিস্থিতি এবং অন্যদিকে অগ্রসর দেশগুলিতে শিল্প-বিপ্লবের প্রারম্ভিক পরিস্থিতির মধ্যে তুলনা করা প্রয়োজন। সুতরাং আমি প্রথমে এখানে, কুজনেৎস এবং অন্যান্যরা প্রারম্ভিক পরিস্থিতি দুটিতে যেসব পার্থক্যের উল্লেখ করেছেন, সেগুলি উপস্থিত করব এবং তার পরে, এই পার্থক্য-গুলি কতটা পরিমাণে প্রাক-ব্রিটিশ ভারতে প্রযোজ্য তা সংক্ষেপে বিবৃত করব।

আজকের দিনের ভারতের এবং অন্যান্য অনগ্রসর দেশের প্রারম্ভিক পরিস্থিতি নিম্নলিখিত দিকগুলির বিচারে অনিবার্যভাবেই অধিকতর প্রতিকূল বলে পরিলক্ষিত হয়: (১) মাথা পিছু আয়ের নিচু হার, (২) অর্থনীতিতে সঞ্চয় বা উদ্বৃত্ত বা বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের নিচু হার (এটি প্রথম উপাদানেরই ফল। শেষোক্তটি আবার অল্প সঞ্চয় এবং নিম্নোক্ত উপাদানগুলির ফল); (৩) মাথাপিছু উপযুক্ত পরিমাণ জমি না পাওয়া বা কৃষিতে যথেষ্ট সংখ্যক লোকের অভাব; (৪) উৎপাদন হার হ্রাস, ফলে শহরাঞ্চলে বিপণন-যোগ্য উদ্বৃত্তের অপ্রতুলতা; (৫) কৃষির উপরে অধিকতর নির্ভরশীলতা, (৬) জন-সংখ্যার মাত্রাধিক ঘনত্ব এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চ হার; (৭ যোগাযোগ

ব্যবস্থার হাল খারাপ বলে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের মানও কাজেকাজেই ভাল নয় ; (৮) বাজার বা 'অর্থ'-ভিত্তিক অর্থনীতির বা অর্থায়িত এলাকার সীমাবদ্ধ পরিধি ; (৯) ঋণ ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতা ; (১০) অর্থনৈতিক কর্মানুষ্ঠানের নিম্নমান ; (১১) জনগণের নিম্নতর সাংস্কৃতিক মান, দক্ষতা ও সাক্ষরতার নিম্নতর হারের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ পায়, ফলে দক্ষ শ্রমিক এবং কৃৎকৌশলী কর্মীর অভাব ঘটে ; (১২) দুর্বল রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোর কারণে একদিকে স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার অভাব ঘটে এবং অন্যদিকে "সরকার ও জনগণের স্বার্থের মধ্যে ফলপ্রসূ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার" অভাব দেখা দেয় ; (১৩) সভ্যতার নানাধরনের ঐতিহ্য (একদিকে, 'রেনেসাঁস' 'প্রটেস্ট্যান্ট' ও ধর্ম-নিরপেক্ষ বিপ্লবের, একটা ধনতান্ত্রিক পরিবেশের এবং ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের পূর্ববর্তী ধনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুপস্থিতি ; অন্যদিকে সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক ধাঁচের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রাধান্য) ; (১৪) অর্থনৈতিক অগ্রগতির পরিপন্থী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ; (১৫) শিল্প ও প্রযুক্তিবিদ্যার নিম্নমান ; (১৬) ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য।[৫৪] ইশিকাওয়া এবং মিরডাল আরো কয়েকটি যোগ করেছেন, এবং আমার মতে এই পার্থক্যগুলি আরো তাৎপর্যপূর্ণ ঃ (১৭) কৃষি-জমিতে, যেমন বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও জল-নিষ্কাশন, বুনিয়াদি বিনিয়োগের অভাব ; (১৮) মেইজি জাপানে যেমন ঘটেছিল, এখানে কৃষি থেকে সেভাবে শিল্পায়ন কর্মসূচির অর্থসংস্থান করা গেল না ; (১৯) বিশ্ব-বাজারের পরিবর্তিত অবস্থা অনগ্রসর দেশগুলির সাগর পারের বাণিজ্য সংকুচিত করে, ফলে দেখা দেয় বিনিময় সংকট এবং যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের ক্রয়ের অক্ষমতা ; (২০) কৃৎকৌশল ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের অধিকতর জটিলতা বৃদ্ধির কারণে দরকার হয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে পারদর্শিতাসম্পন্ন ইঞ্জিনিয়র ও বৈজ্ঞানিক এবং বৃহত্তর আকার ও আয়তনের 'প্ল্যান্ট'। এর জন্য আবার দরকার হয় বিপুলতর প্রারম্ভিক মূলধন বিনিয়োগ, মূলধন বঞ্চিত দেশগুলির পক্ষে তা সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য। আর সেই প্ল্যান্টগুলির সুনিপুণ ও মিতব্যয়ী পরিচালনার জন্য আবশ্যক বৃহৎ আকারের বাজার—দরিদ্র দেশ-গুলিতে ঠিক এই জিনিসটির অভাব ; (২১) উপনিবেশ সমূহের অনুপস্থিতি অর্থাৎ বাজার, মানুষ ও সম্পদ শোষণ যেখান থেকে করা যায় সেগুলোই নেই।

মুঘল ভারতে বা উনিশ শতকের গোড়ার দিককার পরিস্থিতির আলোকে আমরা যদি প্রারম্ভিক পরিস্থিতির এই পার্থক্যগুলি বিচার করি, তা হলে দেখব যে তাদের বেশির ভাগই আদৌ প্রযোজ্য নয়, কিংবা ভারতের প্রারম্ভিক পরিস্থিতি এবং ইউরোপের অগ্রসর দেশগুলির এবং জাপানের শিল্প-পূর্ব অবস্থার মধ্যে খুব বেশি ব্যবধান ছিল না।[৫৫] তাদের মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য থেকে মুঘল ভারতে ধনতন্ত্রের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা এবং তৎকালীন ভারতের উপরে আধিপত্য[৫৬] বিস্তারে ব্রিটেনের সফলতার কারণের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কতক-গুলি পার্থক্য 'অনুকূল' দিকে পরিবর্তিত হয়েও ব্যবহৃত হয়েছিল ঔপনিবেশিক

কাঠামো চাপিয়ে দেওয়ার পক্ষে।[৫৭] সর্বশেষে, উদীয়মান প্রযুক্তিবিজ্ঞানগত শক্তিগুলির সুযোগ গ্রহণে ঔপনিবেশিক ভারতের ব্যর্থতার কারণে বাকি পার্থক্য-গুলির উদ্ভব ঘটেছিল।[৫৮] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধগুলিকে বাদ দিলে আজকের প্রতিকূল প্রারম্ভিক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছিল ঔপনিবেশিক যুগে—এই যুগেই ঘটেছিল "বাইরে থেকে আধুনিকী-করণের আক্রমণ।" সাম্প্রতিককালে ভারতের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতায় উপরোক্ত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধগুলির ভূমিকা আমি পরে আলোচনা করব।[৫৯] তাছাড়া, ভারতের অর্থনীতি সংবদ্ধ হয়েছিল বিশ্বধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সঙ্গে।[৬০] আমি পরিষ্কার বলতে চাই যে আমার উদ্দেশ্য এখানে সাম্রাজ্যবাদের উপরে 'দোষারোপ করা'র উদ্দেশ্যে অতীতকে খুঁচিয়ে তোলা নয়, যেসব অভ্যন্তরীণ শক্তি ও উপাদান ভারতের অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে তাদের সাফাই গাওয়াও নয়, এমনকি অনগ্রসর দেশগুলির নেতারা, বিদ্বজ্জন ও নাগরিকেরা প্রায়শঃই যে পাশ্চাত্ত্য-বিরোধিতার মানসিক প্রবণতায় ভোগেন, তাকে অভিব্যক্তি দেওয়াও নয়।[৬১] আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের অতীত ও বর্তমানকে অনুধাবন করা, বর্তমানের উপরে আলোক সম্পাত করার কাজে ইতিহাসকে ব্যবহার করা। উপরন্তু, বিকাশের কার্যক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার (প্রারম্ভিক পরিস্থিতির) প্রকৃতির সামগ্রিক প্রশ্ন এবং তার ঐতিহাসিক উৎসগুলির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য রয়েছে। বিকাশের কার্যক্রম নির্ধারণ সমকালের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

উপরোক্ত পার্থক্যগুলির উদ্ভব কেমন করে ঘটেছে, প্রারম্ভিক পরিস্থিতিগত দৃষ্টিভঙ্গির সংশোধিত সংস্করণ অবশ্য আমাদের তা বলে দেয় না।[৬২] অর্থাৎ কোন প্রক্রিয়ায় প্রথাগত অর্থনীতি ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে বিবর্তিত হয়েছে কিংবা এই পার্থক্যগুলির কাঠামোগত মাত্রাগুলি কি কি তা বলে দেয় না। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রটিকে তা কিছুটা পরিষ্কার করে এবং নিম্নোক্ত প্রশ্নটি উত্থাপন করতে আমাদের প্রণোদিত করে ঃ ব্রিটিশ শাসনের গত ১৫০ বছর ধরে অর্থনীতির বিকাশ ঘটল না কেন?

প্রারম্ভিক পরিস্থিতিকে যখন দেখা হয় অনগ্রসরতার কারণ হিসাবে এবং অনগ্রসরতা পরিস্থিতিকে ভাবা হয় সেকেলে বলে, সেই সব ক্ষেত্র ছাড়া, ঔপনিবেশিকতাকে বাদ দিলে আরো তিনটি উপাদানের উপর প্রায়ই মূল দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

প্রথমতঃ বলা হয় যে, জাতিভেদ, যৌথ পরিবার ইত্যাদির মত অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং প্রচলিত আচার, অভ্যাস, বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল—বিশেষ করে, শ্রমিক, কৃষক, শিল্পোদ্যোগী এবং যারা সঞ্চয় করতে সক্ষম তাদের আবরণের উপরে প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে এটা করা হয়েছিল। অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ ও অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ কিছুটা অনীহার সঙ্গে এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করে থাকেন। ঐতিহাসিক

ব্যাখ্যাদানে তাঁদের প্রয়াসের অবশিষ্ট এবং সম্ভবতঃ দুঃখজনক ফলশ্রুতি হিসাবেই তাঁরা এটা করেন।[63] এই ব্যাখ্যাতে মন আর ভরছে না এমন লোকের সংখ্যা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বেড়েই চলেছে। সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকরা দেখিয়েছেন যে ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নেই বললেই চলে।[64] পুঁজিবাদী শিল্প সংস্থার অভাব আধুনিক কালে ভারতীয় ধনিক শ্রেণীর উদ্যোগশীলতার অর্থাৎ তার মুনাফা তৈরির উদ্যমের অভাবের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়না ; বরং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার অভাবের দ্বারাই তা পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যাত হয়। ঠিক এই গুণগুলিই ব্যাখ্যা করে ব্যবসা ও তেজারতির প্রতি এই শ্রেণীর আসক্তির কারণ। কিন্তু উল্লিখিত দ্বিতীয় অংশে আমি যেমন দেখিয়েছি, শিল্পে রূপান্তর যখন এই শ্রেণীর স্বার্থের পক্ষে অনুকূল হয়ে উঠল, তখন সে শিল্পে আত্ম-নিয়োগ করতে দ্বিধা করেনি।[65] কখনো কখনো এই প্রশ্নটিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়, এই প্রতিষ্ঠান ও মূল্যবোধগুলি অবশ্যই সে বিপ্লবের প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করে।[66]

দ্বিতীয়তঃ, এমন কথাও বলা হয় যে অতীত অনগ্রসরতার ভার এত বিপুল যে বাইরে থেকে আসা আধুনিকীকরণ তাতে বেশ বড় রকমের কোনো ভাঙন ধরাতে পারেনি। এই বক্তব্যটি সম্ভবতঃ গেরশেনক্রনের তত্ত্ব থেকে নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করেছে ; সেই তত্ত্বটি এই যে, বিভিন্ন দেশ তাদের শিল্প-পূর্ব অবস্থায় পশ্চাদ্‌পদতার বিভিন্ন মাত্রায় থাকে। বলা হয় যে জাপান বা রাশিয়ার তুলনায় প্রাক-ব্রিটিশ ভারত পশ্চাদপদতার এমন এক চরম পর্যায়ে ছিল যে 'যাত্রা শুরু' করার জন্য তার দীর্ঘকাল ধরে প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়েছে।[67] শতাব্দী সঞ্চিত এই গুরুভারের কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই।[68] এমনকি গেরশেনক্রনের মতেরও এখানে ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে। শিল্প বিপ্লব ঘটাবার ক্ষেত্রে কয়েকটি দেশের অক্ষমতাকে ব্যাখ্যা করার কাজে তিনি পশ্চাদপদতার বিভিন্ন মাত্রার ধারণাটি ব্যবহার করেন নি। এই লক্ষ্য সাধনে বিভিন্ন দেশে উদ্যম ও উপায়ের বিভিন্নতা কিংবা উপাদানের প্রতিস্থাপনা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে উক্ত ধারণাটি ব্যবহার করেছেন

তৃতীয় ব্যাখ্যাটির অবলম্বন হল নির্গমনের তত্ত্ব : এই তত্ত্বে বলা হয় যে ঔপনিবেশিক আধুনিকীকরণের সদর্থক প্রভাব এখানে পড়েছিল, কিন্তু সে প্রভাবের দুর্ভাগ্যজনক বিদেশী চরিত্র, শাসকদের শোষণমূলক মনোভাব, দেশীয় সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির দরুণ সেই প্রভাবে তার মধ্য দিয়ে সদর্থক উপাদানগুলি ব্যাপকভাবে নির্গত হয়ে গিয়েছিল।[69] এই ব্যাখ্যা ঔপনি-বেশিকতা সম্পর্কে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠতে উৎসাহ দিলেও এর প্রকৃতিই এমনই যে তা কারিগরি-অর্থনৈতিক উপাদানগুলির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে। যাইহোক কার্য-কারণের তত্ত্ব হিসাবে এর মূল্য যদিও খুবই

সীমাবদ্ধ তা হলেও ঔপনিবেশিক অর্থনীতির অভ্যন্তরস্থ ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার অনুসন্ধানে জটিল ও চিত্তাকর্ষক পদ্ধতি এর সাহায্যে পাওয়া যায়।

যদি এই তিনটি ব্যাখ্যাকেই অনুপযুক্ত বলে প্রত্যাখ্যান করতে হয়, তাহলে বাকি থাকে কেবল একটিই; সেটি হল ঔপনিবেশিকতার ভূমিকা। অনগ্রসরতার অন্যতম কারণ হিসাবে ঔপনিবেশিকতার স্বীকৃতি আধুনিক ভারতের এবং অধীতব্য বিষয় হিসাবে ইতিহাসের রাজনৈতিক বিকাশ-প্রক্রিয়ায় নিশ্চয়ই একটি বিরাট পদক্ষেপ। আজকাল অবশ্য, কেবল এই স্বীকৃতিই সংশ্লিষ্ট যুগ সম্পর্কে আমাদের ঐতিহাসিক অনুধাবনের কিংবা উন্নয়ন নীতির আলোচনার ক্ষেত্রে আমাদের খুব বেশি দূরে এগিয়ে দেয় না।[70] আজকাল কোন বিশিষ্ট লেখকই ঔপনিবেশিকতার ভূমিকা বা ঔপনিবেশিক ঐতিহ্যের উল্লেখ না করে ইতিহাস বা অনগ্রসরতার সমস্যাবলী নিয়ে কদাচিৎ আলোচনা করেন। কিন্তু তাঁদের অনেকেই এটিকে বহু উপাদান বা কারণের মধ্যে একটিমাত্র উপাদান বা কারণ হিসাবে গণ্য করেন এবং কদাচিৎ তার অর্থনৈতিক ফলাফল পরীক্ষা করে দেখেন।[71] তাঁদের সমালোচনা প্রায়ই ঔপনিবেশিকতার রাজনৈতিক ও আধিপত্যমূলক দিকগুলির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত থাকে।[72]

অতএব, সাধারণভাবে ভারতের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনে এবং বিশেষভাবে তার অনগ্রসরতার বিবর্তনে ঔপনিবেশিকতা যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে, ঐতিহাসিকদের সেটাও ব্যাখ্যা করতে হবে। এক্ষেত্রেও আবার আমরা বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করি। একটি মূল দৃষ্টিভঙ্গি উনিশ শতকের গোড়া থেকে চলে আসছে[73]—তাকে উদারনৈতিক প্রগতিবাদী সমালোচনা বলে বর্ণনা করা যায়—এই দৃষ্টিভঙ্গি অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলির লেখকদের ক্ষেত্রে সাদামাটা উদারনৈতিক বা প্রগতিবাদী এবং ভারতীয় লেখকদের ক্ষেত্রে উদার জাতীয়তাবাদী। ঔপনিবেশিকতার ব্যর্থতা প্রত্যক্ষ করতে, এমনকি অবাধে তার সমালোচনা করতেও এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা যথেষ্ট আগ্রহী। তাঁরা কিন্তু ঔপনিবেশিকতার ব্যর্থতা মুখ্যতঃ ঔপনিবেশিক নীতির ব্যর্থতা দিয়েই ব্যাখ্যা করেন। তাঁদের সমালোচনা মূলতঃ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের নেতিবাচক দিক সম্পর্কে—তার বিবিধ কর্মনীতির মাধ্যমে তা প্রকাশ পায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে, শিল্পায়নের পথরোধ এবং বিকাশের গতি ব্যাহত করতে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ভূমিকাকে উদারনীতিকেরা সমালোচনা করেন।[74] এমনকি তাঁরা খুব সাধারণভাবে অর্থনৈতিক শোষণের কথাও উল্লেখ করে থাকেন। এই সমালোচনা যখন সবচেয়ে তীক্ষ্ন হয়, তখন তা অনগ্রসরতার জন্য প্রধানতঃ দায়ী করে অভ্যন্তরীণ ধনতান্ত্রিক বিকাশের প্রক্রিয়াকে সাহায্য করার জন্য ইতিবাচক ব্যবস্থা গ্রহণে ঔপনিবেশিক সরকারের ব্যর্থতা ও অনিচ্ছাকে। আরো নির্দিষ্টভাবে বলা যায়, ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতে অবাধ্য বাণিজ্য নীতি আরোপ, ভারতীয় শিল্পকে কর-ব্যবস্থার মাধ্যমে সংরক্ষণ দান এবং রাষ্ট্রীয় অনুদান, দ্রব্য-সম্ভার ক্রয়, ঋণ দান প্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎসাহ-দান ইত্যাদিতে

ব্যর্থতা এবং সেচ ব্যবস্থার প্রতি নেতিবাচক নীতি অনুসরণ করার ক্ষেত্রেই এই সমালোচনা কেন্দ্রীভূত হয়।[75] এই ঔপনিবেশিক কর্মনীতিগুলির উৎস হিসাবে নির্দেশ করা হয় উপলব্ধির অভাব, বর্ণগত ও বংশগত কুসংস্কার, আমলাতন্ত্র এবং খোদ এই রাজত্বেরই মূলতঃ বৈদেশিক চরিত্র, 'সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত অবাধ বাণিজ্য নীতি'র প্রতি ব্রিটিশ ভক্তি, ব্রিটেনের প্রভুত্বকারী শ্রেণীগুলির নিজেদের স্বার্থবোধ ইত্যাদি। এই শেষোক্তরাই সুনিশ্চিত ভাবে বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করতে ঔপনিবেশিক সরকারকে বাধ্য করত।[76]

অতএব উদারনীতিকেরা মূলগত ভাবে ঔপনিবেশিকতার সমালোচক। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার প্রধান কারণ হিসাবে তাঁরা নির্দেশ করেন ঔপনিবেশিকতাকে। নিঃসন্দেহে, ঔপনিবেশিক সরকারের নীতিগুলি ছিল অগ্রগতির পরিপন্থী। তাছাড়া, রাষ্ট্রীয় সহায়তার অস্বীকৃতির কারণে ভারতীয় ধনিক শ্রেণীর বিকাশ ও বৃদ্ধি দারুণ ভাবে ব্যাহত হয়েছিল—অথচ রাষ্ট্রীয় সহায়তাই ছিল ব্রিটেন সমেত প্রায় সমস্ত দেশের অগ্রগমনের সম্ভবত সবচেয়ে শক্তিশালী অবলম্বন। এবং এই ঘটনা উদারনীতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে কেবল বেশ কিছুটা ঐতিহাসিক যৌক্তিকতাই দান করে না, বিশ্লেষণের হাতিয়ার হিসাবে কিছুটা মর্যাদাও দিয়ে থাকে। অবশ্য, এই দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়টির মর্মমূলে পর্যন্ত যেতে পারে না। তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ; তার কারণ এই যে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ভারতের অনগ্রসরতার প্রক্রিয়াকে তা পুরোপুরি ব্যাখ্যা করে না। সাম্রাজ্যবাদ যেসব কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, যেসব নতুন প্রতিষ্ঠান ও উপাদানের উদ্ভব ঘটেছিল, অগ্রগতির পথে যেসব প্রতিবন্ধক সরকারি নীতির ফল নয়, বরং মূলতঃ বিশ্ব-ধনতন্ত্রের সঙ্গে সংবন্ধনের ফল, যেগুলি কর্মনীতির সাহায্যে সংঘটিত হলেও কর্মনীতি ছাড়াও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে—সে সবের উপরে এই দৃষ্টিভঙ্গি মনোযোগ দেয়নি. বরং মনোযোগ সেগুলি থেকে বিক্ষিপ্ত করেছে। এমন কি এ রকম কথাও বলা যায় যে ঔপনিবেশিক সরকারি কাঠামোর বিশ্লেষণ করতে অক্ষম হওয়ার কারণেই উদারনীতিক সমালোচকেরা ঔপনিবেশিক সরকারি নীতির নিন্দা করার আবশ্যকতা অনুভব করতে বাধ্য হয়েছিলেন।[77] ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর উপরে ঔপনিবেশিকতার নানারকম প্রভাব এবং বিভিন্ন শ্রেণীর নিজেদের মধ্যেকার সম্পর্ক এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অনুধাবনে উদারনীতিকদের ব্যর্থতা, ঔপনিবেশিক নীতির প্রতি তাঁদের এই মনোনিবেশের জন্য কিছুটা পরিমাণে দায়ী। এর ফলে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে গবেষণা এবং নীতি-প্রণয়ন—উভয় ক্ষেত্রেই আরো একটি মৌল দুর্বলতা দেখা দিল।

ঔপনিবেশিকতার এই উদারনীতিক সমালোচনার ফলে এমন একটি বিশ্বাসের সৃষ্টি হল যে একবার যদি বিদেশী শাসকের হাত থেকে রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রিক ক্ষমতা নিয়ে নেওয়া যায় এবং নতুন রাষ্ট্রে ক্ষমতার পরিপূর্ণ পরিপোষকতা দেশীয় অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার পেছনে সংহত করা যায়, তা হলেই অর্থনীতির

ঔপনিবেশিক আধেয় ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হয়ে যাবে। বলা যায় ঔপনিবেশিকতা যে শক্তিগুলিকে 'বন্দী' করে রেখেছিল, নোতুন স্বাধীন রাষ্ট্র অগ্রগতি ও আধুনিকীকরণের সেই শক্তিগুলিকে পুরোপুরি মুক্ত করে দেবে। একবার যদি রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিশন নামক অগ্রগতির ইঞ্জিনটিকে পুরনো আধুনিকীকরণের শক্তিগুলির সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া যায় অর্থাৎ সাধারণভাবে "বিশ্ববাজারের শক্তিসমূহ" এবং বিশেষ ভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিদেশী মূলধনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়, তা হলে অগ্রগতির দ্বার পুরোপুরি খুলে যাবে— হয়তো তথাকথিত "সর্বাত্মকতাবাদী" সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির তুলনায় অগ্রগতির বেগ কম হতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গিটির একটি ভাবাদর্শগত উপাদান আছে। সাধারণের মনোযোগ আর ইতিহাসে বা তত্ত্বক্ষেত্রে ঔপনিবেশিকতা প্রশ্নটির উপরে কেন্দ্রীভূত করার প্রয়োজন হবে না। বলা হত যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভাবাদর্শের ইতিবাচক সৃজনশীল ভূমিকা নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে; সেই ভাবাদর্শের পরিবর্তে এখন পুরোপুরি স্থাপন করতে হবে 'রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রগমন'-এর ভাবাদর্শকে। একমাত্র যে ভূমিকা এখন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভাবাদর্শটি গ্রহণ করতে পারে, তা কেবল বিদেশ নীতির প্রতি এবং নির্বাচনের সময়ে রাজনৈতিক সমাবেশ সাধনের ক্ষেত্রে; কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের কাছে তার আর কোনো প্রয়োজন রইল না। যেমন অর্থনীতিতে তেমন ইতিহাসে যা প্রয়োজন তা হল সমকালীন ধনতন্ত্রের ভাবাদর্শের সঙ্গে, 'বিশ্ব বাজারের শক্তিসমূহের' সমকালীন কাঠামো অর্থাৎ ধনতন্ত্রের উপরে ভিত্তিশীল নতুন অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার যোগ সাধন করা।[৭৮]

ঔপনিবেশিক কাঠামো অনুধাবনের দৃষ্টিভঙ্গিটি দাদাভাই নওরোজি, জি ভি যোশী এবং আর সি দত্ত[৭৯] অতি চমৎকারভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন, পরবর্তীকালে আর পাম দত্ত তা আরও বিশদীকৃত করেছিলেন। এমনকি জওহরলাল নেহরু, কে এস শেলভাঙ্কর, এইচ ভেঙ্কটসুব্বাইয়া, এ আর দেশাই[৮০] প্রমুখ কিছু লেখকও এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আগ্রহান্বিত ছিলেন। অথচ ১৯৪৭ সালের পরবর্তী ভারতীয় বিদ্বজ্জন এই দৃষ্টিভঙ্গি কেন পরিহার করলেন তার কিছু ব্যাখ্যা পাওয়া যায় রাষ্ট্রের ভূমিকার প্রতি উদারনীতিকদের গুরুত্ব আরোপের এই ঘটনা থেকে। ঔপনিবেশিকতার মর্ম বলতে যেহেতু বোঝা হত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রনীতিকে, সেই হেতু ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ধরে নেওয়া হল যে ইতিমধ্যেই ঔপনিবেশিকতার মৃত্যু ঘটে গিয়েছে। যে সব সমাজ-বিজ্ঞানী ইতিপূর্বে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের প্রভাবে ঔপনিবেশিকতার স্বরূপ-সন্ধানে কিছু মনোযোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা এখন বিভিন্ন কারিগরি-অর্থনৈতিক প্রশ্ন উত্থাপন করে একটি রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়ন করতে শুরু করলেন। পল বারান যাকে বলেছেন, 'প্রত্যক্ষগোচর ঘটনাবলীর অনুশীলন' তাতেই তাঁরা মনোনিবেশ করলেন। আন্তঃ-সম্পর্কসমূহকে তাঁরা উপেক্ষা করলেন। অর্থনৈতিক অগ্রগতির দৃষ্টিকোণ থেকে অনুকূল ও প্রতিকূল কার্যকর সামাজিক ও অর্থ-

নৈতিক নির্দেশকগুলির বিবর্তনের অনুশীলন হিসাবে আধুনিক ঐতিহাসিকের কর্তব্যকেও ক্রমেই বেশি বেশি করে দেখা হতে লাগল। যেমন জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ণ, কৃষি ও শিল্পগত প্রযুক্তিবিজ্ঞানে নিশ্চলতা বা সচলতা, বর্ণগত আন্দোলন, সম্ভ্রান্ত বর্গের বিবর্তন ইত্যাদি সেই নির্দেশক। আমি অবশ্য এ কথা বলতে চাই না যে এগুলি অনুশীলন করা সমীচীন নয় বা এগুলি খুবই প্রয়োজনীয় বিষয় নয়; আমি কেবল এটাই বলতে চাই যে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের সীমাবদ্ধতার দরুণ বর্তমানে এই জিনিসগুলি আধুনিক ভারতীয় ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে মৌল দিক নির্দেশক নাও হতে পারে।

'প্রথম পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনা' বিষয়ক দলিলটির প্রথম, তত্ত্বমূলক পরিচ্ছেদটিতে নতুন, স্বাধীনতা-উত্তর দৃষ্টিভঙ্গির একটি কৌতূহলকর উদাহরণ পাওয়া যায়।[৪১] "বিকাশের সমস্যা" শীর্ষক এই পরিচ্ছেদটিতে "সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামো" পরিবর্তন কিংবা "সামাজিক সংস্থা ও সম্পর্ক সমূহের পুনরভিযোজন" সম্পর্কে বেশ কয়েকটি বিবৃতি রয়েছে,[৪২] কিন্তু ঔপনিবেশিকতা কিংবা অর্থনীতি ও সমাজের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ঔপনিবেশিক কাঠামোটি সম্পর্কে একটি কথাও নেই। সাম্প্রতিক অতীত সম্পর্কে মন্তব্য আছে মাত্র কয়েকটি এবং সেগুলিতেও উল্লেখ করা হয়েছে কেবল "ব্যাহত", "আংশিক" ও "সীমিত" বিকাশের কথা।[৪৩] সুতরাং কর্তব্য হল পরিকল্পনার মাধ্যমে "নানা দিকে" বিকাশ সাধন—রাজনৈতিক স্বাধীনতার কল্যাণেই এ পরিকল্পনা সম্ভব হয়েছে। কাঠামোগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি এই সংক্ষিপ্ত শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনের পরে, তত্ত্বগত পথ-নির্দেশক এই পরিচ্ছেদটির বাকি অংশ নিয়োজিত হয়েছে পরিকল্পনা-প্রক্রিয়ার প্রায়োগিক দিকগুলির আলোচনায়, যেমন সঞ্চয় ও মূলধন-গঠনের সমস্যা ইত্যাদিতে। ঔপনিবেশিক কাঠামোর সক্রিয় উচ্ছেদ বা ধ্বংস সাধন, কিংবা সাম্রাজ্যিক কেন্দ্র থেকে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির বিচ্ছেদ সাধনের কথা পরিকল্পনা-পত্রের কোথাও স্থান পায় নি। পক্ষান্তরে, মূলধন গঠন ও বিকাশের প্রক্রিয়ায় বিদেশী মূলধনকে দেওয়া হয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।[৪৪] এটা ঠিকই যে বৈদেশিক সহায়তার বিপদ সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, কিন্তু সেই বিপদ কেবল "আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের স্বাধীন নীতি গ্রহণের সামর্থ্য" সম্পর্কে[৪৫], অর্থাৎ এটা কেবল একটা রাজনৈতিক বিপদ। এই ভাবে একটি ঔপনিবেশিক অর্থনীতির পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে বিদেশী মূলধনের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতার সম্পূর্ণ অভাব এখানে প্রকাশ পেয়েছে। স্বভাবতই তারপরে আসছে বৈদেশিক (ইক্যুইটি) মূলধনের অবাধ আগমনের সপক্ষে যুক্তি-প্রদর্শন। সর্বশেষ, দলিলটিতে অর্থনৈতিক বিকাশ প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ভূমিকার উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।[৪৬]

ঔপনিবেশিকতা মানে শুধু রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বা ঔপনিবেশিক নীতি নয়, তার থেকে ঢের বেশি কিছু। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র নিঃসন্দেহে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থারই একটি অংশ বিশেষ ছিল; এই হাতিয়ার দিয়েই ঐ ব্যবস্থাটি সবচেয়ে

সফলভাবে সবলে চালু করা গিয়েছিল, এবং ঔপনিবেশিক নীতিগুলি ঔপনিবেশিক কাঠামোটিকে গড়ে তুলতে ও রক্ষা করতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র এবং ঔপনিবেশিক নীতি ঔপনিবেশিকতার মর্মবস্তু নয়। বিশ্ব-ধনতন্ত্রের সঙ্গে ভারতের অর্থনীতি ও সমাজের সম্পূর্ণ কিন্তু জটিল সংহতি ও সংবন্ধনই হচ্ছে ঔপনিবেশিকতা, প্রায় দুশো বছর ধরে ধাপে ধাপে তা সম্পাদিত হয়েছে। সুতরাং ভারতের অনগ্রসরতার মূলে ঔপনিবেশিক নীতির মধ্যে নিহিত ছিল না, নিহিত ছিল বাণিজ্য ও মূলধনের মাধ্যমে বিশ্ব-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে যে 'সংযোগ' ঘটে, সেই সংযোগের প্রকৃতির উপরে। ঔপনিবেশিক নীতি 'বিশ্ব-বাজারের শক্তিগুলি'র সঙ্গে ভারতের 'সংযোগ' সীমিত করার জন্য নয়, পরন্তু তাঁকে 'আন্তর্জাতিক অর্থনীতি'-র পূর্ণাঙ্গ অথচ অসম সদস্য করে নেবার দায়িত্ব ঔপনিবেশিক নীতির উপরই বর্তায়।

কাজে কাজেই, রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে আপনা আপনিই অর্থনীতির এক নতুন পর্যায়ের আবির্ভাব হয় নি। তা কেবল নতুন রাষ্ট্রীয় নীতি গ্রহণের উপযোগী রাজনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি করতে পেরেছিল। সেই নীতিকে এখন ঔপনিবেশিক কাঠামো উচ্ছেদ করা বা ভেঙে ফেলার পক্ষে উপযোগী হাতিয়ার করে তৈরি করা যায়। কিন্তু ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ও সমাজের ভাঙন ও পুনর্গঠনের কাজটিকে একটি দায়িত্ব সচেতন প্রয়াস হতে হবে। খুব সক্রিয় ভাবেই এ প্রয়াস চালাতে হবে। এ প্রয়াসকে রূপায়িত করতে হবে সংগ্রামের মাধ্যমে এবং ভারতে এবং বিশ্বের অন্যান্য অংশে ঔপনিবেশিক কাজকর্ম চলছে কিভাবে, তার পরিপূর্ণ অনুধাবনের ভিত্তিতে এই সব কিছু করতে হবে।

আধুনিক ভারতে ঐতিহাসিকদের সামনে এটাই ছিল চ্যালেঞ্জ—এবং এখনো তাই আছে। ঔপনিবেশিক যুগে আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অনগ্রসরতার মূল খুঁজে বার করতে হলে, বিশ্ব-ধনতন্ত্রের বহুমুখী যে যোগাযোগ ও বন্ধনের মাধ্যমে ভারতকে বিশ্ব-ধনতন্ত্রের অঙ্গীভূত করা হয়েছিল তার বিবর্তন প্রক্রিয়া অনুধাবন করতে হলে আমাদের আরো গভীরে যেতে হবে, খুঁজে পেতে হবে তার শিকড়।

ঔপনিবেশিক নীতির প্রসঙ্গে আবার উল্লেখ করে বলতে পারি যে এই নীতিগুলিকে যখন ঔপনিবেশিক কাঠামোর অবলম্বন স্তম্ভ হিসাবে দেখা হয়, তখনি কেবল সেগুলি সঠিক ভাবে অনুশীলন করা যায়। কোন যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ আলাদা করে প্রতিটি অংশকে আলাদা ভাবে দোষ দেওয়া বা প্রশংসা করার প্রবণতা তখন অন্তর্হিত হয়—কেবল সেগুলির নিজ নিজ পরিধির মধ্যে তা করা যায় না। গবেষকের কাজও তখন আর লেখা, বক্তৃতা, সরকারি নথি বা ব্যক্তিগত কাগজপত্র থেকে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রনীতিবিদ ও প্রশাসকদের উদ্দেশ্য ও ভাবাদর্শের মূল্যায়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। তখন দেখা যায় ঔপনিবেশিক নীতি, প্রশাসন ও প্রশাসকেরা যেমন ঔপনিবেশিক কাঠামোর অবলম্বন হিসাবে কাজ করেন তেমনি তার নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়েও যেতে পারেন না। এই নির্দিষ্ট

সীমার মধ্যে প্রচলিত হয় নানা ধরণের নীতি। এই সব নীতি রচনা ও রূপায়িত করেন মানুষেরাই—মানুষের দোষগুণ সবই যাদের রয়েছে, যারা অনেক উঁচুতেও উঠে যেতে পারেন, আবার নেমে যেতে পারেন অনেক নিচুতেও।

৪

পরিশেষে, আমি বলতে চাই যে, ঔপনিবেশিকতাকে যদি ভারতের আধুনিক ঐতিহাসিক বিবর্তনের একটি সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক পর্যায় বা যুগ হিসাবে দেখা যায়, সনাতন, প্রাক-ব্রিটিশ সমাজ ও অর্থনীতি এবং আধুনিক ধনতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও অর্থনীতির মধ্যবর্তী কাল জুড়ে যা বিদ্যমান ছিল তা হলে ঔপনিবেশিকতা অনুশীলনের পক্ষে তা সহায়ক হয়। এটা কেবল অতীতের অভিযোজন বা বিকৃতি নয়, একটি আংশিক ভাবে আধুনিকীকৃত সমাজও নয়, কিংবা সমাজের একটি রূপান্তরকালীন অবস্থাও নয়।[৬৭] এটা ইতি-বাচক এবং নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যসমূহের একটি বেমানান ও বাজে ভাবে মেশানো সংমিশ্রণও নয়।[৬৮]এটা একটি সুবিন্যস্ত 'সমগ্র',[৬৯] একটি সুস্পষ্ট সামাজিক গঠন (ব্যবস্থা) বা উপগঠন (উপ-ব্যবস্থা) এর মধ্যে অর্থনীতি ও সমাজের মূল নিয়ন্ত্রণ থাকে একটি বিদেশী পুঁজিবাদী শ্রেণীর হাতে, উপনিবেশে (বা আধা-উপনিবেশে) তা কাজ করে পর-নির্ভর ও পরবশ অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক এক কাঠামোর মাধ্যমে। বিশ্ব-জোড়া ব্যবস্থা হিসাবে ধনতন্ত্রের ঐতিহাসিক বিকাশের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে সে কাঠামোর রূপ পরিবর্তিত হতে পারে।[৭০]

আমি এখানে আবার বলি যে ব্রিটিশ শাসন পুরনো সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভিত্তিকে নিশ্চিত ভাবেই বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল। পুরানো প্রাক-ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতিকে তা ভেঙ্গে দিয়েছিল,[৭১] কিন্তু তার পিছু পিছু নতুন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটেনি। পরিবর্তে এসে ছিল নতুন এক ঔপনিবেশিক উৎপাদন-পদ্ধতি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ১৭৯৩ সালের পরে যে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল তা পুরানো ভূমিস্বত্ব সম্পর্ককে সম্পূর্ণ উলটে দিল। ঔপনিবেশিকতার প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে নতুন ভূমি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হল এবং তার ফলে বন্ধনমুক্ত অর্থনৈতিক শক্তিগুলির প্রভাবে সেই ব্যবস্থাটি নিঃসন্দেহেই আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসাবে দেখা দিলেও তা কিন্তু ছিল নতুন; এটা পুরনোকে বাঁচিয়ে রাখার কোন ব্যাপার ছিল না।[৭২] বস্তুতপক্ষে ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা জুড়ে উদ্ভূত হয়েছিল নতুন নতুন সম্পর্ক, নতুন নতুন শ্রেণী—একটি নতুন আভ্যন্তরী শ্রেণী-কাঠামো। এ সব সম্পর্ক ও শ্রেণী ছিল ঔপনিবেশিকতার ফল এবং তার

সঙ্গে পুরোপুরি সংবন্ধ। ঐতিহাসিক পরিস্থিতির জটিলতা থেকেই অংশতঃ বিভ্রান্তির উদ্ভব। বিশ্ব-ধনতন্ত্র একটি অখণ্ড ব্যবস্থা এবং ঔপনিবেশিকতা এই ব্যবস্থার এক মৌলিক উপাদান। তবুও ঔপনিবেশিকতার নিজস্ব বিবিধ সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদ-উপনিবেশবাদের একই ব্যবস্থাকে আমাদের দুটি পৃথক সত্তার আকার দেখতে হবে,—একটি উপনিবেশে, অন্যটি উপনিবেশবাদী দেশে।

১৯৪৭ সালের পরে এই ঔপনিবেশিক পর্যায় থেকেই ভারতকে নতুন এক সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণের পথে যাত্রা শুরু করতে হয়েছে। অন্য ভাবে বলা যায়, স্বাধীনতা-উত্তর যুগে যে দায়িত্ব এসে পড়ল, তা ঔপনিবেশিক যুগে আরব্ধ উত্তরণের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব নয়, সে দায়িত্ব ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা বা পর্যায় থেকে ইতিহাসের নতুন এক ব্যবস্থায় বা পর্যায়ে উত্তরণের। রূপান্তরকালীন যে কোন পর্যায়ই তার পূর্ববর্তী পর্যায় থেকে এবং একই সঙ্গে তার পরবর্তী পর্যায় থেকে ভিন্নতর। সঙ্গে সঙ্গে আবার রূপান্তরকালীন কোন পর্যায়ের মর্মই এমন যে তাকে দু দিকে থেকেই টানা হয়—নতুন এক পর্যায়ে তার এগিয়ে যেতে কিংবা পশ্চাদগামিতার লক্ষণের বিচারে পুরনো পর্যায়ে পিছিয়ে যেতেওযাতে সক্ষম হয় সেজন্যই এটা করা হয়। ঔপনিবেশিকতাকে একটি সুস্পষ্ট সামাজিক গঠন হিসাবে উপলব্ধি করতে পারলে আধুনিক ভারতের ঐতিহাসিকেরা তাঁদের গবেষণাকার্যের জন্য কেবল নতুন ও উন্নততর একটি 'কাঠামোগত মডেল'-ই তৈরি করতেই সক্ষম হবেন না, উপরন্তু, ঔপনিবেশিকতার মৌল বৈশিষ্ট্যগুলির বিশ্লেষণের মাধ্যমে এমন অবদান রাখতে সক্ষম হবেন, পশ্চাদ্‌মুখী প্রবণতাকে যা প্রতিহত করবে।

অতএব, যে-দৃষ্টিভঙ্গির রূপরেখা উপর দেওয়া হল আধুনিক ইতিহাসকে তা বিচার করে সনাতন ও আধুনিক, প্রাক্-ধনতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক, কিংবা প্রাক-শিল্প-যুগীয় ও শিল্প-যুগীয় এই দ্বি-মেরুগত অবস্থা থেকে। এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোনটিকে বেছে নেওয়া হবে, তা দুদিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ —অতীতের অনুশীলন এবং বর্তমানের রূপায়ণ। আধুনিকীকরণের ধোঁয়াটে ও ঢালাও ধারণা ইতিহাস অনুশীলনে কোনো প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য কদাচিৎ সাধন করে। অন্য দিকে, যেমন উনিশ শতকে আধুনিকীকরণের অর্থ ছিল ব্রিটেনে শিল্প-পুঁজিবাদের বিকাশ এবং ভারতে ঔপনিবেশিকতা ও অনগ্রসরতার বিকাশ, ঠিক তেমনি আজ আবার আধুনিকীকরণের অর্থ হল সমাজতন্ত্র কিংবা অনগ্রসর পুঁজিবাদ। সব সময়েই তা পশ্চাদমুখী প্রবণতা বা নয়া উপনিবেশ-বাদের দ্বারা বিপদাপন্ন। তুলনাগত বিচারে যদি বিশ্ব-ধনতন্ত্রের সঙ্গে আমাদের অতীত অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে "পরিচালিত অনগ্রসরতা" প্রতিফলিত হত তা হলে তা থেকে নিষ্ক্রান্তির পথ ছিল সেই বিশ্ব-ধনতন্ত্রের সঙ্গেই সংহতি স্থাপনের মধ্য দিয়ে নয়, ছিল তার প্রভাবের পরিধি থেকে বেরিয়ে এসে সেই 'পাপ চক্র' ধ্বংসের মধ্য দিয়ে। কিন্তু আমি এদিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অধিকারে ইতিমধ্যেই বেশ কিছুদূর অনধিকার প্রবেশ করে ফেলেছি।

টীকা

1 আর্থনীতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন্ পথ আমরা অবলম্বন করতে চাই সেই দিক থেকে এই প্রশ্নের সদুত্তর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণও বটে। আজ এটাও প্রায়শই স্বীকার করে নেওয়া হয় যে আমাদের সমাজের কাঠামোগত ভিত্তির পরিবর্তন ঘটাতে হলে, কতকগুলি অর্থনীতিক, রাজনীতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার বদল চাই। কিন্তু এখানে বিতর্কমূলক ও কঠিন প্রশ্ন হল : কোন্ গুলি ?

2 পরবর্তী III শাখা দ্রষ্টব্য।

3. এবং ঠিক সেই কারণেই মোগলযুগের ভারত—প্রকৃত ঐতিহ্যময় ভারত—ছিল আজকের অনুন্নত ভারতের চেয়ে অনেকটা অন্যরকম। বর্তমানে যা 'চিরাচরিত' ভারতের অর্থনীতি, রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা, সমাজ, সংস্কৃতি ও মননশীল জীবন বলে বিবেচিত হয়ে থাকে তা আসলে আধুনিক ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ইত্যাদি। জনৈক লেখক তাই সম্প্রতি লিখেছেন, 'ভারতের প্রথাগত সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বর্তমান ইতিহাসের সঙ্গে অতীত ইতিহাসকে গুলিয়ে ফেলা হয়।' জোসেফ আর গাসফিল্ড, 'ট্রাডিশন অ্যান্ড মডার্নিটি : মিসপ্লেসড পোলারিটিস্ ইন দ্য স্টাডি অব সোস্যাল চেঞ্জ', আমেরিকান জার্নাল অব সোসিওলজি, জানুআরি 1967, পৃ 353।

4. যে কথা জে. এস. ফারনিভাল বলেছেন : 'আধুনিক ভারত বিকশিত হয়েছে আধুনিক ইউরোপের সঙ্গে সঙ্গে।' 'কলোনিয়াল পলিসি অ্যান্ড প্র্যাকটিস', 1956, পুনর্মুদ্রণ, পৃ 537-38।

5. এই বিষয়ে অর্থবহ আলোচনার জন্য রজনী পাম দত্তের 'ইন্ডিয়া টুডে', 1949, পৃ 95-96 দ্রষ্টব্য ; কে. এম শেলভাংকরের 'দ্য প্রবলেম অব ইন্ডিয়া' 1940, পৃ 136-44 ; ইরফান হাবিবের 'পোটেনশিয়ালিটিস অব ক্যাপিটালিস্ট ডেভেলপমেণ্ট ইন দ্য ইকনমি অব মুঘল ইন্ডিয়া' 1968, 'এনকোয়ারি', সংখ্যা 15 ; সতীশচন্দ্রের 'হোয়াই ডিড অ্যান ইনডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশন নট টেক প্লেস ইন ইন্ডিয়া' 1968, স্টেনসিল কপি ; পল এ বারান-এর 'দ্য পলিটিক্যাল ইকনমি অব গ্রোথ', 1962 ভারতীয় সংস্করণ, পৃ 179-80, 191-92 ; এস সি ঝা-র 'স্টাডিস ইন দা ডেভেলপমেণ্ট অব ক্যাপিটালিজম্ ইন ইন্ডিয়া' 1969, অধ্যায়, I ও II।

6. এই গ্রন্থে 'ভারতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্রিটিশ ও ভারতীয় ধারণা, 1858-1905' দ্রষ্টব্য।

7. এই ব্যাপারে এমনকি অনুসন্ধানমূলক উদ্দেশ্যের খাতিরেও, পুরনো রীতি অনুবর্তনের ধারণা স্বীকার করে নেওয়া যায় না। ধনতন্ত্র তার নিজস্ব প্রকৃতির দরুণই এক বিশ্বব্যাপী ব্যবস্থা। ধনতন্ত্র একদিকে তার বাজার দিকে দিকে সম্প্রসারিত করেই চলবে, আর অন্যদিকে যেসব প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সমাজ রয়েছে সেগুলিকে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় রূপান্তর অথবা উপনিবেশ কিংবা আধা-উপনিবেশ হিসেবে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামিল হওয়া,—এই দুটি পন্থার যে কোন একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছে। কাজেই, ভারত যদি প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা বজায় রাখতে পারত তাহলে কী ঘটত—এই ঐতিহাসিক প্রশ্ন কখনই ওঠে নি। ধনতন্ত্রের উন্মেষের ফলে শুধু ভারতের ক্ষেত্রেই নয় অন্যান্য দেশের বেলায়ও এই বাছাই করার অধিকার নিঃশেষ হয়ে গেল। ভারতকে হয়ে উঠতে হল রাশিয়া বা জাপানের ধাঁচের স্বাধীন ধনতান্ত্রিক দেশ, না হয় বিশ্ব ধনতন্ত্রের এক ঔপনিবেশিক অঙ্গ। সমকালীন শক্তিশালী সাম্রাজ্য চীন ও তুরস্কের পরিণতি লক্ষ্য করা যেতে পারে। লাতিন আমেরিকায় স্পেন ও পর্তুগালের উপনিবেশ ছিল এমন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির পরিণতিও লক্ষণীয়।

8. 1946 সালে ভারতে যেখানে 40,000 মাইলের বেশি রেলপথ ছিল সেখানে চীনের

রেলপথ ছিল 14,000 মাইলের মতো। রেলপথ যেমন ঔপনিবেশিক সংহতির মাত্রার তেমনি আধুনিক যুগের 'আধুনিকীকরণের' অন্যতম প্রধান বাহক এবং পরিচালক।

9. বিপন চন্দ্রের 'দ্য রাইজ অ্যান্ড গ্রোথ অব ইকনমিক ন্যাশনালিজম ইন ইন্ডিয়া', 1966 বিশেষ করে অধ্যায় XV দ্রষ্টব্য।

10. 'ইন্ডিয়া টুডে' 1949।

11. উদাহরণস্বরূপ, ঔপনিবেশিক পদ্ধতি এবং সমাজে তার প্রভাব থেকেই জাতীয় আন্দোলন তার মূল প্রেরণা উদ্দেশ্য ও চালিকাশক্তি এবং সেই সঙ্গে বাস্তব ঐতিহাসিক অধিকার অর্জন করে। যাঁরা ঔপনিবেশিকতাবাদের বাস্তব অস্তিত্বকে একটি মৌল অর্থনৈতিক কাঠামো - তার রাজনৈতিক ও জাতিগত কর্তৃত্ব থেকে আলাদা হিসেবে—স্বীকার করতে চান না তাঁরাই অন্যান্য যুক্তির মধ্যে জাতীয় আন্দোলনকে মূলত দেশীয় শীর্ষ ব্যক্তিদের প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত বলে প্রকাশ করে থাকেন। এই মতবাদের দেখা মেলে সেই 1893 সালে জন স্ট্র্যাচির 'ইন্ডিয়া'-তে এবং 1910 সালে ভি. চিরোলের 'ইন্ডিয়ান আনরেস্ট'-এ। এই মতবাদের আদর্শগত ভিত্তিটা বরাবরই এই রকম ছিল : ব্রিটিশ শাসকরা বিদেশী হিসেবে তাদের সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক শাসন কর্তৃত্ব ও উন্নয়ন হ্রাসের বদলে বরং আধুনিকীকরণ ও উন্নয়নের প্রক্রিয়ারই প্রবর্তন করেছিল যার ফলস্বরূপ ক্রমশ ভারতীয় জনগণের উন্নয়ন এবং ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যেকার মূল বিরোধটা ফুটে ওঠে।

12 এমন কি ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের সূত্রপাত হয়েছিল 1873-96 সালের মন্দার সময়ে। তখন ভারতীয় মুদ্রার বিনিময় মূল্য হ্রাস পাওয়ায় ভারতের বাজারে ব্রিটিশ পণ্য প্রতিযোগিতায় মার খায়, মূলধনী রপ্তানী আরও দুষ্কর হয়ে ওঠে এবং দূর প্রাচ্যের অনুন্নত দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ়তর হয়।

13. দুই বিশ্বযুদ্ধের কালে শিল্পোন্নয়ন এবং সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক সম্পর্কের শিথিলতার মধ্যে এই যোগাযোগের ব্যাপারটি এ'রা পরিষ্কারভাবে লক্ষ্য করেছেন : জি ই. হুবার্ড' ইস্টার্ন ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন অ্যান্ড ইটস্ এফেক্ট অন দি ওয়েস্ট', 1938, আর পাম দত্ত, কেট এল মিচেল, 'ইন্ডাসট্রিয়ালাইজেশন অব দি ওয়েস্টার্ন প্যাসিফিক', 1942 এবং এন এস আর শাস্ত্রী, 'এ স্ট্যাটিসটিক্যাল স্টাডি অব ইন্ডিয়ান ডেভেলপমেন্ট, 1947। মিচেল (পৃ 7) শাস্ত্রী (পৃ 5) এবং ফারনিভাল (পৃ. 318) আবার উন্নয়ন ও মন্দার মধ্যেকার সম্পর্কও লক্ষ্য করেছেন। সম্প্রতিকালে এ গুন্ডার ফ্র্যাংক এটিকে একটি দ্ব্যর্থহীন প্রকল্পরূপে ব্যক্ত করেছেন। দ্রষ্টব্য, 'দা ডেভেলপমেন্ট অব আন্ডার ডেভেলপমেন্ট', 'মন্থলি রিভিউ', সেপ্টেম্বর 1966 এবং 'ক্যাপিটালিজম অ্যান্ড আন্ডার ডেভেলপমেন্ট ইন লাতিন আমেরিকা', 1967, পৃ 149।

14. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাল হিসাবে 1914 থেকে 1921 সাল অবধি ধরা হয়েছে, কারণ ততদিনে ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রভাব অনুভূত হয়। এছাড়া ব্রিটিশ অর্থনীতি ও মূলধনও যুদ্ধের ধাক্কা সামলাতে কিছু সময় নেয়।

15. পি. রায়, 'ইন্ডিয়াস ফরেন ট্রেড সিন্স 1870', 1934, পৃ 116।

16. তুলোর ব্যাপারে : শাস্ত্রী, পৃ. 174 দ্রষ্টব্য।

17. জাপানকে এ ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি এবং ঐ দেশ ভারতের যুদ্ধকালীন চাহিদা দ্রুত দূর করে।

18 ভেরা অ্যানস্টে, 'দা ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট অব ইন্ডিয়া' 1946 পুনর্মুদ্রণ, পৃ. 267, পাদটীকা 4।

19. অবশ্য ভারতের যুদ্ধ পূর্ববর্তী হিসাবকে তা ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। পি. রায়, পৃ 116 ও 126।

20. এ. কে. ব্যানার্জি হিসাব করে দেখিয়েছেন যে 1921, 1922 ও 1923 সালে ভারতে বৈদেশিক মূলধনের নীট অন্তঃপ্রবাহ ছিল যথাক্রমে 37 কোটি টাকা, 55.3 কোটি টাকা এবং 38.7 কোটি টাকা। 1923 সালের পর কিন্তু এই পরিমাণ হ্রাস পেয়ে 1924-এ দাঁড়ায় 6.7 কোটি এবং 1925 সালে 4.1 কোটিতে। ব্যালান্স অব পেমেন্টস-এর সমীক্ষার ভিত্তিতে পরোক্ষ গণন পদ্ধতিতে এই অঙ্ক আরও বেশি দেখায় : 1921-এ 87.47 কোটি, 1922-এ 63.50

কোটি, 1923-এ 9.36 কোটি এবং 1924-এ 40.37 কোটি। এ. কে. ব্যানার্জি, 'ইণ্ডিয়াস ব্যালান্স অব পেমেণ্টস', 1963, পৃ 195 ও 200।

21. ভি অ্যানস্টে, ভূমিকা।

22. যদি ভিত্তি হিসেবে 1914-র 100 ধরা হয়, সূচক সংখ্যা হবে এই রকম :

ব্রিটিশ ভারতে নতুন মূলধন বিনিয়োগ

1914	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927
100	221	121	51	40	31	45	29

'স্ট্যাটিস্ট', 6 আগস্ট 1927, আর পি দত্ত পৃ 148-এ উদ্ধৃত।

23. ভেরা অ্যানস্টে 1929 সালে লিখেছেন : 1919-21-এ বাজারে তেজীভাব থেকে দেখা দিল 'এক সংকট যা থেকে উদ্ভব হয় এক সর্বনাশা ও ভয়ংকর মন্দার।...মোটামুটি 1922-23 থেকে শুরু হয় শিল্পে ছাটাই ও পুনর্গঠনের কাল...।' (পৃ 220)

24. প্রাগুক্ত, পৃ 266 অনুবর্তী; ডি আর গ্যাডগিল, 'ইণ্ডাসট্রিয়াল এভোলিউশন অব ইণ্ডিয়া', 1918 পুনর্মুদ্রণ, পৃ 232 অনুবর্তী।

25. 'বোম্বাই-এর কারখানাগুলির নীট লাভের পরিমাণ "1922 সালের 3 কোটি 88 লক্ষ টাকা থেকে কমে গিয়ে 1923-এ দাঁড়ায় 33 লক্ষে এবং 1924 সালে সে ক্ষতি 92 লক্ষ টাকায় দাঁড়ায় এবং 1925-এ ক্ষতির পরিমাণ ছিল 1 কোটি 34 লক্ষ টাকা।" ভি. অ্যানস্টে, পৃ 267।

26. এই শিল্পে 1922-23 এবং 1923-24 সালে অংশীদারদের কোনও লভ্যাংশ দেওয়া হয়নি এবং 1925 সালে 100 টাকার শেয়ারের মূল্য 10 টাকায় নেমে যায়। প্রাগুক্ত, পৃ 245, আর পি দত্ত, পৃ 149।

27. জি ই হুবার্ড, পৃ 254।

28. এ কে ব্যানার্জির দুটি হিসাব অনুসারে 1929 থেকে 1931 পর্যন্ত বৈদেশিক মূলধনের নীট অন্তঃপ্রবাহ ছিল যথাক্রমে 19.46 কোটি ও 44.92 কোটি টাকা এবং 1931 থেকে 1938 সাল পর্যন্ত তার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 30.35 কোটি ও 23.37 কোটি টাকা। (পৃ 200)

29. বিশ্ব পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল হয়ে পড়ার ফলেও এই সুযোগসুবিধা অনুমোদনের পথ সুগম হয়। অনেক ভারতীয় শিল্পকে এখন আর ব্রিটিশ পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন না হয়ে জাপান, জার্মানী, ওলন্দাজ, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে। সাম্রাজিক অগ্রাধিকারের দ্বারা ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষিত হয়।

30. বস্ত্রশিল্প এবং চিনির জন্য দ্রষ্টব্য : শাস্ত্রী, পৃ 174-75।

31. কাপড়ের থান, চিনি ও কেরোসিনের চাহিদা হ্রাসের ব্যাপারে দ্রষ্টব্য : সুব্রহ্মনিয়াম ও হময়ে, পৃ 78।

32. এইভাবে চিনি শিল্পে নিয়োজিত ভারতীয় মূলধনে শ্রমশক্তির অংশ ছিল 89 শতাংশ। সিমেণ্টে ছিল প্রায় 90 শতাংশ। কাগজ শিল্পে মোট উৎপাদনের ভারতীয় অংশ ছিল শতকরা 66 ভাগ। এম. কিডরন, 'ফরেন ইনভেস্টমেণ্টস ইন ইণ্ডিয়া 1965, পৃ 42।

33. সুব্রহ্মনিয়াম ও হময়ে, পৃ 56, 60 ও 61।

34. পাট, চা ও কয়লার ক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল। লোহা ধাতুপিণ্ড এবং ইস্পাতের মধ্যে অদ্ভুত তফাৎ দেখা গিয়েছিল। দেশী বাজারে ইস্পাতের উৎপাদন বেড়ে গেল আর লোহা ধাতুপিণ্ডের উৎপাদন কমে গিয়ে নিশ্চল হয়ে গেল। অথচ মন্দার আগে লোহা ধাতুপিণ্ডের উৎপাদনের শতকরা 40 ভাগের মত রপ্তানি হত।

35. লক্ষ্য করার বিষয় হল, সব মিলিয়ে বৃদ্ধির হারও বেশি ছিল না।

36. সরকারের তরফে দেশী পণ্যের ক্রয় এইভাবে বাড়তে থাকে—1938 সালে 5.6 কোটি টাকা থেকে 1939-এ 21.1 কোটি, 1940-এ 18.8 কোটি, 1941-এ 196 কোটি, 1942-এ 247.8 কোটি, 1948-এ 133.4 কোটি এবং 1944-এ 145.8 কোটি টাকা। প্রাগুক্ত, পৃ 79।

37. প্রাগুক্ত, পৃ 67 এবং রজনী পাম দত্ত, পৃ 172।

38. 1914 সালে বিদেশী ব্যাংকগুলিতে যেখানে মোট স্থায়ী আমানতের 70 শতাংশ গচ্ছিত ছিল 1937 সালে তা 57 শতাংশ হয়, সেই আমানতের পরিমাণ 1947 সালে কমে দাঁড়ায় 17 শতাংশে। কিডরন, পৃ. 42।

39. বি. এন. দাতার ও আই. জি. প্যাটেল, 'এমপ্লয়মেণ্ট ডিউরিং দ্য সেকেণ্ড ওয়ার্লর্ড ওয়ার', 'ইণ্ডিয়ান ইকনমিক রিভিউ', III খণ্ড, সংখ্যা 1, ফেব্রুয়ারি 1956, পৃ. 161।

40. কিডরন, পৃ. 66।

41. পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, জে. আর. ডি. টাটা, জি. ডি. বিড়লা ও অন্যান্য 'এ ব্রিফ মেমোর‍্যাণ্ডাম আউটলাইনিং এ প্ল্যান অব ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট ফর ইণ্ডিয়া', 1944।

42. কিডরন. পৃ. 65।

43. 'ইস্টার্ন ইকনমিস্ট', 18 মে 1945, পৃ. 658;

44. এমন কি বৈদেশিক ঋণও নেওয়া যেতে পারে যদি না তার ফলে 'বৈদেশিক প্রভাব' কিংবা 'বিদেশি কায়েমি স্বার্থের হস্তক্ষেপ সূচিত হয়। পৃ. 46 ও 48।

45. তাছাড়া এটা কোনও ব্যতিক্রম ব্যাপার নয়। এ জিনিস চীন, ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ, ল্যাতিন আমেরিকার মত সবকটি উপনিবেশেই ঘটেছে। কেট মিচেল, জে এস. ফারনিভাল এবং এ. গুণ্ডার ফ্রাংকের সমীক্ষায় এটা পরিষ্কার ভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

46. এভাবে আধুনিক কলকারখানায় শ্রমিকদের কর্মসংস্থান হয়েছে 1931 সালে মাত্র 13,40,675 জনের এবং 1944 সালে 25,22,753 জনের। সুব্রহ্মনিয়াম ও হমফ্রে, পৃ. 30।

47. প্রকৃতপক্ষে শিল্পক্ষেত্রে তিনবারের এই উৎসারণ সত্বেও ভারতে শিল্পায়ন বিমুখিতা এবং কাঠামোগত বিকাশের অনগ্রসরতা অব্যাহত থাকে। এভাবে বর্তমান ভারত রাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার মধ্যে কৃষিকাজে নিরত ব্যক্তির শতকরা হিসাব 1901 সালে 67.58 থেকে বেড়ে 1931-এ 70,26 এবং 1951 তে 72.01 এ দাঁড়ায়। জে. কৃষ্ণমূর্তি, 'সেকুলার চেঞ্জেস ইন অকুপেশনাল স্ট্রাকচার', 'দ্য ইণ্ডিয়ান ইকনমি অ্যাণ্ড সোস্যাল হিস্টরি রিভিউ', জানুয়ারি 1965, খণ্ড II, সংখ্যা 1, পৃ. 50।

48. সাইমন কুজনেটস, 'প্রেজেণ্ট আণ্ডার ডেভেলপড কানট্রিস অ্যাণ্ড পাস্ট গ্রোথ', মূল গ্রন্থ 'ইকনমিক গ্রোথ অ্যাণ্ড স্ট্রাকচার', নির্বাচিত প্রবন্ধাবলী ভারতীয় সংস্করণ 1969 (এরূপর থেকে 'কুজনেটস I' হিসাবে উল্লিখিত হবে), এবং 'আণ্ডার ডেভেলপড কানট্রিস অ্যাণ্ড দি প্রি-ইণ্ডাসট্রিয়াল ফেজ ইন অ্যাডভানসড কানট্রিস' (এরপর থেকে 'কুজনেটস II' হিসাবে উল্লিখিত হবে), মূল গ্রন্থ এ. এন. আগরওয়াল ও এস. পি. সিং-এর 'দ্য ইকনমিকস্ অব ডেভেলপমেণ্ট', গ্যালাক্সি বুক সংস্করণ, 1963। এছাড়া দ্রষ্টব্য শিগেরু ইশিকাওয়া, 'ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট ইন এশিয়ান পার্সপেকটিভ' 1967; গুনার মিরদাল 'এশিয়ান ড্রামা', পেঙ্গুইন সংস্করণ 1968, চতুর্দশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। বুর্জোয়া অর্থনীতি বিষয়ে নুর্কসে-র পথিকৃতের কাজ, 'প্রবলেমস অব ক্যাপিটাল ফর্মেশান ইন আণ্ডার ডেভেলপড কানট্রিস', অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা।

49. কুজনেটস I, পৃ. 177 ও 191-93, কুজনেটস II, পৃ. 151-53; ইশিকাওয়া পৃ. (i) 1, 2, গুনার মিরদাল, পৃ. 673-74 এবং 16-24।

50 উদাহরণের জন্য দ্রষ্টব্য, মিরদাল, পৃ. 674-76, 679, 703-04। আরও দ্রষ্টব্য ইশিকাওয়া, পৃ. 4 (পাদটীকা)।

51. অতএব মিরদাল লিখছেন যে, "সাইমন কুজনেৎসের মত পণ্ডিতরা দেখিয়েছেন", বিকাশের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে গবেষণার মধ্য দিয়ে যে সব 'সম্ভাব্য ও মূল্যবান' সাধারণীকরণ খোঁজা হয় সেগুলি, "বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরিবর্তনশীল গুরুত্ব অথবা-আকার, পেশা এবং অঞ্চল ভিত্তিতে আয়ের পরিবর্তনশীল বণ্টন, অথবা ক্ষেত্রাভিত্তিক সঞ্চয়, বিনিয়োগ, মূলধন/উৎপাদন অনুপাত, জনসংখ্যার প্রবণতা, নগরীকীকরণ ইত্যাদিতে পর্যবসিত।' কিন্তু ওঁর মতে, শুধু এই কারণেই এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে "কোন সর্ব-পরিব্যাপী ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না; পাওয়া যায় কেবল সীমিত অন্তর্দৃষ্টি।" (পৃঃ 1856-57)। এ ধরনের সর্বব্যাপী, অর্থাৎ

সংগঠনগত ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি মার্কসবাদ বিরোধী রোস্টো এবং মার্কসবাদীদের সমভাবেই ভর্ৎসনা করেছেন। দ্রঃ পৃঃ 1847 অনুবর্তী এবং 674। কুজনেৎস II, পৃঃ 177 দ্রষ্টব্য।

52. নুর্কসের বহু উদ্ধৃত উক্তি "একটা দেশ গরীব বলেই গরীব" এই মতের বহিঃপ্রকাশ পৃঃ 4।

53. এ. গেরশেনক্রন, 'ইকনমিক ব্যাকওয়ার্ডনেস ইন হিস্টরিক্যাল পারস্পেকটিভ', প্রেগার সংস্করণ, 1965।

54. পাদটীকা 48-এ উল্লেখ দেখুন। এইচ. লিবেনস্টাইন, 'ইকনমিক ব্যাকওয়ার্ডনেস এণ্ড ইকনমিক গ্রোথ', 1962 পুনর্মুদ্রণ, পৃঃ 15 অনুবর্তী, পৃঃ 40 অনুবর্তী; জি মিরার, 'লিভিং ইস্যুস ইন ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট', পৃঃ 43 পরবর্তী; জি. মিয়ার, 'লিমিটেড ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট', আগরওয়াল এণ্ড সিং; এবং জে. ভিনার, 'দ্য ইকনমিকস অব ডেভেলপমেণ্ট', আগরওয়াল এণ্ড সিং।

55. প্রাথমিক (1) নম্বর শর্তের জন্য ব্রিজ নারায়ণ, 'ইণ্ডিয়ান ইকনমিক লাইফ, পাস্ট এণ্ড প্রেজেণ্ট', 1929, পৃঃ 2 অনুবর্তী দ্রঃ; আর. কে মুখার্জী, দ্য ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া ঃ 1600-1800, 1948, পৃঃ 54; 'এসেস অন ইকনমিক ট্রানজিশন', 1965-এ এস জে. প্যাটেল, 'ইকনমিক ডিসট্যান্স বিটুইন নেশনস। (2) বণিক পুঁজির বিপুল সঞ্চয় সম্পর্কে হাবিব, পৃঃ 57 অনুবর্তী দ্রঃ; এস. চন্দ্র, পৃঃ 3; এন. সি. সিনহা, 'স্টাডিজ ইন ইন্দো-ব্রিটিশ ইকনমি হাণ্ড্রেড ইয়ার্স এগো', 1946, পৃঃ 17-23; এন. কে সিনহা, 'দি ইকনমিক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল', খণ্ড I, 1961 সংস্করণ, পৃঃ 148 অনুবর্তী; খণ্ড III, 1910, পঞ্চম অধ্যায়: ভি আই. পাভলভ, 'দি ইণ্ডিয়ানক্যাপিটালিস্ট ক্লাস, 1964 তৃতীয় অধ্যায়। (3) এই সম্পর্কে হাবিব, পৃঃ 3 দ্রঃ; এইচ. এইচ. খান, ল্যাণ্ড এণ্ড লেবার ইন এ ডেকান ভিলেজ (পিম্পাল সৌদাগর), 1917, পৃঃ 46 এবং (জাটেগাঁও বুদরুক), 1921, পৃঃ 42। (4) কৃষি উৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কে হাবিব, পৃঃ 4 দ্রঃ (এছাড়া, হাবিব বলেছেন, উর্বর ভূমির প্রাচুর্যের কারণে শ্রমিক পিছু উৎপাদন ক্ষমতা যতদিন বেশি ছিল, প্রাথমিক শর্ত হিসাবে একর পিছু উৎপাদন ক্ষমতার গুরুত্ব তত বেশি ছিল না); আর পি. দত্ত, পৃঃ 203-07-এ উদ্ধৃত ভিলকার. 'রিপোর্ট অন দি ইমপ্রুভমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচার', 1891 ও দ্রঃ; বাজারে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত সম্পর্কে মনে রাখা দরকার যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারত খাদ্য ও কৃষিজ কাঁচামাল রপ্তানি করত। (5) হাবিব, পৃঃ 41 দ্রঃ: এস চন্দ্র, পৃঃ 2: 1891 সালে, দীর্ঘকাল ধরে শিল্পবিকাশের বন্ধ থাকার পরেও জনসংখ্যার মাত্র 61·1 শতাংশ কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল। (6) আদৌ প্রযোজ্য নয়। (7) আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সম্পর্কে, আর. কে. মুখার্জি, পৃঃ 117-19; হাবিব. পৃঃ 59 দ্রঃ; সড়ক সম্পর্কে, টি. মরিসন, 'দি ইকনমিক ট্রানজিসন ইন ইণ্ডিয়া', 1911, পৃঃ 22-23। (8) হাবিব, পৃঃ 8, 11-12, 68 দ্রঃ। (9) হাবিব, পৃঃ 61-63 দ্রঃ। (10) হাবিব দ্রঃ; আর. সি. দত্ত, 'দি ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া', খণ্ড I, 1956 পুনর্মুদ্রণ, পরিচ্ছেদ XII-XIII; অ্যানস্টে, পৃঃ 5; টি. রায়চৌধুরী এবং অন্যান্য কৃত 'দ্য ইণ্ডিয়ান ইকনমি ইন দা নাইনটিনথ সেঞ্চুরি, এ সিমপোসিয়াম' গ্রন্থে তাঁর রচনা দ্রষ্টব্য, পৃঃ 79 অনুবর্তী; বেঞ্জামিন হিগিনস, 'ওয়েস্টার্ন এণ্টারপ্রাইস এণ্ড দা ইকনমিক ডেভলেপমেণ্ট অব সাউথ-ইস্ট এশিয়া', 'প্যাসিফিক অ্যাফেয়ার্স', মার্চ 1958, খণ্ড 31, নং 1, পৃঃ 76। (11) দক্ষতা প্রসঙ্গে ভি. ভি. ভাট, 'আসপেক্টস অব ইকনমিক চেঞ্জ এণ্ড পলিসি ইন ইণ্ডিয়া', 1800-1960', পৃঃ 14-18 দ্রঃ; কার্লমার্কস, 'অন কলোনিয়ালিজম', দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃঃ 81; 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমিশন রিপোর্ট 1918', পৃঃ 6; সংস্কৃতির সাধারণ স্তর প্রসঙ্গে আর. সি. দত্ত, খণ্ড I, পৃঃ 259-60-এ উদ্ধৃত ম্যালকম ও মুনরো-র রচনা দ্রঃ; মিরদাল, পৃঃ 695 ও দ্রঃ। (12) হাবিব, পৃঃ 58, এস চন্দ্র, পৃঃ 1 দ্রঃ। (15) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা ক্ষেত্রে ভারত নিঃসন্দেহে

অনগ্রসর ছিল, কিন্তু তার অগ্রগতি একেবারে রুদ্ধ হয়ে যায় নিঃ হাবিব, 'টেকনলজিক্যাল চেঞ্জেস এন্ড সোসাইটি, 1969 ; শিল্প ও সংগঠনেও ভারত অতটা অনগ্রসর ছিল না : মিরদাল, পৃঃ 453-54 ; এস. চন্দ্র, পৃঃ 3-4 ; হিগিনস, পৃঃ 76। (18) এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কৃষি থেকে এত উদ্বৃত্ত হয়েছিল যে 1756 থেকে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণ সংক্রান্ত সমস্ত যুদ্ধের খরচ তা থেকেই সংগৃহীত হয়েছে ; গোটা উনবিংশ শতাব্দী ধরে সারা দুনিয়ায় সবাপেক্ষা ব্যয়সাধ্য সমরাস্ত্র এবং অসামরিক আমলাতন্ত্র বজায় রাখার খরচও এখান থেকেই যোগান হয়েছে ; রেলপথ নির্মাণ এবং অন্যান্য 'আধুনিকীকরণ' সংক্রান্ত ব্যবস্থার খরচও এখান থেকেই বহন করা গেছে। (19) প্রাক-ব্রিটিশ যুগে এবং উনবিংশ শতাব্দীতেও ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল বিপুল এবং রপ্তানিযোগ্য (পণ্য)ও হোত প্রচুর পরিমাণে।

56. 13 ও 15 নং প্রাথমিক শর্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

57. 12, 13, 18, 19-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

58. বিশেষ এই অর্থে এটি 10, 15, 17 ও 20-র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই শেষ দিকটি ইশিকাওয়া (পৃঃ 23, 359, 369-70 এবং 384-85) এবং মিরদাল (পৃঃ 692-95) খুব ভালোভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন।

59. মিরদাল, পৃঃ 704।

60. কার্যতঃ কতকগুলি প্রাথমিক শর্ত সারা উনবিংশ শতাব্দী ধরেই সুবিধাজনক ছিল, সে সময় ঔপনিবেশিক আধুনিকীকরণ ঘটছিল ; 1918 সালের পরই কেবল নেতিবাচক প্রাথমিক শর্তাবলী পুরোপুরি দেখতে পাওয়া গেল, উপনিবেশ হিসাবে ভারতকে ততদিনে ঢেলে সাজানো হয়েছে।

61. উদাহরণ স্বরূপ, জে. ভিনার, পৃঃ 31 ; কুজনেৎস I, পৃঃ 182 ; লিবেনস্টাইন, পৃঃ 31 দ্রঃ। এছাড়া এম. এন, শ্রীনিবাস, 'সোস্যাল চেঞ্জ ইন মডার্ন ইন্ডিয়া, 1966', পৃঃ 51 ও দ্রঃ।

62. এর দ্বারা যদিও আমরা এই প্রক্রিয়া অনুশীলনে নির্দেশিত এবং পার্থক্যগুলি মেনে নিতে বাধ্য নই।

63. অ্যানস্টে, পৃঃ 2 পরবর্তী, 475-76 ; বুকানন, অধ্যায় II ; ডি. আর. গ্যাডগিল, 'ইকনমিক পলিসি এন্ড ডিভলপমেন্ট, 1955' পৃঃ 153-55 ; ব্রাইব্যান্টি ও স্পেঙ্গলার সম্পাদিত 'অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ইকনমিক ডিভলপমেন্ট ইন ইন্ডিয়া', 1963, ইউ. এন., গ্রন্থে এন. ভি সোভানি, 'নন-ইকনমিক আসপেক্টস অব ইন্ডিয়াস ইকনমিক ডিভলপমেন্ট' : 'মেজার্স ফর দা ডিভলপমেন্ট অব আন্ডার ডিভলপড্ কান্ট্রিস', 1951, পৃঃ 13-15 ; কুজনেৎস, মুর এন্ড স্পেঙ্গলার সম্পাদিত ইকনমিক গ্রোথ—ব্রাজিল, ইন্ডিয়া, জাপান' 1955 গ্রন্থে কে. ডেভিস ; কুজনেৎস I, পৃঃ 183-84 ; লিবেনস্টাইন, পৃঃ 31 অনুবর্তী ; মিরদাল পৃঃ 690-91, 1872-73।

64. জোসেফ আর. গাসফিল্ড, পৃঃ 351 অনুবর্তী ; মিলটন সিঙ্গার এন্ড বারনার্ড এস. কোহ্ন সম্পাদিত 'স্ট্রাকচার অ্যান্ড চেঞ্জ ইন ইন্ডিয়ান সোসাইটি' ; মরিস ডি. মরিস, 'ভ্যালুজ অ্যাজ অ্যান অবস্ট্যাকল টু ইকনমিক গ্রোথ ইন সাউথ এশিয়া : অ্যান হিস্টরিক্যাল সার্ভে', 'জার্নাল অব ইকনমিক হিস্ট্রি', খণ্ড XXVII, নং 4, ডিসেঃ 1961 ; কিডরন, পৃঃ 22 : লেভকভস্কি, পৃঃ 243-45। হাবিব, পৃঃ 47ও দ্রঃ।

65. কিডরন, পৃঃ 41-42ও দ্রঃ। প্রাক-ব্রিটিশ শিল্পোদ্যোগ সম্পর্কে উপরোক্ত পাদটীকা নং 55(2)-এ উল্লিখিত রচনাবলী দ্রঃ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই শিল্পোদ্যম সম্পর্কে এন. সি. সিনহা, পৃঃ 23 অনুবর্তী দ্রঃ। এই বিষয়ে সাধারণ আলোচনার জন্য পল বারান, পৃঃ 271-81 দ্রঃ।

66. একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সাধারণ মানুষ যেমন সামাজিক ও ব্যক্তিগত

অবস্থা বিনাবাধায় মেনে নিয়েছিল, ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ করেছিল, ঔপনিবেশিক ও সামাজিক সমস্যাবলী বিষয়ক সংগ্রামে তা এক নেতিবাচক ঘটনা ; কিন্তু ধনতন্ত্রের বিকাশ বা ঔপনিবেশিক আধুনিকত্বের অগ্রগতির পক্ষে তা অতীব সহায়ক। বিজ্ঞান, যুক্তি এবং জ্ঞানালোক (এবং হিতবাদ) যুগের মধ্যাহ্নে যাজককুল এবং চার্চ অব ইংল্যান্ডের সহায়তায় প্রথম যুগের ব্রিটিশ কারখানা মালিকরা শ্রমিকদের মধ্যে এসব বিষয়ে সক্রিয়ভাবে উৎসাহ দিতেন।

67. টি রায়চৌধুরী এবং অন্যান্য কৃত 'ইন্ডিয়ান ইকনমি ইন দা নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরি : এ সিমপোসিয়াম' গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত মরিস ডি. মরিস 'টুওয়ার্ডস এ রি-ইন্টারপ্রেটেশন অব নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরি ইন্ডিয়ান ইকনমিক হিস্ট্রি', পৃঃ 2 অনুবর্তী, 13-14। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারত সম্পর্কে লিখতে গিয়ে প্রায় সব ব্রিটিশ লেখকই এই মত পোষণ করেছেন, তাঁরা কেবল নিজ নিজ যুগে উত্তরণ সম্পর্কেই বিশ্বাস করতেন। উদাহরণ স্বরূপ, ডব্লু ডব্লু. হান্টার, 'ইন্ডিয়া অব দা কুইন এন্ড আদার এসেজ', 1903, পৃঃ 135 অনুবর্তী ; জন আডাই, জানুয়ারি 1880, পৃঃ 89 ; 'দ্য পোভার্টি অব ইন্ডিয়া', 'ওয়েস্টমিনস্টার রিভিউ', নং 1887, পৃঃ 990-1001, 1004 ; কার্জন, 'স্পিচেস' খণ্ড IV, 1906, পৃঃ 37 ;

68 প্রাক মুঘল ভারতের প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে আমার সম্পূর্ণ আলোচনা থেকে এটাই দেখা যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সঞ্চিত মৃত ভার হল সম্ভবতঃ উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্কের 'সামন্ততান্ত্রিক' কাঠামো এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা ; ব্রিটেন এ দুটোই চূর্ণ করেছিল। ভারতের নতুন শাসক শ্রেণী ছিল বুর্জোয়া, এবং অতি আধুনিক চরিত্র বিশিষ্ট। পাদটীকা নং 67-তে বর্ণিত রচনার পৃঃ 79-88 তে, টি. রায়চৌধুরী, 'এ রি-ইন্টারপ্রেটেশন অব নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরি ইন্ডিয়ান ইকনমিক হিস্ট্রি'ও দ্রঃ।

69. এটিও এক 'অবশিষ্ট' ব্যাখ্যা। আগরওয়াল অ্যান্ড সিং-এ মিয়ার, পৃঃ 67-9 : বেরিল, পৃঃ 24 অনুবর্তী ; বেরিল, পৃঃ 218-তে ই. এ. জি. রবিনসন। মিরদালের রচনার মহাকোষীয় চরিত্র এবং রচনার মধ্যে সমস্ত ধরনের ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও ব্যাখ্যাকে স্থান করে সার সংকলনের যে নীতি তিনি অনুসরণ করেছেন, তার ফলে তাঁর আলোচ্য আসল বিষয়টি যে কি তা বলা শক্ত। কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে শেষ পর্যন্ত তিনি স্রবণ তত্ত্বের পুরোধা হিসাবেই দেখা দেবেন।

70. সাম্রাজ্যবাদের যে সব স্তুতি গায়কদের নিজ নিজ বুদ্ধিবৃত্তিতে এ ধরনের স্বীকৃতির আজও কার্যকরী ভূমিকা আছে তাঁদের অবশ্য আমি পাত্তা দিই নি।

71. উদাহরণ স্বরূপ, কুজনেৎস I, পৃঃ 182 ; কুজনেৎস II, পৃঃ 141 ও 151-52 : ইশাকওয়া, পৃ 364 দ্রঃ।

72. উদাহরণ স্বরূপ, লিবেনস্টাইন, পৃঃ 103 ; কুজনেৎস, পৃঃ 182-83 দ্রঃ।

73. জেমস্ মিল, জন ব্রাইট, ডব্ল্যু. এস. কেইন, এ. ও. হিউম, হেনরি কটন এবং এ. কে. কনেলের মত লোকেরা ছিলেন এর আদি প্রবক্তা।

74. মিরদাল, পৃঃ 455-56 ; বেরিল, পৃঃ 238-40। মিয়ার, পৃঃ 70-74 ; বেরিল-এর গ্রন্থে ডব্লু. এইচ. নিকোলাস, পৃঃ 352 ; ক্যালভিন বি. হুভার সম্পাদিত 'ইকনমিক সিসটেমস অব দা কমনওয়েলথ্', 1962, গ্রন্থে পি. এস. লোকনাথন, 'দ্য ইন্ডিয়ান ইকনমিক সিসটেম', পৃঃ 263। পূর্বতন উদারনৈতিক মতের জন্য ডি. এইচ. বুকানন, 'দ্য ডিভলপমেন্ট অব ক্যাপিটালিস্ট এন্টারপ্রাইজ ইন ইন্ডিয়া', 1934, অধ্যায় XIX দ্রঃ।

75. ভারতে এর সূচনা রাণাডে ও তাঁর অনুগামীরা করেছেন বলা যায়। বিপান চন্দ্র. পৃঃ 112 অনুবর্তী এবং 14শ পরিচ্ছেদ দ্রঃ। 1947 পূর্ববর্তী জাতীয়তাবাদী রচনার প্রায় সম্পূর্ণ প্রবণতাও ছিল এই। এ মতের দুটি সাম্প্রতিক বিবৃতির জন্য ভি. ভি. ভাট, পৃ 2-6, 36 অনুবর্তী, 58-60 ও 70 এবং আর. সি. মজুমদার সম্পাদিত 'স্ট্রাগল্ ফর ফ্রিডম', 1969-এ টি. রায়চৌধুরী, 'দ্য ইন্ডিয়ান ইকনমি (1905-19 7)', পৃঃ 866 দ্রঃ।

76. বুকানন, 19শ পরিচ্ছেদ। মিইন্ট, পৃঃ 108-09 (ইনি অবশ্য এ মত পোষণ করেন না)।

77 দাদাভাই নৌরজীর উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ, ঔপনিবেশিকতাবাদকে ঔপনিবেশিক নীতি এবং রাষ্ট্রের ভূমিকা হিসাবে দেখানোর অপরিণত সমালোচনার জন্য বিপান চন্দ্র, পৃঃ 699, 703-06 দ্রঃ। উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মৌলিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অত্যাশ্চর্য ব্যর্থতার জন্য ফার্নিভাল, 'কলোনিয়াল পলিসি অ্যান্ড প্র্যাকটিস' দ্রঃ; আলোচ্য ক্ষেত্রে এখনও এটি অন্যতম বোধগম্য রচনা। ভারতীয় লেখকদের ক্ষেত্রে আর একটি বাধা হল ধনতন্ত্র এবং পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে। ঔপনিবেশিকতাবাদের মূলগত ধনতান্ত্রিক চরিত্রের সমালোচনা কেবল সমাজতন্ত্রীদের দ্বারাই সম্ভব। সুতরাং অন্যান্যরা ঔপনিবেশিক নীতির উপর দৃষ্টি দিয়েছেন. সামাজিক ব্যবস্থা হিসাবে ধনতন্ত্রের কোন সমালোচনা থেকে ভারতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতাকে বিচ্ছিন্ন করা এ নীতিতে সম্ভব।

78. নব কীনসীয় অর্থনীতি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের উপর এক মূল দায়িত্ব ন্যস্ত করায় এ কাজও সহজতর হয়েছে।

79. প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদীরাও পরিমাণগত বিশ্লেষণ থেকে শুরু করে প্রথমে শাসকদের উদ্দেশ্য এবং তারপর তাদের নীতির ব্যাখ্যায় উপনীত হন এবং শেষের দিকেই কেবল তাঁরা এসব নীতির বনিয়াদের গঠন সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে লাগলেন। বিকাশের যে পথ, অর্থাৎ, অর্থনীতির ঔপনিবেশিক গঠনের যে পথ ভারতীয় অর্থনীতি অনুসরণ করছে, সে পথ সম্পর্কে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক করে নিতে হয়েছে বলেই তাঁদের 'গঠনগত' বা মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করতে হয়েছে। বিপান চন্দ্র, অধ্যায় XV দ্রঃ।

80. একেবারে ঔপনিবেশিক যুগেই এই পরিত্যাগ শুরু হয়েছে, ভারতীয় কেতাবী অর্থনীতিবিদ এবং অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকদের শিরোমণি, ভি. জি কালে থেকেই এর শুরু। এর সূত্র দুটি। প্রথমতঃ, ঔপনিবেশিক তত্ত্বগত কাঠামোর সঙ্গে নিজেদের অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে ফেলায় একদিকে ঔপনিবেশিকতাবাদের মৌলিক সমালোচনায় তাঁরা ব্রতী হতে পারেননি এবং অপরদিকে, তাঁদের কেতাবী সমাদর বা 'অবস্থান' দিয়ে রাজধানীবাসী তাঁদের গণ্যমান্য বন্ধুদের শ্রদ্ধা অর্জন করতে হবে এবং, কাজে কাজেই, রাজধানীতে প্রচলিত তত্ত্বগত ভাবাদর্শ ও ঐতিহ্যের চৌহদ্দির মধ্যে কাজ করতে হবে। অন্যভাবে বলতে গেলে নিজেদের জাতীয়তাবাদ সত্ত্বেও তাঁরা মহানগরীয় বুদ্ধিজীবী জগতের উপগ্রহ হিসাবেই রয়ে গেলেন। ঔপনিবেশিকতাবাদকে ঔপনিবেশিক নীতি হিসাবে বিবেচনা ও সমালোচনা করে জাতীয়তাবাদ এবং তাঁদের কেতাবী ভাবাদর্শ ও 'নিরাপত্তা' সম্পর্কিত চিন্তাধারার মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাধান করা যেত। এভাবে তাঁরা ব্রিটেনে ঔপনিবেশিকতাবাদের উদারনৈতিক-শ্রমিক সমালোচকদের সঙ্গেও হাত মেলাতে পারতেন। দ্বিতীয় কারণ, অর্থাৎ ধনতন্ত্র-উত্তর কোন কিছুর সম্ভাবনা লক্ষ্য করতে তাঁদের ব্যর্থতাও উপরোক্ত 77নং পাদটীকায় ইতিমধ্যেই আলোচিত হয়েছে। আমি আরও উল্লেখ করতে চাই যে এ কথা লেখার সময় উপরে বর্ণিত পরবর্তী লেখকদের চারজনই ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে ছিলেন এবং সমাজতন্ত্রের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন। আমার যতটুকু জানা আছে 1958 সালে বি, এন. গাঙ্গুলিই কেবল ঔপনিবেশিকতাবাদকে কাঠামো হিসাবে বোঝার একমাত্র কেতাবী প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তাঁর প্রবন্ধ, "ইন্ডিয়া—এ কলোনিয়াল ইকনমি (1757-1947)" 'এনকোয়ারি', পুরানো অনুক্রম, নং 1, দ্রঃ।

81. পরিকল্পনা কমিশন, ভারত সরকার, 'প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, 1952'। এই নথিটি কমিশনের সভাপতি জওহরলাল নেহরুর স্বাক্ষরিত ছিল।

82, ঐ, পৃঃ 7।

83. ঐ, পৃঃ 9-12। উক্ত নথির মতে ঔপনিবেশিক যুগে ভারতীয় অর্থনীতিতে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি ঘটেছিল, ফলে বিকাশ ঘটেছে 'সীমাবদ্ধ': "অর্থনৈতিক জীবনধারার

প্রথাগত পদ্ধতির" উপর "আধুনিক শিল্পনীতির প্রভাবের" ফলে হস্তশিল্পের ধ্বংস এবং তার ফলে জমির উপর চাপ বৃদ্ধি; কৃষিতে মাথাপিছু উৎপাদনশীলতা হ্রাস; "জনগণের মনে এক করুণ সন্তোষের মনোভাব জাগরণ"; আমদানিযোগ্য পণ্য ক্রয়ের জন্য অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত নিয়োগ এবং "প্রধানতঃ বৈদেশিক বাণিজ্যের স্বার্থে" রেলপথ নির্মাণ; শিল্পের অতি সীমিত বিকাশ, সরকার আরও ইতিবাচক নীতি গ্রহণ করায় শিল্পে মন্দার যুগে পুঁজির সৃজন বৃদ্ধি, এবং উৎপাদকের পক্ষে এবং কৃষিজীবীদের বিরুদ্ধে বাণিজ্যের শর্তাবলী পরিবর্তন; কৃষিতে অবক্ষয়। ঐ, পৃঃ 28-29।

84. ঐ, পৃঃ 26, 473-78।

85. ঐ, পৃঃ 26।

86. ঐ, পৃঃ 31-32।

87. উত্তরণকালের অর্থনীতির ধারনা (ডি. আর. গ্যাডগিল, 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইভোল্যুশন অব ইন্ডিয়া' পৃঃ 1-2 : টি. মরিসন, 'দ্য ইকনমিক ট্রানজিশন অব ইন্ডিয়া'; অ্যানস্টে, ভূমিকা এবং অধ্যায় XVII দ্রঃ) থেকে 'কোথায় উত্তরণ?' এ প্রশ্নের উত্তর মেলে না। যদিও এটাই বলতে চাওয়া হয়েছে বলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে ঔপনিবেশিক ভারত তার সাধারণ বা 'স্বাভাবিক' বিকাশের মধ্যেই, অর্থাৎ ঔপনিবেশিকতাবাদের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন না করেই 'আধুনিক' বা শিল্পভিত্তিক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বিকশিত হতে পারত। নিজেদের মত করে সমস্যার সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে আধুনিক অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সমাজবিদ্যার কোন কোন মহলে এই ভুল করা হয়। তাঁদের আদর্শে দুটি মাত্র সমাজ ব্যবস্থার অস্তিত্ব বিদ্যমান—প্রথাগত ও আধুনিক। সুতরাং, ঔপনিবেশিক যুগকে হয় ঐতিহ্যের কাল বা আধুনিকতার উত্তরণের কাল বা দুই একটি চরম অবস্থায় একেবারে আধুনিক বলেই বর্ণনা করা হয়।

88. একটা যুগের ইতিবাচক ভূমিকা এবং আর একটার নেতিবাচক ভূমিকা আছে এটাও ঘটনা নয়।

89. ঔপনিবেশিকতাবাদের এই চরিত্রের কারণেই সক্রিয় সংগ্রাম ছাড়া একে ধ্বংস করা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক ক্ষমতার কিছু পরিবর্তন ঘটলে এ সংগ্রামের ক্ষেত্রে তা সহায়ক হয়, এই পরিবর্তন দিয়ে কেবল এ ধরনের ধ্বংস সম্ভব নয়।

90. এ ব্যাপারটির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া দরকার। শিল্পভিত্তিক ধনতন্ত্র বা শিল্পে বৃদ্ধির হার শূন্য' হওয়া আধুনিক ঔপনিবেশিকতাবাদের সংজ্ঞা পুরো বোঝানো যায় না। এমনকি সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্রভূমিতে পুঁজি বিনিয়োগ বিপুলাকারে না হলেও চলে। ঔপনিবেশিকতা-বাদের মূল বক্তব্য পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদী অংশের অর্থনীতির প্রতি ঔপনিবেশিক অর্থনীতির বশ্যতা এবং শেষোক্তর ক্ষেত্রে মূল প্রবণতা নির্ধারণের ব্যাপারে প্রথমোক্তর ক্ষমতার মধ্যে নিহিত। এ কারণেই, আধুনিক যুগে ঔপনিবেশিকতাবাদ কেবল শিল্পে অনগ্রসর বা আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশগুলির উপরই চাপান যায় না, শিল্পোন্নত বা উন্নয়নশীল ধনতন্ত্রী দেশগুলির উপরও চাপান সম্ভব।

91. 1853 সালে কার্ল মার্কস এটা প্রথম লক্ষ্য করেন। তিনি বলেন, "ইংল্যান্ড ভারতীয় সমাজের গোটা কাঠামোটাই ভেঙে ফেলেছে…(এর ফলে) ব্রিটিশ শাসিত হিন্দুস্তান, তার সমস্ত প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে, তার সমগ্র অতীত ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে" (পৃ. 34)। মার্কসের মতে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বৃহত্তম 'সমাজ বিপ্লব' এনেছে (পৃ. 38-39)। পৃ. 84ও দ্রঃ।

92. 'এসেস অন ইকনমিক ট্রানজিশন' গ্রন্থে এস. জে. প্যাটেল "এগ্রিকালচারাল লেবারারস ইন মডার্ন ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান"; রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 'দি ডাইনামিকস অব এ রুরাল সোসাইটি', 1957 অধ্যায় ।। 1853 সালে মার্কস এটি লক্ষ্য করেছিলেন, পৃ. 80।

উনবিংশ শতাব্দীর
ভারতীয় অর্থনৈতিক ইতিহাসের পুনর্ব্যাখ্যা

উনিশ শতকে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের যথাযথ ব্যাখ্যা ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক উভয়বিধ কারণেই যে গুরুত্বপূর্ণ সেটা স্বতঃসিদ্ধ। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের অনগ্রসরতা এবং অগ্রসর দেশগুলির তুলনায় তার পশ্চাদপদতার প্রকৃতি আর সেই সঙ্গে এই অনগ্রসরতা ও পশ্চাদপদতার কারণগুলি অনুধাবন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা কোন কোন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাওয়াই প্রয়োগ করা দরকার তা এই অনুধাবনের ওপরেই নির্ভর করে। ভারতের উপরে ব্রিটিশ প্রভাবের প্রকৃতি এবং কাঠামোগত বিভিন্ন দুর্বলতা সম্পর্কে নিজ নিজ সাধারণ ধারণার ভিত্তিতে রচিত কতকগুলি অর্থনৈতিক নীতি আজ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করছে। কাঠামোগত ঐ সব দুর্বলতা আবার দেশীয় অর্থনৈতিক-সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া থেকে উদ্ভূত। উনিশ শতকের ভারতীয় ইতিহাসের গবেষণামূলক চর্চা সবে শুরু হয়েছে। যেসব ধরনের অনুমানের ভিত্তিতে গবেষণা হচ্ছে এবং যেসব ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করা হচ্ছে, অনুশীলন লব্ধ ফলের উপরে তার একটা স্থায়ী প্রভাব পড়বে। বিস্তারিত আলোচনার জন্য আমি ডঃ মরিস-এর ব্যাখ্যাটি বেছে নিয়েছি[1]। কারণ আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে দুটি চিন্তা ধারার একটি তিনি একত্রে সুসংহত ভাবে প্রকাশ করেছেন এবং সেই প্রকাশকে সাধারণ সূত্রায়ন ও যৌক্তিকতা প্রতিপাদনের এক অতি উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করেছেন।

॥ ১ ॥

কোন লেখকের বিস্তারিত সমালোচনা করতে বসে তাঁর লেখাটির শিরোনাম থেকে শুরু করলে খুব ভুল হবে না। একটি নতুন ব্যাখ্যা বা পুনর্ব্যাখ্যার লক্ষ্যে মরিস ডি মরিস কত দূর অগ্রসর হচ্ছেন?

ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারত যে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে, তার প্রকৃতি সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ ও অর্থনৈতিক-ইতিহাসবিদদের দুটি বিরোধী গোষ্ঠীর মধ্যে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে বিতর্ক চলেছে। একটি গোষ্ঠী ঘোষণা করেন, 'ব্রিটেন কর্তৃক শান্তি স্থাপন' (দীর্ঘস্থায়ী অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে), আইন ও শৃংখলা, বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সৎ ও দক্ষ আমলাতন্ত্র, রেল-পথের উন্নয়ন, বাণিজ্যের, বিশেষ করে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার, সেচ-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং আবাদী জমির আয়তন-বৃদ্ধির আনুষঙ্গিক ফল হিসাবে ভারত যেমন সমৃদ্ধতর হচ্ছিল, অর্থনৈতিক বিকাশও তেমনি এদেশে ঘটছিল। পক্ষান্তরে অপর গোষ্ঠী বলেন, ব্রিটিশ শাসনের ফলে শিল্প-বিকাশ, বা শিল্প-বিপ্লব, বা অর্থনৈতিক অগ্রগতি, বা এমন কি, জনসাধারণের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধিও সাধিত হচ্ছিল না ; ব্রিটিশ শাসনের ফলে দেশে অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু কোন অর্থনৈতিক বিকাশ সূচিত হয়নি ; বরং, অপরপক্ষে, এই শাসন একটি ব্যবস্থা হিসাবে এ দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ ও আধুনিকীকরণের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দেখা দিয়েছে ; সুতরাং ভারতকে বিকাশের পথে এগোতে হলে ব্রিটিশ শাসনের অপসারণ একমাত্র শর্ত না হলেও এক অপরিহার্য শর্ত।

ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও তার বিবিধ ব্যাখ্যার ছাত্র হিসাবে উল্লিখিত ঘটনাটি আমাদের মনে রাখা ভাল। এবং দ্বিতীয় এই গোষ্ঠীটিকে আমরা যখন জাতীয়তাবাদী বলে অভিহিত করতে উৎসুক হই, তখন আমাদের প্রথম গোষ্ঠীটির অস্তিত্বও স্বীকার করতে হবে। প্রথম গোষ্ঠীটিকে খুব সঠিক ভাবেই সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী বলে অভিহিত করা যায়। আর উপরোক্ত দ্বিতীয় গোষ্ঠীটির ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী কথাটি ব্যবহার করার চেয়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কথাটি আমি বেশি পছন্দ করি।[২] প্রথম গোষ্ঠীটির মুখ্য প্রবক্তাদের মধ্যে আছেন স্ট্র্যাচি ভ্রাতৃদ্বয়, জেনারেল চেসনি এবং লর্ড কার্জন (এবং অসংখ্য অন্যান্য রাজকর্মচারী) এবং পরবর্তীকালে টি মরিসন, জি এফ শিরাস, এল সি এ নোলস, এবং কিছুটা কম মাত্রায়, ভেরা অ্যানস্টে। এই শ্রেণীবিভাগ সঠিক মান অনুযায়ী হয়েছে তা বলা ঠিক হবে না, একমাত্র যে ক্ষেত্রে আমরা এর কোন একটিকে বিশেষ একটি দিকের প্রতি প্রবণতার পরিচায়ক হিসাবে ব্যবহার করি, সেই ক্ষেত্রটি ছাড়া, কারণ সে ক্ষেত্রে অন্য প্রবণতাটিকেও আলাদা করে বোঝা যায়। একটি মৌল দৃষ্টিভঙ্গি বৈধ কি অবৈধ তা এই শ্রেণী বিভাগ থেকে প্রমাণ করা যাবে না। কিন্তু এটা সমভাবেই স্পষ্ট যে 'জাতীয়তাবাদী' বিশেষণটির বিপরীত 'বস্তুনিষ্ঠ' নয়, 'সাম্রাজ্যবাদী'[৩] ; বিশেষতঃ মৌল বিষয়টি সম্বন্ধে যেখানে কোন মিল হতে পারে না সে ক্ষেত্রে ত' বটেই—হয় এটা বৈধ হবে নয়ত ওটা।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, মরিস উনিশ শতকের অর্থনৈতিক ইতিহাসের নতুন কোন ব্যাখ্যা উপস্থিত করছেন না। উনিশ শতকের যে সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টি-ভঙ্গি সে যুগের বেশির ভাগ ব্রিটিশ সরকারি ও বেসরকারি লেখায় অন্তর্নিহিত

ছিল, তিনি তাকেই কেবল কিছুটা আধুনিক অর্থনৈতিক পরিভাষার মাধ্যমে পুনরুচ্চারণ করছেন—এমন কি তাও খুব বেশি করেন নি, কেননা তাঁর নিজের অর্থনৈতিক কাঠামোটি ছিল 'লেইজে ফেয়ার' পন্থী অবাধ উদ্যোগ।[4] মরিস যাই বলেন তাই ভুল, সেটা অবশ্য এ থেকে বোঝা যায় না। পুরানো তত্ত্ব কেবল পুরানো বলেই মিথ্যা বলে ঘোষণা করা যায় না। কিন্তু তাই বলে সেগুলিকে নতুন ব্যাখ্যা হিসাবেও গ্রহণ করা যায় না।

বস্তুতঃ পক্ষে, তাঁর যে পূর্বসূরিরা এই ব্যাখ্যা দিয়ে গিয়েছেন, চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁদের কাছ ঋণ স্বীকার করতে এমন কি তাঁদের অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করতে মরিস এমন কুণ্ঠিত যে বিস্মিত হতে হয়। একেবারে গোড়ার দিকেই তিনি বলছেন যে, দু ধরনের অর্থনৈতিক লেখক আছেন ঃ "উনিশ শতকে অবক্ষয়ের কারণ হিসাবে ভারতীয় লেখকরা ব্রিটিশ শাসনের শোষণমূলক চরিত্রের উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। যে সব পশ্চিমী পন্ডিত এই 'শোষণমূলক প্রতিপাদ্যটি' গ্রহণ করেন না, শিল্প-বিপ্লবের উষ্ণতায় সঞ্জীবিত হতে ভারতীয় অর্থনীতির ব্যর্থতার কারণ হিসাবে তাঁরা দায়ী করেন সমাজের 'পরলোক-মনস্কতা', জনসমষ্টিগুলির উদ্যোগহীনতা এবং "সমাজের অভ্যন্তরস্থ জাতিগত বর্ণগত আত্মসর্বস্বতা"কে (পৃঃ ৬০৭)। কিন্তু ব্রিটিশ অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক রচনার পাঠক মাত্রই অচিরে লক্ষ্য করবেন যে শেষোক্ত গোষ্ঠীর লেখকদের দৃষ্টি-ভঙ্গি সব সময়েই গৌণ ও আত্মরক্ষামূলক, বলা যায় পলায়নমূলক ছিল। ব্রিটিশ রাজের কল্যাণকর অবদানসমূহে সুস্থির বিশ্বাস ; বিশেষ করে উনিশ শতকে এটাই ছিল মুখ্য দৃষ্টিভঙ্গি—উৎপাদন ও জীবনযাত্রার নিম্নমানকে ব্যাখ্যা করা হত এই যুক্তি দিয়ে যে ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়ার সময় সে মান আরও নিচু ছিল।

দ্বিতীয়তঃ, মরিস সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গোষ্ঠীকে যতটা ব্যঙ্গ করেছেন, যতটা উপহাস করেছেন, কার্যত বালখিল্যসুলভ বলে প্রায়শঃই খারিজ করে দিয়েছেন, ততটা কিন্তু যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেন নি। যেমন তিনি লিখেছেন, "দুটি ব্যাখ্যাই যে অভ্যন্তরীণ স্ববিরোধ দোষে দুষ্ট সরলতম অর্থনৈতিক উপকরণ সমূহের কষ্টিপাথরে যাচাই করলে অচিরেই তা প্রকট হয়ে ওঠে। তাছাড়া এই দুটি ব্যাখ্যার কোনটির পিছনেই যথেষ্ট সমর্থন নেই, কারণ যার ভিত্তিতে এ সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সব বিষয়ে কোন গভীর গবেষণাও হয়নি (পৃঃ ৬০৮)।[5] এখন মরিস ঐ সব সরল উপকরণ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দেখে এমন সব বিবৃতি দিয়েছেন, যা ঐ উপাদানগুলির প্রয়োগ যোগ্যতা সম্পর্কে, এমনকি সেগুলির অস্তিত্ব সম্পর্কেও আমাদের সন্দিহান করে তোলে। তাছাড়া, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মূল তত্ত্বটি সম্পর্কে তাঁর বিরোধিতা কোন সমালোচনামূলক পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হতে পারে না। আমি গোড়াতেই এ কথা বিশেষ জোর দিয়ে বলতে চাই যে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লেখকেরা যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, সেগুলি এত মূলগত এবং এত গভীর ভাবে

অনুশীলিত যে অত সহজে সেগুলিকে খারিজ করে দেওয়া যায় না বা বিশোষিত করা যায় না। তাঁদের মূল বক্তব্য নিয়ে বিশদ আলোচনার অবকাশ এখানে নেই, কিন্তু প্রধান যে প্রশ্নটি তাঁরা উত্থাপন করেছেন, সেটি যে মাথা-পিছু আয় বা হস্তশিল্পের সর্বনাশের প্রশ্ন নয়, অর্থনৈতিক বিকাশের প্রশ্ন, সেটা এখানে উল্লেখ করা যায়। যে সব মৌলিক প্রশ্ন তাঁরা উত্থাপন করেছিলেন, সেগুলি এই যে, ১৮৫৮ সালের পরবর্তী ব্রিটিশ শাসন অর্থনৈতিক বিকাশের পক্ষে প্রতিকূল ছিল, না অনুকূল ছিল এবং ব্রিটিশ 'রাজ' যে অর্থনৈতিক কাঠামোটি গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল, সেটি বিকাশের পক্ষে অনুকূল ছিল কি ছিল না। তাঁরা যখন দেখলেন যে ভারত শিল্পায়নের লক্ষ্যে সফলভাবে অগ্রসর হচ্ছে না, তখন তাঁরা প্রশ্ন করলেন, কী সব সেই উপাদান যেগুলি গোটা ভারতের অগ্রগমনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল এবং এই ব্যাপারটিতে ব্রিটিশ ভূমিকাই বা কি ছিল? ভারতীয় অর্থনীতির কাঠামোতে এবং সেই কাঠামো গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্রিটিশের ভূমিকা সম্পূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করার পরেই কেবল তাঁরা ব্রিটিশ শাসনকে শোষণ অবক্ষয় এবং ব্যর্থতার কাল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ব্রিটিশ শাসন যে অতীতকে রক্ষা করতে পারেনি বা অব্যাহত রাখতে পারেনি কেবল তার জন্যই তাঁরা কখনো সমালোচনা করেন নি। তাঁরা সমালোচনা করেছেন এই বলে যে নতুন অর্থাৎ আধুনিক অর্থনৈতিক বিকাশ তা ব্যর্থ করে দিয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পশ্চিমী বিকাশবাদী অর্থনীতিকেরা যে প্রশ্নগুলি উত্থাপন করতে শুরু করেন, তাঁরাও ঠিক সেই প্রশ্নগুলিই উত্থাপন করেছিলেন। অধিকন্তু, এই বিকাশবাদীদের মধ্যে কয়েকজনই মাত্র পূর্বোক্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অর্থনীতিকদের অনুকূল অবস্থানে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছেন। এই অবস্থান থেকে সামাজিক রাজনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক ধারণাগুলিকে সংযুক্ত ও সংহত করা যায় এবং অর্থনীতির সমস্ত দিকগুলির উপর যুগপৎ দৃষ্টিপাত করা যায়। ফলে একটি সুসংবদ্ধ পরস্পর সম্পর্কিত সামগ্রিক চিত্র ফুটে উঠতে পারে। পরিণামে এই অর্থনীতিকেরা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী হয়ে ওঠেন। তাঁদের মধ্যে এই বিশ্বাস গড়ে ওঠে যে দেশের শিল্পায়ন সম্পাদন করতে হলে আগে চাই ব্রিটিশ শাসনের উৎসাদন। তাঁদের বিশ্লেষণের কাজে তাঁরা মিল, লিস্ট এবং কেরি থেকে শুরু করে পরবর্তী কালের মার্কস, মার্শাল এবং কীন্স পর্যন্ত সকলের সমকালীন অর্থনৈতিক তত্ত্বসমূহ পুরোপুরি ব্যবহার করেছেন। তা ছাড়া, তাঁরা সমসাময়িক বিকাশশীল দেশগুলির অভিজ্ঞতাও কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছেন—কেবল ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতাই নয়, সেই সঙ্গে জাপানের এবং পরবর্তী কালে সোভিয়েত দেশের অভিজ্ঞতাও।

মজার ব্যাপার হল মরিস নিজেও শেষ পর্যন্ত কাঠামোগত বিশ্লেষণের এই মানদণ্ডটিকে গ্রহণ করেছেন, কেননা তিনি লিখেছেন: "সাম্প্রতিক কালে

অর্থনীতিবিদেরা অর্থনৈতিক বিকাশের গতিবেগের মাপকাঠি হিসাবে উৎপাদনের পরিমাণকে গ্রহণ করতে এত বেশি ব্যস্ত থাকছেন যে, যেসব কাঠামোগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অর্থনীতিকে অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে, সেগুলিকে তাঁরা উপেক্ষা করছেন—গোড়ার দিকে এ সব পরিবর্তন আর উৎপাদনে অচলাবস্থা হাতে হাত মিলিয়ে চলছে বলে মনে হতে পারে" (পৃঃ ৬১৮, পাদটীকা)। কিন্তু উনিশ শতকের অর্থনৈতিক ইতিহাসের পুনর্ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি নিজেই এই নিষেধাজ্ঞা ভুলে গিয়েছেন। কারণ উনিশ শতকের অর্থনৈতিক কাঠামো কেমন ভাবে বিকাশ লাভ করছিল কিংবা বাস্তব অর্থনৈতিক বিকাশ প্রক্রিয়ার সঙ্গে কাঠামোগত পরিবর্তনগুলির সম্পর্ক কী, তার একটি দিকও তিনি আলোচনা করেন নি। কৃষিগত সম্পর্কের কাঠামো, এমন কি কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন পদ্ধতি, ধনিক শ্রেণী বা সঞ্চয়কারী ও বিনিয়োগকারী শ্রেণীগুলির কাঠামো বা তাদের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের রূপ, যন্ত্র বা মূলধনী দ্রব্যাদি বা শিল্প-প্রচেষ্টার প্রযুক্তিবিজ্ঞানগত ভিত্তি, বিদেশী মূলধন এবং দেশীয় মূলধনের মধ্যেকার সম্পর্ক, দেশীয় বাজারের বা চাহিদার কাঠামো, সামাজিক উপরিব্যয়গুলির (ওভারহেড: পরিবহণ, শিক্ষা, কারিগরি জ্ঞান ইত্যাদির) কাঠামো এবং ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার সঙ্গে সেগুলির সম্পর্ক, বিশ্ব-অর্থনীতির সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধের প্রকৃতি প্রভৃতি মৌল প্রশ্নগুলি তিনি উত্থাপন করেন নি। একমাত্র বড় ধরনের যে অর্থনৈতিক প্রশ্নটি তিনি আলোচনা করেছেন, সেটি হল মাথা-পিছু আয়-বৃদ্ধি বা জাতীয় উৎপাদনের বস্তুগত এক-রৈখিক গতিরূপ ('ফিজিকাল ইউনিলিনিয়ার মুভমেণ্ট')। তাঁর মতে ঠিক এই প্রশ্নটি উল্লিখিত উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে পুরোপুরি অর্থহীন না হলেও কম অর্থপূর্ণ। তার পরে, 'সরল অর্থনৈতিক উপকরণ' সমূহের উপরে নির্ভর ক'রে, কল্পনা করছেন যে আইন ও শৃংখলা, শান্তি, উদারনৈতিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, অন্ততঃ পক্ষে বিশ্ব-বাজারের সঙ্গে ভারতের সংযোগ স্থাপনের জন্য যতদূর দরকার ততদূর পর্যন্ত পরিবহণের বিকাশ এবং বাণিজ্যের বিস্তার প্রভৃতিই অর্থনৈতিক বিকাশের প্রশ্নটির সুরাহা করে দেবে। আমার আশংকা, কাঠামোগত পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক বিকাশের প্রশ্ন দুটি এর তুলনায় অনেক বেশি জটিল।

সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গোষ্ঠীর মধ্যে যে বিতর্ক দীর্ঘকাল ধরে চলে এসেছে, তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্পর্কে মরিস সম্যক অবহিত নন, কারণ তাঁর ধারণা যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীরা নাকি উনিশ শতকে ভারতীয় অর্থনীতির বিপর্যয় ও অবক্ষয়ের স্থূল তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি এই প্রসঙ্গে মার্কস্ থেকে এক উদ্ধৃতি দিয়ে নিজের বক্তব্য সমর্থন করতে চেয়েছেন। উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি কী যে বোঝাতে চান তা অবশ্য কেবল তিনিই জানেন। মার্কস্ কেবল এ কথাই বলেন নি যে "বুর্জোয়া শিল্প এবং বাণিজ্য

নতুন এক জগতের এই সব বাস্তব পরিস্থিতি সৃষ্টি করে”.[৩] ঐ প্রবন্ধে সেই সঙ্গে তিনি একথাও লিখেছেন যে,

> ইংরেজ বুর্জোয়া শ্রেণী যা কিছু করতে বাধ্য হতে পারে তা জনগণের সামাজিক অবস্থাকে মুক্ত করতে বা তার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটাতে পারে না, কেননা তা কেবল উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশের উপরেই নির্ভর করে না, জনগণের দ্বারা সেগুলি আয়ত্ত করার উপরেও নির্ভর করে। ব্রিটিশ বুর্জোয়া শ্রেণী ভারতীয়দের মধ্যে সমাজের যে নতুন উপাদানগুলি ছড়িয়ে দিয়েছে, ভারতীয়রা তার ফল ততদিন পর্যন্ত ভোগ করতে পারবে না, যত দিন না খাস গ্রেট ব্রিটেনেই শিল্প শ্রমিক শ্রেণী বর্তমান শাসক শ্রেণীকে উৎখাত করছে বা হিন্দুরা নিজেরাই ইংরেজের শৃংখল সম্পূর্ণ চূর্ণ করার মত শক্তি সঞ্চয় করছে।[7]

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বিশিষ্ট সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লেখকদের অধিকাংশই মার্কসের সঙ্গে এ ক্ষেত্রে একমত হবেন। তাঁদের মধ্যে এমন কেউ নেই যিনি বলেন নি যে ইংরেজরা কিছু কিছু কাঠামোগত পরিবর্তন প্রবর্তন করেনি বা যিনি এই পরিবর্তনগুলিকে পশ্চিমের জ নালা দিয়ে বয়ে আসা প্রগতিশীল হাওয়া বলে স্বাগত জানাননি। বস্তুতপক্ষে ব্রিটিশ শাসন যে আসলে গঠনমূলক ভূমিকাই পালন করেছে, তা প্রমাণ করার জন্য তাঁরা চেষ্টার ত্রুটি রাখেন নি।[৪] প্রথাগত সামাজিক ব্যবস্থাকে ব্রিটিশেরা বিপর্যস্ত করে দিয়েছে, কেবল এটুকু বলেই তাঁরা ক্ষান্ত হন নি, এটা তাঁদের সমালোচনার মূল বিষয়ও ছিল না। তাঁরা সমালোচনা করেছেন এই বলে যে ব্রিটিশরা নতুন একটি সমাজব্যবস্থার ভিত্তি রচনা ও নির্মাণ কার্যকে বিলম্বিত করেছে, ব্যর্থ করে দিয়েছে ও বাধা দিয়েছে। আর. সি. দত্ত, দাদাভাই নওরোজি এবং রানাডে থেকে শুরু করে জওহরলাল নেহরু এবং আর. পি. দত্ত পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লেখকেরা “অর্থনৈতিক অবক্ষয়” কথাটি হস্তশিল্পগুলির অবক্ষয় বোঝাতে ব্যবহার করেননি, ব্যবহার করেছেন ভারতের শিল্পায়ন ও আধুনিকীকরণের প্রতিরুদ্ধ প্রকৃতিকে বোঝাতে, অতীতের প্রতি আকুল আবেগ, এবং মার্কস যেমন ‘বেচারা হিন্দুদের’ পুরানো জগৎ হারিয়ে যাওয়ায় তাদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন, সে সমবেদনা জানাতে—এ ধরনের সমবেদনা যে কোন ভদ্রলোকই প্রকাশ করে থাকনে। এটুকু ছাড়া তাঁদের মধ্যে একজনও কিন্তু প্রাক্-ব্রিটিশ কাঠামোটির ধ্বংসসাধন কার্যের নিন্দা করেন নি। এমনকি জাতীয়তাবাদী লেখকদের প্রথম প্রজন্মও চিরায়ত অর্থনৈতিক বা সরকারি নিয়ন্ত্রণ মুক্ত ব্যবস্থার (‘লেইজে ফেয়ার’) দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। পুরানো ব্যবস্থার ধ্বংসকার্যে উৎসাহদানের ব্যাপারে উক্ত দৃষ্টিভঙ্গি প্রচণ্ড আধুনিকতাবাদী ছিল বলে তাঁরা তা প্রত্যাখ্যান করেন নি, “পুরানো উত্তরাধিকার ও পরম্পরাগত দুর্বলতা সমূহ” এবং “সামন্ততন্ত্র ও সামাজিক অবস্থান”[৫] এর শৃংখলকে রক্ষা ও চিরস্থায়ী করার কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে

ভারতে এই দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তব প্রকাশ ঘটেছিল বলেই তাঁরা এটিকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে কোন সময়েই তাঁদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য অতীত ছিল না, বর্তমান কাল—বর্তমান দারিদ্র্য, বর্তমান শিল্প-বিরল অবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রেই তাঁদের আক্রমণ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। বর্তমান প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা ইত্যাদি, এমনকি পুরানো শিল্পগুলির ধ্বংসসাধনের ব্যাপারে তাঁদের যে সমালোচনা, তারও উদ্দেশ্য ছিল অতীতে ভারতীয় স্বার্থের প্রতি উপেক্ষার নজিরগুলি তুলে ধরা—উদ্দেশ্য বর্তমান স্বার্থগুলির প্রতি যথাযথ নজর দেওয়ানো। আর তা ছাড়া ভারতীয় শিল্পগুলির ধ্বংসসাধনের ব্যাপারে তাঁদের সমালোচনাই বা কী ছিল? তা ছিল এই যে পুরানো ধরনের শিল্পগুলি যাতে নতুন ধরনের শিল্পে[10] সহজে রূপান্তরিত হতে পারে সে উদ্দেশ্যে সেগুলিকে সাহায্য করা হয়নি। যে কোন অর্থনৈতিক মাপকাঠিতেই এটি একটি সম্পূর্ণ সঙ্গত সমালোচনা।

মরিসের নতুন ব্যাখ্যার প্রত্যেকটি বিষয়কে আলাদা আলাদা ভাবে আলোচনা করার আগে আরো একটি সাধারণ মন্তব্য করতে চাই।

আধুনিক ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদদের সামনে মূল প্রশ্নটি হল: ১৯৪৭ সালে ভারত কেন এত পশ্চাদ্‌পদ ছিল, অর্থনৈতিক বিকাশ বা বিকাশের পথে "যাত্রা শুরু করার" অবস্থান থেকে কেন এত পিছিয়ে ছিল? ভারত এবং ব্রিটেনের মধ্যে, ধরা যাক, ১৮১৮ এবং ১৯৪৭ সালের মধ্যবর্তী কালে, অর্থনৈতিক ফারাক কমে যাওয়ার বদলে এত বৃদ্ধি পেয়েছিল কেন? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি, কানাডা, ইতালি, রাশিয়া, এমনকি জাপানে পর্যন্ত যখন অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটেছিল, ভারতে তখন তা ঘটে নি কেন? এ থেকেই আসে সেই সব প্রশ্ন, যেগুলি সম্পর্কে প্রায় সমস্ত বড় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লেখকই আগ্রহান্বিত: অর্থনৈতিক বিকাশের সমস্যাটির সঙ্গে ব্রিটিশ নীতি, ব্রিটিশ ভারতীয় প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কাঠামো এবং ভারতীয় সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামোর সম্পর্ক কি? মরিস এই তিনটি প্রশ্নের কোনটিরই সঠিক উত্তর দেন নি। বাস্তবিক পক্ষে, মরিসের নতুন বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে, অর্থনৈতিক বিকাশের এই অনুল্লেখ আরো বেশি দুর্বোধ্য। তাঁর মতে (ক) "উনিশ শতকীয় একটি উদারনীতিক জাতি-রাষ্ট্রের কাঠামো" ভারতে বিদ্যমান ছিল (যে সুবিধাটা রাশিয়া, জাপান এবং সংশ্লিষ্ট যুগের অর্ধেকটা কালে ফ্রান্সেরও ছিল না); (খ) ভারতে এমন এক সরকার ছিল, যার "সাধারণ উদ্দেশ্য জনগণের কল্যাণসাধন" (রাশিয়া বা জাপান বা আর কোন দেশের সরকারের ক্ষেত্রে তেমন কথা বলা যাবে কি!), এমন একটা সামাজিক কাঠামো ছিল যা অর্থনৈতিক বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াত না (বম্বের শ্রমিকদের সম্বন্ধে তাঁর বই এবং পাদটীকা ১৭, পৃঃ ৬১০ দ্রষ্টব্য); প্রচুর পরিমাণে উদ্বৃত্ত জমি ছিল (তাঁর নিজস্ব বিশ্লেষণ), জনসংখ্যার আধিক্য ছিল না (তাঁর মতে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও 'অরাজকতা' ব্রিটিশ রাজত্বের পূর্ব পর্যন্ত

ভারতের জনসংখ্যা সীমিত করে রেখেছিল। উনিশ শতকে তা অতি মন্থর গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল); কৃষি ও শিল্প উৎপাদনে মাথাপিছু ক্রমবৃদ্ধি সহ মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি (তাঁর নিজস্ব মত), এ থেকে সঞ্চয় সংস্থানে কোন সমস্যাই দেখা দেওয়া উচিত ছিল না (অন্ততপক্ষে তিনি এমন কোন সমস্যার ইঙ্গিত করেন নি); পণ্য ও সোনারূপা উদ্বৃত্ত থাকায় বিপুল পরিমাণে রপ্তানি করা হত, আইন ও শৃংখলা, "স্থিতিশীলতা, মান নির্ধারণ ও কুশলতার উচ্চমাত্রা" সম্পন্ন প্রশাসন (পৃঃ ৬১১); "সড়ক ও রেল পরিবহণের মোটামুটি সুষ্ঠু ব্যবস্থা", যুক্তিসঙ্গত কর ও বাণিজ্যিক নিয়মাবলী (পৃঃ ৬১১), এবং এই সঙ্গে আমরা যোগ করতে পারি, বিশ্বের সর্বাপেক্ষা অগ্রসর দেশের নেতৃত্ব। বস্তুতঃ পক্ষে গোড়ার দিককার জাতীয়তাবাদী লেখকরা অনুরূপ সব কটি ধারণা নিয়েই শুরু করেছিলেন, কিন্তু অচিরেই বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে তাঁদের সংঘাত ঘটে। ক্রমে ক্রমে তাঁরা ব্রিটিশ রাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চরিত্র অনুশীলন ও অনুধাবন করতে লাগলেন এবং বলতে শুরু করেন যে ব্রিটিশ নীতি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী (শোষণমূলক ও শিল্পায়ন-বিরোধী); ব্রিটিশ প্রশাসন বিকাশের প্রবণতার পক্ষে প্রতিকূল (সিভিল সার্ভিস, আর্থিক প্রশাসন, রাষ্ট্রীয় সাহায্যের অভাব); বিদেশীরা জাতীয় সঞ্চয় ও মূলধন লুটে নিয়ে যাচ্ছে; এবং কৃষিক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কাঠামো (উচ্চহারে কর, জমিদারি ব্যবস্থা, মহাজনী প্রথা, জাতীয় বাজারের সংকোচন) এবং শিল্পক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কাঠামো (বিদেশী মূলধনের আধিপত্য, যন্ত্রভিত্তিক শিল্পের অনস্তিত্ব, সামাজিক উপরিব্যয় সমূহের কার্যতঃ অনুপস্থিতি) অর্থনৈতিক বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। এটা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লেখকগোষ্ঠীর রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি; এটা "বিপর্যয়ের মূল তত্ত্ব নয়" (পৃঃ ৬০৭, পাঃ টীঃ ৫) কিংবা "অন্তহীন ও ক্রমবর্ধমান দুর্দশার তত্ত্ব" নয় (পৃঃ ৬০৮, পাঃ টীঃ ৭)। অন্য দিকে ব্রিটিশ রাজের সমসাময়িক প্রবক্তারা, যথা স্ট্রাচি এবং অন্য লেখকরা অরাজকতার অবসানের ফলে উদ্ভূত সুফলগুলির উপরে—আইন শৃংখলা ও ন্যায়বিচার, দক্ষ প্রশাসন, ব্রিটিশ রাজের বদান্যতা, 'ব্রিটেন কর্তৃক শান্তি স্থাপন', বাণিজ্যের প্রসার, রেলপথ নির্মাণ এবং চাষের জমির আয়তন বৃদ্ধি ইত্যাদি সুবিধাগুলির উপরে গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁরা দাবি করেন, অগ্রগতি অবশ্যই ঘটেছে, ভারতীয়রা এখন ইউরোপীয়দের চেয়ে এমনকি ইংরেজদের চেয়েও সচ্ছল। ব্যাহত বিকাশ-এর তত্ত্বটি তাঁরা খারিজ করে দেন। কিন্তু এ দেশের চরম দারিদ্র্যের বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁরা এ জন্য দায়ী করেন ভারতের অ'রতনকে, প্রাক-ব্রিটিশ অনগ্রসরতাকে, ভারতীয় জনগণের বহু-প্রজনন-প্রবণতাকে, তাদের সামাজিক সংগঠন এবং আচার-অভ্যাসকে, জলবায়ু ও আবহাওয়াকে (বর্ষার উপর ভরসা করে বসে থাকা) এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অভাবকে।[11] তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ব্রিটিশ গণতন্ত্রের "সরকারি নিয়ন্ত্রণ মুক্ত ব্যবস্থা" মতবাদের প্রতি আসক্তির উপরেও কিছুটা দোষ আরোপ করেন।

মরিস মূলে প্রশ্নটিকে উপেক্ষা করতে চান, কিন্তু তাঁকে যখন ব্যাখ্যার জন্য চেপে ধরা হয়, তখন তিনি মূলতঃ বিংশ শতকের পূর্বেকার সাম্রাজ্যবাদী ব্যাখ্যা ও আলোচনাকে অবলম্বন করেন।

২

উনিশ শতকে ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশে মৌল উপাদানগুলি কি কি? মরিসের মতে প্রথমতঃ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি ছিলনা এবং তাই "জনসংখ্যা সম্প্রসারণের উচ্চহারের দ্বারা অর্থনীতি ভারাক্রান্ত হয় নি" (পৃঃ ৬১১)। ৬০৮ পৃষ্ঠায় (পাঃ টীঃ ৭) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে অর্থনৈতিক অগ্রগতির একটি নিদর্শন হিসাবে ধরা হয়েছে, আর ৬১১ পৃষ্ঠায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিম্নহারকে বলা হয়েছে বিকাশ ও সমৃদ্ধির অন্যতম উপাদান। এই যুক্তি অনুযায়ী সপ্তদশ শতক ছিল আরো উচ্চমানের সমৃদ্ধির কাল, কেননা তখন আইন শৃংখলার সুঅবস্থার সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যার চাপ ছিল আরও কম। অবশ্য, গোটা বিষয়টাকেই একেবারে নিরর্থক ভাবে টেনে আনা হয়েছে। কারণ উনিশ শতকের বিকাশের অর্থনীতিতে তার কোন ভূমিকাই নেই। জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার বা নিম্নহার অর্থনীতিকে দু ভাবেই প্রভাবিত করতে পারে। উনিশ শতকের জনসংখ্যাগত পরিস্থিতিতে এই সম্ভাবনাই বেশি যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহারের সঙ্গে অর্থনৈতিক বিকাশেরও উচ্চহার এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিম্নহারের সঙ্গে অর্থনৈতিক বিকাশেরও নিম্নহার ঘটে থাকে। অনুরূপভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চ ও নিম্নহার কিছু দূর পর্যন্ত অর্থনৈতিক অচলতা বা অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে কেউ কেউ এটাও উল্লেখ করতে পারেন যে এর ফলে মরিসের "সরল অর্থনৈতিক উপকরণগুলি"র কার্যকারিতা বরং সংশয়াপন্ন হয়ে পড়ে। ৬০৮ পৃষ্ঠায়, ৭নং পাদটীকায়, তিনি "সীমাহীন ও ক্রমবর্ধমান দুর্দশার তত্ত্ব"টিকে নস্যাৎ করার জন্য এমন একটি জনসংখ্যাগত তত্ত্ব ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেন, "জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি এবং আয়ুস্কালের আপাতঃ বৃদ্ধি এই দুটি মৌল ঘটনা"কে তা ব্যাখ্যা করতে পারে না। দুর্ভাগ্যক্রমে, এখনো এমন কিছু "অতিজনসংখ্যা" বিশেষজ্ঞ আমাদের মধ্যে আছেন, যাঁরা বলেন, এটাই হচ্ছে আজ দারিদ্র্যের সবচেয়ে বড় কারণ। এটাও স্বীকার্য যে এমন অনেক দেশ আছে যেখানে অর্থনৈতিক বিকাশ, এমনকি সম্প্রসারণ ছাড়াও জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছে। মরিস মনে করেন, চরম পরিস্থিতি দেখা দিলে ম্যালথুসীয় প্রতিষেধকগুলি কার্যকরী হয় এবং সেটা সচরাচর অজন্মা, দুর্ভিক্ষ ও রোগ-ব্যাধির মাধ্যমে দেখা দিয়ে যায়। বস্তুতঃপক্ষে, শুনলে আশ্চর্য হতে হয় যে

আধুনিক যুগে অর্থনৈতিক অচলাবস্থা ও 'ক্রমবর্ধমান দুর্দশা'-র পরিস্থিতিতে জনসংখ্যা বাৎসরিক শতকরা ০.৪% ভাগ হারে বৃদ্ধি পেতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির আপাত প্রত্যাশা প্রবলতর হবার' প্রমাণ কোথায়? কে. ডেভিস প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ও মৃত্যু-হারের এই সারণী তৈরি করেছেন।[12]

বছর	প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল	মৃত্যুহার
1871-1881	24.6	
1881-1891	25.0	41.3
1891-1901	23.8	44.4
1901-1911	22.9	42.6
1911-1921	20.1	48.6
1921-1931	26.8	36.3
1931-1941	31.8	31.2

দেখা যাচ্ছে, ১৯২১ সাল পর্যন্ত প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল বাড়েনি, বরং কমেছে। তেমনি, মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে কেবল ১৯২১ সালের পরে; শিশু মৃত্যুর হারও হ্রাস পেয়েছে ১৯২১ সালের পরে।[13] অন্যদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ০.৪% হারে নয়, ১% হারে। ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত জি. ব্লাইন-এর হিসাব অনুযায়ী মাথা পিছু খাদ্য-উৎপাদনের সূচীসংখ্যা তখন হ্রাস পাচ্ছিল ১৯১৬-১৭—১৯২৫-২৬ সালে ৯০ থেকে ১৯৩৬-৩৭—১৯৪৫-৪৬ সালে ৬৮-তে (১৮৯৩-৯৪ থেকে ১৮৯৫-৯৬ সময়কালে ১০০ ভিত্তি ধরে)।[14] ব্লাইন এর সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী মাথা-পিছু খাদ্য পাওয়ার পরিমাণ ১৯১১-১৯৪১ সালের মধ্যে ২৯% হ্রাস পেয়েছে।[15] অনুরূপ ভাবে, ১৯৫৫ সালে ব্লাইন প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী মাথা-পিছু কৃষি-উৎপাদন ১৯১৬-১৭—১৯২৫-২৬-সালে ৯৮ থেকে ১৯৩৬-৩৭—১৯৪৫-৪৬-এ ৮০-তে হ্রাসপেয়েছে।[16] তাঁর সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী মাথা-পিছু কৃষি-উৎপাদন ১৯২১ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত হ্রাস পায় ৪%, ১৯৩১ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত ১০%।[17] তেমনি এটাও উল্লেখ করা যায় যে শিশু-মৃত্যু ও মৃত্যু-হার হ্রাস পায় এবং গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পায় ঠিক এই সময়কালেই, যখন ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির প্রতিটি সূচক ছিল নেতিবাচক।[18]

সরল অর্থনৈতিক উপকরণগুলি যে খুব একটা কার্যকরী নয় বা তাদের প্রয়োগ তেমন সহজসাধ্যও নয়, এটুকু প্রমাণের জন্যই কেবল জনসংখ্যা তথ্যের এই অনুশীলনের প্রয়োজন হল। অথচ মরিস তাঁর বইয়ের ৬০৮ পৃষ্ঠার ৭নং পাদটীকায় এটাই বোঝাতে চেয়েছেন। অন্য লেখকদেরও তিনি এক লহমায় নস্যাৎ করে দিতে পারেন না। অতএব, তাঁরা এমন নির্বোধও ছিলেন না যে বলবেন, "সরলতম অর্থনৈতিক উপকরণের কষ্টিপাথরে যাচাই করলেই" সেগুলি অসার বলে প্রতিপন্ন হবে।[19]

জনসংখ্যার বিষয়টির পরেই আসে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয় : "ব্রিটিশ রাজ প্রবর্তন করেছিল **ঊনবিংশ শতকের 'উদারনীতিক', জাতি-রাষ্ট্র**" (পৃঃ ৬১১, বড় হরফ আমার)। এমনকি স্ট্রাচি ভ্রাতৃদ্বয়ের বক্তব্যের চেয়েও এটা অনেকটা আগ বাড়িয়ে বলা। কারণ তাঁরা দাবি করেছিলেন যে ব্রিটিশ রাজ ছিল প্রাচ্যবাসীদের পক্ষে উপযুক্ত এক সদাশয় স্বৈরতন্ত্র। কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

মরিস তাঁর নিবন্ধে আগাগোড়াই জোর দিচ্ছেন যে আইন শৃংখলা ও সুদক্ষ প্রশাসন ('সুদক্ষ' বলতে কি বোঝায় তা না বলেই) হচ্ছে এমন একটি বিষয় যা অবশ্যই অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে চালিত করে (পৃঃ ৬১১)। আর এই কারণেই এখানে বলা দরকার যে দুটির মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই, এমনকি আইন শৃংখলা ও অর্থনৈতিক কল্যাণের মধ্যেও কোন সম্পর্ক নেই। এটা তো স্পষ্ট যে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অরাজকতা চললে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটতে পারে না, কিন্তু এর বিপরীতটা সত্য হবেই এমন কোন কথা নেই।[২০] আইন শৃংখলাকে কী উদ্দেশ্যে লাগানো হচ্ছে, তার উপরেই সব কিছুই নির্ভর করে। অর্থনৈতিক কল্যাণ ও অগ্রগতির উপরে প্রশাসনের প্রভাব কি এবং কতটা, ঐতিহাসিককে ঠিক সেইটাই বিশ্লেষণ করতে হবে।[২১] আইন শৃংখলা ঠিক কোন ভাবে কাজ করে তা অনুমান করে নেওয়া যায় না। বস্তুতঃপক্ষে আইন শৃংখলা কেবল অর্থনৈতিক কল্যাণ ও অগ্রগতির পক্ষেই মৌল আবশ্যিক শর্ত নয়, প্রণালীবদ্ধ শোষণের পক্ষেও এক মৌল আবশ্যিক শর্ত। মুঘলরাও তো ভারতে আইন শৃংখলা বজায় রেখেছিল কিন্তু কোনো অর্থনৈতিক বিকাশের সূচনা করেনি,[২২] এবং মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ আইন শৃংখলা ভেঙে পড়া নয়, সাম্রাজ্যটা অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল হয়ে যাওয়া।[২৩]

মরিস-এর মতানুসারে বিকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্রিটিশ শাসনের আরেকটি ইতিবাচক দিক হল কর ব্যবস্থা ও বাণিজ্যিক নিয়মকানুনের পরিকল্পিত প্রণালী প্রবর্তন (পৃঃ ৬১১) কিন্তু যে ঘটনাটি সকলে না হলেও অধিকাংশ গবেষণাকর্মীই মানেন, সেটা এই যে ভূমি-রাজস্বের পরিকল্পিত প্রণালী প্রবর্তনের ফলে কৃষিজীবীদের মধ্যে প্রচণ্ড দুর্দশা এবং সঞ্চয়হানি দেখা দিয়েছিল—ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে তো বটেই, সম্ভবতঃ সমস্যামূলকভাবে শেষ পর্যন্ত। তেমনি, ১৮৪০-এর দশক নাগাদই কেবল বাণিজ্যিক নিয়মকানুন সুবিন্যস্ত করা হয়। তার আগে পর্যন্ত, অন্তঃশুল্কের ফলে ভারতের অভ্যন্তরীণ শিল্পবাণিজ্য ব্যাহত হয়েছে। আর. সি. দত্ত সে কথা উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালে ১৮৭০-এর দশকে, অন্তঃশুল্ক বিন্যাসের ফলে সঙ্গত ভাবেই তা জাতীয়তাবাদী জন অসন্তোষের প্রধান কারণ হয়ে ওঠে।

বস্তুতঃপক্ষে, বিকল্প প্রকল্প হিসাবে এ কথা বলা যায় যে তৎকালীন পরিকল্পিত কর ব্যবস্থা, বাণিজ্যের ধাঁচ, আইন ও শৃংখলা এবং বিচার প্রণালীর

ফলে এক চরম প্রতিক্রিয়াশীল (কথাটির সার্বিক অর্থেই) কৃষি-ব্যবস্থার পত্তন ঘটে—সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লেখকেরা এ রকমই বলেছেন।[২৪]

এর পরে মরিস উল্লেখ করেছেন সড়ক ও রেল পরিবহণের একটি বিস্তৃত ব্যবস্থার বিকাশের কথা। কিন্তু সড়কের ক্ষেত্রে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটেনি।

অন্যদিকে, রেলপথের দ্রুত বিস্তার ঘটেছিল। এটা অবশ্য অনেকেই উল্লেখ করেছেন যে ভারতের অর্থনৈতিক প্রয়োজনের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করে রেলপথ তৈরি করা হয়নি, সেগুলি নির্মিত হয়েছিল অন্যান্য সামাজিক উপরিব্যয় এবং শিল্পের বদলে, রেলপথের "পশ্চাদ্বর্তী ও সম্মুখবর্তী যোগসূত্রগুলি" ব্রিটেনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল[২৫], তাদের 'প্রদর্শন ফল' ছিল দারুণ ভাবে সীমিত, অর্থনৈতিক বিকাশের উপর তাদের যতটা প্রভাব পড়া উচিত ছিল কার্যক্ষেত্রে পড়েছে তার তুলনায় অনেক কম। তারা গড়ে তুলেছিল এক "পরিবেষ্টিত অর্থনীতি", সুতরাং তার শোষণের উপায় হিসাবে যতটা কাজ করেছে, বিকাশের উপায় হিসাবে ততটা করেনি।[২৬] বাস্তবিকপক্ষে, ঐতিহাসিকেরা ও অর্থনীতিকেরা উভয়েই এই দিকটি নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। যাই হোক, আরো একবার আলোচনা অনভিপ্রেত নয়।

৩

মরিসের "ধারণা উনিশ শতকে একর পিছু ও মাথা পিছু গড় কৃষি-উৎপাদন বেড়ে গিয়েছিল" (পৃঃ ৬১২)। তাঁর এই ধারণার ভিত্তি ত্রিবিধ।

প্রথমতঃ, তিনি মনে করেন কর্ষণভুক্ত জমির আয়তনে ব্যাপক হ্রাস-বৃদ্ধির অবসান ঘটেছে এবং অধিকতর পরিমাণ জমি কর্ষণের পরিধিভুক্ত হয়েছে। এটা একটি পরিসংখ্যানগত প্রশ্ন এবং সেই ভাবেই এটা আলোচিত হওয়া উচিত। নিঃসন্দেহে কর্ষণভুক্ত জমির পরিমাণ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু স্থান ও কালের দিক থেকে এই প্রক্রিয়া ছিল অসম। অধিকন্তু, জমির উপরে জনসংখ্যার চাপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার কারণেই এই বৃদ্ধি ঘটেছিল, না তার বিপরীত কারণেই ঘটেছিল, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কৃষিতে গ্রামীণ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বেড়েছিল কিনা মরিস তা আলোচনা করেন নি। আসলে এই বিষয়টি সম্পর্কে এখনো কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ সহজলভ্য নয়। আলোচ্য শতকের গোটা প্রথমার্ধে দেশের বিরাট এলাকায় ভূমি-রাজস্ব প্রায়শঃই বকেয়া পড়ে থাকত। শতাব্দী জুড়ে ঋণগ্রস্ততার অপ্রতিহত ও অনবচ্ছিন্ন বৃদ্ধি এবং মহাজনদের সর্বব্যাপী ও ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি থেকে বোঝা যায় যে গ্রামীণ সঞ্চয় ও বিনি-য়োগের ক্ষেত্রে কোন ধারাবাহিক বা সাধারণ বৃদ্ধি ঘটেনি; বোঝা যায় যে,

যদি কোনো উদ্বৃত্ত হয়েও থাকে তা হলে সরকারি চাহিদা, জমির উপরে জনসংখ্যার চাপ, জমিদার ও মহাজনরা তাকে নিঃশেষে চুষে নিয়েছে; দুর্ভিক্ষ ও অভাবের প্রকোপে নীট সঞ্চয় কেবল নিঃশেষিতই হয়ে যায়নি, সম্ভবতঃ সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে নীট ক্ষতিও ঘটেছে অন্য দিকে,—কারণ এই দুই বিভীষিকা দূর করার জন্য উনিশ শতকে কিছু করা হয় নি। স্বভাবতই এই প্রক্রিয়ায় কোনো অর্থনৈতিক বিকাশ বা কল্যাণ ঘটা কদাচিৎ সম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ, মরিস বলেন, একর পিছু গড় উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল (পৃঃ ৬১২)। এই ধারণাটি উনিশ শতকের প্রচলিত ধারণার পরিপন্থী, এর ভিত্তি কি?

(১) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা: কিন্তু একর পিছু উৎপাদনশীলতার উপরে এর বড় জোর একটা **স্বল্প মেয়াদী তাৎক্ষণিক** প্রভাব থাকতে পারে। এর কোন **দীর্ঘ মেয়াদী** প্রভাব থাকতে পারে না এবং মরিস তো একটা গোটা শতাব্দীর প্রবণতার কথা আলোচনা করছেন।

(২) "উন্নততর প্রয়োগ বিজ্ঞান" প্রবর্তন (পৃঃ ৬১২)। উনিশ শতকে উৎপাদন পদ্ধতিতে বা উৎপাদনের প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন ঘটেছে এমন একটিও প্রমাণ নেই। বাস্তবিকপক্ষে, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এটা অন্যতম প্রধান সমালোচনা। যতদূর জানি, কোন অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ বা লেখক বা প্রশাসক এমন দাবি করেন নি। অন্য পক্ষে, মরিস যে কথাটি ব্যবহার করছেন, তার অর্থ তিনি জানেন না এটা বিশ্বাস করা কঠিন। অতএব, তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য অপেক্ষা করে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

ইতিমধ্যে উপস্থিত যে সাক্ষ্য প্রমাণ আছে, তা এই:

(ক) **উপকরণাদি**: 'যন্ত্রপাতি'র কথা বাদ দিলেও, ১৯৫১ সালে ৯,৩১,০০০ লোহার এবং ৩,১৭,৮০,০০০ কাঠের লাঙ্গল ছিল।[২৭] ১৮৯১-১৯৪১ সময়কাল সম্পর্কে ব্লাইন বলেন: "ব্যবহৃত সাজ-সরঞ্জামে খুব সামান্যই পরিবর্তন ঘটেছিল"।[২৮]

(খ) **সার**: ব্লাইনের লেখাই উদ্ধৃত করা যাক: "রাসায়নিক সারের সুবিধাগুলি সাধারণভাবে জানা ছিল এবং যেটুকু ব্যবহার হত তার পরিমাণও ছিল নগণ্য। ব্যবহারের একটি মোটামুটি পর্যাপ্ত পরিমাপ হিসাবে আমদানিকে ধরা যেতে পারে—১৮৯৮-৯৯ থেকে ১৯২৩-২৪ পর্যন্ত রাসায়নিক সারের গড় বার্ষিক আমদানির পরিমাণ ছিল ২,০০০ টনেরও কম ...মজার কথা যে সার সামগ্রীসমূহের, বিশেষ করে গবাদি পশুর হাড়, মাছের কাঁটা ইত্যাদি, রপ্তানির পরিমাণ ছিল আমদানির চেয়ে বেশি।[২৯] ব্লাইন আরো উল্লেখ করেছেন যে মানুষের মল ব্যবহারের ক্ষেত্রেও পরিমাপযোগ্য কোন বৃদ্ধি ঘটেনি।[৩০]

(গ) **বীজ :** ১৯২২-২৩ সালে সমগ্র ফসলী এলাকার মাত্র ১.৯ শতাংশ উন্নততর বীজের সাহায্যে চাষ হয়েছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে এ ধরনের জমির পরিমাণ বেড়ে ১১.১ শতাংশ দাঁড়ায়।[৪১]

(ঘ) **কৃষিগত শিক্ষা :** প্রযুক্তিগত পরিবর্তন কতটা ঘটেছে এই শিক্ষার প্রসার দেখে তা বোঝা যায়। ১৯৬১ সালে ভারতে কৃষি কলেজের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫টি এবং তাদের ছাত্র সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৪৫ জন। একটি নিম্নতর মানের বিদ্যালয়ও ছিল, তার ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৪।[৪২] সবাই জানেন যে গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ঘটেছিল সামান্যই।

অতএব, উনিশ শতকে ভারতীয় কৃষিতে প্রযুক্তি-বিজ্ঞানে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। ভারত যখন কৃষির দিক থেকে সর্বাপেক্ষা অগ্রণী দেশটির শাসনাধীন ছিল, তখনই এটা ঘটেছিল।

মরিস হয়ত কেবল সেচের কথাই বলছেন। কিন্তু সেচ তো ঠিক আধুনিক প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের উপাদান নয়। বহু শতাব্দী ধরে ভারতীয়রা সেচের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন; বস্তুতঃ পক্ষে মরিসের মতে ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি ছিল 'সেচ-ভিত্তিক স্থায়ী কৃষিকর্ম"। অবশ্য সেচভুক্ত এলাকা যে কিছুটা বেড়েছিল তা অস্বীকার করা যায় না। আর. সি. দত্ত সানন্দে এই বৃদ্ধিগুলির একটি তালিকা দিয়েছেন কিন্তু সেই সঙ্গে এও বলেছেন যে সমগ্রভাবে এগুলি উনিশ শতকে বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নয়। পরিসংখ্যান যখন সংগৃহীত হবে তখন আমরা একটা ধারণা করতে পারব। কিন্তু ১৮৯১-৯২ সালে ভারতের বৃহত্তম অংশ বাংলা-বিহার-ওড়িশায় সেচভুক্ত এলাকার পরিমাণ ছিল ১.৫ শতাংশেরও কম, মধ্যপ্রদেশে (সেণ্ট্রাল প্রভিন্সে) ৩.৩; মাদ্রাজে ২৪.৩; যুক্তপ্রদেশে ২৯.৩; বোম্বাই ও সিন্ধুতে ১২.৮; পাঞ্জাব, দিল্লী ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৩৮.২ শতাংশ।[৩৪] এখানে এটাও উল্লেখ্য যে, জমি ব্যবহারের ব্যবস্থাতেও কোন উন্নতি ঘটেনি। পক্ষান্তরে, যে সমস্ত কারণে জমির একর-পিছু উৎপাদনশীলতা কমে, সেগুলিও লক্ষ্য করা যায়। ক্রমাগত জমি আরও বেশি করে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।[৩৪] প্রজাকে দিয়ে চাষ এবং ভাগচাষও বাড়তে থাকে।

তৃতীয়ত, মরিস মনে করেন বাণিজ্যিকীকরণের ফলে একর-পিছু উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। প্রথম যে-প্রশ্নটি আবার এখানে ওঠে তা এই যে বাণিজ্যিক ফলন কতটা বেড়েছিল? ১৮৯১-৯২ সালে মোট ১৬ কোটি ৮০ লক্ষ একরের মধ্যে মাত্র ২ কোটি ৭৯ লক্ষ একরে অর্থাৎ ১৬.৫ শতাংশে খাদ্যশস্য নয় এমন ফসল উৎপাদন করা হয়েছিল।[৪৫] স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, বাণিজ্যিকীকরণ জোর কদমে এগিয়ে গিয়েছিল এবং তার ফলে কৃষিতে দারুণ প্রেরণা জেগেছিল, এই মত ঠিক নয়, বিশেষ করে আমরা যদি মনে রাখি যে আগেও ভারতীয়রা বিপুল পরিমাণ অর্থকরী ফসল, যেমন তুলো, গুড়, তৈল-বীজ, পাট, বাদাম, মশলা ইত্যাদি উৎপাদন করত। (মুঘল আমলের সঙ্গে তুলনাটা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক।)

তা ছাড়া, নিছক বাণিজ্যিকীকরণের ফলেই উন্নততর প্রযুক্তি-বিজ্ঞান চালু হয়ে যায় নি। এর ফলে জমির 'বিশেষীকরণ'-ই কেবল ঘটতে পারে, অর্থাৎ ভাল জমিতে খাদ্যশস্যের চাষ বন্ধ করে অর্থকরী শস্যের চাষ শুরু করা যেতে পারে। যাই হোক না কেন, কোন উন্নততর প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের প্রবর্তন যে ঘটেনি সেটা আমরা জানি। বাণিজ্যিকীকরণের ফলে এমনকি কৃষিতে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনও প্রবর্তিত হয় নি। এর ফলে সচরাচর প্রজাস্বত্ব ও ভাগ-চাষ ব্যবস্থাই অনেক জোরদার হয়েছে। ভারতে বাণিজ্যিকীকরণের অর্থ ছিল শুধু বিক্রয়ের জন্য শস্য উৎপাদন। তাছাড়া, ভূমি-রাজস্বের চাহিদা, খাজনা ও সুদের চাপের প্রয়োজনে যদি এই সীমাবদ্ধ বাণিজ্যিকীকরণ ঘটে থাকে এবং আরও দুর্মূল্য শস্য রোপণের প্রয়াসেই যদি তা করা হয়ে থাকে, সেটা তা হলে কৃষকের শক্তির উৎস হয় না। তা বরং পরিণত হয় কোন উপকরণ সরবরাহ, বা প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন ঘটানো ছাড়াই কৃষককে "বিশেষীকরণ" করতে বাধ্য করে গ্রামাঞ্চল থেকে লুণ্ঠনের পরিমাণ আরো বাড়িয়ে নেবার জন্য শহরাঞ্চলের ও বিদেশী শাসনের এক অপকৌশলে মাত্র। এটা পর্যবসিত হয় শোষণের একটা হাতিয়ারে। বাজারের টানা-পড়েন ও ওঠানামার শক্তিগুলির মুখে কৃষককে তা এক অসহায় শিকারে পরিণত করে আরো নিঃস্ব করে দিতে পারে। উনিশ শতকে অন্তত এটাই ঘটেছিল বোঝা যায়। সরকার, জমিদার, মহাজন, বণিক ও বিদেশি রপ্তানি-কারকেরা বর্ধিত বাণিজ্যিকীকরণের এবং সেই সঙ্গে সেচেরও সুযোগ সুবিধা আত্মসাৎ করেছিল। সেচের চড়া হার কৃষককে বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদন করতে বাধ্য করেছিল। কৃষক আরো গভীরে ঋণে ডুবে গিয়েছিল, কৃষির উন্নতি সাধনে আরো অক্ষম হয়ে পড়েছিল।

মরিস এখানে আসল প্রশ্নটি একেবারেই উপেক্ষা করেছেন: কৃষিজাত উদ্বৃত্ত কে আত্মসাৎ করত এবং কোন কাজে তা লাগাত? "শোষণকারী শ্রেণীগুলির দ্বারা মহাজনী কারবার, জমি বিক্রয় কিংবা পরিভোগ ছাড়া এই উদ্বৃত্তের কোন একটি অংশও কি কৃষি বা শিল্পে আবার ঘুরে এসেছে? আর. সি. দত্ত, রানাডে, জোশী, দাদাভাই এবং পরবর্তী কালে রাধাকমল মুখার্জী এবং আর. পি. দত্ত এই প্রশ্নটি আলোচনা করতে এবং তার উত্তর দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। উত্তর তাঁদের যাই হোক না কেন, তাঁরা অন্ততঃ সঠিক পথে এগিয়েছিলেন।[৪৩]

সুতরাং আইন-শৃংখলা বা বাণিজ্যিকীকরণের মধ্যে এমন কিছু নেই যা একর প্রতি বা মাথা পিছু উৎপাদনশীলতা আপনা আপনি বাড়িয়ে দেয়; আছে ভূমি-সংক্রান্ত কাঠামো ও গোটা অর্থনৈতিক কাঠামোর উপরে তাদের প্রভাবের গভীরতর প্রশ্নটি। আসল কথা এই যে, এই ধরনের বৃদ্ধি যে ঘটেছে, তা প্রমাণ করতে হবে। অর্থনৈতিক ইতিহাসে কিংবা "সরল অর্থনৈতিক উপকরণ-গুলি"তে এমন কিছু নেই যার ভিত্তিতে আমরা এই বৃদ্ধির ব্যাপারটা অনুমান করে নিতে পারি।

বাস্তবিকপক্ষে, যে তিনটি কারণে কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়তে পারত, সেগুলি হল : (ক) মূলধন বিনিয়োগ, (খ) একর পিছু শ্রম-বিনিয়োগ জোরদার করা, (গ) সামাজিক অনুপ্রেরণা। কৃষক তার জমি হারাচ্ছে এবং চড়া খাজনায় ঠিকা প্রজায় পরিণত হচ্ছে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে **এমনকি অর্থনৈতিক তত্ত্বের কারণেও আবাদি জমির আয়তন বৃদ্ধি এবং উৎপাদন বৃদ্ধির হেতু খুঁজতে হবে দ্বিতীয় উপাদানটির মধ্যে – উপরোক্ত বৃদ্ধি যদি সত্যিই ঘটে থাকে তবেই এ প্রশ্ন উঠবে। জমির উপরে ক্রমবর্ধমান চাপের সাহায্যেই কেবল এর ব্যাখ্যা দেওয়া যায়।**[৪৭] শ্রমের অতিরিক্ত বিনিয়োগ যখন কোনমতেই আর উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারে না, মানুষ জমি অনুপাত সে রকম পর্যায়ে পেঁছলেই কেবল এসব সম্ভব। কিন্তু সেক্ষেত্রে খাদ্য-শস্যের পরিমাণ-বৃদ্ধি জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ বা সমৃদ্ধির নিদর্শন না হয়ে জনসংখ্যা-বৃদ্ধি ও জমির উপর চাপের মোকাবেলা করার জন্য মানুষের আদিমতম প্রতিক্রিয়ায় পর্যবসিত হয়। সেটা তখন বন্ধ্যা অর্থনীতির একটি দিক মাত্র হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া, জাতীয়বাদীরা যেমন বলেছেন যে, কৃষি-উৎপাদনে এই যে বৃদ্ধি তা হচ্ছে ভারতকে ব্রিটেনের পশ্চাদভূমিতে পরিণত করাতে ব্রিটেনের অভিসন্ধিরই অভিব্যক্তি—ভারত যাতে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি করে ব্রিটেনের কাঁচামাল ও খাদ্যের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে এবং সেই সঙ্গে ব্রিটেনের শিল্পজাত দ্রব্যাদির ও মূলধনের বাজারের রূপান্তরিত হতে পারে। সে জন্যই ব্রিটেন এটা চেয়েছিল। সে যাই হোক না কেন, একটা সার্বিক অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্বসৃষ্টি করা তো আর সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক স্বার্থের উপজীব্য ছিল না, যদিও সেটা তাদের নীতির পরোক্ষ ফল এবং সেই কারণে, সাম্রাজ্যবাদ যে স্ববিরোধগুলিতে জড়িয়ে গিয়েছিল তার একটি প্রকাশ হতে পারে।

৪

যে সব ব্যাপারে মরিস নতুন করে লিখতে চাইছেন, ভারতীয় হস্তশিল্পের সর্বনাশ এবং দেশের আপেক্ষিক গ্রামায়ণের প্রশ্নটি সেগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দুটি বিষয়ের উপরে এখানে আবার জোর দেওয়া দরকার : (১) আগেই দেখিয়েছি, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির বিচার্য হল অর্থনৈতিক কাঠামোর উপরে ব্রিটিশ প্রভাব। আর জাতীয়তাবাদীরা এই সর্বনাশকে অনুচিত গুরুত্বও দেন নি। তাঁদের বেশি আগ্রহ ছিল অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার গুণমানের ব্যাপারে, দ্রব্য-সামগ্রীর স্বল্পকালীন প্রাপ্যতা সম্পর্কে তাঁদের আগ্রহ ততটা ছিল না। (২) মরিস যে-ভাবে প্রশ্নটিকে নতুন করে উত্থাপন করেছেন, তাতে তিনি নিছক 'ধারণা', 'বিশ্বাস' ইত্যাদি হাজির করেছেন, কিংবা 'অর্থনৈতিক উপকরণ'সমূহের উপরে নির্ভর করেছেন, কিন্তু গুণগত বা পরিমাণগত প্রমাণের এক কণাও পেশ করেন নি।

আর. সি. দত্ত এবং অন্যান্য লেখকেরা তাঁদের মতের সমর্থনে বিপুল পরিমাণে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। এর মধ্যে ছিল একেবারে নিম্নপদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারী (‘অকুস্থানে উপস্থিত ও ওয়াকিবহাল লোকজন’) এবং উচ্চ-পদস্থ কর্মচারীদের সাক্ষ্য, সারা জীবন যাঁরা কাটিয়েছেন ভারতের গ্রামাঞ্চলে ও শহরগুলিতে এবং প্রথম আমলের ব্রিটিশ প্রভাব ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের বাস্তব প্রক্রিয়া যাঁরা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন; গভর্নর, গভর্নর-জেনারেল, পাণ্ডিত্যসম্পন্ন রাজকর্মচারী, সমসাময়িক পর্যটক, ব্রিটিশ ও ভারতীয় বণিক, সরকারি তদন্ত কমিশন, সরকারি নথিপত্র ইত্যাদি। এই সমস্ত তথ্য প্রমাণের পুনরাবৃত্তি আমি করব না। আর. সি. দত্ত, জি. ভি. জোশী, বি. ডি. বসু, ডি. আর. গ্যাডগিল, আর. পি. দত্ত এবং অন্যান্যরা তা ভূরি ভূরি প্রকাশ করেছেন। আরও সাম্প্রতিক কালের পণ্ডিত ব্যক্তিরা, যেমন আর. ডি. চোকসি, রমণ রাও, সারদা রাজু, এন. কে. সিনহা এবং এইচ. আর. ঘোষাল, একই ধরনের সাক্ষ্য-প্রমাণ পরীক্ষা করে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। হ্যারল্ড ম্যান এবং জে সি. জ্যাক এর আগে গ্রাম নিয়ে যে সমীক্ষা করেছেন, তা থেকেই অনুরূপ সাক্ষ্য মেলে। যেমন, জে. সি. জ্যাক নামে জনৈক আই-সি-এস ঘোষণা করেন যে ব্রিটিশ রাজের কল্যাণকর অবদানগুলি প্রমাণের ধারণা থেকেই তিনি গ্রন্থ রচনার প্রেরণা লাভ করেছিলেন—ঐ ভদ্রলোক ছিলেন ব্রিটিশ রাজের এক মস্ত বড় সাক্ষী। তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে ফরিদপুরের চাষীদের অবস্থা ইতালীয় চাষীদের তুলনায় ভাল ছিল। তিনি লেখেনঃ "বয়ন-শিল্পের মত দারুণ প্রাণবন্ত শিল্প অংশতঃ বিদেশ থেকে আমদানি করা ও মিলে তৈরী তুলাজাত সামগ্রীর চাপে এবং অংশতঃ ম্যালেরিয়ার তাণ্ডবে নিহত হয়েছে।"[৪৪] যাই হোক, বিষয়টির উপরে আর গুরুত্ব দেওয়া বা তার সপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করা নিষ্প্রয়োজন। কুটিরশিল্পীদের সর্বনাশের ব্যাপারটি সকলেরই জানা, বিপুল পরিমাণ তথ্যের ভিত্তিতে তা প্রমাণিত সত্য। উন্নততর পরিমাণগত বা গুণমানগত সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত না করে একে বাতিল করা বা বিদ্রূপ করা যে সমীচীন নয়, সে বিষয়টির উপরে এখন গুরুত্ব দিতে হবে। কোন পক্ষের সাক্ষ্য-প্রমাণ অধিকতর গ্রহণযোগ্য প্রত্যক্ষ কিছু তথ্য প্রমাণ হাজির করলেই কেবল তা আমরা বিচার করতে পারি। পুরনো সত্যগুলিকে প্রতিনিয়ত নিশ্চয়ই নতুন করে যাচাই করতে হবে এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন হলে তা খারিজ করে দিতে হবে। আমরা সর্বদাই নতুন তথ্যের সন্ধান করি এবং পুরানো তথ্যকে আবার যাচাই করি।[৪৫] তাছাড়া, অবরোহমূলক বিশ্লেষণকে অবশ্যই নতুন পথে অনুসন্ধানের সূচনা হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু অনুমান ও ধারণা দূরে থাক, ‘অবরোহমূলক’ ‘অর্থনৈতিক যুক্তিকেও’ কোন পুরনো সত্যের প্রতিকল্প বা পুনর্ব্যাখ্যা হিসাবে খাড়া করা যায় না।

আমি আবার জোর দিয়ে বলতে চাইঃ মরিস যে মতটির বিরোধিতা করেছেন সেটি যে কোন ‘শাস্ত্রীয় প্রথা’র উপরে বা জাতীয়তাবাদী সংস্কারের উপরে প্রতিষ্ঠিত, সেটা সত্য নয়। এই মতটির ভিত্তি হল বিপুল পরিমাণ সাক্ষ্য—

বস্তুতঃপক্ষে এখনো পর্যন্ত প্রাপ্ত একমাত্র সাক্ষ্য। এই মত খণ্ডন করতে গিয়ে মরিস কোনো সাক্ষ্যই উপস্থিত করেনি—না পরিসংখ্যানগত, না গুণগত।[40]

অর্থনৈতিক ইতিহাসে গুণগত প্রমাণ ব্যবহার সম্পর্কে আর একটি কথা এখানে বলতে চাই। এটা ঠিকই যে নির্ভরযোগ্য পরিমাণগত প্রমাণ পেলে এবং পরিসংখ্যানের সাহায্যে তা বিশ্লেষিত হলে আমাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তি দৃঢ়তর হয়। কিন্তু কারিগর ও হস্তশিল্পীদের উপর ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব খুঁজতে গ্রাম, জেলা ও শহরের নথিপত্র যদি তুলনামূলকভাবে ব্যবহার করা যেত ব্যাপারটা তা হলে খুবই চমৎকার হত। কিন্তু এ ধরনের পরিসংখ্যান যতদিন পাওয়া না যাচ্ছে, গুণগত প্রমাণের উপরই ততদিন নির্ভর করতে হবে। সে প্রমাণ অবশ্য যথেচ্ছ ব্যবহার করা চলবে না। অনেক ভাবনা-চিন্তা, হিসাব-নিকাশ করে ব্যবহার করতে হবে এবং ব্যবহারের সময়ে সর্বদাই খেয়াল রাখতে হবে যে এ ধরনের প্রমাণ থেকে মোটামুটি একটা ধারণাই কেবল করা যায়। তাছাড়া, ভুল ও বিকৃত পরিসংখ্যানের তুলনায় গুণগত প্রমাণ অনেক সময়ই ভাল।[41] এই ব্যাপারটি অবশ্য কেবল আলোচনার জন্যই আলোচনা করা, কেননা আর. সি. দত্ত প্রমুখ লেখকদের সাক্ষ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলার মত কোন পরিসংখ্যানই মরিস উত্থাপন করেন নি, এমন কি কোন বাজে পরিসংখ্যানও দেন নি।

আমরা এখন এ ব্যাপারে মরিসের অর্থনৈতিক 'তাত্ত্বিকতা' নিয়ে আলোচনা করব। অবশ্য এই আলোচনা প্রসঙ্গে সব সময়েই মনে রাখতে হবে যে আমাদের অনুশীলন অর্থনৈতিক ইতিহাস নিয়ে নয়, অর্থনৈতিক যুক্তিবিদ্যা নিয়ে। সেই কারণে এই আলোচনা করতে গিয়ে কখনও কখনও অনুশীলনের প্রক্রিয়ায় সত্যিকারের কোন বিতর্ক নাও উঠতে পারে, কেননা মরিস এখনও সেই উনিশ শতকীয় আন্তর্জাতিক 'অবাধ' বাণিজ্যের তত্ত্বটুকু আঁকড়ে ধরে আছেন—এই তত্ত্ব অনুযায়ী প্রতিযোগিতা ও স্বার্থবোধ থেকেই অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটে থাকে। পক্ষান্তরে, আমি গ্রহণ করি প্রথম দিককার ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ও মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি (হয়ত যুদ্ধোত্তর পর্বে বিকাশের দৃষ্টিভঙ্গিও)—এই দৃষ্টিভঙ্গি বলে অর্থনৈতিক বিকাশকে দেখা হয় বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নানা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের, এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর সামগ্রিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফল হিসাবে। এর ফলে এক মৌল পার্থক্যের সৃষ্টি হয়ঃ উনিশ শতকের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে স্বল্পকালীন মেয়াদে মোট উৎপাদনে (অথবা, মোট আয়ে) যা বাড়বে তার সবটা নিয়েই অর্থনৈতিক প্রগতি। অন্যদিকে দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি বলে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াটির 'গুণগত দিক' এবং তার দীর্ঘমেয়াদী তাৎপর্যসমূহ অনুসন্ধান করা হয়। এর পরে তার লক্ষ্য শিল্পায়ন এবং নিরবচ্ছিন্ন শিল্পোৎপাদন ক্ষমতা এবং ত্বরণের ন্যূনতম হারে সেই উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষমতাকে অর্থনৈতিক প্রগতির চূড়ান্ত পরীক্ষা হিসাবে গণ্য করা।

৬১২ পৃষ্ঠায় মরিস লিখেছেন, "ব্রিটিশ বস্ত্র যখন ভারতীয় হস্তচালিত তাঁতের বস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছিল, দাম পড়ে যাওয়া সত্ত্বেও কলে তৈরি

সুতো তখন দেশীয় হস্ত চালিত তাঁতের জিনিসের প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছিল বলে মনে হয়।"[৪২] প্রথমতঃ, সংশ্লিষ্ট পরিমাণগুলি সম্পর্কে, বিশেষ করে বোনা জিনিস আমদানির সঙ্গে সুতো আমদানির অনুপাতটি সম্পর্কে (যা কার্যতঃ ছিল খুবই কম) একটা ধারণা নেওয়া যাক। বোনা জিনিস অবশ্য আমদানি করা হত খুবই সামান্য ঃ

	তুলাজাত দ্রব্যাদি আমদানি[৪৩]	
বৎসর	তুলোর পাক ও সুতো (£)	তুলার জিনিস (£)
1849	909,016	2,222,089
1859	1,714,216	8,088,927
1869	2,779,934	16,072,551
1889	3,746,797	27,764,508

দ্বিতীয়তঃ, যার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে তাঁতির ঐ ক্ষমতা আরও বেড়ে গেল, সে জিনিসটা কি? ধরে নিতে হবে, সেটা আমদানি করা কাপড়। কিন্তু তাও বা কেমন করে সম্ভব—কারণ, সেই একই সুতো ত ব্রিটিশ তাঁতিরকাছে ছিল সুলভ আর ব্রিটিশ তাঁতিদের উৎপাদনশীলতা যখন একদিকে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল, অন্যদিকে ভারতীয়দের উৎপাদনশীলতা তখন ছিল অপরিবর্তিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ব্রিটিশ তাঁতিদের প্রতি পাউন্ড সুতো পিছু মজুরি নিম্নলিখিত ভাবে হ্রাস পেয়েছিল ঃ [৪৪]

1819-21	15·5 পে
1829-31	9·0 পে
1844-46	3·5 পে
1859-61	2·9 পে
1880-82	2·3 পে

তাছাড়া, বোনা জিনিসের (তুলো) রপ্তানি-দাম সুতোর দামের চেয়ে ঢের বেশি তাড়াতাড়ি হ্রাস পাচ্ছিল ঃ[৪৫]

কাল	পাউন্ড পিছু গড় রপ্তানি মূল্য	
	সুতো (পেন্সের হিসাবে)	কাপড় (পেন্সের হিসাবে)
1819-21	29·0	70·3
1829-31	15·3	40·6
1844-46	12·0	22·5
1859-61	11·7	20 5
1880-82	12·8	19·4

এ থেকে বোঝা যায় যে গোটা উনিশ শতকের বেশির ভাগটা জুড়েই ব্রিটিশ তাঁতিদের সঙ্গে ভারতীয় তাঁতিদের প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা ক্রমশঃ কমে যাচ্ছিল। এই কারণেই কাপড়ের আমদানি ১৮৪৯ সালের চেয়ে ১৮৮৯ সালে ২ কোটি ৫৫ লক্ষ স্টার্লিং (১২.৫ গুণ) বেড়ে যায় অথচ সুতোর আমদানি বাড়ে ১৮ লক্ষ (৪ গুণ)। মরিসের বক্তব্যের যুক্তি বিচারেও ত্রুটিপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়। বিদেশী কাপড় তখনও কেন ক্রমবর্ধমান পরিমাণে আমদানি করা হত? এ কি রকম শক্তিবৃদ্ধি? আরো একটু এগোনো যাক: কাপড় আমদানি সত্ত্বেও বা ঐ কারণেই কোন না কোন ভাবে দাম কমেছিল। কি কারণে তা হলে হস্ত-শিল্প উৎপাদন বেড়েছিল?[৪৩] তিনটি শর্ত দিয়ে কেবল সেই পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে:

(১) মূল্যান্তর ছিল ল্যাংকাশায়ারের অনুকূলে; কিন্তু তাঁতিরা বেশি করে বিক্রয় করতে পেরেছিল, কারণ ল্যাঙ্কাশায়ার ঐ দামে প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করতে পারেনি কিংবা প্রসারণশীল বাজারে পৌঁছতে পারেনি। তাঁতিরা কিন্তু তা পেরেছিল। শেষোক্ত ক্ষেত্রে ভারতীয় তাঁতিরা একটা একচেটিয়া বা সংরক্ষিত বাজার পেয়ে গিয়েছিল; সেক্ষেত্রে তাদের কোন শক্তিবৃদ্ধির আদৌ প্রয়োজন ছিল না।

(২) সুতো আমদানির ফলে, মূল্যান্তর তাঁতিদের অনুকূলে ছিল, কিন্তু তবু ল্যাংকাশায়ারের কাপড়ের বিক্রির পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল। তার কারণ তাঁতিরা যথেষ্ট পরিমাণ সুতো পায়নি কিংবা তাদের পুরো কাজ ছিল। এই ক্ষেত্রে আরও একটি উপশর্ত আছে: সেটা হল এই যে ভারতীয়রা তাঁতিদের তৈরি সস্তা জিনিসের তুলনায় বেশি দামী বিদেশি জিনিস পছন্দ করত।

(৩) তাঁতি তার সংসার খরচ কাটছাঁট করে বাঁচার চেষ্টা করত। কিন্তু সেটা ছিল প্রতিদিনই পিছু হঠার অবস্থা। এই পরিস্থিতি দ্বিতীয় পরিস্থিতিটিরই অনুরূপ, কিন্তু এক্ষেত্রে তার প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে উন্নতি ঘটে না, ঘটে অবনতি। নিজের সংসার খরচ ও মূলধন কাটছাঁট করে সে তার শিল্পকে রক্ষা করে।

বস্তুতঃপক্ষে, যে সমস্ত কারিগর বেঁচে থাকল, তারা হয় তৃতীয় পরিস্থিতির ফলে, নয়তো প্রথম পরিস্থিতিটির দ্বিতীয় উপশর্তটির ফলে বেঁচে থাকল— এবং গ্রামীণ কারিগরদের একটা বড় সংখ্যাই বেঁচে ছিল। অর্থাৎ বিশাল ভারতীয় বাজারে পৌঁছতে ল্যাংকাশায়ার ব্যর্থ হওয়ার ফলে তারা বেঁচে থাকতে পারল। (অন্য ভাবে বলা যায়, ভারতের গ্রামীণ কারিগর বেঁচেছিল আরো রিক্ত হয়ে অথবা ভারতের উপরে ব্রিটিশ প্রভাব যেহেতু সব সময়েই অসম্পূর্ণ ছিল, সে কারণেই, ব্রিটিশ শাসনের পশ্চাৎপদতার প্রসাদে সে বেঁচে গিয়েছিল! 'নিয়ন্ত্রণ মুক্ত' অর্থনীতির আদর্শ অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ বাজার তৈরি করার মত

যথেষ্ট নৈপুণ্যও ব্রিটিশ শাসনের ছিল না)[47] কিংবা ডঃ গ্যাডগিল যেমন বলেছেন, চাষী ছিল খুবই গরীব এবং জীবন নির্বাহের ব্যয় ছিল সামান্য, পক্ষান্তরে, হাতে-তৈরি কাপড় ছিল এত শস্তা যে চাষীর পক্ষে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম ল্যাংকাশায়ারের কাপড় কেনা সম্ভব ছিল না, অথবা ল্যাংকাশায়ারের এই কাপড় হাতে তৈরি কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতেও সক্ষম হত না। অন্য ভাবে বলা যায়, চাষীর আয় "উল্লেখযোগ্যভাবে" বৃদ্ধি পাক (মরিস যা বিশ্বাস করেন) আর নাই পাক, ব্রিটিশ কাপড় কেনার সামর্থ্য তার ছিল না।[48] দ্বিতীয়তঃ, এই "উন্নততর" প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা বজায় রাখতে হলে কারিগরকে নিজের সংসার খরচ কাটছাঁট করতে হত।

এর পর আবার মরিস একটি বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা প্রায় দিয়ে ফেলেন। তিনি লেখেন, "ভারতে কাপড়ের চাহিদা বেশ স্থিতিস্থাপক বলেই মনে হয়। দাম পড়ে যাওয়ার ফলে চাহিদাও পড়ে যায়। তা ছাড়া তন্তুজ বস্ত্রের চাহিদার রেখাটি ডান দিকে সরে যায় বলেও মনে হয়"। কিন্তু 'চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা' ও 'চাহিদা-রেখা'-র মত আধুনিক অর্থনীতির জটিল উপকরণগুলি কোথা থেকে আমদানি করা হল? যার ভিত্তিতে এমন একটি উন্নত মানের চাহিদা-রেখা আঁকা যায় এবং তার স্থানান্তরণ দেখানো যায় অর্থনৈতিক সাহিত্যে সে রকম সামগ্রী দুষ্প্রাপ্য। বস্তুতঃ পক্ষে, ঐ রেখাটি একটি মনগড়া জিনিস এবং 'ঘটায়', 'স্থানান্তর' ইত্যাদি কথাগুলি তার বাস্তব অস্তিত্ব সম্পর্কে বিভ্রম সৃষ্টি করে। এবং চাহিদা-রেখাটির এই স্থানান্তরের একমাত্র ভিত্তি হচ্ছে আবার সেই তত্ত্বঃ জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং রীতি-নীতি পরিবর্তন (শাড়ির নিচে কাঁচুলি ব্যবহারের মত)। কিন্তু যে বিষয়ে আমাদের গবেষণা চালাতে হবে, আয়ের 'প্যাটার্ন' এবং 'কার্যকর চাহিদার কাঠামো'—এই দুটির উপরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাবই হচ্ছে সেই জটিল সমস্যা। মরিস যেমন সরল ভাবে এটি বিবৃত করলেন, তেমন সরল ভাবে তা করা যায়না—যদিও জনসংখ্যা বাড়লে শিল্প-বিকাশ আপনা-আপনিই ঘটবে এ ধরনের মতবাদে কেউ বিশ্বাস করলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। বিষয়টি সম্পর্কে কোন গবেষণা না হওয়ায়, কাঁচুলির ফ্যাশনে অদলবদলও উনিশ শতকীয় কল্পকাহিনীর মত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ল্যাংকাশায়র তখন স্বপ্ন দেখত চীনাদের কোট টেল এক ইঞ্চি বাড়িয়ে দেবার আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের দক্ষিণী সদস্যরা স্বপ্ন দেখত চীনাদের তামাক ধরাবার। সেই সুন্দর স্বপ্নময় অতীতে 'কার্যকর চাহিদার' সমস্যাগুলিকে বাজার-বুভুক্ষু বণিক ও শিল্প-মালিকেরা এই রকম সরল ও সহজ ভাবেই সুরাহা করে ফেলত।

এক্ষেত্রে একমাত্র কার্যকর অর্থনৈতিক যুক্তি হল এই যে ক্রমবর্ধমান আয়ের ফলেই সুতী-বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু তা হলে দেখাতে হবে যে সত্যই এই ধরনের আয়-বৃদ্ধি ঘটেছিল, যে এই বর্ধিত আয় যাদের হাতে পড়েছিল তারা তা ব্যয় করত হস্তশিল্পজাত দ্রব্যাদির জন্য, এবং দেখাতে হবে যে সুতী-

বস্ত্রের আমদানি এবং পরবর্তী সময়ে দেশীয় যন্ত্রশিল্প-জাত দ্রব্যাদি এই বর্ধিত চাহিদাকে পূরণ করেনি।[৪৯]

বস্তুতঃপক্ষে উপস্থিত সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে যে-চিত্রটি ফুটে ওঠে সেটি হচ্ছে এই :

(১) অর্থনীতিতে যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করত, শহরের সেই হস্তশিল্পের ক্রমবর্ধমান সর্বনাশ।

(২) অর্থনৈতিক বৃত্তি হিসাবে সুতো কাটার উপর দারুণ আঘাত পড়ল। কৃষকের গার্হস্থ্য অর্থনীতির ক্ষেত্রে এর পরিণাম হয়েছিল গুরুতর। ফলে কৃষক ও কুটির শিল্পীর উপরে বণিক-মহাজনের কর্তৃত্ব আরো বাড়ল এবং তা ছাড়াও আরো নানা কিছু ঘটল যেগুলি আলোচনার অবকাশ এখানে নেই।

(৩) গ্রামের কারিগর ক্রমশঃই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল (প্রকৃত আয় সামান্য কমলেই কোন ক্রমে বেঁচে আছে এমন শ্রমিকের উপরে তার পরিণাম সাংঘাতিক হতে পারে)। এর ফলে কারিগরেরা ক্রমেই বেশি বেশি সংখ্যায় নিজ শিল্পকর্ম পরিত্যাগ করতে বাধ্য হল, বিশেষ করে যতই বেশি বেশি পরিমাণ জমি আবাদের আওতায় আনা হল ততই সে সংখ্যা বেড়ে গেল। তাছাড়া, চিরাচরিত শ্রম-বিভাগ ভেঙে যাওয়ায় তাদের পক্ষে উঠ্‌বন্দী-প্রজা ও ভাগ-চাষী হবার পথ খুলে গেল। অনেকেই ক্ষেত-মজুর হতে পারল।[৫০] এই কারণে বর্ধমান জনসংখ্যার যুগে (বাৎসরিক ০.৪ শতাংশ হারে), বিশেষ বিশেষ হস্তশিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের চূড়ান্ত সংখ্যা অবশ্য হ্রাস নাও পেতে পারে (যদিও বেশির ভাগ সাক্ষ্য থেকে বোঝা যায় যে তাও ঘটেছিল), তবে মোট জনসংখ্যার অনুপাত হিসাবে অবশ্যই তা হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু তখনও এক বিরাট সংখ্যক কারিগর তাদের পরম্পরাগত শিল্পকর্মগুলিতেই লেগে ছিল, সেটা অবশ্য অর্থনৈতিক পছন্দের কারণে ততটা নয়, অন্য কোন সুযোগের অভাব তার চেয়ে ঢের বড় কারণ। দুর্ভিক্ষ কমিশনগুলির প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে এরাই দুর্ভিক্ষের প্রথম বলি হয়েছিল। অনেকে তাদের শিল্প-কর্মের সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছিল ছোট্ট একটা খামার কিংবা কৃষি-মজুরের কাজ কিংবা সামান্য ব্যবসা।

তা ছাড়া, কুশলী কারিগরদের অনেকে এমন সব জিনিস তৈরি করে কোন-ক্রমে টিকে ছিল, যে জন্য নিম্নমানের কুশলতাই যথেষ্ট। জাপানের পরম্পরাগত হস্তশিল্প-কর্ম এমন উন্নতমানের কুশলতার অধিকারী ছিল যার বলে দ্রুত ও নিপুণভাবে আধুনিক শিল্পগত কুশলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল—বহু অর্থনীতিবিদের মতে এটাই ওদেশের দ্রুত শিল্পায়নের কারণ। এই কুশলতা অর্থনৈতিক বিকাশের একটি বাস্তব উপাদান অথচ ভারতে তা বহুলাংশেই বিনষ্ট হয়ে যায়।

মরিস সিদ্ধান্ত করেছেন হস্তচালিত তাঁতের শিল্পীদের "সংখ্যা শুরুতে যত ছিল এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা যত সচ্ছল ছিল ঐ আমলের শেষে তাদের

সংখ্যা অন্ততঃ কমেও যায়নি বা তাদের অবস্থাও কম সচ্ছল ছিল না"। (পৃ.৬১৩) এই দুটি বিষয় সম্পর্কেই আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। কিন্তু লক্ষ্য করা যেতে পারে যে তিনি আর বলছেন না যে মোট জনসংখ্যায় হস্তশিল্পীদের অনুপাতে কোনো হ্রাস ঘটেনি। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর সংশোধিত বক্তব্যের সমর্থনেও কোন প্রমাণ দেওয়া হয় নি। ভারতের চিরাচরিত বস্ত্র-বয়ন কেন্দ্রগুলির অবলুপ্তি সকলের কাছেই স্পষ্ট (যেমন, মুর্শিদাবাদে), অন্য দিকে নতুন কেন্দ্র কোথাও গড়ে উঠেছে, এমন দৃষ্টান্তও বিরল। তা ছাড়া, গ্রামে বা তখনকার শহরগুলিতে হস্তশিল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, এটাও কোন সমীক্ষাতেই দেখা যায় নি। ভারতের বৃহৎ শহরগুলির মধ্যে একমাত্র দিল্লিতেই এ পর্যন্ত পেশাগত সমীক্ষা করা হয়েছে, এবং সেটা করেছেন কৃষণ লাল। ১৯৬১ সালে অনুষ্ঠিত ভারতীয় ইতিহাসের অধিবেশনে একটি নিবন্ধে তিনি দেখিয়েছিলেন যে দিল্লিতে হস্তশিল্পকে কার্যতঃ পাইকারি হারে নিধন করা হয়েছে।

মরিসের বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশটিও ধোপে টেকে না। ভারতীয় হস্ত-শিল্পীর নিজের উৎপাদনশীলতা যদি বেড়ে না গিয়ে থাকে—যার সাক্ষ্যের ছায়ামাত্র নেই—কিংবা তার খরচ যদি কমে গিয়ে থাকে অর্থাৎ ভারতে জিনিসপত্রের দাম পড়ে গিয়ে থাকে কিংবা সুতোর কম দামের সুযোগে কারখানা-জাত জিনিসের সঙ্গে তার প্রতিযোগিতার ক্ষমতা এবং সেই সঙ্গে তার নীট মুনাফাও যদি সে বাড়িয়ে নিতে পেরে থাকে, তবে ব্রিটিশ শ্রমের বর্ধিষ্ণু উৎপাদনশীলতার মুখে[51] ভারতীয় হস্তশিল্প তার নিজের মজুরি ব্যয় না কমিয়ে কি করে প্রতিযোগিতা করতে পারে, মরিসের বক্তব্যে তার কোন ব্যাখ্যা নেই, বিশেষতঃ ভারতীয় হস্তশিল্পীর নিজের উৎপাদনশীলতা বেড়ে যাওয়ার কোন প্রমাণই যখন নেই। মরিস সাহেবের বক্তব্য যে কত অসার তা দেখাবার জন্যই কেবল এই বিকল্পগুলির কথা তোলা হল।

এবং এই ধরনের "যুক্তিবিজ্ঞান-সম্মত" অর্থনৈতিক ইতিহাস যদি আমাদের গড়ে তুলতে হয় তা হলে যুক্তির দিক দিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেয়ঃ সব দিক বিচার করে শিল্প এলাকার কর্মসংস্থান যদি বেড়ে গিয়ে থাকে, আরো বেশি জমি যদি চাষের আওতায় এসে থাকে, মুদ্রা-অর্থনীতির পরিধি এবং ব্যবসায়ীর সংখ্যা যদি বেড়ে গিয়ে থাকে এবং যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বছরে প্রায় ০.৪ শতাংশ অর্থাৎ ১৮২০ থেকে ১৯২০ অবধি ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ হয়ে থাকে তা হলে জমির খণ্ড-বিখণ্ডীকরণ বিপুল মাত্রায় হল কি ভাবে? এবং প্রজা ও ভাগচাষীরা কেনই বা এত চড়া হারে খাজনা দিতে রাজি হল? এবং সেক্ষেত্রে ভাগচাষী, ছোট জোত-মালিক ইত্যাদি সমেত কৃষি-মজুরেরাই বা কোথা থেকে এল, এবং ধর্ম কুমার যেমন বলেছেন, তাদের মজুরিই বা কেন এমন কমে গেল? এই কারিগরেরা কোথায় বাস করে?—এ প্রশ্নটি আমি আগেই তুলেছি। গ্রামের জনসংখ্যায় কারিগরদের সংখ্যা ও অনুপাত কি বেড়ে যায়?

কারিগর-পল্লীগুলির হাল কী? সেগুলির সংখ্যা বেড়ে যায়, না কমে যায়? কোথা থেকে এবং কেন শ্রমিকরা এমন অবাধে বিদেশ এবং বোম্বাইয়ের মত শহরগুলিতে চলে যায় (যে ঘটনাটি মরিস এত চমৎকার ভাবে তাঁর বোম্বাই সুতী-বস্ত্র শ্রমিক সংক্রান্ত বইটিতে দেখিয়েছেন)? স্পষ্টতঃই মুঘল আমলে জনবাহুল্যের কথা বলে এর উত্তর পাওয়া যাবে না। কেননা (ক) তার কোন প্রমাণ নেই, (খ) মরিসের মতানুসারে যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ ভারতীয় জনসংখ্যাকে ম্যালথুসীয় সীমার মধ্যে বেঁধে রেখেছিল।

সবশেষে, চূড়ান্ত যুক্তি হিসেবে, অ্যালিস এবং ড্যানিয়েল থর্নারের নজির দেখিয়ে মরিস বলেন, "চিরায়ত যুক্তির ভিত্তি হল আদম শুমারির তথ্য, এতে দেখানো হচ্ছে যে ১৮৭২ থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে জনসমষ্টির একটি ক্রমবর্ধমান অংশ কৃষিকর্মের উপরে নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি অবশ্য এই তথ্য দারুণ মার খেয়েছে"; মারটা দিয়েছেন থর্নার প্রমুখ। (পৃঃ ৬১৩) থর্নারদের ধারণা ও সিদ্ধান্তগুলি আলোচনার জায়গা এটা নয়। কিন্তু তাঁরা বড় জোর প্রমাণ করতে পেরেছেন যে এই বিষয়টি প্রমাণ বা অপ্রমাণ করার পক্ষে আদম শুমারির তথ্য নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার নয়। তা ছাড়া, চিরায়ত যুক্তিটিকে তাঁরা খণ্ডন করতেও পারতেন না, কেননা এই যুক্তিটি দিয়েছিলেন রানাডে, আর. সি. দত্ত, জি. ভি. জোশী প্রমুখ—এমনকি ১৯০১ সালের (গ্যাডগিলের ক্ষেত্রে ১৯৩১ সালের) আদম শুমারি প্রকাশিত হবার আগেই। ভারতে অর্থনৈতিক বিকাশ কতটা ঘটেছে, সেটা দেখানোর জন্য জনসংখ্যাগত পরিসংখ্যান প্রয়োগের গুরুত্ব অনেক। কারণ ১০০ বছরের 'গর্ভাবস্থা'র পরে ১৮৯২ সালে দেখা যায় ভারতে কারখানা আইন বলে আধুনিক শিল্পোৎপাদনে মাত্র ২,৫৪,০০০ জন লোককে লাগানো সম্ভব হয়। ১৯৩১ সাল নাগাদ এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল আরো ১১ লক্ষ এবং ১৯৫১ নাগাদ আরও ১১,৮০,০০০। অথচ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৮৯১ সালে ২৩ কোটি ৬০ লক্ষ থেকে ১৯৩১ সালে ২৭ কোটি ৫৫ লক্ষ এবং ১৯৫১ সালে ৩৫ কোটি ০৭ লক্ষ। এবং শ্রমিক সংখ্যা ১৮৯১ সালে ৯ কোটি ৪০ লক্ষ থেকে বেড়ে ১৯৫১ সালে দাঁড়িয়েছিল ১৪ কোটি ২০ লক্ষে।[৫৩] এই সংখ্যা তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে কেউ কেউ মনে করবেন যে 'সম্প্রসারণশীল শক্তিসমূহ' অথবা আদমশুমারির পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিতর্ক সম্পূর্ণ অসার। আর এই ব্যাপারটি নিয়েই রানাডে এবং দত্ত থেকে রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এবং আর. পাম দত্ত অবধি সকল লেখক ব্যস্ত থেকেছেন।[৫৪]

পরে মরিস যখন বলেন "উনিশ শতকে" ব্রিটিশ শাসনের "ভূমিকা ইতিবাচক থাকলেও তার প্রভাব ছিল সীমিত এবং এই ভূমিকার কথা আমি আগেই বর্ণনা করেছি" (পৃঃ ৬১৫), তখন তাঁর এই বক্তব্যটি আমাদের বিচার করতে হবে উল্লিখিত সংখ্যাতথ্যের ভিত্তিতে এবং তা তুলনা করে দেখতে হবে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, রাশিয়া বা জাপানের অনুরূপ পরিসংখ্যানের

সঙ্গে। উনিশ শতকের শেষে ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো ও কার্যকারিতা সম্পর্কে আমরা যা জানি, তার প্রেক্ষিতে আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি, এই সীমিত বিকাশের প্রকৃতি কি ছিল? জাতীয়তাবাদীরা এবং মার্কসবাদীরা এবং যুদ্ধোত্তর "বিকাশ অর্থনীতিবিদদের" কেউ কেউ ঠিক এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন। তাঁরা জানতে চাইবেন ব্রিটিশ শাসন কোন "শিল্প-বিপ্লব" বা অর্থ-নৈতিক বিকাশের প্রক্রিয়ার সূচনা করেছিল, না করেনি। শিল্পে বাণিজ্যে ও ব্যাংকিং ব্যবসায়ে আধুনিক প্রযুক্তিগত ও সাংগঠনিক আবিষ্কারগুলি যখন প্রবর্তিত হয়েছিল, তখন কিছু কিছু পরিবর্তনের শক্তি যদিও প্রবর্তিত হয়েছিল, তবু এ কথা কি সত্য নয় যে এই নব প্রবর্তিত ব্যবস্থাগুলির বিকাশ ও বৃদ্ধিকে বাধা দেওয়া হয়েছিল, ব্যর্থ করা হয়েছিল? "সীমিত প্রভাব" কথাটি তা হলে অর্থহীন হয়ে পড়ে। এইটুকু বড়জোর বলা যায় যে ভারতে যা ঘটেছিল, তা হল "আধুনিকীকরণের গর্ভপাত," যা আধুনিক ঔপনিবেশিক কাঠামোর একটি স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। এ কথা মার্কস অনেক আগেই ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিলেন এবং রানাডে, নওরোজি ও আর. সি. দত্ত এবং তার পরে আর. পাম দত্ত এবং আরো সম্প্রতি বি. এন. গাঙ্গুলীর মত লেখকদের অভিযোগের মূলেও এ কথাই রয়েছে।[৬৪] এবং উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় অর্থনৈতিক ইতিহাসের ব্যাখ্যায় আজও পর্যন্ত যে ব্যাখ্যামূলক কাঠামোটি বৈধ বলে স্বীকৃত সেটি আসলে এই।[৬৫]

৫

তাঁর নিবন্ধের শেষ অংশে মরিস সরকারি নীতির কয়েকটি সূত্র নিয়ে আলোচনা করেন। কেননা শেষ পর্যন্ত তিনি সচেতন যে তখনও তাঁকে ভারতের অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা ব্যাখ্যা করতে হবে। কারণ আসল সত্য এই যে "শিল্পায়িত হওয়ার লক্ষ্যে পৌঁছতে অর্থনীতির এখনো অনেক দেরি।" (পৃঃ ৬১৪) তিনি এমনকি এ সম্পর্কেও অবহিত যে, "উনিশ শতকের কাজকর্ম সম্পর্কে আমি যে বর্ণনা দিয়েছি, তাতে এটা বরং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে" (পৃঃ ৬১৪) এবং বলেন, "অগ্রগামী" কোন ক্ষেত্র কেন বিকাশ লাভ করেনি, তার কোন উত্তর তাঁর জানা নেই। (পৃঃ ৬১৫) তিনি লিখেছেন "কারণগুলি নিশ্চয়ই জটিল এবং উপস্থিত সম্পর্ক সমূহের জটিল ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করার স্থান এটা নয়"। (পৃঃ ৬১৫) আমি অন্তত নিজেকে প্রতারিত বলে বোধ করছি। যদি এমন আলোচনার স্থানই এখানে না থাকে, তবে উনিশ শতকের অর্থনৈতিক ইতিহাসের পুনর্ব্যাখ্যা দূরে থাক, তার কি কোন

আলোচনাও সম্ভব? যে সব জিনিস দিয়ে ব্রিটিশ প্রভাব গড়ে উঠেছে "উপস্থিত সম্পর্ক সমূহ"ই কি সব জিনিস?

কিন্তু মরিস এ বিষয়ে সচেতন যে, তাঁর নতুন ব্যাখ্যার সামগ্রিক বৈধতার স্বার্থেই তিনি তা এই পর্যায়ে ছেড়ে দিতে পারেন না। এবং তিনি বস্তুতঃই কিছু কিছু উত্তর দিতে চেষ্টা করেন, যদিও সে উত্তর দেওয়া হয়েছে সেই অবাধ নিয়ন্ত্রণ মুক্ত অর্থনীতি এবং স্ট্র্যাচিপন্থী চিন্তার ধারা অনুযায়ী। কিন্তু এটা লক্ষ্য করতে হবে যে, তিনি এখন আলোচনা করছেন অগ্রগতির ব্যাপার নিয়ে নয়, পরন্তু অর্থনৈতিক অচলাবস্থার কারণসমূহ সম্পর্কে। তিনি যা বলতে চান তা মনে হয় এই যে, বিপরীত এই উপাদানগুলি না থাকলে তাঁর পূর্ববর্তী সব কটি ইতিবাচক প্রবণতাই ফলবতী হত। কিন্তু এখনো তিনি অর্থনৈতিক কাঠামো বিশ্লেষণ করছেন না, বরং বলির পাঁঠা সন্ধান করছেন। আর তা করতে গিয়ে যেটা বেরিয়ে পড়ল তা এই যে বলির পাঁঠাগুলি কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নয়, সেগুলি সাম্রাজ্যবাদের কাঠামো এবং তার প্রভাবেরই অংশবিশেষ।

সর্বাগ্রে তিনি বলেন, ব্রিটিশ রাজের প্রভাব ছিল সীমাবদ্ধ, কারণ "স্পষ্টতই সক্রিয় অর্থনৈতিক বিকাশের কোন আত্মসচেতন কর্মসূচী ভারত সরকারের ছিল না।" কারণ ব্রিটিশ রাজে নিজেই ছিল কেবল 'নিষ্ক্রিয় নৈশপ্রহরীর ভূমিকায়।" (পৃঃ ৬১৫) ভাসা ভাসা ভাবে এই উত্তরটি সঠিক বলেই মনে হয় কিন্তু অবাধ নিয়ন্ত্রণমুক্ত অর্থনীতি এবং সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেকার গ্রন্থিবন্ধনের কুৎসিত বাস্তবকে আসলে তা আড়াল করে রাখে। এই সব কিছুকেই মতাদর্শগত একটা বিভ্রম বলে মনে হয়। কিন্তু সত্যই কি ভারত সরকার কেবল 'নৈশ প্রহরী' ছিল? সব্যসাচী ভট্টাচার্য সার্থকভাবে এই মত খন্ডন করেন।[56] তাঁর যুক্তির পুনরাবৃত্তি না করে, আমি কেবল উল্লেখ করতে চাই যে বিচারপতি রানাডে ও অন্যান্যেরা স্পষ্ট করেই দেখিয়েছেন যে, ভারতে শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ এবং উন্নয়ন এবং ব্রিটিশ ধনিকদের বিশেষ প্রাধিকার অনুমোদনের ব্যাপারে ভারত সরকার প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। 'অবাধ, নিয়ন্ত্রণমুক্ত অর্থনীতি' যুগের তুঙ্গে ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় অর্থে, এবং বিপুল ব্যয়ে, এ দেশে সিনকোনা, চা ও কফি বাগিচার সূত্রপাত করেছে এবং তুলোর চাষ ও পরিবহণে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছে। ভারত সরকার যে রাষ্ট্রের দ্বারা রেলপথ নির্মাণের পথিকৃৎ এবং "উদারনৈতিক" ডালহৌসি পর্যন্ত রাষ্ট্র কর্তৃক 'গ্যারান্টি' প্রদত্ত রেলপথ প্রসারণে উদ্যোগ নিয়েছিলেন—এসব ঘটনা ভারতীয় অর্থনৈতিক ইতিহাসে সুপরিজ্ঞাত।[57] তেমনি ভাবে এই ছিল একমাত্র অবাধ নিয়ন্ত্রণমুক্ত অর্থনীতি সম্পন্ন "উদারনীতিক জাতি রাষ্ট্র" যার সরকার চা ও কফি বাগিচায় কাজ করতে ভারতীয় শ্রমিককে বাধ্য করার জন্য দণ্ডমূলক আইন প্রণয়ন করেছিল ('প্রগতি' পন্থী লর্ড রিপন যে আইনটি পাশ করে-ছিলেন, সেটা আরো তাৎপর্যপূর্ণ)। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের অভাব ও নিষ্ক্রিয়

ভূমিকা'র প্রতি নিষ্ঠা এখানে কোথায়? বাস্তবিকপক্ষে, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজটিকেই তুলে দেওয়া হয়েছিল বাগিচা মালিকদের হাতে। ভারতীয়রা এটাও উল্লেখ করেছেন যে, ইংরেজরা আমেরিকার স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানিকে বর্মায় কাজ করতে দেবে না।[৫৪] অধিকন্তু, যে সরকার গোটা ভূখন্ডের উপরে জমিদারির দাবি করত এবং উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সরকারের মত জমিদার ও প্রজা এবং ঋণ গ্রহীতা ও দাতার মধ্যেকার সম্পর্কের মধ্যে খোলাখুলিভাবে হস্তক্ষেপ করত, কিংবা যে সরকার অরূপান্তরযোগ্য কাগজী মুদ্রা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল সেই সরকার কার্যক্ষেত্রে নিজেকে 'অবাধ নিয়ন্ত্রণ মুক্ত' অর্থনীতির প্রবক্তা হিসাবে বা 'নৈশ প্রহরী' হিসাবে দাবি করতে পারে না। অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদেরা ও অর্থনীতিকেরা যখন বলেন যে, উনিশ শতকে ব্রিটেন এক অবাধ, নিয়ন্ত্রণ মুক্ত কর্মনীতি অনুসরণ করেছিল কারণ তা তখন তার স্বার্থের অনুকূল ছিল, ভারতীয়রা তখন অনেক আগেই দেখান যে, ব্রিটিশ-ভারতের সরকার কিন্তু কখনও কার্যক্ষেত্রে ঐ কর্মনীতি অনুসরণ করেন নি। ভারতীয় শিল্প বিকাশ ও সামাজিক 'উপরিব্যয়' সমূহের সংস্থানে ভারত সরকারের নিষ্ক্রিয়তাকে এখন আর তাঁরা যে কেবল 'নৈশ প্রহরী'র ভূমিকায় ছিলেন ইত্যাদি বলে ব্যাখ্যা করা যায় না। এখন প্রশ্নটা হচ্ছে এই: কেন ভারত সরকার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের কতকগুলি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সক্রিয়তার নীতি অনুসরণ করল এবং বাকি ক্ষেত্রগুলিতে আবার 'অবাধ নিয়ন্ত্রণমুক্ত' নীতি অনুসরণ করল, এটাই বা কেমন যে সরকারের সক্রিয় সাহায্যে ও অংশ গ্রহণের মাধ্যমে 'কাঁচামাল ভিত্তিক রপ্তানি অর্থনীতি'র প্রতিষ্ঠা ঘটল? কিন্তু শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সরকারি সমর্থনের প্রশ্ন যখনই তোলা হল, তখনি টেনে বার করা হল 'অবাধ, নিয়ন্ত্রণমুক্ত' অর্থনীতির মতবাদটি?

মরিসের মতে ভারত সরকারের নিষ্ক্রিয়তার আরেকটি কারণ হচ্ছে, "বাৎসরিক বাজেটকে সুষম রাখার জন্য ভারত সরকারের ব্যস্ততা। সামাজিক 'উপরিব্যয়' সুযোগ সুবিধা গড়ে তোলার জন্য সরকারি ব্যয়-বরাদ্দের আয়তন ও কার্যকরতা, এই দর্শনের ফলে প্রত্যক্ষভাবে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।"[৫৯] (পৃঃ ৬১৫) কিন্তু আসল প্রশ্নটা আবারও অন্যত্র। কেন এক ধরনের ব্যয়কে ছাঁটাই না করে, কিংবা এক ধরনের কর সংগ্রহ করে অথচ অন্য ধরনের কর সংগ্রহ না করে বাজেটকে সুষম রাখা হত? আর. সি. দত্ত প্রমুখ লেখকদের উল্লেখ করা কিছু তথ্য এখানে উদ্ধৃত করা যায়। ১৮০১ সালে ভারতের বাজেট ব্যয়ের ৪৫.৫ শতাংশ ব্যয়িত হয়েছিল সশস্ত্র বাহিনীর খাতে, ৩৭.৫ শতাংশ অসামরিক প্রশাসন খাতে (যার মধ্যে ১৮.৭ শতাংশ ব্যয় করা হয়েছিল শিক্ষা, চিকিৎসা ও বিজ্ঞান বিভাগগুলির জন্য এবং ৮১.৩ শতাংশ প্রশাসনের অ-বিকাশমূলক দিকগুলির জন্য)।[৬০] ভারতীয়রা অনেক আগেই দেখিয়েছিলেন, যে, ১৮৮০-র দশকে ব্রিটেন, জার্মানি, রাশিয়া, জাপান বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ভারত সেনাবাহিনীর খাতে চূড়ান্ত হিসাবে বেশি টাকা খরচ করেছিল; ব্রিটেন বা রাশিয়া সেনাবাহিনীর খাতে

রাজস্বের যত অংশ ব্যয় করেছিল, ভারত করেছিল তার চেয়ে বেশি, ভারতে সৈন্য পিছু ব্যয় ছিল বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ—বিশ্বের সবচেয়ে দক্ষ সেনাবাহিনীর জন্য যা খরচ হত তার চেয়েও বেশি হত ভারতে।[61] ১৮৯১ সালে ভারতের রাজস্বের ৩০ শতাংশ খরচ করা হয় ইউরোপীয়দের জন্য,[62] ৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা রেলপথের জন্য এবং মাত্র ৬০ লক্ষ টাকা সেচের জন্য। এমন তথ্য ও সংখ্যা ঢের ঢের উদ্ধৃত করা যায়।[62] ব্যস্ততাটা যে সুষম বাজেট তৈরি নিয়ে নয়, এমন এক বিশেষ ধাঁচের বাজেট বরাদ্দ নিয়ে যা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সিদ্ধ করতে পারে, সেটা অনস্বীকার্য।

কর ব্যবস্থা সম্পর্কেও এই একই কথা প্রযোজ্য। সরকারি কর্মচারী, বৃত্তিজীবী গোষ্ঠী, ব্যবসায়ী, মহাজন, ভূস্বামী ও জমিদার, বাগিচা মালিক, বিদেশী বাণিজ্য সংস্থা প্রভৃতি কর বাবদ খুব সামান্য টাকাই দিত। ১৮৮৬ সালে প্রথম যখন আয় কর বসান হল, তখন তার হার ছিল ২.৭ শতাংশেরও কম। জমি (জমিদার ও ভূস্বামী) ও বাগিচা থেকে অর্জিত আয় আবার তা থেকে বাদ দেওয়া হল। তা ছাড়া, ইংল্যাণ্ডে প্রদত্ত বেতন, পেন্সন, অবকাশ-ভাতা, ইংল্যাণ্ডে নিগমবদ্ধ জাহাজ কোম্পানিগুলির মুনাফা, ইংল্যাণ্ডে প্রদত্ত 'জামিন' বাবদ সুদ এবং গ্যারাণ্টি দেওয়া সুদের পরিমাণ অবধি রেলপথের মুনাফাও করের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। তার উপর, সামরিক অফিসারদের ক্ষেত্রে কর রেহাইয়ের সীমা ধরা হয়েছিল বার্ষিক ৬০০০ টাকা। সুতরাং শতাব্দীর শেষে দেখা গেল যে আয়কর বাবদ প্রাপ্ত মোট রাজস্ব দাঁড়িয়েছে মাত্র ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা, অথচ ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ সেখানে হয়েছে ২৬ কোটি ২০ লক্ষ টাকা এবং লবণ কর বাবদ ৮ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা।[63] বিত্তবান ব্যক্তিরা আর কোন কর দিত না বললেই হয়ঃ সামান্যই দিতে হত, এমন আবগারি কর বা অন্তঃশুল্ক ছিল না বললেই হয়। এই কারণেই ১৮৮৮ সালে জি. ভি. জোশী অভিযোগ করেন যে, সরকারি কর নীতি অনুযায়ী "ব্রিটিশ প্রশাসন, ব্রিটিশ ন্যায়বিচার ও ব্রিটিশ শান্তিশৃংখলা থেকে যারা সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছিল সেই স্বল্পসংখ্যক ধনাঢ্য ব্যক্তি কর দিত সবচেয়ে কম, অন্য দিকে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষকে দিতে হত সবচেয়ে বেশি।"[64] সেই একই আসল প্রশ্ন আবার ওঠেঃ বাজেটের ভারসাম্য ঠিক না রেখে কেন তার পাল্লা একদিকে ঝুঁকে পড়তে দেওয়া হত?

মরিস বলেন, বাজেটের আরো একটা দিকের প্রতি নজর দিতে হবেঃ বাজেট ছিল 'বর্ষা ঋতু নিয়ে জুয়া খেলা'। রাজস্বের পরিমাণে সামান্য পরিবর্তনও বাজেট বিপর্যস্ত করে দিতে পারে বলে যদি ধরা না হয়, এটাও তাহলে বাস্তবের সঙ্গে খাপ খায় না। দুর্ভিক্ষের বছরগুলির কিছু পরিসংখ্যান এখানে উদ্ধৃত করা হল:[65] (পরের পৃষ্ঠায় সারণী দ্রষ্টব্য)

বছর		ভূমি রাজস্ব (কোটি টাকা)	উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি
1876	(দুর্ভিক্ষের	19·8	−2·0
1877	বৎসর)	19·8	−4·3
1878		22·3	+2·1
1879		21·8	−1·2
1880		21·1	−3·6
1890	(দুর্ভিক্ষের	24·0	+3·7
1891	বৎসর)	23·9	+0·5
1892		24·9	−0·8
1893		25·5	·· 1·5
1895		26·2	−0·5
1896	(দুর্ভিক্ষের	23·9	−1·7
1897	বৎসর)	25·6	−5·3
1898		27.4	+3·9
1899	(দুর্ভিক্ষের	25 8	+4·1
1900	বৎসর)	26·2	+2·4
1901		27·4	+7·3

শিক্ষা, সেচ ও রেলপথ বাবদ ব্যয় "লাফে লাফে এগিয়েছিল"—এই বিবৃতিও সঠিক নয়। একমাত্র রেলপথের ক্ষেত্রে ছাড়া বাকি সব ক্ষেত্রেই তা ছিল ধারাবাহিক ভাবে কম, কেবল রেলের ক্ষেত্রেই তা ছিল ধারাবাহিক ভাবে বেশি। প্রকৃত পরিসংখ্যান আর একবার উদ্ধৃত করা যাক।[66] (৬৬ পৃষ্ঠার সারণী দ্রষ্টব্য)

আরো লক্ষণীয় যে রেল পথ বাবদ ব্যয় হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে ভূমি রাজস্ব কিংবা মৌসুমী ঋতুর কোন সম্পর্ক নেই।

এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা মনে হয় যথেষ্ট দীর্ঘই হয়েছে। ভারত সরকারের ব্যয়ের আকার-প্রকার বিচারের ক্ষেত্রে আসল প্রশ্নটি হচ্ছে এই: সেচ, শিক্ষা, কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার প্রসার বা শিল্পের ক্ষেত্রে অর্থব্যয় না করে সেনাবাহিনী ও আইন শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে কেন ব্যয় করা হল? আমি আরো যোগ করতে পারি যে, "সামাজিক উপরি-ব্যয় বাবদ সরকারি বিনিয়োগের ব্যয় চালু সুদের হারের সাহায্যে আপনা থেকেই খুব শীঘ্র উঠে আসবে?—এই মতবাদের দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছিল" বলেই সরকার সেচের বিকাশ সাধন করেনি—মরিসের এই বিবৃতিটিও দৃষ্টি-বিভ্রম বলে মনে হয়। রেলপথের বিকাশ কিন্তু এই ধরনের বিবেচনার ফলে ব্যাহত হয়নি; সরকারি গ্যারান্টি-দত্ত

(কোটি টাকা)

সাল	রেলপথের ব্যয়	(মূলধন) সেচ	শিক্ষা (চূড়ান্ত)	চিকিৎসা ও বৈজ্ঞানিক বিভাগ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1875	3·2	1·1	·8	·98
1876	2·9	·9	·8	
1877	4·1	·8	·8	
1878	3·4	·7	·8	
1879	2·9	·5	.8	
1880	3·0	·6	·8	
1881	2·1	·5	·8	
1882	1·8	2·7	·9	
1883	3·3	·7	·9	
1884	3·5	·7	1·0	
1885	4·7	·5	1·0	1·09
1886	5·1	.5	1·0	
1887	2·2	·5	1·0	
1888	1·1	·4	1·0	
1889	2·7	·3	1·1	
1890	2·8	·4	1·1	
1891	2·7	·7	1.2	
1892	3·4	·5	1·2	
1893	2·9	·6	1·2	
1894	3·8	·5	1·2	
1895	3·3	·7	1·3	
1896	4·2	·7	1·3	
897	3·6	·6	1·3	
1898	4·2	·6	1·3	
1899	3·6	·9	1·3	1·98
1900	5·1	·9	1·3	
1901	5·2	·7	1·3	

সুদ দিয়েছিল, রাষ্ট্রীয় রেলপথ চালু করেছিল এবং "চালু সুদের হার" "খুবই তাড়াতাড়ি" দূরের কথা, আদৌ যে পায়নি তাই নয়, পক্ষান্তরে ১৯০১ সাল পর্যন্ত নীট লোকসান দিয়েছে।

দেখা যাচ্ছে শিল্প-বিকাশে সরকারের নিষ্ক্রিয়তা "নৈশ প্রহরী" সুলভ নীতি, বাজেট সুষম করার দিকে অথবা মৌসুমী বর্ষণের প্রতি তার ঝোঁক ইত্যাদির সাহায্যে ব্যাখ্যা করার বদলে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা দরকার, সেগুলি এই: সরকারি নিষ্ক্রিয়তা যখন ব্রিটিশ পুঁজির স্বার্থ সাধন করত সরকার তখনি কেবল কেন সক্রিয় হত? কেন সরকার শিক্ষা,[67] প্রযুক্তি-শিক্ষা, স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য সম্পদ ব্যবহার না করে, সেনাবাহিনী, আইন-শৃংখলা এবং 'দক্ষ' প্রশাসন বাবদ তা অপচয় করত? কেন তারা সেচ-ব্যবস্থার বিকাশ না ঘটিয়ে রেল-ব্যবস্থার বিকাশ ঘটাল? ব্রিটিশ শাসন, তার 'কর্মনীতি' এবং তার ফলাফলের মর্মমূলের সন্ধান এই প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তরের মধ্য দিয়েই পাওয়া যাবে। জাতীয়তাবাদীরা এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন ব্রিটিশ শাসন ছিল সাম্রাজ্যবাদী। তার মূল চরিত্র– তার অস্তিত্বের সপক্ষে যুক্তি—ছিল ব্রিটিশ স্বার্থের কাছে ভারতীয় স্বার্থকে বলি দেওয়া। এটাই ছিল তার 'অবাধ নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত' নীতির ইচ্ছামত প্রয়োগ, রাষ্ট্রীয় সক্রিয়তা-নিষ্ক্রিয়তা এবং বাজেট-বিষয়ক অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে নিয়ামক। অবাক হয়ে ভাবতে হয়, অন্য উত্তরটি কী!

৬

মরিসের আরো কিছু বিক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। যেমন, তিনি বলেন, "একটি শিল্প-বিপ্লবের পূর্ব-শর্তগুলির পক্ষে প্রয়োজনীয় যাবতীয় কাঠামোগত পরিবর্তনগুলি সাধন করার পক্ষে উনিশ শতকের কালটিকে আমরা অতি সংক্ষিপ্ত বলে বিবেচনা করতে পারি"। এবং সমাজ যাতে উন্নত ও অনবচ্ছিন্ন এক অর্থনৈতিক বিকাশের পর্যায়ে প্রবেশ করতে পারে, শিল্প-বিপ্লবের পূর্ব-শর্তগুলি সে জন্য গড়ে তুলতে হয়। অথচ সে ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় দীর্ঘ "গর্ভধারণ কালের ভূমিকাকে" অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকেরা পর্যন্ত উনিশ, শতকের উত্তর অতলান্তিক দৃষ্টান্তের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, অবহেলা করেন।" (পৃঃ ৬১৭) কিন্তু অন্য মতের অনুসারীগণ মনে করেন, এই দীর্ঘ "গর্ভাবস্থা"র প্রয়োজন নেই।[68] আর যাই হোক, জাপান বা রাশিয়া কেউই তো আর উত্তর অতলান্তিক রাষ্ট্র নয়।[69]

দ্বিতীয়তঃ, কাঠামোগত বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় যে "গর্ভাবস্থা"র কারণেই অর্থনৈতিক বিকাশের পরিপন্থী শক্তিগুলি জোরদার হয়ে ওঠে, এমনকি নতুন করে উদ্ভূত হয়।"[70] একটা প্রশ্ন এখানে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। মরিস

কি বিশ্বাস করেন যে, ব্রিটিশ শাসন আরো পঞ্চাশ বছর কায়েম থাকলে তা অর্থনৈতিক বিকাশের সূচনা করত? এটা এমনি একটা প্রশ্ন যার উত্তর তিনি যদি বলেন "না" তাহলে তাঁর পুনর্বাখ্যাটাই সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়; অন্য দিকে আবার "হ্যাঁ" বলতেও তিনি দ্বিধা বোধ করেন। কেননা উপসংহারে তিনি লেখেন, যে মতটিতে বলে, যুদ্ধ-মধ্যবর্তী বছরগুলিতে "বেশ গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত রদ-বদল ঘটে এবং স্বাধীনতার পরে নতুন করে অভ্যুত্থানের ভিত্তিভূমি রচিত হয়, সেই মতটির প্রতি তাঁর 'কিছু সহানুভূতি' আছে।" (পৃঃ ৬১৭-১৮) কিন্তু স্বাধীনতা কি কেবল একটা বছর, না শাসনকারী ব্যক্তিবর্গের পরিবর্তন, না কি তা ছিল একটা বিপ্লব, যাকে ধ্বংস করতে হয়েছিল "গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত পরিবর্তন গুলির বহুলাংশের" একটি বড় অংশকে? ১৯৪৭ সালের পরে ভারত কতটা সাফল্য অর্জন করেছে, কিংবা কতটা ব্যর্থতা বরণ করেছে তার সঠিক মাপকাঠি কি এটাই নয় যে সেই কাঠামোটাকে সে কতটা ভেঙ্গে ফেলতে পেরেছে কিংবা কতটা ভেঙ্গে ফেলতে পারেনি? ভাঙ্গার সেই কাজটা ভূমি-সম্পর্ক, বৈদেশিক বাণিজ্য, স্বদেশী ও বিদেশী পুঁজির প্রতি গৃহীত নীতি, কৃষি ঋণ, যন্ত্র ও মূলধনী দ্রব্যাদি নির্মাণ, কৃষিতে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, সামাজিক উপরিব্যয় বলে অভিহিত সুযোগ সুবিধা (রাস্তা, রেলপথ, শক্তি, জল সরবরাহ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি) প্রভৃতি যে কোন ক্ষেত্রেই ঘটতে পারে।[71] মজার ব্যাপার এই যে, যার জন্য এই 'গর্ভাবস্থা'র প্রয়োজন, সেই পূর্বশর্তগুলি যে কি সেটা মরিস কোথাও বলেন নি। "যাত্রা শুরু" করার আগেকার যে কোন সময়ই কি এই বিশেষ কাল, না কি তার কতকগুলি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে? সম্ভবতঃ মূল ধারণাটা নিয়েই এই ঝামেলা।

মরিস যে ধরনের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সমালোচনা করছেন, গর্ভাবস্থার এই দীর্ঘকালের ধারণাটা আবার তার সঙ্গে সম্পর্কিত। সে ধরনের অর্থনৈতিক ইতিহাসের লেখকেরা "দীর্ঘ গর্ভাবস্থা"র ব্যাপারে খুশি হবেন না, কারণ তাঁরা নিজেরাই তার শিকার। তাঁরা তাঁদের বিকাশকে তুলনা করেছেন যা "সম্ভব" ছিল তার সঙ্গে—জার্মানিতে, জাপানে, এমনকি জারতন্ত্রী রাশিয়াতেও এবং সবচেয়ে বেশি, সোভিয়েত রাশিয়াতে এই "সম্ভব" বাস্তব হয়ে উঠেছিল। এ থেকেই বোঝা যায় কেন আর. সি. দত্ত আত্মতৃপ্ত, আত্মতুষ্ট লর্ড কার্জন বা স্ট্র্যাচিদের নিরুত্তাপ নির্লিপ্ততা অবলম্বন না করে, অবলম্বন করেছিলেন বার্ক-এর বিষ জ্বালা। মরিসের মতে এই 'বিষ জ্বালা', এই আবেগ বিকাশের ভূমিকার জন্য এই উদ্বেগ প্রায়শঃই অপরিপক্বতা ও পক্ষপাতদুষ্টতার নিদর্শন। তিনি ভুলে গিয়েছেন, যে এই বিষ জ্বালা অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো মার্কস ও জন স্টুয়ার্ট মিল এবং জে. এম. কীন্সের লেখারও বৈশিষ্ট্য। এমন ভাববার কোন কারণ নেই যে এই মানসিক নিরুত্তেজনা (এমনকি জ্ঞানচর্চায়ও) বিজ্ঞানসম্মত বস্তুনিষ্ঠ বা অন্তর্দৃষ্টি বা বিশ্লেষণের গভীরতার ক্ষেত্রে বড় ধরণের অবদান রাখতে পারে।

'নিরুত্তাপ' ভাষাও যে মরিসের দারুণ ভাবে পক্ষপাত দুষ্ট হবার পথে বাধা সৃষ্টি করেনি সেটা তাঁর এই বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট ঃ "ব্রিটিশ রাজের সামগ্রিক উদ্দেশ্য ছিল নিশ্চিত ভাবেই সমাজের কল্যাণ সাধন।" (পৃঃ ৬১৫)

তৃতীয়তঃ, উনিশ শতকের ইতিবাচক সাফল্য প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি একটি অদ্ভুত যুক্তি খাড়া করেছেন। তিনি বলেছেন, যদি দেখা যায় যে ১৯২০ সালের পরে মাথাপিছু আয় কমে গিয়েছিল তা হলে প্রমাণ হয়ে যাবে যে তার আগে পর্যন্ত তা বৃদ্ধি পেয়েছিল, তা না হলে কমে যাওয়াটা পুষিয়ে দিল কি করে? কথাটা ঠিক। কিন্তু উনিশ শতক শেষ হবার আগেই যদি মাথাপিছু আয়ে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে থাকে এবং ১৮৮৮ সালের ডাফরিন এনকোয়েরিতে যেমন দেখা গেছে এবং ১৮৯৬—১৯০০ সালের দুর্ভিক্ষ গুলিতে যেমন প্রকাশ পেয়েছে, জীবন ধারণের মান যদি তেমনই নিচু থেকে থাকে, তা হলে, ঐ একই যুক্তিতে, আয় ও জীবন ধারণের মান উনিশ শতকের গোড়ায় এত কম হল কি করে? যদিও পরবর্তী কালে 'উল্লেখযোগ্য উন্নতি' বলতে সেটাই বোঝা যায়।[78]

কিন্তু ভুলটা আরো গভীরে, কেননা মরিস আরো লিখেছেন, "যাই হোক, উনিশ শতকে মাথা পিছু উৎপাদনবৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জীবনধারণের প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি উদ্বৃত্ত তৈরি হয়, যার কল্যাণে সমাজের পক্ষে সম্ভব হয় চরম সামাজিক বিপর্যয় না ঘটিয়েও আসল আয়ের এই হ্রাসকে সহ্য করে নেওয়া।" এই সবই একেবারে বালসুলভ যুক্তি। কেননা 'সমাজ' জীবনধারণের প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করেছিল কিনা প্রশ্নটা কখনো তা ছিল না। সেই আদিম কাল থেকে সমাজ সর্বত্রই তা করে এসেছে। এটাই ছিল সভ্যতার পথে অগ্রগতির পূর্বশর্ত। শত শত বছর ধরে ভারত 'জীবনধারণের প্রয়োজনের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত' উৎপাদন করে এসেছে। আসল প্রশ্নটা হচ্ছে কতটা পরিমাণ উদ্বৃত্ত উৎপাদিত হল এবং তার পরিণতি কি? এই উদ্বৃত্তের উপরে নিয়ন্ত্রণ এবং তার ব্যবহারের ধরন ধারণ কিরকম? অর্থনৈতিক বিকাশ (সঞ্চয়-বিনিয়োগ) এবং অর্থনৈতিক কল্যাণ—এই উভয়বিধ দৃষ্টিকোণ থেকেই এই প্রশ্নটির উদ্ভব হয়। যদি এই উদ্বৃত্ত চলে যায় বিদেশিদের পকেটে, তারা তা পুনর্বিনিয়োগ না করে রপ্তানি করে দেয় (কিংবা বিনিয়োগ করে অর্থনৈতিক ভাবে 'পশ্চাৎপদ' কোনো ভঙ্গিতে)। অথবা এই উদ্বৃত্ত যদি চলে যায় বানিয়া, মহাজন, ভূস্বামী, জমিদার, বৃত্তিজীবী মানুষ বা রাজ-রাজড়াদের হাতে, তারা তা ব্যবহার করে বিশেষ ধরণের পরিভোগের জন্য বা মহাজনী কারবারের সম্প্রসারণের জন্য বা জমিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে মধ্য স্বত্ব ভোগের কুফলগুলি তীব্রতর করে তোলবার জন্য। ফলে, না ঘটে অর্থনৈতিক বিকাশ, না হয় অর্থনৈতিক কল্যাণ। বরং এই বিকাশ ও কল্যাণ প্রায়শঃই এর ফলে ব্যাহত হয়। এই জন্যই আমরা জোর দিয়ে বলে আসছি যে প্রশ্নটা মাথা-পিছু আয় বৃদ্ধি বা আইন শৃংখলার চেয়ে ঢের বেশি গভীর। যা বিশেষ করে 'অবাধ

নিয়ন্ত্রণমুক্ত' ধরনের "সরলতম অর্থনৈতিক উপকরণসমূহের" সাহায্যে সুরাহা করা যায়, এমন কোন ব্যাপারও আদৌ নয়।

মরিস আরো দুটি পুরানো অজুহাতের উল্লেখ করেছেন। ১৯২১ সালের পরেকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারটিকে পরোক্ষভাবে হলেও টেনে এনেছেন। এটা ছিল একটা "প্রতিকূল উপাদান"। 'উদারনীতিক' অর্থনৈতিক নীতি যখন বিকাশের হার ক্রমাগত বৃদ্ধি করতে অক্ষম হয়ে পড়ল, ঠিক তখনই জনসংখ্যা বাড়তে থাকল এবং সম্প্রসারণমুখী শক্তিগুলিকে আগেকার যে কোনো কালের তুলনায় বেশি বোঝা নিয়ে অগ্রসর হতে হল। এটা হচ্ছে ঘোড়ার আগে গাড়ি জুতে দেবার মত ব্যাপার। প্রথমতঃ, এটা মনে রাখা দরকার যে এমনকি এই সময়েও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১ শতাংশ—মোটেই এটা বেশি নয়। তা ছাড়া, এর চেয়ে আরো উঁচু হারও বিকাশশীল দেশগুলি চটপট সামলে নিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, সে যুগের "জনসংখ্যাতাত্ত্বিক পরিস্থিতিতে", জনবাহুল্য অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার একটি লক্ষণ মাত্র, তার কারণ নয়। তৃতীয়তঃ, জনসংখ্যাবৃদ্ধির এই হারও ছিল বিকাশের বিশেষ করে তুলনামূলক অর্থে নিম্নমুখিনতার ফল। ভারত ও উত্তর অতলান্তিক দেশসমূহ এবং জাপান ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যেকার ক্রমবর্ধমান ব্যবধান এ ক্ষেত্রে উদাহরণ; শেষোক্ত দেশদুটিতে বিকশের ফলে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যবস্থাবলীর উন্নতি ঘটেছিল। কিন্তু তাদের মৃত্যু হার হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে তাদের জন্ম হারও হ্রাস পায়, উন্নততর জীবন মান, শিক্ষা, জন্ম নিয়ন্ত্রণের জ্ঞান ও সামগ্রীর সুপ্রাপ্যতা ইত্যাদির কারণে এটা ঘটে থাকে। ভারত যদি ১৮২০ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত 'গর্ভাবস্থায়' না থেকে অর্থনৈতিক বিকাশ সাধনে ব্রতী হত, তা হলে তারও মৃত্যু হার এবং সেই সঙ্গে জন্ম হার হ্রাস পেত। অতএব, ১৯২১ সালের পরে 'জনসংখ্যার ভার' বৃদ্ধি পাবার ঘটনাটি 'দীর্ঘস্থায়ী গর্ভাবস্থা'র সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। প্রথম ঘটনাটি সেক্ষেত্রে ১৯২১ সালের পরে নিম্নতর হারে বৃদ্ধির কারণ না হয়ে, 'দীর্ঘস্থায়ী গর্ভাবস্থা'ই বরং ১৯৫১ সালের পরে ক্রমবর্ধমান হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হয়ে ওঠে।

উত্তর অতলান্তিক অঞ্চলভুক্ত নয় এমন দেশের "দীর্ঘস্থায়ী গর্ভাবস্থা'র প্রয়োজনের কথা বলতে গিয়ে মরিস আরো বলেন, "সমস্যাটির ভূগোলকে, যে অঞ্চলের অভ্যন্তরে প্রক্রিয়াটি সংঘটিত হবে তার আয়তন ও সম্পদসম্ভারকে আমরা অবহেলা করতে পারব না"। (পৃঃ ৬১৭) সমস্যাটির ভূগোল আমার কাছে পরিষ্কার নয়। যদি আয়তন[৭৩] ও সম্পদের কথা ধরতে হয়, তা হলে ধরে নেওয়া শ্রেয় যে ভারতের ক্ষেত্রে এ দুটি সামঞ্জস্যপূর্ণই ছিল। এটা ঠিকই যে, বেশ কিছু বছর আগে বলা হত যে ভারতে লোহার আকর, কয়লা, সম্ভাব্য বিদ্যুৎ শক্তি এবং তেল ইত্যাদি নেই; কিন্তু আজ আর কেউ একথা বলেন না। জমির আয়তন সম্পর্কে বলা যায়, সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত জমি-মানুষ অনুপাত প্রতিকূল ছিল না। তা ছাড়া, জনসংখ্যা বৃদ্ধি কোন কোন অবস্থায় মাথা পিছু

আয়ের মন্থর হারে বৃদ্ধির কারণ হতে পারে, কিন্তু মোট জাতীয় উৎপাদনের মন্থর হারে বৃদ্ধির কারণ তা হতে পারে না।

৭

সুতরাং, মরিসের নতুন ব্যাখ্যা খুঁটিয়ে বিচার করলে আমাদের সিদ্ধান্ত করতে হয় যে চিরাচরিত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বক্তব্য অর্থনৈতিক ইতিহাসের আরও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত। মরিস অর্থনৈতিক ইতিহাস যে ভাবে বিচার করে তাঁর যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন বা এই একই বিষয়ে অন্য যে কেউ এ পর্যন্ত যাই বলে থাকুক না কেন, সে সবের চেয়ে উপরোক্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বক্তব্য দৃঢ়তর ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। এই বক্তব্যের সারমর্ম হল ঃ ব্রিটিশ শাসন অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছে ; অর্থনৈতিক পরিবর্তন সূচনায় সাহায্য করে ব্রিটিশ শাসন অচিরেই শিল্প ও কৃষি বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল, কারণ ব্রিটিশ শাসনের কল্যাণে ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ও 'আধা-সামন্ত-তান্ত্রিক' কৃষি ব্যবস্থা গড়ে উঠল ; অর্থ, শুল্ক, পরিবহণ, বাণিজ্য, বৈদেশিক ঋণ, মূলধন রপ্তানি বা 'বেরিয়ে যাওয়া', মুদ্রা, ব্যবস্থা, শিক্ষা, প্রযুক্তি-বিদ্যা, ভারি শিল্প, ব্যাঙ্কিং, কৃষি ইত্যাদি সর্ব ক্ষেত্রেই ব্রিটিশ রাজের অর্থ-নৈতিক নীতি ঔপনিবেশিক অর্থনীতি টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যেই নিয়োজিত ছিল ; অতএব, জাতীয় অর্থনৈতিক বিকাশের স্বার্থে ভারতবর্ষের জনগণের অধিকাংশ যে দাবি করেছিল তা সর্বাংশে যুক্তিযুক্ত—ভারতবর্ষের পুঁজিপতি শ্রেণী, শহরের 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণী, কৃষক সমাজ, শ্রমিকের অর্থাৎ দেশের বেশির ভাগ মানুষের সে দাবি ছিল ব্রিটিশ শাসন উৎখাত করার এবং ব্রিটিশ শাসনের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সৃষ্ট রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো চূর্ণ করার।[74]

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্ন ধারার তথা সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গিরই যে বহু দুর্বলতা ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। যে সব কারণে বিকাশ বাধা পাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লেখকরা তার সবগুলি চিহ্নিত করতে পারেন নি। যেমন তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতবর্ষের জনগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ করার প্রতিই মনোনিবেশ করেছেন, কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদেরই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের প্রতি দৃষ্টি দেননি। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, তাঁরা ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তরীণ সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোয় অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বগুলি অনুশীলন করেন নি—পুরানো দ্বন্দ্বগুলি ব্রিটিশ শাসনের কালেও কতদূর পর্যন্ত টিকে ছিল, ব্রিটিশ শাসনের দ্বারা সেগুলি কতদূর পর্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিল, ব্রিটিশ শাসনের ফলে নতুন নতুন দ্বন্দ্ব কতদূর পর্যন্ত

সৃষ্টি হয়েছিল, সে সব তাঁরা আলোচনা করেন নি। নতুন যে কৃষি কাঠামো গড়ে উঠেছিল তাও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে অনুশীলন করা হয় নি। কৃষক সমাজের মধ্যে বিভিন্ন স্তরে স্তরে পার্থক্য একরকম দৃষ্টির অগোচরেই থেকে গেছে, কৃষিশ্রমিকদের উদ্ভবের ঘটনাটা অবশ্য নজর এড়ায় নি। ভাগচাষের জটিল ব্যাপারটি নিয়েও ঠিকমত আলোচনা হয় নি। অনুরূপভাবে, জাতীয়তা-বাদী লেখকরা দেশের টাকা বিদেশে চলে যাওয়ার ব্যাপারটির উপর আলোকপাত করেছেন বটে, কিন্তু যে সব কারণে দেশের ভেতরকার সম্ভাব্য মূলধনের প্রকৃত মূলধনে রূপান্তরের পথে বাধা পড়তে পারত সেগুলির প্রতি তাঁরা যথেষ্ট নজর দেননি। উদীয়মান পুঁজিপতি শ্রেণীর গঠনের উপর ব্রিটিশ প্রভাবও স্পষ্ট করে আলোচিত হয়নি। ভারতীয় পুঁজি এবং বিদেশি পুঁজির মধ্যে ভালো-বাসা-ঘৃণার সম্পর্ক নিয়ে আরও বিস্তারিত অনুশীলন প্রয়োজন। অনুরূপ ভাবে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ছক এবং বৈষম্য এবং সাম্প্রদায়িক ও জাতপাতের ফারাকের উপর ব্রিটিশ প্রভাব নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এখনও হয়নি। সমাজ সংগঠন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কের উপর ব্রিটিশ প্রভাব নিয়ে অনুশীলন সবে শুরু হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, 'যজমানী' ব্যবস্থা এবং তার উপর ব্রিটিশ প্রভাব সম্পর্কে আরও বিশদ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে সমাজ-তাত্ত্বিকরা উনিশ ও বিশ শতকে বৃত্তিগত বণ্টনের প্রশ্নটিতে নতুন অধ্যায় যোগ করছেন। পুরানো মতাবলম্বীদের বহু অনুশীলনের ফলে কৃষি কাঠামোর প্রশ্নটি যেমন দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আসলে, জাতীয়তাবাদী লেখকদের মূল দুর্বলতা ছিল যে সমসাময়িক অর্থনীতির বন্ধন তাঁরা একেবারে ছিন্ন করতে পারেন নি। অনেকেই তখনও বিশ্বাস করতেন যে শুধু সংরক্ষণ ও রাষ্ট্রীয় সহায়তা পেলেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হবে। (রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে ভুল ধারণাও সেদিক থেকে এ ক্ষেত্রে জড়িত।) অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধা হিসাবে ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনা তাঁরা সার্থকভাবেই করেছেন, কিন্তু এ রকম বিকাশ কি করে সৃষ্টি করা যায় সে প্রশ্নের সঠিক উত্তর বহু ক্ষেত্রেই তাঁরা দিতে পারেন নি।[৭৮]

একটা জিনিস অবশ্য পরিষ্কার। চিরাচরিত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ব্যাখ্যা আরও অনুশীলনের মাধ্যমে সংশোধিত হবে, এবং সেটা হওয়া দরকারও। কিন্তু উনিশ শতকের সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বা যে সব অর্থনৈতিক তত্ত্ব দিয়ে উক্ত দৃষ্টিভঙ্গি পরিপুষ্ট হয়েছিল তাতে ফিরে গিয়ে ঐ সংশোধন ঘটান যাবে না। তাছাড়া, ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে ঔপনিবেশিক স্তরে নামিয়ে আনার কারণে ব্রিটিশ শাসন এ দেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার জন্য দায়ী—সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শিবিরের এই মূল বক্তব্য সংশোধিত হওয়ার আদৌ কোন সম্ভাবনা নেই। অন্ততঃ এ রকম কোন সংশোধনের বিন্দুমাত্র আভাসও আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

1. মরিস ডি. মরিস, "টুওয়ার্ডস এ রি-ইন্টারপ্রেটেশন অব নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি ইন্ডিয়ান ইকনমিক হিস্ট্রি", জার্নাল অব ইকনমিক হিস্ট্রি', খণ্ড XXIII, নং 4, 1963, পৃঃ 606-18।

2. এই আলোচনার প্রায় একেবারে সূত্রপাত থেকেই মার্কস এবং হিন্ডম্যানও ডিগবি থেকে শুরু করে আর. পাম. দত্ত পর্যন্ত এবং আরও অনেক ব্রিটিশ, আমেরিকান, রুশ ও অন্যান্য বিদেশী লেখক এই মতের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন।

3. এই পার্থক্যের গুরুত্ব অনেকখানি। ঐতিহাসিকদের মধ্যে 'জাতীয়তাবাদী বা 'ভাবাদর্শ-গত' বিচ্যুতির কথা বলা আজকাল কিছু লোকের মধ্যে ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে, অথচ আরও অনেক বেশি প্রকট সাম্রাজ্যবাদী বিচ্যুতি সম্পর্কে এঁরা আলোচনা করেন না, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির কেতাবী ঐতিহাসিকদের প্রায় সব রচনাতেই শেষোক্ত এই বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। উপনিবেশ-গুলির কিছু কিছু কেতাবী ঐতিহাসিকের রচনাতেও অনিবার্যভাবেই এই বিচ্যুতি প্রতিফলিত হয়েছে, কারণ ঔপনিবেশিক শক্তি এবং তার শিক্ষা ব্যবস্থার উপর এ সব ঐতিহাসিক অর্থনীতি ও মননশীলতা উভয় দিক থেকেই নির্ভরশীল ছিলেন। যেমন, কয়েক বছর আগে লন্ডনে ভারতীয় ইতিহাস রচনা সম্পর্কিত এক সেমিনারে ভারতীয় ইতিহাসের জাতীয়তাবাদী মত সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হয়, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী মত সম্পর্কে কোন আলোচনাই হয়নি। অথবা, আর একটি উদাহরণ, ভারতের জনসংখ্যা সম্পর্কে কিংসলি ডেভিসের পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনায় তিনি আর. পি. দত্ত, কুমার ঘোষাল এবং কেট মিচেলকে পরিষ্কার ভাষায় জাতীয়তাবাদী মনোভাবাপন্ন বলে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি যে অগণ্য ব্রিটিশ লেখকের রচনার উপর নির্ভর করেছেন, তাঁর গ্রন্থের কোথায়ও তাঁদের একজনকেও সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবাপন্ন বলে উল্লেখ করেন নি। আজও বহু পণ্ডিত ব্যক্তি তথাকথিত 'সাম্রাজ্যবাদী বিচ্যুতি' এড়াতে গিয়ে, সচেতনভাবে না হলেও, সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন।

4. মরিসের প্রবন্ধে এমন বক্তব্য বোধ হয় নেই, জন স্ট্র্যাচি, লর্ড কার্জন ইত্যাদি আগে যার উল্লেখ করেন নি। মরিস অবশ্য এঁদের অনেক অনাবশ্যক বক্তব্য ছাঁটাই করে কিছু কিছু আধুনিক অর্থনৈতিক সংজ্ঞা ব্যবহার করেছেন।

5. দাদাভাই নৌরজী, জি. ভি. যোশী, বিচারপতি রাণাডে, আর. সি. দত্ত, কে. টি. শাহ, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, ব্রিজ নারায়ণ, ডি. আর. গ্যাডগিল, আর. পি. দত্ত ইত্যাদির মত পণ্ডিত ও অর্থনীতিবিদদের প্রতি না ভেবে চিন্তে উদ্ধৃত উক্তিতে বিস্মিত হতে হয়।

6. মরিস কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃঃ 607 পাদটীকা।

7. কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, 'অন কলোনিয়ালিজম', মস্কো, তারিখ নেই, পৃ. 80।

8. এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবের দ্বৈত চরিত্র সম্পর্কে মার্কসের লেখা বা মূল্যায়ন ভারতীয়দের দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্র জে. এল. নেহরু, কে. এস. শেলভাঙ্কর, ওয়াদিয়া ও মার্চেন্ট, আর. পি. দত্ত প্রমুখ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মতাবলম্বী প্রায় প্রতিটি লেখকই নির্দ্বিধায় তা গ্রহণ করেছেন এবং অবাধে উদ্ধৃত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, বিতর্কটা এই স্তর অতিক্রম না করলে 'পুরনো' ও 'নতুন' ব্যাখ্যার মধ্যে বিরোধ খুব একটা থাকবে না।

9. এম. জি. রাণাডে, 'এসেস অন ইন্ডিয়ান ইকনমিকস', বোম্বাই, 1898, পৃঃ 23 ও 65।

10. উদাহরণ স্বরূপ, জি. ভি. যোশী, 'স্পীচেস এন্ড রাইটিংস', পুণা 1912, পৃষ্ঠা 680 ও 785; 'ইন্ডিয়ান পলিটিকস', মাদ্রাজ, 1898-এ জি. এস. আয়ার, পৃঃ 193; আর. সি. দত্ত, 'ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া ইন দা ভিক্টোরিয়ান এজ', ষষ্ঠ সংস্করণ, লন্ডন, পৃঃ 163 ও 518-19 দ্রঃ।

11. মৎ কৃত 'দা রাইজ এন্ড গ্রোথ অব ইকনমিক ন্যাশন্যালিজম ইন ইন্ডিয়া', নয়াদিল্লি, 1966, অধ্যায় I দ্রঃ

12 কে ডেভিস, 'দা পপুলেশন অব ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান', প্রিন্সটন, 1951, পৃঃ 36।
13. ঐ, পৃঃ 34।
14. সাইমন কুজনেৎস এবং অন্যান্য কৃত 'ইকনমিক গ্রোথ: ব্রাজিল, ইণ্ডিয়া, জাপান', ডারহাম, 1955, গ্রন্থে ড্যানিয়েল থর্নার কর্তৃক উদ্ধৃত. পৃ 123।

15. জর্জ ব্লাইন, 'এগ্রিকালচারাল ট্রেণ্ডস ইন ইণ্ডিয়া', 1891-1947, য়ুনিভার্সিটি অব পেনসিলভ্যানিয়া প্রেস, 1966, পৃঃ 102।

16. পূর্বোক্ত গ্রন্থে ড্যানিয়েল থর্নার কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃঃ 123।

17. পূর্বোক্ত, পৃঃ 122। অনুরূপভাবে 1921-1951 সালেও মাথাপিছু আয় কমে যাচ্ছিল। এম মুখোপাধ্যায়, "এ প্রিলিমিনারি স্টাডি অব দা গ্রোথ অব ন্যাশনাল ইনকাম", 'এশিয়ান স্টাডিজ ইন ইনকাম এণ্ড ওয়েল্‌থ্', বোম্বাই, 1965, পৃঃ 101। আরও চিন্তাকর্ষক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বাঙলা, বিহার ও ওড়িষ্যায় 1891 থেকে 1941 পর্যন্ত মোট কৃষি উৎপাদন প্রতি বছর 45% কমেছে, অথচ সেই সময়েই জনসংখ্যা বেড়েছে বছরে ·65% (ব্লাইন, পূর্বোক্ত, পৃঃ 119)। এই তিনটি প্রদেশে উপরোক্ত সময়কালে খাদ্যের লভ্যতা বছরে ·46% হারে কমেছে (ঐ. পৃঃ 104)।

18 অন্যান্য দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস থেকেও দেখা যায় যে মৃত্যুর হার বাড়া কমার সঙ্গে জীবন-যাত্রার মান যুক্ত থাকবেই এমন কোন মানে নেই। ডব্লু. ডব্লু. রোস্টো, 1965-তে হাবাকুক এণ্ড ভীন, 'দা টেক-অফ ইন ব্রিটেন', পৃঃ 68 দ্রঃ।

19. কার্যত অজস্র রকমের অর্থনৈতিক হাতিয়ার রয়েছে।

20. কিন্তু 'নৈরাজ্য' শব্দটির ব্যাখ্যা করা কঠিন। সতীশ চন্দ্র, পার্সিভাল স্পিয়ার এবং অন্যান্যরা দেখিয়েছেন যে ঊনবিংশ শতাব্দীর লেখক ও প্রশাসকরা অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতে রাজনৈতিক নৈরাজ্যের বিষয়টি বাস্তবের কোন সম্পর্ক না রেখেই অতিরঞ্জিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে ই. ফেলপ্‌স্ ব্রাউনের মতে 'গোলাপের যুদ্ধ' সত্ত্বেও পঞ্চদশ শতাব্দীর ব্রিটেনে মাথাপিছু আয় খুব বেশি ছিল। 'দা গ্রোথ অব ব্রিটিশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন্‌স্', 1959, পৃঃ 2।

21. মোটের উপর এটা আজ সকলেরই জানা যে ব্রিটিশ প্রশাসনের মহাজন-ঘেঁষা এবং জমিদার-ঘেঁষা বিচার ব্যবস্থা, জমিদার ঘেঁষা আমলাতন্ত্র, দারুণ রকম উৎপীড়ক ও দুর্নীতি-পরায়ণ প্রশাসন ও পুলিশ ব্যবস্থার কারণে তা ছিল গ্রামে অর্থনৈতিক বিকাশ তথা সাধারণ কল্যাণের পথে প্রধান বাধা। সমাজের অর্থনৈতিক সংগঠনে অথবা তার সাধারণ সংগঠনের ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা আদৌ নিরপেক্ষ থাকে না। যে কোন ক্ষেত্রেই হোক, কৃষক ও দরিদ্রদের ব্যাপারে ব্রিটিশ বিচার ও আইনের দাবি মেনে নেওয়ার সময় ভারতের ঐতিহাসিককে খুবই সতর্ক থাকতে হবে।

22. অন্যান্য বন্ধ্যা সমাজে স্থায়ী প্রশাসনের মত মোগল শাসনের ফলেও জনসংখ্যা এবং জাতীয় আয়, এমন কি মাথাপিছু আয়ও বাড়তে পারার সম্ভাবনা থাকলেও অর্থনৈতিক বিকাশ প্রক্রিয়া এখান থেকে সূচিত হয় নি।

23. বিষয়টি অন্যভাবে দেখান যেতে পারে: আইন-শৃঙ্খলা ছাড়া অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটতে পারে কি না এটা প্রশ্ন নয়; ব্রিটিশ শাসন ছাড়া আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা যেত কি না এটাও প্রশ্ন নয়, বরং প্রশ্ন এটাই হবে যে আইন-শৃঙ্খলা সত্ত্বেও কোন অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটেনি কেন?

24. দুনিয়ায় অন্য কোথাও 'কোন উদারনৈতিক জাতি রাষ্ট্র' 'অর্থনৈতিক খাজনা'র 55% আদায় করতে সাহস করবে কি না তা নিয়ে জল্পনা করা যেতে পারে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভূমি রাজস্বের ভুক্তে ব্রিটিশরা অই করেছে বলে দাবি করে।

25. এগুলিকে খবর ফাঁস হয়েছে বলা ঠিক নয়, এভাবেই এগুলির পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

26. রেলপথের সম্ভাব্য সুযোগসুবিধা এখানে বিচার্য বিষয় নয়, বরং অর্থনীতির উপর তাদের প্রভাবের চরিত্র এবং পূর্ণ ও সত্যিকারের বহুমুখী প্রভাব ফেলতে তাদের ব্যর্থতার কারণই এখানে বিবেচ্য। দ্বিতীয়তঃ, ভারতে রেলপথ নির্মাণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ব্যক্তিরা ভুলে যান যে নির্দিষ্ট কোন এক সময়ে সত্যিকারের অর্থনৈতিক সমস্যা হল প্রাপ্তব্য সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার, অন্ততঃপক্ষে উন্নততর ব্যবহার। প্রকৃতপক্ষে, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লেখকদের মতে যে কায়দায় ভারতে রেলপথ তৈরি করা ও চালান হয়েছিল, তাতে কৃষির উপর ভারতের নির্ভরতা বেড়েই গিয়েছিল। তাঁরা আরও দেখিয়েছিলেন যে শিল্পায়নে বা সেচে একই পরিমাণ পুঁজি খাটা করে ব্যবহার করলে অর্থনৈতিক বিকাশের হার বাড়বে কি না সেটাই হচ্ছে মূল কারণ (মৎকৃত উপরে বর্ণিত গ্রন্থ, অধ্যায় V)। এই প্রসঙ্গে উপরোক্ত 'ইকনমিকস অব টেক-অফ' গ্রন্থে অধ্যাপক কুটনারের মন্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক ও যথাযথ। তিনি বলেন যে, "রেলপথ তৈরি থেকে অন্যান্য শিল্প চালু করা হবে অথবা কৃষির উপর কোন অঞ্চলের নির্ভরশীলতা হ্রাস করা হবে বলে আশার কোন কারণ যদি না থাকে, তবে রেলপথ তৈরি করলে বিকাশ ঘটবে এটা মনে করারও কোন কারণ নেই। (পৃঃ 455) অন্যত্র "আলোচ্য সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার হওয়ার পূর্ববর্তী সময়কাল যদি অতি দীর্ঘ হয়, তবে সুদের হারের ভিত্তিতে অন্য কোথাও পুঁজি নিয়োগ করা ভাল।" (পৃঃ 456) "বিশেষ করে উৎপাদনকারী ক্ষেত্রের বিকাশ প্রসঙ্গে উন্নয়নের কথা চিন্তা করলে, অর্থনৈতিক উন্নয়নে সামাজিক উপরি পুঁজির বিশেষ কোন ভূমিকা"ও তিনি অস্বীকার করেন। (পৃঃ 261) তিনি বলেন যে "অনগ্রসর দেশে সামাজিক উপরি পুঁজি গঠনের প্রকৃত সুবিধা সেই দেশের কপালে জোটে না, বরং তার উৎপন্ন দ্রব্য ব্যবহারীদের ভাগ্যে জোটে"। (পৃঃ 275)

27. ডি কোটোভস্কি 'এগ্রেরিয়ান রিফর্মস ইন ইন্ডিয়া' 1964, দিল্লি, পৃঃ 29-30। কৃষি দপ্তরগুলি 1925-26 সালে কেবল 17,000 উন্নত ধরনের লাঙ্গল বিক্রয় করে। 'রিপোর্ট অব দা রয়াল কমিশন অন এগ্রিকালচার ইন ইন্ডিয়া', 1928, অনুচ্ছেদ 105।

28 পূর্বোক্ত, পৃঃ 203।

29 ঐ, পৃঃ 195।

30 ঐ, পৃঃ 194। এছাড়া 'রিপোর্ট অব দা রয়াল কমিশন অন এগ্রিকালচার ইন ইন্ডিয়া', 1928, অনুচ্ছেদ 80 ও 81 দ্রঃ।

31 ব্লাইন, পূর্বোক্ত; পৃঃ 200।

32 ঐ, পৃঃ 202।

33. ঐ, পৃঃ 340। ঐ সময়ে মোট 2 কোটি 76 লক্ষ একর জমিতে সেচ দেওয়া হত। এর মধ্যে 1 কোটি 1 লক্ষ একর জমিতে খালের জল দিয়ে সেচ দেওয়া হত। 'স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাবস্ট্রাক্ট অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া', 1882-83 থেকে 1891-92, নং 27, পৃঃ 142।

34. জোত খণ্ড খণ্ড করলে একর প্রতি উৎপাদন ক্ষমতা বাড়তে পারে কিন্তু অধিক পরিমাণে শ্রমের যোগানের ফলে মাথাপিছু উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে না—এই মতটি চিন্তা করে দেখা যেতে পারে।

35. ব্লাইন, পূর্বোক্ত, পৃঃ 316।

36. জনৈক 'বিকাশ' অর্থনীতিবিদের বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত করতে চাই: "...প্রাকৃতিক সম্পদ দক্ষ ভাবে ব্যবহার করলে মোট উৎপাদন বাড়বে এবং তার ফলে সব সময়েই এবং একই সঙ্গে জনগণের অনগ্রসরতা কমবে—এমনটা ঘটবেই এটা জোর করে বলা যায় না। পক্ষান্তরে, বহু দেশেই অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার সমস্যা তীব্রতর হওয়ার কারণ এই নয় যে প্রাকৃতিক সম্পদের 'পূর্ণ ব্যবহার হয় নি', কারণ বরং এই যে বাজারের পরিস্থিতি অনুযায়ী তার অনেকটা পুরোমাত্রায় এবং দ্রুত ব্যবহার হয়েছে বটে, দেশের অধিবাসীদের কিন্তু তার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, বিকাশের এই প্রক্রিয়ায় পুরোপুরি অংশগ্রহণ করতে হয় তারা অক্ষম বা অনিচ্ছুক বা দুইই···সুতরাং, বিনিয়োগ এবং উৎপাদন ও অর্থনৈতিক কাজকর্মের মোট পরিমাণ বিবেচনা করে আমাদের যা

থেকে আবার বিনিয়োগের ধরন এবং বিভিন্ন অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষ ও অন্যান্যদের মধ্যে কে কি রকম অর্থনৈতিক কাজে লিপ্ত এবং কার কি রকম অর্থনৈতিক ভূমিকা তা বিবেচনা করতে হয়।" এবং 'উনিশ শতকীয় উদারনৈতিক রাষ্ট্রের' কাঠামো সম্পর্কে তিনি লিখছেন: "আনুষ্ঠানিক যে কাঠামোয় অর্থনৈতিক অধিকারের সঠিক সমতার কথা বলা হয়েছে তাতে সংস্করণের কোন আশ্বাস নেই এবং সতত পরিবর্তনশীল রপ্তানি মূল্যোদ্ভূত পরিস্থিতিতে 'বিভিন্ন অর্থনৈতিক শক্তির অবাধ লীলা'র ফলাফল আসলে গ্রামের মানুষের ঋণগ্রস্ততা, ভূমির বিচ্ছিন্নতা, এবং কৃষি ক্ষেত্রে অশান্তি সম্পর্কিত সুপরিচিত কাহিনী।' এ. এন. আগরওয়াল এন্ড এস. পি সিং সম্পাদিত 'দ্য ইকনমিকস অব আন্ডার-ডিভলপমেন্ট', নিউ ইয়র্ক, 1963, গ্রন্থে এইচ মাইন্ট, "অ্যান ইন্টারপ্রিটেশন অব ইকনমিক ব্যাকওয়ার্ডনেস", পৃঃ 96, 106 ও 125।

37. সেচের কারণে কিছু পরিমাণে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ছাড়াও।

38. জে. সি. জ্যাক, 'দ্য ইকনমিক লাইফ অব এ বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট', 1916, পৃঃ 92।

39. উদাহরণস্বরূপ, সাম্প্রতিককালে গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক তথা সমাজতাত্ত্বিক অনুশীলন থেকে এই বিষয় সম্পর্কিত অজস্র তথ্য আহরণ করা যায়।

40. বেশ মজার এক ধরনের গবেষণা এবং অর্থনৈতিক ইতিহাসের কায়দা লক্ষ্য করা যাচ্ছে: সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতীয়রা দারুণ গরিব ছিল এটা প্রমাণ করবার জন্য কোন কোন লেখককে পর্যটক পেলসার্টের সাক্ষ্য মেনে নিতে হচ্ছে এবং উৎপাদনের একটা সম্পূর্ণ পদ্ধতির চরিত্র নির্ধারণ করতে গিয়ে উক্ত লেখকদের হস্তশিল্পের অধোগতি সম্পর্কে শত শত পর্যটক, প্রশাসক ও অন্যান্য পর্যবেক্ষকের সাক্ষ্য বাধা হয়ে অগ্রাহ্য করতে হচ্ছে অথবা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতীয়দের দারিদ্র্য ও অনাহার সম্পর্কে 1888 সালের ডাফরিন তদন্ত বা ডব্লু. ডব্লু. হান্টার ও চার্লস ইলিয়টের মত ব্যক্তির মন্তব্য অগ্রাহ্য করতে হচ্ছে: অথবা উপরোক্ত পদ্ধতির ফলে সেই সব লেখক "আধুনিক ইওরোপের প্রথম যুগের" বা তোকুগাওয়া জাপানের তুলনায়ও সনাতন ভারতীয় সমাজ (কোন শতাব্দী?—বি. চ.) মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের নিম্নতর স্তরে সমর্থিত হয়েছিল" বলে "নিজের যে সাধারণ মত পোষণ" করেন তার সপক্ষে 1919 সালে টমাস কেরিজের বিবৃতি "এ দেশ ধনী বলে মনে হলেও এখানকার সাধারণ অধিবাসীরাও অতি গরিব···" উপস্থিত করেন। (পৃঃ 610, পাদটীকা 16) ভারত, জাপান ও ইওরোপের 'অতি গরিবদের' মাথাপিছু আয়ের মধ্যে তুলনা করব কি করে? 'সরলতম অর্থনৈতিক হাতিয়ারগুলির' 'অলৌকিকত্ব'-র সাহায্যে তোকু-গাওয়া জাপানে, আধুনিক যুগের প্রথম দিকের ইওরোপ এবং 1619 সালে ভারতে মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের স্তরের মধ্যে প্রচলিত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তুলনা করা সম্ভব হলে ঐ সব অলৌকিক ঘটনার সামনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়।

41. অন্য এক প্রসঙ্গে মরিস এ বিষয়টি ভালভাবেই দেখিয়েছেন: "ভারতে সুতিবস্ত্র শিল্প, এবং বিশেষ করে, বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্প সম্পর্কে পরিসংখ্যান পাওয়া যায় অজস্র, অর্থনীতির অন্য প্রায় কোন বড় অংশ সম্বন্ধেই এত পাওয়া যায় না। এ সব পরিসংখ্যান থেকে অবশ্য, কিছু বোঝা মুশকিল। প্রতি পদেই এ সব পরিসংখ্যান সম্বন্ধে গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়, এবং এই অনুশীলন পরিমাণগত সাক্ষ্যের বদলে অবশ্যই গুণগত সাক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল হবে, কারণ দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐতিহাসিক গবেষণাগুলিকে প্রায়শঃ এটাই করতে হয়।" (রেখাঙ্কিত হরফ লেখকের), 'দ্য এমার্জেন্স অব অ্যান ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেবার ফোর্স ইন ইন্ডিয়া', 1965, পৃঃ 9।

42. এই "মনে হয় জোরদার করছে"-র সপক্ষে এখানেও কোন প্রমাণ দেওয়া হচ্ছে না। কোন তত্ত্বগত ব্যুৎপত্তিকে যথাযথ পরাংশ হবে "জোরদার হওয়া উচিত।" "মনে হয়" এই শব্দগুলি নিয়ে বাস্তব অবস্থা বোঝায়—কিন্তু কোন প্রমাণ নেই। অবশ্য, বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা ভারতীয় হস্তশিল্পীদের তুলনামূলক অবস্থানের অবনমন সম্পর্কে প্রমাণ উপস্থিত করে।

43. আর. সি. দত্ত, পৃঃ 161 এবং 'স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাবস্ট্রাক্ট রিলেটিং টু ব্রিটিশ ইন্ডিয়া', সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রদত্ত তালিকাগুলির ভিত্তিতে।

44. টমাস এলিসন, 'দ্য কটন ট্রেড অব গ্রেট ব্রিটেন'. লন্ডন, 1886, পৃঃ 69।

45. ঐ, পৃঃ 60।

46. অসম্পূর্ণ বাজার পরিস্থিতি, ঐতিহ্যের চাপ ইত্যাদি দ্বারা ক্ষয়িষ্ণু উৎপাদন অবশ্য দীর্ঘদিন বজায় রাখা যেত।

47. কিন্তু ঠিক ঐ কারণেই শহরের হস্তশিল্প ধ্বংস হয়ে গেল।

48. আভ্যন্তরীণ বাজার ও চাহিদার সীমাবদ্ধতা প্রথমত বৈদেশিক আমদানি, এবং তারপর দেশজ কারখানাজাত উৎপাদন সীমিত করার ক্ষেত্রে প্রধান কারণ ছিল। 1947 সালে ভারতের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার ক্ষেত্রে এটা ছিল অন্যতম মুখ্য কারণ। ব্রিটিশ শাসন কিভাবে আভ্যন্তরীণ চাহিদাকে সম্পূর্ণ প্রভাবিত করেছিল তা অনুশীলন করাই অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকদের অন্যতম প্রধান কাজ। আইন-শৃঙ্খলা, রেলপথ, বৈদেশিক বাণিজ্য, ব্যবসার প্রসার বা মুদ্রাঙ্কনের ফলে কার্যতঃ বা অনিবার্যভাবে দেশের বিকাশ ঘটেছে দাদাভাই নৌরজী এবং অন্যান্যরা এ ধারণা বাতিল করেছেন। লক্ষণীয় যে দুটি বিশ্বযুদ্ধের দ্বারা তৎকালীন সীমিত কার্যকরী চাহিদা আমদানি থেকে দেশীয় উৎপন্ন দ্রব্যে পরিচালিত হওয়ার ফলেই কেবল 1947 সালের আগে ভারতের শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে বড় ধরনের আলোড়ন দেখা গেছে।

48a. কোন সারণী, পরিসংখ্যান, প্রকৃত বক্ররেখা, কোন পণ্ডিত ব্যক্তির বক্তব্য প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত করা হয় নি।

49. সুতিবস্ত্রের জন্য কার্যকরী চাহিদায় যে কোন প্রকৃত বিকাশই যে ল্যাঙ্কাশায়ার এবং/ অথবা ভারতীয় সুতিবস্ত্র শিল্পজাত উৎপাদনগুলি দিয়ে মেটানো যাবে সেটা স্পষ্ট। প্রযুক্তিবিদ্যা-গত পরিবর্তন অর্থাৎ যান্ত্রিকীকরণের ফলে 1918 সালের পরেই কেবল ভারতের তাঁতীরা কিছু পরিমাণে স্বকীয়তা বজায় রাখতে সক্ষম হল।

50. বিংশ শতাব্দীতে কৃষিতে যখন এদের বেশির ভাগেরই ঠাঁই হল না, তখন এরা সাধারণ শ্রমিক, আংশিকভাবে কর্মরত কৃষি শ্রমিক, ভিক্ষুক এবং 'ব্যবসায়ী', অর্থাৎ ফিরিওয়ালা ইত্যাদির বৃত্তি গ্রহণ করতে আরম্ভ করল অর্থাৎ অকৃষিজ কাজে নিযুক্ত জনসংখ্যার আনুপাতিক হার এভাবে 'বৃদ্ধি পেল'। তুঃ, এস. কুজনেৎস, 'ইকনমিক গ্রোথ', 1959, পৃঃ 61।

50. ব্রিটিশ সুতিবস্ত্র শিল্পে প্রতি পাউন্ডে মজুরি ঃ

সময় কাল	তন্তু	বোনা জিনিস
1819-21	6 4 পেনি	15·5 পেনি
1829-31	4·2 ,,	9·0 ,,
1844-46	2·3 ,,	3·5 ,,
1859-61	2·1 ,,	2 1 ,,
1880-82	1·9 ,,	2·3 ,,

এলিসন, পূর্বোক্ত, পৃঃ 68-69।

52 কোল এন্ড হুভার, 'পপুলেশন গ্রোথ এন্ড ইকনমিক ডিভলপমেন্ট', পৃঃ 30, 231 ; ডি. এইচ. বুকানন, 'দ্য ডিভলপমেন্ট অব ক্যাপিটালিস্ট এন্টার প্রাইজ ইন ইন্ডিয়া, নিউ ইয়র্ক 1934, পৃঃ 139 ; সেনসাস অব ইন্ডিয়া, 1951, পার্ট-এ, রিপোর্ট, পৃঃ 122 ; এ. মায়ার্স 'লেবার প্রব্লেম্‌স্ ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন অব ইন্ডিয়া', কেমব্রিজ, ম্যাসাচুসেট্‌স্ 1958, পৃঃ 17। প্রক্রিয়ণ ও উৎপাদনে নিযুক্ত মানুষের সংখ্যা 1901 সালে 1 কোটি 3 লক্ষ থেকে কমে 1951 সালে 88 লক্ষ নেমে গেছে বলে ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশন যে হিসাব করেছেন সেটা বাদেই এ হিসাব দেওয়া হয়েছে। জোসেফ ই. সোয়ার্জবার্গ ; 'অকুপেশন্যাল স্ট্রাকচার এন্ড লেভেল্‌স

অব ইকনমিক ডিভলপমেণ্ট—এ রিজিওন্যাল অ্যানালিসিস', অপ্রকাশিত, শিকাগো য়ুনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে রক্ষিত মাইক্রোফিল্ম্, পৃঃ 127-এ উধৃত ইন্ডিয়ান প্ল্যানিং কমিশন কৃত 'অকুপেশ-ন্যাল প্যাটার্ন অব ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন ফ্রম 1901-1951', সারণী II, পৃঃ 6। বিশদ আঞ্চলিক অনুশীলনের পর সোয়ার্জবার্গ বলছেন যে পরিকল্পনা কমিশন "নিঃসন্দেহে মনে করে যে তারা অবশেষে 1901 থেকে 1951 সালের পেশাগত প্রবণতার একটা তাৎপর্যপূর্ণ চিত্র পাচ্ছে। লেখক এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত। (পৃঃ 133) পরিকল্পনা কমিশনের বক্তব্যে পুরনো এবং নতুন পেশাগত গোষ্ঠীগুলির এক বিশদ হিসাব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সোয়ার্জবার্গ আরও বলেন যে "উনবিংশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (অর্থাৎ উৎপাদন ও প্রক্রিয়ণ) আরও অধোগমনের প্রমাণ পাওয়া যায়"। (পৃঃ 123)

53 তুঃ এস. কুজনেৎস ঃ "ব্যাপক প্রয়োগের মত প্রয়োজনীয় প্রাচীন জ্ঞান সীমিত বলে শ্রমের প্রতি ইউনিট পিছু উৎপাদনের নিরবচ্ছিন্ন ও বড় রকমের বৃদ্ধি কেবল নতুন প্রায়োগিক ও সম্পর্কিত জ্ঞানে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধির ফলেই সম্ভব।" 'ইকনমিক গ্রোথ', পৃঃ 29।

54. 'এনকোয়ারি, সংখ্যা I (পুরনো সিরিজ), 1958-তে ও'র "ইন্ডিয়া—এ কলোনিয়াল ইকনমি (1757-1947)" দ্রঃ।

55. "অর্থনৈতিক কার্যকলাপের বণ্টন অনুশীলন না করা পর্যন্ত অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা বা প্রগতির প্রকৃতি ও অগ্রগতি অনুধাবন করা যায় না" এই মত আজকাল ব্যাপক স্বীকৃতি পেয়েছে। স্বাধীনতন্ত্রী অর্থনীতির একেবারে শেষধাপে এসে মার্শালও এটা বুঝতে পেরেছিলেন, সেজন্যই উনি লিখেছেন : "মানবজাতির ইতিহাসের মূল সুরের সন্ধান করতে গিয়ে উদ্যোগ ও কার্যকলাপের আকারে পরিবর্তনের দিকেই আমাদের যেতে হবে।" এইচ মাইণ্ট, পূর্বোক্ত, পৃঃ 123-এ উদ্ধৃত 'প্রিন্সিপ্‌লস', পৃঃ 85।

58. 'ইন্ডিয়ান ইকনমিক এণ্ড সোস্যাল হিস্ট্রি রিভিউ', খণ্ড II, সংখ্যা 1, 1965। উদাহরণ স্বরূপ, ড্যানিয়েল থনার কৃত 'ইনভেস্টমেণ্ট ইন এম্পায়ার', 1950 এবং আর্থার সিলভার কৃত 'ম্যানচেস্টার মেন এণ্ড ইন্ডিয়ান কটন', 1966 ও দ্রঃ।

57. রাণাডে, পূর্বোক্ত, পৃঃ 33, 86-89, 102, 165 অনুবর্তী।

58. 'হিন্দুস্তান রিভিউ', ফেব্রুঃ 1903, পৃঃ 193-194 ; জি. এস. আয়ার, 'সাম ইকনমিক আসপেক্টস্ অব ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া', মাদ্রাজ, 1903, পৃঃ 123।

59. উল্লেখ্য যে বর্তমানেও সব সরকারই নিজ নিজ বাজেট এবং বাজেট সম্পর্কিত সমস্ত তত্ত্বগত ও রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার যে চেষ্টা করে তা প্রধানতঃ ব্যয় ও রাজস্বের আদর্শ বিষয়ক প্রশ্নেই কেন্দ্রীভূত থাকে। ঘাটতি অর্থ সংস্থানের অর্থনীতি দিয়ে 'সুষম বাজেটের জন্য চিন্তাভাবনা'র চাহিদা দূর করা যায় না।

60. এই সব পরিসংখ্যান মোটামুটিভাবে 'ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার', খণ্ড IV, 1908 এবং সি. এন. ভকীল, 'ফিনান্সিয়াল ডিভলপমেণ্ট ইন মডার্ন ইন্ডিয়া', 1860-1924 বোম্বাই, থেকে তৈরি করা।

61. বিশদ বিবরণের জন্য মৎকৃত 'দ্য রাইজ এণ্ড গ্রোথ অব ইকনমিক ন্যাশন্যালিজম ইন ইন্ডিয়া' অধ্যায় XII দ্রঃ।

62. ভারতের প্রশাসন ব্যবস্থা হয়ত ভাল ছিল না, প্রশাসন বাবদ ব্যয় কিন্তু তা বলে কোন অংশে কম নয়।

62a, উদাহরণ স্বরূপ, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটেনে ও ভারতে সামরিক খাতে ব্যয় নিম্নলিখিত ভাবে বেড়েছিল ঃ

	ব্রিটেন (মিলিয়ন স্টার্লিং)			ভারত (কোটি টাকা)
	সৈন্যবাহিনী	নৌবাহিনী	মোট	
1861	15·0	13·3	31·3	16 2
1881	14·7	10 5	25·8	21·3
1891	17·9	15·5	33·5	24 6

রবার্ট গিফেন, 'ইকনমিক এনকোয়ারিজ এন্ড স্টাডিজ" খণ্ড II, পৃঃ 329. ভকীল. পূর্বোক্ত, পৃঃ 547-48।

63. ভকীল, পূর্বোক্ত, পরিশিষ্ট।

64. পূর্বোক্ত, পৃঃ 164।

65 ভকীল, পূর্বোক্ত, পরিশিষ্ট-র ভিত্তিতে।

66. ঐ। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে শিক্ষা খাতে ব্যয় যখন 1875 সালে 80 লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে 1901 সালে 1 কোটি 40 লক্ষ টাকা হয়েছে (অর্থাৎ, 60 লক্ষ টাকা বেড়েছে), সামরিক খাতে ব্যয় তখন 1875 সালে 17 কোটি 60 লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে 1901 সালে 25 কোটি 80 লক্ষ টাকায় দাঁড়িয়েছে (অর্থাৎ, 8 কোটি 20 লক্ষ টাকা বেড়েছে)।

67. উত্তর এখানে সমসাময়িক ঐতিহ্য বর্জিতও নয়। 1877 থেকে 1882 সালের মধ্যে ব্রিটেনে শিক্ষা খাতে ব্যয় হঠাৎ অনেকটা বেড়ে গেল, ঠিক ঐ একই সময়ে ভারতে উদ্বৃত্ত বাজেটের যুক্তিতে প্রায় সব শুল্কই দেওয়া হত। ব্রিটেনে শিক্ষা খাতে ব্যয় 1871 সালে 1.859 মিলিয়ন পাউন্ড থেকে বেড়ে 1881 সালে 4.281 মিলিয়ন পাউন্ড এবং 1901 সালে 12.662 মিলিয়ন পাউন্ড হল। রবার্ট গিফেন, 'ইকনমিক এনকোয়ারিজ এন্ড স্টাডিজ', খণ্ড II, পৃঃ 330।

68. অপরদিকে, দীর্ঘ এই ভ্রূণাবস্থার ফলে ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা অনুকূল সুযোগ নষ্ট হয়ে গেল, অথচ এই কাজটা এদেশে এখন করতে হচ্ছে একটা প্রতিকূল সময়ে এবং ব্যবধানও এখন অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কথা হল এই যে দীর্ঘ এই 'ভ্রূণাবস্থা'র ফলে অনগ্রসরতা আরও বেড়ে গেল, অর্থাৎ 1813 সালে ভারত ব্রিটেনের চেয়ে যতটা অনগ্রসর ছিল, 1947 সালে তার তুলনায় আরও বেশি পিছিয়ে গেল।

69. এই 'উত্তর অতলান্তিক অভিজ্ঞতা' পুরানো সাম্রাজ্যবাদী ধ্যানধারণা দুষ্ট অর্থাৎ, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুযুক্ত দেশগুলিতেই কেবল শিল্পায়ন সম্ভব, এই তত্ত্বের কেবল বাড়তি একটা সুযোগ আছে—রাশিয়া এবং জাপানও এর আওতায় আসতে পারত।

70. এই 'ভ্রূণাবস্থা' কাল অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে খুব কম হলেও, 3,200 কোটি টাকা কৃষি ঋণ সঞ্চিত হওয়ার পক্ষে এবং যে পরিস্থিতিতে জনসংখ্যার 2% অংশ 70% কৃষিজমির মালিক হতে পারে সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পক্ষে কম নয়।

71. কোন কোন ঐতিহাসিকের একটা ভুল ধারণা আছে যে ব্রিটিশ শাসনে অন্ততঃ অর্থনৈতিক বিকাশের বনিয়াদ গড়ে উঠেছে। বিশদ বক্তব্যে না গিয়েও বলা যায় যে এঁরা রেলপথ তৈরি এবং আইন শৃঙ্খলা নিয়ে এত হৈ-চৈ দেখে বিভ্রান্ত হয়েছেন। আসলে, প্রশাসন থেকে শিক্ষা পর্যন্ত কোথাও কোন বনিয়াদ তৈরি হয়নি। আধুনিক ঔপনিবেশিক অর্থনীতির শক্তিবৃদ্ধির জন্য [illegible]। বনিয়াদ এবং বিকাশশীল অর্থনীতিকে সাহায্য করার জন্য প্রয়োজনীয় বনিয়াদের মধ্যে পার্থক্যটা বুঝতে হবে। যেমন, একটা প্রধান দুর্বলতা হল কারিগরী শিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে অবহেলা। আর একটি হল বৈদ্যুতিক শক্তির উৎসগুলির ক্ষেত্রে অবহেলা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ভারতও এসব সম্পদে সমৃদ্ধ এবং রেলপথের কাজে যেমন আগেই হাত দেওয়া হয়েছিল, এগুলি বিকাশের ব্যাপারে তেমনি আগেই চেষ্টা করলে শিল্পের বহু ক্ষেত্রে আজ অনেক কদম এগিয়ে থাকা যেত। কিন্তু এটা আজ সুপরিজ্ঞাত যে ভারতে রেলপথও শিল্পোন্নয়ন

শুরু করার উদ্দেশ্যে পাতা হয়নি। তাছাড়া, রেলপথ তৈরির ফলে সৃষ্টি সুযোগ সুবিধা ব্রিটেনে যেমন রপ্তানি করা গিয়েছিল, বৈদ্যুতিকরণ জাত সুযোগ সুবিধা ত' আর করা যেত না।

72. মরিস এখানে সম্ভবতঃ 'ইকনমিক গ্রোথ' (পৃঃ 19-29)-এ এস. কুৎনেৎসের যুক্তি ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মাথাপিছু 100 ডলার বা সামান্য কিছু বেশি বার্ষিক আয় সমন্বিত দেশগুলিতে গত কয়েক দশকে মাথাপিছু আয় অনেক বেড়ে যেতে পারত, এই বক্তব্য অস্বীকার করার জন্যই কুজনেৎস তাঁর যুক্তি প্রয়োগ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ স্মতর্ব্য যে 1952-54 (কুজনেৎসের হিসাব এই ক'বছরের ভিত্তিতে করা হয়েছে) ভারতে মাথাপিছু আয় 100 ডলারের চেয়ে অনেক কম ছিল।

73. শুধু আকারের খুব একটা গুরুত্ব নেই। তুঃ এস. কুজনেৎস, 'ইকনমিক গ্রোথ", অধ্যায় V.

74. আর এক দল ঐতিহাসিকের অভ্যুদয় ঘটেছে। এঁরা বলতে চান যে ব্রিটিশ শাসনের ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় অর্থনীতির মৌলিক কোন পরিবর্তন ঘটেনি। কিন্তু এই কল্পনা এখনও পর্যন্ত স্পষ্টভাবে সূত্রায়িত বা কোন অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ দ্বারা সমর্থিত হয়নি। এই কল্পনা সম্ভবতঃ প্রাক-ব্রিটিশ অর্থনৈতিক কাঠামো এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে তৈরি, কিন্তু অর্থনৈতিক কাঠামোর ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত পরিমাণগত ও গুণগত মৌলিক পরিবর্তনগুলি এই কল্পনায় ধরা পড়েনি। অর্থনীতি অধ্যয়ন সম্পর্কে মরিসের কতকগুলি উপদেশ এখন যথার্থই এঁদের সম্পর্ক প্রযোজ্য, কারণ এঁরা এখন টিকে যাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে।

75. ঐতিহ্যবাহী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লেখকরা 'সহজ অর্থনৈতিক হাতিয়ারগুলির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না সেটা তাঁদের দুর্বলতা নয়, দুর্বলতা তাঁদের এই যে তাঁরা বিভিন্ন ধরনের যে সব অর্থনৈতিক হাতিয়ার ব্যবহার করা যায় সেগুলি সঠিকভাবে বেছে নিতে সর্বদাই ব্যর্থ হয়েছেন। আজকের দিনে এই স্বীকৃতি বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ভারতীয় ইতিহাস গবেষণার নতুন জোয়ার দেখা যাচ্ছে এবং নতুন পথ ও দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সক্রিয়ভাবে অনুসন্ধান চলছে। সুতরাং গোড়াতেই এটা বুঝতে হবে যে মার্কিনীরা যেমন বলে থাকে দেউলিয়া, সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আবার গ্রহণ করে কোন লাভ নেই।

ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি (১৮৫৮-১৯০৫) : ব্রিটিশ ও ভারতীয় ধারণা

প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করার আগে ভূমিকা হিসেবে কয়েকটি কথা বলা দরকার।

প্রথমতঃ আলোচ্য সময়ে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্পর্কে ব্রিটিশ ধারণা বা ভারতীয় ধারণা কোনটির বিষয়েই পেশাদার অর্থনীতিবিদরা কিছু বলেন নি। ব্রিটেনে ভারতের ব্যাপারে অর্থনৈতিক মতামত বস্তুতঃ ব্রিটিশ ভারতীয় সরকারি আমলাদের একচেটিয়া ব্যাপার ছিল। ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাধারণ সমস্যাবলী সম্পর্কে সমসাময়িক ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদের প্রায় কেউই বিস্তারিতভাবে লেখেননি।[1] ভারতবর্ষ বিষয়ক ব্রিটিশ সরকারি লেখকদের, কেউই, প্রধানতঃ অর্থনৈতিক প্রসঙ্গে, সময় ও মনোযোগ ব্যয় দেন নি। ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ অর্থনৈতিক আলোচনার স্তর যে বিশ্লেষণের দিক দিয়ে মোটেই উঁচুতে উঠতে পারেনি এটা তার একটা কারণ হতে পারে।[2] সমভাবেই এ বিষয়ে ভারতীয় লেখকদের মধ্যেও একজনও পেশাদার অর্থনীতিবিদ ছিলেন না। অবশ্য তাঁদের অনেকে, যেমন দাদাভাই নওরোজি, এম. জি. রানাডে, জি. ভি. যোশি, জি. এস. আয়ার এবং আর. সি. দত্ত প্রধানতঃ অর্থনীতি বিষয়ক লেখাই লিখে গেছেন।

দ্বিতীয়তঃ, সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বা জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী—ভারত বিষয়ক এই দুটি পরস্পরবিরোধী অর্থনৈতিক চিন্তাধারার বাস্তব কারণেই উদ্ভব হয়েছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধকে যদি ভারতে ব্রিটিশ অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ও শোষণের চরম সময় বলা যায়, ভারতের অর্থনীতিকে যদি ব্রিটিশ অর্থনীতির এক নির্ভরশীল পরিপূরক অর্থাৎ এক ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে পরিণত করার প্রয়াসের চূড়ান্ত কাল বলা যায়, তবে এই সময়েই আবার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রধান প্রধান আভ্যন্তর বিরোধগুলো পরিণত হয়ে উঠেছিল। ভারতের অর্থনীতির কৃষির বুনিয়াদকে এ সময়ে সজোরে ক্ষয় ও ধ্বংসের পথে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল, শিল্পে দেশজ এক পুঁজিবাদী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল এবং জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ভিত্তি দৃঢ়মূল হয়েছিল। অন্যভাবে বলা যায়, ব্রিটিশ ধারণা যদি সত্যের একদিক প্রতিফলিত করে, তবে জাতীয়তাবাদী ধারণা প্রতিফলিত করে অন্যদিক। এই দু'রকমের ধারণার কোনটিই নিছক 'ভাবাদর্শগত' ছিলনা, দুয়েরই মূল একই সত্যে নিহিত ছিল।

তৃতীয়তঃ, কি ব্রিটিশদের রচনায়, কি ভারতীয়দের রচনায় প্রায়শঃই যা থাকতো তা আর্থনীতিক চিন্তাভাবনা নয়, আর্থনীতি। যাই হোক, অর্থনৈতিক অগ্রগতির

জন্য তাঁদের দেওয়া ব্যবস্থাপত্রের মৌল উপাদানগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্পর্কে তাঁদের ধারণার ব্যাপারে আমরা হুবহু না হলেও মোটামুটি একটি চিত্র তৈরি করতে পারি। উভয়পক্ষই কিন্তু একেবারে আলাদা রকমের আর্থিকনীতি উপস্থাপিত করেছিলেন।[3] উপরন্তু, তাঁদের পথ ও ধ্যানধারণার তুলনা ও প্রতিতুলনা করা যেতে পারে, কারণ দুটি পক্ষেরই একটি সাধারণ ধারণা ছিল যে, কোন সমাজ বা জাতির প্রগতির মূল কথা ও প্রধান মাপকাঠি হল অর্থনৈতিক উন্নতি এবং আর সব প্রগতি এরই উপর নির্ভরশীল।[4] ব্রিটিশ লেখক বা জাতীয়তাবাদী কেউই একথা বলেননি যে আত্মিক, সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক প্রগতিও অর্থনৈতিক উন্নতির অভাব মেটাতে পারে অথবা তারই মত গুরুত্বপূর্ণ।

সবশেষে, অর্থনৈতিক অগ্রগতির সমস্যা সম্পর্কিত পুরো আলোচনাই তৎকালীন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং সেই সময়ে পরিমাণগত ও গঠনগত যেসব পরিবর্তন ঘটেছিল তার প্রকৃতি সম্পর্কে নির্দিষ্ট কিছু মতামতের প্রসঙ্গে করা হত। এই দুই প্রশ্নে মতদ্বৈধ ব্রিটিশ ও ভারতীয়দের দুই ভিন্ন পথে চালিত করেছিল। ভারতে অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রতিবন্ধক এবং সেই অগ্রগতির সাধনের পথ-পন্থা সম্পর্কে তাঁরা পরস্পরবিরোধী মত গড়ে তুললেন, অর্থাৎ অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্পর্কে তাঁরা দুটি ভিন্ন তত্ত্ব গড়ে তুললেন।

জাতীয়তাবাদীরা বিশ্বাস করতেন ভারতবর্ষ চূড়ান্ত দারিদ্র্যগ্রস্ত এবং ক্রমশঃ আরো দরিদ্র হচ্ছে ও অর্থনৈতিক উন্নতিতে ইউরোপের পেছনে পড়ে যাচ্ছে, সমকালীন প্রেক্ষাপটে হয়ে পড়ছে আরো পশ্চাৎপদ বা অনুন্নত। এই পশ্চাদ্বর্তিতা ও অনগ্রসরতার কথা মেনে নিলে, প্রচলিত পন্থা নয়, প্রয়োজন সম্পূর্ণ আলাদা রকমের অর্থনৈতিক প্রতিকার। আর ব্রিটিশ মত ছিল, এই অনগ্রসরতা দ্রুত কাটিয়ে ওঠা হচ্ছে এবং বর্তমান নীতিই তার পক্ষে যথেষ্ট।

অনুরূপভাবে, ভারতবর্ষ যে দ্রুত অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে চলেছে ব্রিটিশ ও ভারতীয়রা এটা মেনে নিলেও সেই পরিবর্তনের প্রকৃতি নিয়েও অত্যন্ত মতান্তর ঘটেছিল। ব্রিটিশ লেখকরা তৎকালীন অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে ঐতিহ্যিক অর্থনীতির আধুনিকীরণ অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নতি হিসেবে দেখেছিলেন। পক্ষান্তরে, ভারতীয় লেখকরা এটাকে দেখেছিলেন ঐতিহ্যিক বা 'সামন্ততান্ত্রিক' পশ্চাদ্বর্তিতা থেকে ঔপনিবেশিক পশ্চাদ্বর্তিতায় রূপান্তর হিসেবে। সেক্ষেত্রে, বিশেষতঃ বাণিজ্য ও পরিবহণে, সীমিত আধুনিক উন্নতি ঘটে এবং দেশ রূপান্তরিত হয় এক কাঁচামাল উৎপাদনকারী ও প্রক্রিয়াকারী দেশে; পরিণামে কৃষি হয়ে পড়ে পশ্চাৎপদ, শিল্প ব্যাহত হয় এবং অর্থনৈতিক জীবনের ওপর ঘটে বিদেশী আধিপত্য। এইভাবে তাঁরা গড়ে তুললেন উন্নয়নশীল নয় এমন একটা অর্থনীতিকে 'আধুনিকীকরণের' ধারণা অর্থাৎ তাঁরা গড়ে তুললেন এক ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ধারণা। এই ব্যাপারে তাঁরা অর্থনৈতিক তত্ত্বের একটা মৌলিক উন্নতি সাধনও করলেন। ব্রিটিশ

লেখকরা সমকালীন অর্থনৈতিক কাঠামোর মাত্র দুটি রূপ দেখতে পেতেন। তা হল, ঐতিহ্যগত ও আধুনিক, প্রতিটিই তার নিজস্ব অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এবং আজকের অর্থনৈতিক ও সমাজ-বিজ্ঞানের তত্ত্বের অনেকখানিই এখানেই এখনও থমকে আছে। পক্ষান্তরে, ভারতীয় লেখকরা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করলেন এক তৃতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো, অর্থাৎ ঔপনিবেশিক অর্থনীতি, বিকাশ লাভ করছে। এটি শিল্পে পুঁজিবাদের মতই আধুনিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যের এলাকায় নিজস্ব ঔপনিবেশিক ভাবাদর্শের ওপর দাঁড়িয়ে, এবং, একই সময়ে, ঐতিহ্যক অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর মতই অর্থনৈতিক জীবনের ওপর এর প্রভাব ক্ষতিকর। তাই তাঁরা ঐতিহ্যক ও নতুন ঔপনিবেশিক উভয় প্রকার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজ-নৈতিক কাঠামোর বিরুদ্ধেই, এমনকি অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও, সংগ্রাম করার প্রয়োজন অনুভব করলেন।

আমরাও অবশ্য একথা ভাল করেই জানি যে নীতিবিষয়ক প্রকৃত সিদ্ধান্ত-গুলো প্রধানতঃ অর্থনৈতিক ধারণার ফল নয়। এগুলো নানা ঘাত-প্রতিঘাতের চূড়ান্ত ফল। সরকারি নীতির ক্ষেত্রে নির্ধারক শক্তি ছিল ব্রিটিশের ব্যক্তিগত স্বার্থ, এবং সাম্রাজ্যের সুস্থিতি ও স্থায়িত্ব। ভারতীয়দের ক্ষেত্রে, উদীয়মান শিল্প পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ জোরালো প্রভাব ফেলেছিল। সেই সঙ্গে, শুধু নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রেই নয়, সমস্ত ভাবাদর্শের মতই, নীতি প্রণেতাদের চোখে এবং ব্রিটেন ও ভারতের তৎকালীন সীমাবদ্ধ জনমতের সামনে এসব নীতির ন্যায্যতা আরো বেশি করে প্রতিপাদনের জন্য অর্থনৈতিক ধারণাগুলোর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ফলে কোন আর্থিক নীতি প্রণয়নে নিছক প্রভাব হিসেবে কাজ করার চেয়ে অর্থনৈতিক ধারণার ক্ষেত্রে বৃটিশ আমলাবর্গ ও তাদের ভারতীয় সমালোচকদের মধ্যে বিরোধের অনেক বেশি রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল। এই বিরোধ এক সুরক্ষিত সাম্রাজ্যবাদ এবং এক প্রকাশমান ও পুনরুদীয়মান জাতীয়তাবাদের মধ্যে ভাবাদর্শের লড়াইয়ের প্রধান রূপ হয়ে উঠলো। মোটের ওপর, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসনের তথাকথিত আধুনিকীকরণের ভূমিকাকে সাম্রাজ্যবাদী শাসককুল ও তাদের মুখপাত্ররা 'ব্রিটিশ রাজে'র অস্তিত্বের পক্ষে প্রধান যুক্তি হিসেবে খাড়া করত এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লেখকরা মৌলিক ভঙ্গিতে ঠিক এই দাবিরই বিরোধিতা করেছিলেন। ঐতিহাসিক আকর্ষণ ছাড়াও এই বিতর্ক আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ আজও পৃথিবীর এক বিরাট অংশে যে এক বাস্তব সত্য শুধু এই কারণেই নয়, সাম্রাজ্য-বাদী ইতিহাস প্রণেতাদের গবেষণায় এর আধুনিক যুগের উপযোগী ভূমিকার ধারণা এখনও যে পরিব্যাপ্ত সেজন্যও। উদাহরণস্বরূপ, এই গোষ্ঠীর পুরোধা পুরুষ সি. এইচ. ফিলিপস সম্প্রতি জোরের সঙ্গে বলছেন, "রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে কিনা এবং কখন করা হবে এই মৌলিক প্রশ্ন" ছাড়াও ১৮৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা এইসব প্রশ্ন

নিয়েও ব্যস্ত ছিল; "ব্রিটেনের ভারতবর্ষকে সভ্য করে তোলার ব্রত কিভাবে সম্পন্ন হবে, কিভাবে ভারতীয় মানসে নতুন ধ্যানধারণার উন্মেষ সম্ভব হবে, এবং কিভাবে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র অজ্ঞ মানুষকে হীনাবস্থা থেকে তুলে আনা সম্ভব হবে, সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে মৌলিক প্রশ্ন।"[5]

১

ভারতের অর্থনীতি ও তার ভবিষ্যৎ অগ্রগতি-সম্পর্কে ব্রিটিশ মতের দুটি দিক উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষ যে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নিশ্চল বা পশ্চাদ্‌বর্তী বা দরিদ্র হয়ে পড়ছিল এ কথা ব্রিটিশ লেখকরা অর্ধশতক ধরে অস্বীকার করেছেন এবং এ ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে ঐকমত্য লক্ষণীয়। বরং তাঁরা জোরের সঙ্গে ঘোষণা করতেন যে ভারতবর্ষ ও ভারতীয়রা সেই সময় সমৃদ্ধ ছিল এবং দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি দ্রুত ছিল। তৎকালীন অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে যে-ভাষা ব্যবহার করা হয়েছিল, এ বিষয়ে পার্থক্যটা ছিল তাতেই। কেউ কেউ আশ্রয় নিয়েছিলেন কাব্যিক ভাষার। উদাহরণ স্বরূপ, সংযত ও বিদগ্ধ জর্জ ক্যামবেলও ১৮৮২ সালে ঘোষণা করেন ঃ

> …জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম ও বৈষয়িক উন্নতির দিক দিয়ে ভারতবর্ষকে সভ্য দেশগুলোর স্তরে বেশ ভালভাবেই ধরে রাখা হয়েছে। গত ত্রিশ বছরে রেলপথ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নতির মাধ্যমে যে রূপান্তর সাধিত হয়েছে তা আর কিছু কাল আগে ইউরোপ ও আমেরিকায় যে উন্নতি ঘটেছে প্রায় তারই মত সম্পূর্ণ।[6]

জন ও রিচার্ড স্ট্রাচি ১৮৮২ সালে জোরের সঙ্গে বলেন ঃ

> …গত পঁচিশ বছর ধরে ইংরেজরা ভারতবর্ষে যে কাজের দায়িত্বভার নিয়েছে এবং বহুলাংশে সম্পাদন করেছে, এবং যে-কাজ এখনও চলছে তার চেয়ে বড় অথবা প্রশংসনীয় কাজের কথা আর কখনো কোন দেশে কল্পনাও করা হয়নি। …(এই কাজ) ভারতের মানুষের সম্পদ ও স্বাচ্ছন্দ্য ধারণাতীত ভাবে বৃদ্ধি করেছে।[7]

১৮৫৯ থেকে ১৮৮৭ সালের মধ্যে ভারতের অগ্রগতি সম্পর্কে হেনরি সামনার মেইন লিখেছেন ঃ

> পশ্চিমী দেশগুলির অগ্রগতি নির্ণয় করতে গিয়ে যে মাপকাঠি ব্যবহার করা হয় সেই অনুযায়ী, এবং ব্যতিক্রমের দিকে লক্ষ্য রেখেই বলা যায় যে ইউরোপে এমন কোন দেশ নেই যা একই সময়ের মধ্যে ব্রিটিশ ভারতের তুলনায় আরো তাড়াতাড়ি এবং বেশি উন্নতি লাভ করেছে।…নৈতিক ও

বৈষয়িক উন্নতির এক নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া কিছু কিছু ব্যাপারে এমন এক উচ্চতর স্তরে পৌঁছেছে যা ইংল্যান্ডে এখনও সম্ভব হয়নি।[8]

ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার, সাম্রাজ্যবাদী লেখকদের মধ্যে সম্ভবতঃ সবচেয়ে কড়া সমালোচক। সাধারণ মানুষের জীবনধারণের অবস্থা সম্পর্কে তিনি গভীর আশংকা প্রকাশ করেছিলেন। ১৮৮০ সালে তিনি লেখেন যে বৈদেশিক বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতির পরিসংখ্যান "এত বিরাট, এবং তা থেকে বৈষয়িক উন্নতির যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা এত বিপুল যে কল্পনাও করা যায় না"।[9] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে ভারতের উন্নতির তুলনা করে ১৮৮৭ সালে তিনি লেখেন: "গত পঞ্চাশ বছরে ভারতের অগ্রগতি মোটেই কম বিস্ময়কর নয়, এবং কিছু কিছু ব্যাপারে, যে রকম নিচু স্তর থেকে ভারতবর্ষ শুরু করেছিল সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে, তা আরো দ্রুত।"[10]

এমনকি অ্যালফ্রেড মার্শালও ১৮৯৯ সালে বলেছিলেন যে ভারত যদিও "পশ্চিমের সঙ্গে, অথবা জাপানের সঙ্গেও, তাল মিলিয়ে চলতে" পারেনি, তবুও "...ভারতের শ্লথ অগ্রগতি নিয়ে অভিযোগ করার সময় মনে রাখতে হবে যে একই অক্ষাংশে, এবং একই রকম সমস্যাকীর্ণ, আর কোন প্রাচীন সভ্যতা নেই যে ভারতবর্ষের সঙ্গে তুল্য উন্নতি করেছে।"[11]

দ্বিতীয়তঃ, এখনকার তুলনায় তৎকালীন ব্রিটিশ লেখকদের ভবিষ্যতের ওপর আস্থা বেশি ছিল। তাঁরা প্রায় সবাই দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতির—সে সময় বলা হত ভারতবর্ষের আর্থিক সংস্থানের উন্নতি—এক আসন্ন নবযুগ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই সময়ে যে প্রকাশিত মত তা হল, অর্থনৈতিক উন্নতির দৃঢ় ভিত্তি অব্যবহিত অতীতে[12] ও বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতের দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি এইভাবে সুনিশ্চিত হয়েছে। যাই হোক না কেন, নৈরাশ্যবাদের অনুপস্থিতি বেশ লক্ষণীয়ভাবে চোখে পড়ত। এই আমলের শেষের দিকে অবশ্য আশাবাদ সকলের সমান মাত্রায় ছিল না এবং তাকে নিয়ন্ত্রিত করার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু অধিকাংশ লেখকই বিশ্বাস করতেন যে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নতি সীমাবদ্ধ নয়। ১৮৬৪ সালে আর. ডি. ম্যাংগলস্ লিখেছিলেন: "অবশেষে প্রগতির বিরাট চালক-চক্রটিতে গতি ভালভাবেই সঞ্চারিত হয়েছে এবং সামান্য দৃষ্টিশক্তি থাকলেই দেখা যাবে যে সমাজ প্রায় অ্যাংলো স্যাক্সন দ্রুততায় সামনে এগিয়ে চলেছে।"[13]

অধিকাংশ ব্রিটিশ লেখক 'আর্থিক সংস্থান বাড়ানোর' ধারণাটিকে কিছুটা অস্পষ্টভাবে ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা তাঁরা ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছেন অথবা তাঁদের মতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কি বোঝায় তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। কেউ কেউ শিল্পযোজনার একটা অস্পষ্ট ধারণাকে গণ্য করেছেন, কিন্তু অধিকাংশই এর দ্বারা বুঝতেন কৃষি-উৎপাদন, চাষ-আবাদ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতি। যেসব ব্যাপার দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের পক্ষে সহায়ক বলে তাঁরা মনে করতেন সেগুলো সনাক্ত করা অনেক সোজা।

২

ব্রিটিশ লেখকদের মতে সম্ভবতঃ ভারতের উন্নতির পক্ষে সবচেয়ে জরুরী যে জিনিসটা ব্রিটিশ শাসকরা দিয়েছেন তা হল জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা - দেশের ভেতরে আইন-শৃংখলা, বহিরাক্রমণের হাত থেকে নিরাপত্তা এবং নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থা।[14] তাঁদের অধিকাংশের মতে ভারতের অতীত হল অবিরাম ও নিরবচ্ছিন্ন বহিরাক্রমণ, লুঠতরাজ আর ব্যাপক হত্যালীলা এবং গৃহবিবাদের এক দীর্ঘ ইতিহাস। আর তার সঙ্গে ছিল প্রশাসনিক নৈরাজ্য ও আইন-শৃংখলার অভাব এবং মোটের ওপর এমন এক সামাজিক অবস্থা যেখানে সম্পত্তি ও 'শ্রমের ফসল' নিরাপদ ছিল না, করের বোঝা ছিল সাংঘাতিক, যার পরিণাম হল দারিদ্র্য আর অর্থনৈতিক অচলাবস্থা।[15]

এই লেখকরা অবশ্য আইন-শৃংখলা এবং অর্থনৈতিক উন্নতির মধ্যে কোন সরকারি সম্বন্ধের প্রমাণ বড় একটা দেননি। এটাকে একটা স্বীকৃত অর্থনৈতিক স্বতঃসিদ্ধ বলেই মেনে নেওয়ার প্রবণতা তাঁদের ছিল। বস্তুতঃ, তাঁরা প্রায়ই অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে প্রশাসনিক উন্নতিকে গুলিয়ে ফেলতেন। সম্ভবতঃ বনেদী অর্থনীতিবিদদের এক সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁরা তাঁদের এই বিশ্বাস গড়ে তুলেছিলেন। সে দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কোন ব্যক্তির শ্রমের ফসল যে পরিবেশে সুনিশ্চিত হয় সরকার যদি সেই পরিবেশ একবার নিশ্চিত করতে পারে তাহলে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নতি সুনিশ্চিত হবে।[16] উপরন্তু, সে আমলের সর্বাধিক প্রভাবশালী অর্থনীতিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিলও মনে করতেন যে, "সামরিক ও রাজস্বজনিত লুণ্ঠনের কারণে সম্পত্তির চূড়ান্ত নিরাপত্তাহীনতা" অতীতে এশিয়ার মানুষের পুঁজি সঞ্চয় (অথবা সঞ্চিত পুঁজি রক্ষা করা), কঠোর পরিশ্রম ও উন্নতি করার উৎসাহ এবং শহরের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।[17] প্রাচ্যে 'শিল্প বিস্তারের' প্রথম শর্ত ছিল,

> তুলনামূলক ভাবে একটি ভাল সরকারঃ সম্পত্তির আরো পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা; নিয়ন্ত্রিত কর, এবং করের নামে খামখেয়ালি অর্থসংগ্রহ থেকে মুক্তি; জমি ভোগদখলের অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ও সুবিধাজনক শর্তাবলী এবং তার দ্বারা কৃষক যে শ্রম, দক্ষতা ও অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে তার পূর্ণ সুযোগ লাভের অধিকার যথাসম্ভব সুনিশ্চিত করা।[18]

সমকালীন ব্রিটিশ অর্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে একমাত্র হেনরি ফসেট, ভারতীয় অর্থনীতির সাধারণ সমস্যাবলীর প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তিনি তাঁর 'ম্যানুয়াল অব পলিটিক্যাল ইকনমি'তে ব্রিটিশ দৃষ্টিভঙ্গির অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। মজুতদারি[19] ও সুদের চড়া হারের[20] কারণ হিসেবে তিনি

অরাজকতা ও নিরাপত্তাহীনতাকে দায়ী করেছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন, ব্রিটিশ শাসনের ফলে গোপনে সঞ্চিত পুঁজি মুক্তি পাবে এবং তার কার্যকর ব্যবহার সম্ভব হবে। তিনি লিখেছিলেন, অতীতে ভারতীয়রা

> মজুর নিয়োগ করলে মজুরদের শ্রমের ফল রক্ষা করতে পারবে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারতো না। সুতরাং আমরা যুক্তিসঙ্গতভাবেই ভারতে ইংরেজ শাসনের একটি প্রধান সুফলের কথা অনুমান করতে পারি। কারণ ইংরেজ শক্তির উপস্থিতির ফলে কালক্রমে ভারতে সমস্ত শ্রেণীর মানুষ হয়ত উপলব্ধি করবে যে সম্পত্তির অধিকার উপযুক্ত মর্যাদা পেয়েছে। **পুঁজি বৃদ্ধি এবং তার ফলে দেশের সম্পদ বৃদ্ধির পক্ষে আর কিছুই এত সহায়ক হবে না**; কারণ সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান করা হলে সঞ্চয়ে জাগে বিপুল উৎসাহ, এবং সঞ্চিত সম্পদ গোপনে মজুত হওয়ার বদলে পুঁজি হিসেবে আরো সম্পদ সৃষ্টির জন্য সদ্ব্যবহৃত হবে।[২১]

ব্যক্তি ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিদেশী পুঁজি আকর্ষণ করে এবং সে দিক থেকে উন্নতিতে সাহায্য করে বলে একটা বিশ্বাস ছিল।[২২] আইন-শৃঙ্খলা বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতির পক্ষে, এমনকি তার অস্তিত্বের পক্ষেও অপরিহার্য, একথা স্পষ্টভাবে বলা না হলেও অবশ্যই ধরে নেওয়া হোত।

এখানে আলাদা করে বলে নেওয়া যেতে পারে যে ব্রিটিশ বাণিজ্যের স্বার্থে তাদের ভারতে থাকার ন্যায্যতা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে বহু লেখক আইন-শৃঙ্খলা ও বৈদেশিক বাণিজ্যের মধ্যে এই সম্পর্ক আরো স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। এক্ষেত্রে যুক্তি ছিল, ব্রিটিশ সরে আসার পরেও যখন আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য অব্যাহত রয়েছে এবং অস্ট্রেলিয়া ও কানাডার সঙ্গে অব্যাহত থাকবে, তখন ভারতের ক্ষেত্রে ব্রিটেন সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ বাণিজ্য অদৃশ্য হবে, কারণ তার পরিণাম হবে প্রশাসনিক অরাজকতা, গৃহযুদ্ধ ইত্যাদি। সুতরাং ব্রিটিশ বাণিজ্যের স্বার্থেই ব্রিটেনের ভারত-শাসন প্রয়োজন।[২৩]

৩

ব্রিটিশ লেখকদের মতে ভারতে অগ্রগতির দ্বিতীয় বড় কারণ হল বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতি। বস্তুতঃ, বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক কারণগুলোর মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতিবিধানকে ভারতের অগ্রগতির প্রধান উপায় হিসেবে দেখা হত। এখানেও জন স্টুয়ার্ট মিল তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর 'প্রিন্সিপলস অব পলিটিক্যাল ইকনমি'তে তিনি বলেছেন, ভারতীয় কৃষকরা যা উৎপাদন করতো তার চেয়ে অনেক বেশি উৎপাদন তারা করতে পারত, কিন্তু তা করার মত প্রেরণা অতীতে তাদের ছিল না। উদ্বৃত্ত শস্য বিক্রির কোন ব্যবস্থা তারা

করতে পারতো না, কারণ বিভিন্ন কারণে শহরের জনসংখ্যা তখন বেশি ছিল না। বরং "কৃষকদের চাহিদা অল্প আর মন উচ্চাভিলাষহীন" হওয়ায় শহরে উৎপন্ন পণ্য তারা ভোগ করতে পারতো না। অশুভ চক্র এইভাবে গড়ে উঠেছিল। এই চক্র ভাঙার এবং অর্থনৈতিক উন্নতি সূচনা করার সর্বোত্তম উপায় ছিল ভারতের কৃষিজাত পণ্য যথা, তুলা, নীল, চিনি ও কফি রপ্তানির উন্নতিসাধন। এর ফলে গ্রামের ভেতরেই খাদ্যশস্যের বাজার সৃষ্টি হতে পারত এবং তার ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদনও বাড়তে পারত। ফলে উৎপাদকরা গ্রামে বাজার পেত। তা ইউরোপীয় পণ্যের আমদানিই শুধু বাড়াতো না, ভারতেও উৎপাদনের উৎসাহ যোগাতো। উন্নয়নের-এই প্রক্রিয়া শুরু হওয়া উচিত ছিল।[২৪]

এক্ষেত্রেও ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ লেখকরা বৈদেশিক বাণিজ্য অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত করে বলে যে বক্তব্য পেশ করেছেন তার সমর্থনে অর্থবিজ্ঞানসম্মত যুক্তি পেশ না করে সেটাকে একটা প্রমাণিত সত্য বলেই ধরে নিয়েছিলেন। যুক্তি দেওয়ার বদলে তাঁরা বেশির ভাগ সময় বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধিকে অর্থ-নৈতিক উন্নতির প্রমাণ হিসেবে দেখাতেন, রপ্তানি বৃদ্ধিকে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রমাণ হিসেবে দেখাতেন এবং আমদানি বৃদ্ধির অর্থ হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন যে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ছে।[২৫] কিন্তু তাঁদের কেউ কেউ এই মতের প্রতিধ্বনি করতেন যে, ভারতীয় কৃষক উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রি করতে পারত না বলে সামর্থ্য অনুযায়ী উৎপাদন করত না, এবং তাই কৃষিজাত পণ্য রপ্তানির ফলে পুরানো ও নূতন দুরকমের কৃষিপণ্য উৎপাদনেরই উন্নতি ঘটল।[২৬] কয়েকজন লেখক আবার এক অদ্ভুত রকম তুলনামূলক ব্যয়ের তত্ত্বও হাজির করেছেন: তাঁরা বলেছেন যে ভারতবর্ষ তার সেরা উৎপাদন রপ্তানি করে এবং তার বদলে অপেক্ষাকৃত সস্তা শিল্পজাত পণ্য আমদানি করে নিজের আর্থিক সংস্থানকে আরো ভালভাবে কাজে লাগাতে পারে এবং এভাবেই বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতি হয়।[27]

লক্ষ্য করা যেতে পারে যে ভারতের মত যে দেশে শিল্পযোজনা ঘটেনি, যে দেশ আধুনিক শিল্প গড়ে তুলতে চায়, সে দেশে অবাধ বাণিজ্যের মূল্য নিয়ে তৎকালীন প্রশ্নটি, ব্রিটেনেও কোন ব্রিটিশ লেখকই ভেবে দেখেননি। কোন নূতন শিল্প যদি কোন দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত হয় কিন্তু সেখানকার বেসরকারি শিল্পোদ্যোগীরা যদি আমদানি করা পণ্যের সঙ্গে অবাধ প্রতি-যোগিতার প্রারম্ভিক ব্যয় বহন করতে ইচ্ছুক না হয়, সেই শিল্পকে গড়ে উঠতে সাহায্য করাই যদি লক্ষ্য হয় তবে সেক্ষেত্রে জে. এস. মিল তাঁর 'প্রিন্সিপলস অব পলিটিক্যাল ইকনমি'তে ইতিমধ্যেই যেমন বলেছেন, সে রকম ভাবে সংরক্ষণকর শুল্ক আরোপের প্রয়োজন সমর্থন করতে হয়।[২৮] অধ্যাপক হেনরি সিজউইক এই অপরিণত শিল্প-রক্ষা নীতি সমর্থন করেছেন। তিনি এটিকে আরো সম্প্রসারিত করে উৎপাদনের বর্তমান ধাঁচের কোন অবাঞ্ছিত পরিবর্তন রোধ করা যেখানে লক্ষ্য, সেখানেও এই সংরক্ষণ সমর্থন করেছেন। অধ্যাপক অ্যালফ্রেড মার্শাল

এবং এফ. ওয়াই. এজওয়ার্থও এই নীতি সমর্থন করেছেন।[২৯] উপরন্তু, অনেক ব্রিটিশ রাষ্ট্রনায়ক, যেমন র‍্যানডলফ চার্চিল,[৩০] এই সময় ব্রিটেনেও অবাধ বাণিজ্য নীতিকে আক্রমণ করছিলেন এবং 'পরিচ্ছন্ন বাণিজ্য' অথবা কিছু কিছু পালটা সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি দিচ্ছিলেন।[৩১]

বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতির যেসব ছকের দ্বারা বিভিন্ন ধাঁচের অর্থনৈতিক উন্নতি অনুপ্রাণিত হতে পারতো বা হচ্ছিল ভারতবিষয়ক ব্রিটিশ লেখকরা কোন পর্যায়েই সেগুলোর মধ্যে কোন প্রভেদ নির্ণয় করেন নি।

৪

অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনে বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর আরোপ করা হয়েছিল চালকের ভূমিকা। ফলে অনিবার্যভাবেই এই প্রক্রিয়ায় রেলব্যবস্থাকে দ্বিতীয় প্রধান অর্থনৈতিক কারণ হিসেবে গণ্য করা হত। ব্রিটিশ লেখকরা বারবারই বলেছিলেন যে রপ্তানি ও আমদানি উভয়েরই উন্নতি এবং তার ফলে কৃষি ও শিল্প দুয়েরই অগ্রগতি রেলব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে। এই বিষয় নিয়ে আলোচনা অবশ্য ১৮৫৮ সালের আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং অর্থনৈতিক উন্নতির এক সক্রিয় কারণ হিসেবে রেলের ভূমিকা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। জন ও রিচার্ড স্ট্র্যাচি এই স্বীকৃত অবস্থাটি সংক্ষেপে সুন্দরভাবে বিবৃত করেছেন ঃ

> ভারতের মানুষের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে হবে শুধু সম্পদ বৃদ্ধির মাধ্যমে এবং সম্পদ বৃদ্ধি ঘটে বৈদেশিক বাণিজ্যের নিয়মিত উন্নতির সঙ্গে। এ কাজ সম্পন্ন করার উপায় সুস্পষ্ট এবং তা আমাদের নাগালের মধ্যে।...এই উপায় যে রয়েছে, এই গ্রন্থে তা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই উপায় হল দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় বড় বড় জনকল্যাণমূলক কাজ সুচিন্তিতভাবে সম্প্রসারণ করা, ফলে দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণ ও তার আর্থিক অবস্থার নিরবচ্ছিন্ন উন্নতি সুনিশ্চিত হবে।[৩২]

রেলব্যবস্থা অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে ব্যর্থ হতে পারে এমন সন্দেহ সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর কোন লেখকই পোষণ করেন নি। সঙ্গে সঙ্গে ভারতে রেলব্যবস্থা অথবা তা নির্মাণের পরিকল্পনার সঙ্গে শিল্পোন্নয়নের সম্পর্ক কেউই খুঁটিয়ে দেখেন নি। বস্তুতঃ, বৈদেশিক বাণিজ্য ও কৃষির ওপরে ছাড়া ভারতের অর্থনীতিতে রেলব্যবস্থার প্রভাবের আর কোন দিকই পরীক্ষা করে দেখা হয়নি।

রেলব্যবস্থার পাশাপাশি অধিকাংশ ব্রিটিশ লেখক কৃষির উন্নতি সাধনের উপায় হিসেবে সেচের ওপরও জোর দিয়েছেন।[৩৩] অর্থনৈতিক প্রয়োজন

বা সম্ভাবনা, অথবা সরকারের মোট আর্থিক ব্যয় কোন দিক দিয়েই সেচব্যবস্থার পর্যাপ্ত উন্নতি সাধন হয়নি, অবশ্য এ ব্যাপারে আমরা মোটেই সচেতন নই। সেচের বিভিন্ন ধরন, কৃষির-উন্নতির বিভিন্ন ধরনের সঙ্গে তার যোগ এবং কিছু কিছু ধরনের সেচ-উন্নয়নের ক্ষতিকর পরিণামের কিছুই পরীক্ষা করে দেখা হয়নি।

১৮৫৮ সালের পর ব্রিটিশ লেখকরা ভারতের উন্নতির জন্য বিদেশী পুঁজি নিয়োগের ওপর উত্তরোত্তর ভরসা করতে লাগলেন। তাঁরা বলতেন, ভারতে প্রচুর জমি (ও সম্পদ) এবং শ্রম শক্তি রয়েছে কিন্তু অভাব হল পুঁজির, ব্রিটেনে বিশেষ করে তা আবার প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাবে। ভারতে প্রচুর পরিমাণে ব্রিটিশ পুঁজি নিয়োজিত হবে মূলতঃ এই আশায় ১৮৫৮ সালের পর ভারতের দ্রুত উন্নতির আসন্ন যুগের কথা ব্যাপকভাবে প্রচার করা হল।

এবারও এগিয়ে এলেন জন স্টুয়ার্ট মিল। তিনি লিখেছিলেন, এশিয়ার কোন দেশে যেসব মূল ঘাটতি রয়েছে তার মধ্যে একটা হল আভ্যন্তর পুঁজির অভাব এবং সেই কারণে সেখানে উন্নতির জন্য মৌলিক প্রয়োজন হল "বিদেশী পুঁজি আমদানি যার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি দেশের মানুষের মিতব্যয়িতা বা বিচক্ষণতার ওপর পুরোপুরি আর নির্ভরশীল থাকে না।"[১৪] অধ্যাপক ফসেট ও অধ্যাপক মার্শাল বারবারই বলেছেন যে ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে একটি বড় বাধা হল আভ্যন্তর পুঁজির ঘাটতি, শুধু বিদেশী পুঁজি দিয়েই তা মেটানো যায়। বস্তুতঃ, এটাই হয়ে উঠেছিল অন্যতম অর্থনৈতিক বাণী, এবং আজও তাই আছে। এই বাণী খুঁটিয়ে দেখলে অর্থনীতি সম্পর্কে অজ্ঞতা না হলেও অর্থনৈতিক ভাবনার দেউলেপনা প্রকট হয়ে পড়ে। আরো অনেক ভারতবিষয়ক ব্রিটিশ লেখক এই মতই আরো উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রকাশ করেছেন। ১৮৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে 'ওয়েস্টমিনস্টার রিভিউ'তে জনৈক লেখক ঘোষণা করেন ঃ

> এই যে প্রাচুর্য ভরা দেশকে আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, তার বিশাল ও অফুরান সম্পদকে বিকশিত করার জন্য ইংল্যান্ডের পুঁজি, ইংল্যান্ডের বুদ্ধি এবং ইংল্যান্ডের উদ্যম যদি পুরোপুরি প্রয়োগ করা হয়, তাহলে কি বিস্ময়কর ফল পাওয়া যাবে তা কল্পনাও করা যায় না।[১৫]

এর আগে ১৮৬৪ সালে আর. ডি. ম্যাংগলস বলেছিলেন ঃ

> সুখের কথা, বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদের দ্রুত ও পূর্ণ ব্যবহার করার জন্য সুবিবেচিত আইন প্রণয়ন ও সাধারণ ভাল সরকার এই দুটি অত্যাবশ্যক

বিষয় ছাড়াও ভারতের যা প্রয়োজন তার যোগান দেওয়া যেতে পারে এবং তাতে দুই দেশেরই লাভ হবে—সে প্রয়োজন হল ইংল্যান্ডের পুঁজি, উদ্যম ও শক্তি।[৩৬]

১৮৮১ সালে উইলিয়াম লী-ওয়ার্নার লেখেন।

দেশে কাঁচামাল ও শ্রমের বিপুল সম্পদ রয়েছে এবং নূতন শিল্প গড়ার জন্য পুঁজি ছাড়া আর কিছুরই দরকার নেই। ইংরেজ পুঁজিপতিরা ভারতে লাভজনক বিনিয়োগের ক্ষেত্রটি উপলব্ধি করলেই ভারতের ইতিহাসে এক সন্ধিক্ষণ এসে যাবে।[৩৭]

এম. ই. গ্র্যান্ট ডাফ ১৮৮৭ সালে ব্রিটিশ পুঁজি বিনিয়োগকে "একটা মোটের ওপর অর্ধ-সভ্য দেশকে উন্নত করার প্রথম প্রয়োজনীয় শর্ত" হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন।[৩৮] ১৮৯৯ সালে লর্ড কার্জন একে ভারতের "জাতীয় উন্নতির এক **অপরিহার্য শর্ত**" বলে আখ্যা দিয়েছিলেন।[৩৯]

এই লেখককুল বিদেশী পুঁজি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখতে পাননি। এবং বিদেশী উদ্যোগের মুনাফা বাইরে চলে যাওয়ার মানে যে সম্পদ বাইরে চলে যাওয়া, এদের মধ্যে কেউ কেউ সে তথ্য স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছেন। কারণ, তাঁদের যুক্তি হল, ওই মুনাফা এসেছে বিদেশী পুঁজির আয় থেকে।[৪০]

ভারতের জন্য বিদেশী পুঁজির উন্নয়নমূলক ভূমিকার ওপর জোর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক লেখক ব্রিটেনের পক্ষে উদ্বৃত্ত পুঁজি বিনিয়োগের এক অতি লাভজনক সুবিধার কথাও বলেছেন। 'প্রিন্সিপলস অব পলিটিক্যাল ইকনমি'তে জে. এস. মিল যুক্তি দিয়েছেন যে দেশের পুঁজির অপ্রাচুর্য ঘটিয়ে উপনিবেশগুলোতে বা বিদেশে পুঁজি রপ্তানি হয়। এই ভাবে অপেক্ষাকৃত যে সব সস্তা পণ্য, খাদ্য ও কাঁচামাল সে বিদেশে উৎপাদন করতে সাহায্য করে ও সেগুলি দেশে আমদানি করতে সাহায্য করার ফলে, ব্রিটেনের অভ্যন্তরে মুনাফার হার বেড়ে যায়।[৪১]

আমাদের আলোচ্য সময়ের একেবারে গোড়ায় জনৈক অজ্ঞাতনামা লেখক ১৮৬২ সালের জুলাই য় 'ওয়েস্টমিনস্টার রিভিউ'তে বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন। 'ভারতে ইংরেজ শাসন' নামক রচনায় তিনি বাণিজ্য ছাড়া "সবচেয়ে ব্যাপক কোন সেই সুবিধা **ইংল্যান্ড** যা ভারতের সঙ্গে তার সরকারি সংযোগ থেকে অর্জন করতে পারে ?" এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে ইংল্যান্ড ছিল "বিশেষ করে বছরের পর বছর নূতন **পুঁজির স্রষ্টা**; লাভজনক বিনিয়োগের ব্যাপারটাই ইংল্যান্ডের পক্ষে বেশি প্রয়োজন।" সুদ ও লাভের হার কম হওয়ায় লোকে সঞ্চয় করছিল না। শুধু, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে, সে রকম ভাবে নয়, বিদেশী বিনিয়োগ "কিন্তু অন্য' দেশের অধীন যে-কোন দেশেই" কঠিন, কারণ সেখানে অসংখ্য

বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। বিশেষ করে "বিদেশী এজেন্ট এবং আদালত ও বৈরীভাবাপন্ন সরকারের ভয়" সেখানে রয়েছে। কোন্ ধরণের বিনিয়োগ নিরাপদ সেটা খুঁজে বার করার অসুবিধেও ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগের কারণে উদ্বৃত্ত পুঁজির উপযুক্ত ব্যবস্থা করার সমস্যা এ পর্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠেনি। কিন্তু গৃহযুদ্ধের ফলে সে দেশে ব্রিটিশ পুঁজি প্রবাহের বেগ হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এক্ষেত্রে আসন্ন বিপদ ঠেকাতে একমাত্র ভারতই পারত। ইতিমধ্যেই ভারত সরকার জামানত-ব্যবস্থার দ্বারা ভারতীয় রেলে বিনিয়োগ করতে আকৃষ্ট করে ইংল্যান্ডকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে। কিন্তু ভারতে ব্রিটিশ পুঁজির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অসীম ঃ

> ভারত প্রায় সীমাহীন এক ক্ষেত্র, বিচক্ষণ উদ্যোগের বিনিময়ে সেখানে মেলে বিস্ময়কর পুরস্কার। ইংরেজরা তাকে যা দিতে পারে দীর্ঘকাল ধরে সে তার সবই ব্যবহারের জন্য গ্রহণ করতে পারে, সেই সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে সে নিজে যা উৎপাদন করতে পারে তাও। তার জনসংখ্যা নিবিড়, ফলে বড় বড় কাজ থেকে যে লাভ পাওয়া যায় তা নূতন উপনিবেশগুলোতে যা লাভ হতে পারে তার তুলনায় বেশি ; ভারতবর্ষের জলবায়ুর প্রকৃতিও এমন যে যদি শুধু সেচের ব্যবস্থাই করা হয়, তাহলেই তা উর্বরা ভূমির অধিকারীদের সমমর্যাদায় উন্নীত করবে।

বস্তুত, লেখক বিশ্বাস করতেন, ভারতবর্ষ ইংল্যান্ডের পশ্চাদভূমি হওয়ার পক্ষে চমৎকারভাবে উপযুক্ত। মার্কিন পশ্চাদভূমি সে দেশকে দুটি অর্থনৈতিক সুবিধা দিয়েছিল ঃ তাদের জনসাধারণের জন্য "নূতন 'বাসস্থান'—এবং সম্ভাব্য যে-কোন পরিমাণের নূতন পুঁজি থেকে লাভজনক আয়ের স্থায়ী উৎস। এই দুটি সুবিধার মধ্যে ভারতবর্ষ আমাদের দিতে পারে দ্বিতীয়টি।" এই তুলনাকে আরো প্রসারিত করে তিনি দাবি করেছিলেন যে ইংল্যান্ডের পুঁজি একবার ভারতমুখী প্রবাহিত হতে শুরু করলেই সে দেশ শুধু যে "অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি লাভ করবে তাই নয়, ইংল্যান্ডের 'প্রলেতারীয়রা'ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে সমৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে সক্ষম হবে।"[৪২]

তাঁর পরে অন্যান্যরা প্রায় একই কথা বলেছেন।[৪৩] এবং আলোচ্য সময়ের শেষ দিকে লর্ড কার্জন বলেছিলেন ঃ

> ভারতের বাইরে বিনিয়োগের অন্যান্য প্রণালী শুধু ব্রিটিশ পুঁজিতেই নয়, বিশ্বের সমস্ত সম্পদ-সৃষ্টিকারী দেশের পুঁজিতেও ক্রমশঃ ভরে যাচ্ছে। তাই যদি হয়, তাহলে অচিরেই এমন একটা সময় আসবে যখন ব্রিটিশ পুঁজির স্রোত যে দুই তীরের মাঝখান দিয়ে দীর্ঘকাল নিশ্চিন্তে এঁকেবেঁকে বয়ে এসেছে সেখান থেকে সরে এসে হয়ে নূতন প্রণালীতে প্রবাহিত হতে চাইবে, এবং অর্থ-নৈতিক মহাকর্ষ নিয়মে প্রবাহিত হবে ভারতের দিকে। ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান ও ব্রিটিশ আইনের নিরাপত্তার অতিরিক্ত আকর্ষণেই ব্রিটিশ পুঁজি সেদিকে যাবে।[৪৪]

আলোচিত মতের একটি প্রত্যয়সিদ্ধ অনুসিদ্ধান্ত ছিল যে ব্রিটিশ পুঁজিকে আকর্ষণ ও নিরাপদ করার জন্য এদেশে ব্রিটিশ শাসনকে অবশ্যই স্থায়ী হতে হবে এবং তাকে স্থায়ী বলে বিশ্বাস করতে হবে। সেইভাবে সেই ১৮৬৮ সালেই জন ক্লার্ক মার্শম্যান লিখেছিলেন যে, "স্টক ও ডিবেঞ্চারের ঊনষাট হাজার মালিক আমাদের ভারতীয় প্রশাসনের উন্নতিতে এবং আমাদের শাসনের স্থায়িত্বে প্রত্যক্ষ আগ্রহ দেখিয়েছেন।"[45] অনুরূপভাবে, ১৮৮০ সালে রিচার্ড টেম্পল লেখেন, "ভারতকে তাহলে যে যে কারণে ইংল্যান্ডের অধিকারে রাখতে হবে" সেগুলির মধ্যে একটি হল, "বিপুল পরিমাণ পুঁজি এই দেশে বিনিয়োগ করা হয়েছে এই আশ্বাসে যে ব্রিটিশ শাসন মানবিকভাবে স্থায়ী হবে।"[46] এই মত অত্যন্ত ব্যাপকভাবে অভিব্যক্ত হয়েছিল।[47] বস্তুতঃ, একথা বলা যেতে পারে যে, ১৮৭০-এর দশকের পরে ভারতে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়া বৃদ্ধি ও মধ্য ভিক্টোরীয় যুগের উদারনৈতিক আবেগের নিঃশেষিত অবস্থার জন্য এই মত দায়ী ছিল।

অর্থনৈতিক উন্নতির উপায় হিসেবে বিদেশী পুঁজির ওপর জোর দিলেও তৎকালীন কোন ব্রিটিশ লেখকই লক্ষ্য করেননি যে ভারতে প্রকৃত ব্রিটিশ পুঁজির নিয়োগ বরং কমই ছিল এবং রেলওয়ে ও সরকারি ঋণের ক্ষেত্রে নিরাপদে বিনিয়োগের কথা বাদ দিলে তা ছিল কার্যতঃ নগণ্য ; এমনকি এই পুঁজিরও খুব সামান্যই আধুনিক শিল্পে নিয়োজিত ছিল।[48] ফলে ব্রিটিশ উদ্যোগ ও পুঁজি কেন আরো বেশি পরিমাণে ভারতে আসেনি তার অর্থনৈতিক কারণ সম্পর্কে কোন আলোচনা নেই। তেমন আলোচনা হলে আভ্যন্তর পুঁজির ঘাটতি ও দেশীয় উদ্যোগের অভাব—এইসব সমসাময়িক জিগিরের বদলে ভারতের অনগ্রসরতার আসল কিছু কারণ আবিষ্কৃত হতে পারতো। যাই হোক না কেন, ভারত ছিল ব্রিটেনের শাসনাধীন এবং ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের কাছে সে দেশ উন্মুক্ত ছিল। তাদের না ছিল পুঁজির অভাব, না ছিল উদ্যোগের অভাব।

একইভাবে ভারতে বিদেশী মালিকানার পুঁজিও যে ব্রিটেন থেকে আসত না, বরং তা সৃষ্টি হত ভারতের মধ্যেই এবং এই পুরো সময়টাতেই ভারত ছিল পুঁজি রপ্তানিকারী, এই তথ্যও স্বীকৃতি পায়নি।[49]

বিদেশী পুঁজির ভূমিকার ওপর জোর দেওয়ার সময় ব্রিটিশ লেখকরা আভ্যন্তর পুঁজি সদ্ব্যবহারের সমস্যাগুলো উপেক্ষা করেছেন। আভ্যন্তর পুঁজির কি হল অথবা তা কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা খুঁটিয়ে দেখা অথবা কেন তা উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে না তার কারণ নিয়ে আলোচনার বদলে এই ধারণাই সাধারণ্যে প্রচার করা হত যে ভারতে আভ্যন্তর পুঁজির অভাব এবং এই ধারণা আজও চালু রয়েছে।[50] আগেই বলা হয়েছে, জে. এস. মিল ও অ্যালফ্রেড মার্শাল সহ প্রায় সব লেখকই এই মত পোষণ করতেন।

৬

আলোচ্য সময়ের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কৃষির উন্নতি ও কৃষি-সম্পর্ক বিষয়ে তৎকালীন ব্রিটিশ তত্ত্বের অসারতা এবং কোন বিকল্প তত্ত্ব বা ধারণা গড়ে তোলার ব্যর্থতা। বস্তুতঃ, সেদিকে কোন চেষ্টাই হয়নি, কি চিন্তায় কি কর্মে। কোনও ক্রমে কাজ চালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা উত্তরোত্তর বাড়ছিল। তাত্ত্বিক পর্যায়ে প্রায়ই পুরোন ধারণারই পুনরাবৃত্তি ঘটতো, সেগুলো যে অকার্যকর বা অপ্রযোজ্য তা স্বীকার করা হত এবং বাতলান হত কাজ চালানো সমাধান।

১৭৯০ সালের পর ব্রিটিশ প্রশাসকরা ভারতীয় কৃষিসম্পর্ক পুনর্গঠন করলেন এই তত্ত্বের ভিত্তিতে যে ভূমি-স্বত্ব অথবা ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার, তা জমিদারের হাতেই হোক বা রায়তের হাতেই হোক, তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা ও স্বত্বের অবাধ হস্তান্তর যুক্ত হয়ে, জমিতে পুঁজি অর্থাৎ পুঁজি ও প্রযুক্তির জোগান সম্ভব করবে। এবং ভূমি, শ্রম ও প্রযুক্তির এই সমন্বয়, স্বত্বাধিকারের ফলে উদ্ভূত উন্নতিসাধনের প্রেরণার সঙ্গে একত্রিত হয়ে কৃষির উন্নতি সম্ভব করবে। সেই সঙ্গে সঞ্চয়ী, শ্রমশীল ও দক্ষ মানুষরা অদূরদর্শী, অজ্ঞ ও অলস মালিকদের জমি কিনে নেবে। এইভাবে ভারতবর্ষ ক্রমশ হয়ে উঠবে 'উন্নতিশীল ভূস্বামী' ও 'দক্ষ কৃষকের' দেশ। ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানা ও তার বিক্রয়-সাধ্যতার ফলে সুনিশ্চিত হবে ভূমি রাজস্ব এবং কৃষির উন্নতির ফলে সম্ভব হবে রাজস্ব বৃদ্ধি। সরকারের আয় আসবে এই উৎস থেকে।

প্রকৃতঅবস্থা এসব প্রত্যাশার আদৌ অনুকূল ছিল না। সেই সময়কার প্রচলিত শিল্প ভেঙে পড়ছিল, আধুনিক শিল্পোন্নতির ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ঘটছিল এবং তার ফলে জমির ওপর চাপ বাড়ছিল, জমিদারগিরি ও কুসীদবৃত্তি ছাড়া পুঁজি নিয়োগের আর কোন পথ ছিল না, এবং প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় কাঠামো, বেশ কিছু এলাকায় চিরাচরিত কৃষি কাঠামোর প্রভাব, ভূমি-রাজস্বের গুরুভার ও তার অনমনীয়তা, কৃষির উন্নতি বিধানের জন্য অল্প সুদে ঋণদানের মত ইতিবাচক ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারি ব্যর্থতা—এইসব কারণের সম্মিলিত ফল হিসেবে পুরোন পরিকল্পনার স্থূল পুনরাবৃত্তি ঘটছিল, কৃষি-এলাকা সম্প্রসারিত হতে থাকা সত্ত্বেও পশ্চানপদ কৃষিব্যবস্থা, পিঠভাঙা করের বোঝায় বিপন্ন প্রজাস্বত্ব ও মধ্যস্বত্ব সহ পশ্চাদগামী কৃষিসম্পর্ক উত্তরোত্তর জমিদারি ও রায়তওয়ারি এলাকা উভয়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করছিল। উৎপীড়ক জমিদার ও অত্যাচারী কুসীদজীবীর হাত থেকে রায়তদের রক্ষা করার জন্য সরকার বেশ কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। তা করতে গিয়ে কৃষিউন্নয়নের ভাবনাচিন্তার কথাও উচ্চারিত হয়েছে। অবশ্য, সেসব ভাবনাচিন্তা সেই পুরোন দৃষ্টিভঙ্গিতেই আচ্ছন্ন ছিল।

ভূমি-রাজস্বর বোঝা যে বেশি ছিল এটা সাধারণতঃ স্বীকার করা হত না। বেশ কিছু লেখক এ কথাও জোর দিয়ে বলেছেন যে ভূমি-রাজস্ব মোটেই বোঝা হতে পারে না, কারণ তা আসে জমি থেকে। ভূমি-রাজস্বের অনমনীয়তা যে ক্ষতিকর তা অবশ্য সাধারণতঃ মেনে নেওয়া হত।

সাধারণতঃ তখন এই বিশ্বাসই চলিত ছিল যে ভারতের কৃষিব্যবস্থায় মৌলিক ত্রুটি কিছু নেই। কৃষি-এলাকা সন্তোষজনকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে বলে ধারণা ছিল এবং বিশ্বাস করা হত যে ১৮২০ সালের পর থেকে তা ৫০ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে।[৫০a] প্রযুক্তিগত উন্নতির কোন দাবি ছিল না এবং ভূমির উর্বরতা নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কিছু আশংকা প্রকাশ করা হলেও সেচ-সুবিধার উন্নতিকে সেক্ষেত্রে একটা ইতিবাচক ঘটনা বলে বিশ্বাস করা হত।[৫০b] তবে আশাবাদের প্রধান ছিল এই বিশ্বাস যে, রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে এবং সেই কারণে কৃষি বাণিজ্যিক হয়ে ওঠায় ভারতের কৃষি মিল-এর মতানুসারে 'অচল অবস্থা' ও চিরাচরিত ভারতীয় অর্থনীতি ত্যাগ করে পরিবর্তন, আধুনিকীকরণ ও ক্রমোন্নতির আধুনিক পর্যায়ে প্রবেশ করেছে।[৫১] বস্তুতঃ, তখন বিশ্বাস ছিল যে এই আধুনিকীকরণের ফলে ভূস্বামী-প্রজা সম্পর্ক ও মহাজনদের কাছে জমি হস্তান্তর-সংক্রান্ত কিছু অসুবিধে সৃষ্টি হয়েছে এবং এটাকে নিম্নতর পর্যায় থেকে উচ্চতর পর্যায়ে উত্তরণকালের এক অবশ্যম্ভাবী সাময়িক বিচ্যুতি হিসেবে দেখা উচিত।[৫২]

ভূস্বামী ও প্রজার মধ্যে অবিশ্বাসের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল এবং গ্রামের বিপুল সংখ্যক লোক ঋণগ্রস্ত হওয়ার ফলে জমি চলে যাচ্ছিল অকৃষিজীবী সম্প্রদায়ের হাতে, এবং এই ঘটনাগুলোর ফলে আলোচ্য কালপর্বে সরকারি মনোযোগ কৃষিসমস্যার উপর পড়েছিল। কিন্তু ভূমিসংক্রান্ত অশান্তির সঙ্গে জড়িত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিপদ এবং কিছু পরিমাণে গুরুভার-খাজনা-চাপানো ভূস্বামী ও সুদখোর 'রক্তচোষা' মহাজনের শিকার কৃষককুলের প্রতি মৌখিক সহানুভূতি দেখানোতেই এই আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল। যে কৃষিসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সাধারণভাবে অর্থনৈতিক উন্নতি এবং বিশেষভাবে কৃষির উন্নতির ক্ষেত্রে তার প্রভাব নিয়ে কোন আলোচনা হয়নি। বস্তুতঃ, আগেও বলা হয়েছে যে, প্রতিকারের ব্যবস্থা নিয়ে যা কিছু আলোচনা তার সবটাই পুরোন ভাবনাচিন্তার গণ্ডির মধ্যেই ছিল। ভূমিস্বত্ব বা কৃষিসম্পর্কের ব্যাপারে কোন নূতন তত্ত্ব গড়ে ওঠেনি। জমিদারি ও ভূমিস্বত্ব ভোগের ব্যবস্থা এবং ভূমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে অপরিহার্য ও অবশ্যম্ভাবী বলে মনে করা হত। শুধু উত্তরণের সময়ে কষ্ট যাতে কম হয় সে চেষ্টা করা যেতে পারে বলে মনে করা হত। অবশ্য, ভারতের কৃষি ও অর্থনীতি দ্রুত আধুনিক হয়ে উঠছে এবং বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নতির মূল ধারাতে তা এসে মিশে যাচ্ছে এই ধারণার সঙ্গে উক্ত মত সঙ্গতিপূর্ণ।

প্রজাস্বত্ব সংস্কার সম্পর্কে ব্রিটিশ চিন্তার আদর্শ নমুনা হল এ. সি. লায়ালের

চিন্তাধারা। লায়াল ছিলেন লর্ড ডাফরিনের এক অন্তরঙ্গ সুহৃদ। ডাফরিনের সময়ে প্রজাস্বত্ব আইনের খসড়া পেশ করা হয়েছিল। লায়াল পরে ১৮৮৭ থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত ইন্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য হন। 'এডিনবরা রিভিউ'য়ের জানুয়ারী ১৮৮৪ সংখ্যায় তিনি লিখেছিলেন, আধুনিক অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের অগ্রগতির মধ্যেই জমিদার ও প্রজার মধ্যে দ্বন্দ্বের সূচনার কারণ নিহিত ছিল: বাণিজ্য ও কৃষির অগ্রগতি, প্রথাগত খাজনা থেকে পরিবর্তনীয় চুক্তিমূলক খাজনায় অবস্থান্তর, এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জমির যোগান ও চাহিদার পরিবর্তনের মধ্যে। উপরন্তু, "শান্তি ও নিরাপত্তার ফলে জমির মুনাফা বেড়ে যাওয়ায় এবং পুঁজির নিরাপদ বিনিয়োগ সুনিশ্চিত হওয়ায়, ধনী ও উদ্যোগী শ্রেণীর মানুষরা জমির একক অবাধ মালিকানা লাভের জন্য খুবই চেষ্টা করছে। —এ রকম চেষ্টা বরাবর তারা অন্যত্রও করেছে।" কিন্তু "এই অবস্থান্তর সেকেলে কৃষকদের পক্ষে খুব কষ্টদায়ক হয়ে উঠছে", তার খাজনার বৃদ্ধি উর্ধ্বমুখী এবং তার ফলে সরকার তার কল্যাণের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। উত্তর ভারতে সরকার আইন করে "প্রজাস্বত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য মালিকদের চেষ্টা" রোধ করছিল। **"যে কারণে খাজনার হার কমায় এবং অবশ্যম্ভাবী কিন্তু অপ্রিয় পরিবর্তনের প্রভাব সহনীয় হয়"** এর ফলাফল সেই রকমই "অত্যন্ত উপকারী হয়েছে।" সরকার এবার তার পরিকল্পিত আইন প্রণয়নের দ্বারা জমিদার ও প্রজার মধ্যে চুক্তির শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব করলেন। দুটি কারণে অবস্থাটা আকর্ষণীয়: জমিদার ও প্রজার মধ্যে "সঠিক সম্পর্কে সরকারি আদেশের দ্বারা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করার কোন চেষ্টা আজও পর্যন্ত কখনো সফল হয়েছে বলে জানা যায়নি।" এবং ভারতে অবস্থাটা অনুপম এইজন্য যে "**ভারতে ইংরেজ শাসনের রাজনৈতিক মহাপ্লাবনে যে যুগ সহসা রুদ্ধ হয়ে গেছে…সেকেলে জমিদার ও রায়ত…সেই যুগেরই অবশেষ শ্রেণী…অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উভয়েই একই রকম অদূরদর্শী ও অমিতব্যয়ী…আধুনিক ভূস্বামী, পুঁজিপতি, একদল সঞ্চয়ী, পরিশ্রমী কৃষকের মধ্যে প্রতিযোগিতা এসবই হল এই প্লাবনের ফলে উদ্ভূত।**" অতএব পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ভারতবর্ষকে বদলানোর ক্ষেত্রে সে দেশের সরকারের ভূমিকা এবং দেশের মধ্যে তার প্রতিষ্ঠা এমনই যে **"রূপান্তরের অবশ্যম্ভাবী প্রক্রিয়াকে সাহায্য ও তত্ত্বাবধান"** করার জন্য তাকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। উপরন্তু, "দুর্বলকে রক্ষার চেষ্টা করা" আমাদের নৈতিক কর্তব্য। একই সঙ্গে "নিজেদের কাঁধে অতিরিক্ত দায়ভার নেওয়া এবং **যেসব অর্থনৈতিক লক্ষণ একটা দেশের নবজন্মের কষ্ট ও যন্ত্রণার সম্ভবতঃ অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ** তার দায়িত্ব স্বীকার করার" প্রবণতার বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক হতে হবে এবং তাকে ঠেকিয়ে রাখতে হবে। একথাও মনে রাখতে হবে যে "ভূস্বামীদের সংরক্ষণের জন্য আইনগত কৌশল প্রজাদের রক্ষা করার পরিকল্পনার সঙ্গে সব সময় খুব ভাল খাপ খায় না। এবং এই ধরনের কোন নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাকেই কৃষির উন্নতি বিধান ও নির্দিষ্ট সময় অন্তর

আমাদের ভূমি রাজস্বের সমন্বয়বিধানের সঙ্গে সহজে মেলানো যায় না।" এই রকম নিয়ন্ত্রণ-প্রয়াস যেমন ভূমি-রাজস্ব স্থির করার জন্য রাজস্ব কর্মচারীদের জমির প্রকৃত খাজনা নির্ধারণ করার চেষ্টা ব্যাহত করে, তেমনি পুঁজির প্রবাহও রুদ্ধ করে দেয়। একই সঙ্গে, "কৃষক শ্রেণীগুলোকে মেলানোর এবং পরিবর্তনশীল সময়ের কষ্ট কমানোর চেষ্টা সমর্থনযোগ্য।"[54]

লায়াল বুঝেছিলেন কৃষির অগ্রগতি সম্পর্কে সরকারিভাবে স্বীকৃত তত্ত্বের সঙ্গে প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নের চেষ্টাকে মেলানোর কাজে তাঁর বিশ্লেষণ সফল হয়নি। তাই তিনি তাঁর বিশ্লেষণ শেষ করেছেন এই স্বীকারোক্তি দিয়েঃ "কিন্তু সরকার ভূমির ব্যাপারে তার বিভিন্ন নীতির জট ছাড়িয়েছে বা বিভিন্ন লক্ষ্য ও স্বার্থের সংঘাতের ভেতর থেকে নিজের কর্মপন্থা নির্দিষ্টভাবে স্থির করতে পেরেছে বলে এখনও মনে হয় না।"[54]

যদিও আর কোন লেখক ভূস্বামী-প্রজা সম্পর্ক নিয়ে এতটা আলোচনা করেন নি, তবুও কিছু উন্নতিসাধনের প্রয়োজন হলেও[55] প্রচলিত সম্পর্ক, মূলতঃ সন্তোষজনক হিসেবে দেখা, অথবা, প্রজার দৃষ্টিতে অসন্তোষজনক হলেও,[56] আমূল পরিবর্তনের অযোগ্য হিসেবে দেখা, এটাই ছিল সাধারণ প্রবণতা। অধিকাংশ লেখক প্রশ্নটাকে স্রেফ উপেক্ষা করেছেন।

ব্রিটিশ লেখকরা কেন ভূস্বামী-প্রজা সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন আমূল পরিবর্তনের প্রস্তাব করেননি তার একটা কারণ হল তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস যে জমিদার ও অন্যান্য ভূম্যধিকারী শ্রেণী ব্রিটিশ শাসনের এক অপরিহার্য রাজনৈতিক ভিত্তি, কারণ তাদের অস্তিত্বই নির্ভর করে ব্রিটিশ শাসনের সুস্থিতির ওপর।[57]

গ্রামে ক্রমবর্ধমান ঋণগ্রস্ততা এবং তার ফলে অকৃষিজীবী মহাজনের হাতে দ্রুত জমি চলে যাওয়ায় কৃষকের কল্যাণ ও সরকারের রাজনৈতিক সুস্থিতির ওপর যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছিল ব্রিটিশ লেখকরা সেটাও পুরোপুরি উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু প্রতিকারমূলক কর্মপন্থা এবং অর্থনীতিতে মহাজনের ভূমিকা, ঋণগ্রস্ততা ও জমি হস্তান্তর বৃদ্ধি সম্পর্কে তত্ত্বাবলীর মধ্যে আবারও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হল। ঋণগ্রস্ততা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রচলিত ব্রিটিশ মত অনেকটা এইরকমঃ

> সরকার তার ভূমি-রাজস্বর চাহিদা দীর্ঘ সময়ের জন্য সীমাবদ্ধ করে ও স্থির করে দিয়ে জমির মালিকদের হাতে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করেছিল (অথবা রিকার্ডোপন্থীদের ভাষায় মাঝে মাঝে যেমন বলা হয়, আর্থিক খাজনার একাংশ তাদের কাছেই রেখে দিয়েছিল),[58] এবং এইভাবে তারা জমিকে মূল্য দিয়েছিল। এর সঙ্গে জমি বিক্রি করার বা হস্তান্তরের অধিকারের ফলে তারা জমি জামিন রেখে ঋণ করতে সমর্থ হল। একই সময়ে, নিষ্কর উদ্বৃত্ত ও সম্পত্তির নিরাপত্তার কারণে মহাজন ও 'পুঁজিপতিদের' কাছে জমির মালিকানা আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি এই অনর্জিত উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি করেছিল। এবং সরকার এটা তুলে নিতে রাজি

না হওয়ায় জমির মূল্য বেড়ে গিয়েছিল, যেমন বেড়েছিল কৃষকের ঋণ করার ক্ষমতাও। পরস্বাপহারী, চতুর, বিবেচনাহীন ও সুদখোর মহাজন এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছিল এবং ত্রুটিপূর্ণ প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থা, ভূমি-রাজস্বর দাবির অনমনীয়তা এবং কৃষকশ্রেণীর অমিতব্যয়িতা, ফলে বিপুল ঋণভার জমে গেল এবং জমির দখল নিতে মহাজনরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল।[৫৯]

এ থেকে দুটি সিদ্ধান্তে স্বাভাবিক ভাবেই পৌঁছান যায়ঃ হয় সরকার কৃষককে তার নিজের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য অনর্জিত আয় সহ পুরো আর্থিক খাজনা সিন্দুকে পুরবে, অথবা মহাজনদের বিরুদ্ধে এমন কঠোর ব্যবস্থা নেবে যাতে তেজারতি কারবার এবং গ্রামে জমির যে কোন রকমে হস্তান্তর করা কার্যতঃ অবৈধ হয়ে যায়। প্রথম বিকল্পটি তাত্ত্বিকভাবে ও আর্থিক দিক দিয়ে আকর্ষণীয় হলেও এবং কৃষির অনগ্রসরতার জন্য যারা ভূমিরাজস্বর চড়া দাবিকেই দায়ী বলে মনে করে তাদের বিরুদ্ধে সুন্দর যুক্তি হলেও প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে কখনই এটি উত্থাপন করা হয়নি, কারণ স্পষ্টতঃই রাজনৈতিক দিক থেকে এ যুক্তির কোন সারবত্তা ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ বিকল্পটি যেভাবেই কার্যকর করা হোক, কৃষক তাতে নিঃস্ব হয়ে যাবে। এই পর্যায়ে আরেকটি মত চালু হল। মনে করা হত যে নানা বজ্জাতি সত্ত্বেও গ্রামের **সাহুকারের** (মহাজনের) একটা অতি প্রয়োজনীয় ও উপযোগী ভূমিকা ছিল এবং বস্তুত গ্রামীণ অর্থনীতির পক্ষে তা অপরিহার্য ছিল। আকালের সময় সে রায়তকে বাঁচতে সাহায্য করত, এবং তার ফলে বাঁচিয়ে দিত সরকারি ত্রাণ সাহায্যের খরচ. প্রয়োজনীয় কৃষিকর্মের জন্য রায়তকে পুঁজির যোগান দিত, সময়মত ভূমি রাজস্ব শোধ করতে তাকে সাহায্য করত এবং তার ফলে সরকারকে আর্থিক বিপদ থেকে বাঁচাত এবং সরকার যাতে তাড়াতাড়ি জমি বিক্রি করে না দেয় সেজন্য সেই বিপদ থেকে জমির মালিককে বাঁচাত। জমির হস্তান্তর রোধ অথবা অনুরূপ কোন ব্যবস্থা বলে ঋণের পরিমাণ সীমিত করে দিয়ে কৃষকেরই ক্ষতি করত এবং প্রচণ্ড দুর্দশার মধ্যে ঋণ করতে তাকে স্রেফ বাধ্য করত। এর ফলে জমিতে নূতন পুঁজির নিয়োগও বন্ধ হয়ে যেত।[৬০]

এই লেখকরা এই ধারণাও ছাড়তে পারেননি যে কৃষির উন্নতির জন্য অর্থনৈতিক কারণে জমি হস্তান্তর অবশ্যই প্রয়োজন, কারণ তার ফলে পুঁজিবাদী কৃষির উন্নতি ঘটবে। বিষয়টি ডবলিউ লী-ওয়ার্নার এইভাবে বলেছেন ঃ

> ঋণভার থেকে দেউলিয়া অবস্থা, দেউলিয়া অবস্থা থেকে উচ্ছেদ—স্বাভাবিক ও ক্রমাবিকাশক ক্ষয়ের এক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া গ্রামীণ সমাজের এক সুস্থতর পুনর্বিন্যাস সম্ভব করতে পারে। অস্বীকার করা যায় না যে অজ্ঞ, অদূরদর্শীতা ও অলস কৃষকের হাত থেকে সঞ্চয়ী পরিশ্রমী ও দক্ষ

কৃষকের হাতে সম্পত্তির হস্তান্তর মঙ্গলজনক হবে। এমনকি উৎখাত হওয়া কৃষক সম্প্রদায় আজ এই প্রক্রিয়াকে অসন্তোষ ও আশংকার চোখে দেখলেও তাদের ঋণভারাক্রান্ত ভূসম্পত্তির ধ্বংসাবশেষ থেকে মুক্তি পেয়ে লাভবানই হবে। মুক্ত শ্রমজীবী হিসেবে তারা অন্তত এক নূতন আর্থিক ও নৈতিক জীবন শুরু করবে এবং কালক্রমে তাদের হৃত সম্পদ হয়ত পুনরুদ্ধার করতেও পারবে। যাই হোক, যেসব মানুষ কোন দিন ঋণ শোধ করতে পারে না তাদের ঋণের অনুষঙ্গী ঝুঁকি ও অপচয় ঋণের বাজার থেকে দূর হয়ে গেলে জমি ও পুঁজির মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক সুস্থতর হবে।[৬১]

কিছু একটা যে করতে হবে তা অবশ্যই অনেকেই অনুভব করছিল, কারণ কৃষিজীবী শ্রেণীর হাত থেকে অকৃষিজীবী শ্রেণীর হাতে, 'সংগ্রামী' শ্রেণীর কাছ থেকে 'অসংগ্রামী' শ্রেণীর হাতে জমি চলে যাওয়ার ফলে অসন্তোষ সৃষ্টি হচ্ছিল, সক্রিয় বিদ্রোহে রূপ নিয়ে তা রাজনৈতিক দিক দিয়ে সর্বনাশা হয়ে উঠতে পারত।[৬২] কিন্তু তাঁদের অর্থনৈতিক বোধবুদ্ধিমত যেসব ব্যবস্থা তাঁরা বাতলাতে পারতেন তাতে অবস্থাটা একটু শুধু উন্নত হতে পারত, অর্থাৎ, মহাজন তার কাজ করে যাবে, তবে তার উৎপীড়নের মাত্রা কিছু কমবে। উক্ত ব্যবস্থা হল, সুদের হার নিয়ন্ত্রণ, মহাজনের নির্বিবেক ক্রিয়াকলাপ সংযত করা এবং বিচার ব্যবস্থার সংস্কার।[৬৩]

৭

যেসব ব্যাপার উন্নতির পথে বাধা হচ্ছিল বা হতে পারত, সমকালীন অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে মূলতঃ আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর লেখকরা সেগুলোর ওপর যথেষ্ট মনোযোগ দেননি। অবশ্য বাধাগুলো নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা হলেও ভারতীয়দের জীবন যাত্রার মান কেন নিচু সেই আলোচনার সঙ্গে তা এক করে ফেলা হয়েছিল।

আমরা আগেই দেখেছি যে আভ্যন্তর পুঁজির ঘাটতিকে একটা বিশেষ দুর্বলতা মনে করা হত। কিন্তু সেটাকে বর্তমানের বাধা হিসেবে না দেখে বরং অতীতের ব্যর্থতা হিসেবেই দেখা হত। এর কারণ হল বিদেশী পুঁজিকে একটা উপস্থিত বিকল্প বলে মনে করা হত এবং ব্রিটিশ শাসন জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করছে বলা হত। দ্রুত বর্ধমান জনসংখ্যাকে অগ্রগতি ও কল্যাণের পথে বড় বাধা বলে মনে করা হত, কারণ যে-কোন সময় তা জমির পরিমাণকে ছাড়িয়ে যেতে পারে।[৬৪] অবশ্য এক্ষেত্রেও ভিন্ন মতাবলম্বীরা ছিলেন।[৬৫] তাঁদের আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তাঁরা সাধারণতঃ ভারতবর্ষের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অগ্রগতির পথে প্রধান বাধা হিসেবে দেখতে চাইতেন না।[৬৬] যে তিনটি দিক নিয়ে মাঝে

মাঝে সমালোচনা হত তা হল ঃ অকাল-বিবাহ ও বহু সন্তান উৎপাদনের প্রবণতা জনসংখ্যার চাপ আরো তীব্র করেছিল ;[67] অমিতব্যয়িতা ও সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যয়বাহুল্যের চাপের ফলে পুঁজি কম তৈরি হত ;[68] এবং তাদের চাহিদা সামান্য হওয়ায়, ঔদাস্য এবং উচ্চাশা ও উন্নতি করার উদ্যম না থাকায় নিজেদের ক্ষমতা কাজে লাগানোর এবং উন্নতিসাধনের উৎসাহ বিশেষ থাকতো না বা উন্নতির সুযোগ অল্পই থাকতো।[69] সামাজিক অনগ্রসরতা ও উন্নতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতি এই অমনোযোগ প্রসঙ্গে প্রচারিত মত থেকে বোঝা যায় যে রেলব্যবস্থা, আধুনিক শিক্ষা, ব্রিটিশ প্রশাসন ইত্যাদির প্রভাবে পুরোন সামাজিক মূল্যবোধ ও জীবনযাত্রার ধরন ভেঙে পড়ছিল এবং সামাজিক জীবন দ্রুত আধুনিক হয়ে উঠছিল।[70]

জনসংখ্যার কথা বাদ দিলে অগ্রগতির পথে আর একমাত্র যে প্রধান বাধাটি কিছু ব্রিটিশ লেখক লক্ষ্য করেছেন তা হল অগ্রগতির বিভিন্ন দিকে অবাধে মূলধন যোগান দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত রাজস্ব সংগ্রহে অক্ষমতা। এই ব্যাপারটি আবার দেশের দারিদ্র্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল। অস্তিত্বের জন্য যতটুকু দরকার তার চেয়ে খুব বেশি উদ্বৃত্ত ভারত উৎপাদন করতো না। তাঁদের অনেকে বলেছেন, ভারতকে এশীয় রাজস্ব থেকে একটা আধুনিক প্রশাসন চালাতে হত এবং তার ফলে অন্যান্য উন্নতির জন্য পুঁজি আর বিশেষ কিছু থাকতো না।[71]

কিছু ব্রিটিশ লেখক একথাও মনে করতেন যে ভারতের অগ্রগতি মন্থর বলে মনে হয়। চূড়ান্ত মান অনুযায়ী ভারতের মানুষের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিচু কারণ তার অর্থনৈতিক ভিত্তিও অত্যন্ত নিম্নস্তরের। ব্রিটিশকে সেই নিম্নস্তর থেকে ভারতবর্ষকে টেনে তোলার কাজ শুরু করতে হয়েছে।[72]

যাই হোক না কেন, প্রচলিত মত ছিল এই যে ব্রিটিশ প্রশাসন তার যথাসাধ্য করছে এবং সরকারি নীতিতে অথবা ১৭৫৭ সাল থেকে ভারতে যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে উঠেছে তার মধ্যে মূলতঃ কোন ভুল নেই। তবে যদি কোন দুর্বলতা থেকে থাকে তা ছিল ভারতীয়দের দিকেই।[73] যাই হোক, ব্রিটিশ রাজ সম্ভবতঃ ভারতবর্ষকে বেশি তাড়াতাড়ি আধুনিক ও উন্নত করার অপরাধে অপরাধী। বস্তুতঃ ক্রমশঃ একটা মত গড়ে উঠছিল যে ভারতবর্ষের অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য ব্রিটেনের উচিত আধুনিকীকরণের কাজটাকে মন্থর করা।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃতি সম্পর্কে সর্বাধিক প্রচলিত ব্রিটিশ মত বরাবরই এই ছিল যে ব্রিটিশ শাসনের স্বাভাবিক বিশেষত্ব হল তার উপচিকীর্ষা ও অছিব্যবস্থা। অবশ্য ব্রিটেনের ভেতরে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী

লেখকদের সঙ্গে বিতর্কের সময় ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশের লাভের কথা অকপটে স্বীকার করা হত এবং এমনকি তার ওপর জোর দেওয়াও হত। যেসব লাভের কথা প্রায়ই বলা হত তা হল ; (১) ব্যাপকভাবে প্রসারমান বৈদেশিক বাণিজ্য ; উৎপাদিত পণ্যের বাজার ও কাঁচামালের উৎস হিসেবে ভারতের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হত ; (২) ব্রিটিশ পুঁজির ক্ষেত্র ; (৩) বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্রিটিশ তরুণদের পক্ষে লাভজনক কর্মক্ষেত্র ; (৪) ব্রিটিশ জাহাজের কর্মক্ষেত্র ; (৫) সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যবহার ; (৬) এবং সবশেষে, এসব সুবিধার জন্য ব্রিটেনের কোন ব্যয় নেই ; অন্যান্য উপনিবেশে এই সুবিধা নেই। এসব লাভকে অবশ্য ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে স্বার্থের সমাপতন ও পারস্পরিক সম্পর্কের একটা অঙ্গ বলে ভাবা হত এবং কোনভাবেই ভারতে ব্রিটিশ অর্থনীতির চালিকা প্রেরণা হিসেবে দেখা হত না।

উনিশ শতক শেষ হওয়ার আগেই অর্থনৈতিক অগ্রগতির আলোচিত ধাঁচ ও ধারণাগুলো ভেঙ্গে যাচ্ছিল। ১৮৯৬-১৯০০ সালের দুর্ভিক্ষ এই ভগ্নদশার নাটকীয় প্রকাশ মাত্র। বিশ শতকের আগেই এসব ধারণা আঁকড়ে থাকা মুশকিল হয়ে উঠেছিল, কারণ এগুলোর যথার্থ ব্যাখ্যার অভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, বোঝা যাচ্ছিল যে এসব ধারণা দিয়ে নূতন কিছু করা যাবে না।[74] এইসময় হয়ত মেনে নেওয়া যেত যে অগ্রগতি সম্পর্কে প্রচলিত ব্রিটিশ মডেলে কোন গণ্ডগোল আছে এবং নূতন মডেল তৈরির তাই উদ্যোগ নেওয়া যেত ; নতুবা পুরোন মডেলের কথাই আবার বলা যেতে পারত, ইতিবাচক সাফল্যের ওপর জোর দেওয়া যেত। জাতিভেদ প্রথা, যৌথ পরিবার, জনসাধারণ ও জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি অভ্যন্তরীণ সামাজিক দুর্বলতার ভূমিকা আবিষ্কার করা ও তার ওপর জোর দেওয়া যেত এবং বলা যেত যে বিশেষ করে এশীয় সমাজগুলোতে অর্থনৈতিক উন্নতি হতে বহু সময় লাগে। বিশ শতকে ব্রিটিশ লেখকরা উত্তরোত্তর দ্বিতীয় পথটাই গ্রহণ করতে লাগলেন, ভারতকে এক বৃহৎ শিল্প শক্তিতে পরিণত করার 'মহৎ পরিকল্পনা' ত্যাগ করলেন এবং মোটের ওপর আশাবাদ ও অর্থনৈতিক যুক্তি-নির্ভরতা দুটোই ত্যাগ করার দিকে ঝুঁকলেন। একই সময়ে তাঁরা একথাই জোর দিয়ে বলে যেতে লাগলেন যে উপনিবেশ হিসেবে ভারতের উন্নতির জন্য তাঁদের যে মডেল তা শুধু যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তাই নয়, ভারতবর্ষ যদি উপনিবেশ হয়েই থেকে যায় এবং ঐ মডেলই অনুসরণ করে তাহলেই কেবল তার উন্নতি সম্ভব। অন্যদিকে পাশ্চাত্যের বহু সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লেখকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা প্রথম পথটি বেছে নিলেন এবং সেই পথে উনিশ শতকী সাম্রাজ্যবাদের এক অর্থনীতি শাস্ত্র সৃষ্টি করলেন এবং অনুন্নত অর্থনীতিকে কিভাবে উন্নত করা যায় সে সম্পর্কে নূতন ধারণা পেশ করলেন।

.740

ভারতের জাতীয়তাবাদী লেখকরাও ভারতের ওপর ব্রিটিশ প্রভাবের একটা ইতিবাচক মূল্যায়ন দিয়ে শুরু করলেন। তাঁরাও আশা করলেন কেন্দ্রীভূত প্রশাসন প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তি ও সম্পত্তির নিরাপত্তা, পশ্চিমের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পুঁজি ও অর্থনৈতিক সংগঠন আমদানি, রেলপথ ও সড়ক নির্মাণ, বিশ্বের বাজারের সঙ্গে সংযোগ, এবং আধুনিক ভাবনা ও সংস্কৃতির প্রসার অর্থনৈতিক আধুনিকীরণ ও প্রগতির এক নবযুগ সূচনা করবে। কিন্তু অচিরেই তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে তাঁদের আশার সঙ্গে বাস্তব অবস্থা মিলছে না। তাঁরা এই বিশ্বাসে উপনীত হলেন যে নূতন দিকে অগ্রগতি শুধু মন্থর ও খঞ্জই নয়, দেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পেছনে হাঁটছে অর্থাৎ উত্তরোত্তর অনুন্নত হয়ে পড়ছে। আগেকার অঙ্গীকার কেন সত্য হয়ে উঠছে না এবং তাকে সত্য করে তুলতে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানকে কেন্দ্র করেই তাঁদের অর্থনৈতিক ধারণা গড়ে উঠছিল।

জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দুটি মৌলিক দিকের প্রতি প্রথমে লক্ষ্য করা যেতে পারে।

অর্থনৈতিক উন্নতির সমস্যা সমাধানে জাতীয়তাবাদীরা একটা সুসংবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলেন। পরিবহণ, বাণিজ্য অথবা কৃষি এলাকার মত পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে অগ্রগতি নিজে থেকেই যে সম্ভব, একথা তাঁরা মেনে নেননি। গোটা অর্থনীতির সঙ্গে এদের সম্পর্কের দিক থেকে এগুলোকে দেখতে হবে। এগুলো যাতে একটা সুস্থ পরিণতিতে পৌঁছায়, সে জন্য অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্য অবশ্যই সৃষ্টি করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ, তাঁরা মনে করতেন অর্থনৈতিক উন্নতির প্রাণকেন্দ্র নিহিত রয়েছে দ্রুত ও আধুনিক শিল্পযোজনার মধ্যে। তাঁরা বলতেন, যে কোন সম্পদ-বৃদ্ধিই উন্নতি নয়। ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা, অথবা তাঁদের ভাষায়, 'উৎপাদনের ক্ষমতা' হল আসল ব্যাপার। প্রকৃতি ভারতকে মুখ্যতঃ এক কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে গড়েছে একথা স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা মানতেন না। বরং তাঁরা বলতেন, ভারতকে শিল্পযোজনা করতেই হবে, নতুবা সে ডুবে যাবে, কারণ এখানে জমির যোগান কম। তাঁরা সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণেও শিল্পযোজনা সমর্থন করতেন। শেষোক্তটির ব্যাপারে তাঁদের যুক্তি ছিল যে ভারতের নানা সম্প্রদায়ের মানুষকে যা সাধারণ স্বার্থসম্পন্ন একটি একক জাতীয় সত্বায় মিলিত হতে সাহায্য করতে পারে, আধুনিক শিল্প যথার্থই সেই শক্তি।

জাতীয়তাবাদীরা তাই শিল্পযোজনার এই শ্রেষ্ঠ দিকটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে বাণিজ্য, পরিবহণ, মুদ্রা ও বিনিময়, শুল্ক, রাজস্ব ও বিদেশী পুঁজি সম্পর্কে সরকারি নীতি পরীক্ষা করে দেখার জন্য বারবার অনুরোধ করতেন। উদাহরণস্বরূপ, অর্থনৈতিক পশ্চাদ্বর্তিতা বা অনগ্রসরতা সম্পর্কে তাঁদের সংজ্ঞা ছিল যে সমাজে সামগ্রিক আর্থজীবনে শিল্পের একটা গৌণ ভূমিকা থাকে এবং

যেখানে শ্রমশক্তির অধিকাংশ কৃষিতে নিযুক্ত, এটা হল সেই সমাজের বৈশিষ্ট্য। সেই কারণে ভারতে কারিগরি শিল্পের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার এবং তার জায়গায় নূতন আধুনিক শিল্প গড়ে তোলার ব্যর্থতার তাঁরা নিন্দে করতেন। তাঁরা এও মনে করতেন যে, আধুনিক শিল্পের অভাব সত্ত্বেও ব্রিটিশ শাসনের শুরুতে ভারতে শিল্প ও কৃষির ভারসাম্য উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের তুলনায় বেশি অনুকূল ছিল। বাকি দুনিয়ায় তখন যে ভারসাম্য ছিল এই ভারসাম্য তার থেকে খুব আলাদা ছিল না, এবং সেই সময় থেকে ব্রিটেন ও ইউরোপে আধুনিক শিল্পের উন্নতির কথা যদি বিবেচনা করা হয়, তাহলে ভারত বস্তুতঃ পেছনে হেঁটেছে এবং আরো অবনতির দিকে এগিয়েছে অথবা এই সময় আরো অনুন্নত হয়েছে। এক দিক দিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরাই সম্ভবতঃ প্রথম একটা আধুনিক বৈজ্ঞানিক অর্থে অর্থনৈতিক অনুন্নতির সংজ্ঞা দিয়েছেন, কারণ উনিশ শতকের ব্রিটিশ অর্থনীতিকরা তখনো স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল সমাজের কথা বলছিলেন। এই ভাবে জাতীয়তাবাদীরা এও উপলব্ধি করেছিলেন যে উনিশ শতকের শেষে ভারতের অনগ্রসরতার উদ্ভব হাল আমলের, তা অতীত ঐতিহ্যের জের মাত্র নয়। উপরন্ত, তাঁরা বুঝেছিলেন যে এই অনগ্রসরতার অন্যদিক হোল বিদেশী অর্থনীতির প্রাধান্য এবং এই কারণেই ঔপনিবেশিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য অর্থনীতির আংশিক আধুনিকীকরণ হয়েছিল। বিচারপতি রানাডের ভাষায়, ভারতবর্ষ তার শাসকবর্গের চোখে এমন "একটি উপনিবেশ, যেখানে কাঁচামাল উৎপাদন করে ব্রিটিশ এজেন্টরা তা ব্রিটিশ জাহাজে তুলে চালান দিতে পারবে, ব্রিটিশ দক্ষতা ও পুঁজির সাহায্যে তাকে পণ্যে রূপান্তরিত করবে এবং ব্রিটিশ বণিকরা ভারতবর্ষ ও অন্যত্র তাদের উপনিবেশে অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে আবার তা রপ্তানি করতে পারবে।"[75]

১০

ভারতে ব্রিটিশ আর্থিক নীতি ও অগ্রগতির যেসব সক্রিয় কারণে উন্নতি সম্ভব হয়েছে বলে ব্রিটিশ লেখকরা বিশ্বাস করতেন, প্রথমে জাতীয়তাবাদীরা তার সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নতির প্রকৃত গতিপথের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। এইসব কারণ অগ্রগতিকে কতটা ব্যাহত করতে পারে বা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তাও তাঁরা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন।

বৈদেশিক বাণিজ্যের অনন্যসাপেক্ষ বৃদ্ধির অর্থই হল অর্থনৈতিক অগ্রগতি, অথবা তা রাতারাতি অর্থনৈতিক উন্নতির সূচনা করে একথা তাঁরা মানেন নি। তাঁদের মতে, বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ তার রীতি—কোন্ ধরণের পণ্য বিনিময় হয় এবং দেশের আয়, শিল্প ও কর্মনিযুক্তির

ওপর তার প্রভাব ইত্যাদি। কাঁচামাল রপ্তানি আর তৈরি পণ্য আমদানির প্রতি মাত্রাধিক ঝোঁকের দিকে তাঁরা আবারও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে তৈরি পণ্যের ক্রমবর্ধমান আমদানি মোটেই উন্নতির সূচক বা অগ্রগতির কার্যকর শক্তি হয়ে ওঠেনি, বরং তা স্বদেশী শিল্পের ক্ষতি করছিল। দেশী পণ্যের অভাব মেটানো বা তার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার বদলে এবং নূতন চাহিদা ও নূতন শিল্প বিকাশের বদলে এই আমদানি করা পণ্য দেশের হস্তশিল্পজাত পণ্যের জায়গা নিচ্ছিল এবং আধুনিক শিল্পের বিকাশ ব্যাহত করছিল। জি. এস. আয়ারের ভাষায়, "ভারতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দেশী বাণিজ্যের অভাব মেটায়নি, তাকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলেনি; বরং তা দেশী বাণিজ্যের জায়গা নিয়েছিল এবং তার ফলে তাকে ধ্বংস করেছিল।"[৭০] সুতরাং ক্রমবর্ধমান আমদানি ভারতবর্ষকে ব্রিটেনের এক কৃষিপ্রধান লেজুড় করে তুলেছিল এবং সেই অবস্থাতেই রাখছিল। একই সময়ে জাতীয়তাবাদীরা যন্ত্রপাতি, ধাতু ও কাঁচামাল আমদানিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

কাঁচামালের ক্রমবর্ধমান রপ্তানি লাভপ্রদ একথাও তাঁরা মেনে নেননি। কারণ, তাঁদের মতে, তার মানে হল উত্তরোত্তর বেশি পরিমাণে সম্পদের অপচয়, অথবা একপাক্ষিক পুঁজি হস্তান্তর, এবং ক্রমবর্ধমান আমদানির জন্য টাকা দেওয়া। তার অর্থ দেশকে গ্রামে পরিণত করা এবং আর্থিক দিক দিয়ে তাকে শোষণ করা। উপরন্তু, কৃষিপণ্য রপ্তানির প্রত্যক্ষ সুবিধাও কৃষকের কাছে পৌঁছতো না। তার সারভাগটা নিয়ে নিত ব্যবসায়ী, মহাজন, ভূস্বামী ও সরকার। অন্যদিকে, তার ফলে যে মূল্যবৃদ্ধি ঘটত তাতে দরিদ্র কৃষক ও কৃষি-শ্রমিকদের অবস্থা হীন থেকে হীনতর হয়ে উঠত।

ভারতীয়রা দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের আরেকটি অস্বাভাবিক দিক নিয়েও অভিযোগ করতেন। এই বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত বিদেশীরা এবং তার ফলে মুনাফাও বেরিয়ে যেত ছিদ্রপথে।

ভারতীয়রা নিঃসন্দেহে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার দাবিদার ছিলেন না বা নিছক বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধির বিরোধী ছিলেন না। তাঁরা অবশ্য দাবি করতেন যে এই বৃদ্ধি হওয়া উচিত 'স্বাভাবিক' প্রক্রিয়ায়, অর্থাৎ দেশের অর্থনৈতিক প্রয়োজন এবং সাম্য ও পারস্পরিক সুবিধার ওপর তা প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। তাঁরা চাইতেন সাধারণভাবে অর্থনৈতিক উন্নতির প্রয়োজনে এবং বিশেষভাবে শিল্পের প্রয়োজনে বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপ্তি, প্রকৃতি ও অভিমুখ নির্ধারিত হোক।

জাতীয়তাবাদীরা সদ্যোজাত শিল্পকে নীতির দিক দিয়ে এবং উত্তরোত্তর আয় বাড়ায় বলে কৃষির তুলনায় শিল্প বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এই যুক্তিতেও দেশী পণ্যের সংরক্ষণ সমর্থন করতেন। তাঁরা তুলনামূলক ব্যয়ের তত্ত্বের বৈধতা অস্বীকার করতেন না, কিন্তু ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে শ্রমবিভাগের প্রচলিত ধাঁচটাকে রক্ষার জন্য এই তত্ত্বের ব্যবহার ও তার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা অবাধ বাণিজ্যের বিরোধিতা করেছিলেন। বস্তুতঃ, সমস্ত কারণের মধ্যে ভারত

সরকারের শুল্কনীতিই ভারতীয়দের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করেছিল যে ভারতে ব্রিটিশ নীতি মূলতঃ ব্রিটিশ পুঁজিবাদী শ্রেণীর স্বার্থে চালিত।

১১

রেলব্যবস্থার ফলে অর্থনৈতিক উন্নতি আপনা থেকেই ঘটে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা একথাও মানেন নি। রেলব্যবস্থার অন্যান্য সাধারণ সুবিধার কথা স্বীকার করলেও তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন যে রেলপথ নির্মাণের ফলে শিল্পের উন্নতি ঘটেনি। পরিবর্তে তা ভারতের বাজারে বিদেশী পণ্য প্রবেশের সুবিধা করে দিয়েছিল এবং এইভাবে তৎকালীন অর্থনৈতিক পশ্চাদ্বর্তিতা স্থায়ী ও ব্যাপক করতে সাহায্য করেছিল। রেলপথ নির্মাণের সুফল পেয়েছিল ব্রিটেন—তা সে শিল্পের ওপর তার প্রভাবের দিক দিয়েই হোক বা ইস্পাত ও যন্ত্রশিল্পে অর্থ ও উৎসাহদানের দিক দিয়ে তার পরোক্ষ ক্রিয়ার ব্যাপারেই হোক। সাম্প্রতিক ভাষায়, জাতীয়তাবাদীরা মনে করতেন যে রেলব্যবস্থা ভারতীয় শিল্পের নয়, ব্রিটিশ শিল্পের এক সামাজিক উপরি-ব্যয় হিসেবে কাজ করত এবং তার বৈদেশিক অর্থনীতি ছিল ব্রিটেনে ফিরে চালান করা। বস্তুত, জি. ভি. যোশি মন্তব্য করেছেন যে রেলব্যবস্থার জন্য প্রতিশ্রুত সুদকে ব্রিটিশ শিল্পের জন্য ভরতুকি হিসেবে দেখতে হবে। অথবা, তিলকের ভাষায়, এটা হল "অপরের স্ত্রীকে সাজানোর" মত ব্যাপার।[77]

বিকল্প নীতি হিসেবে ভারতীয়রা মনে করতেন যে রেলপথ নির্মাণকে দেশের অর্থনৈতিক প্রয়োজনের সঙ্গে সমন্বিত করা দরকার। এক্ষেত্রে সমস্যা ছিল সীমিত আর্থিক সঙ্গতিকে সবচেয়ে ভালভাবে ব্যবহার করার। তাঁরা বলেছিলেন, স্পষ্টতঃই পরিবহণের সুযোগ-সুবিধার তুলনায় ভারতের বেশি প্রয়োজন শিল্পের, দরকার কৃষির উৎপাদন বাড়ানো। এবং ভারতের পরিবেশে শিল্প ও কৃষিকে উৎসাহিত করার সর্বোত্তম পন্থা হল তা সরাসরি করা, রেলপথ সম্প্রসারণ করে পরোক্ষভাবে নয়। শিল্পও যদি রেলপথের পাশাপাশি উন্নতি ও বৃদ্ধি লাভ করে, রেলপথও তাহলে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে। সুতরাং তাঁরা দাবি করলেন রেলব্যবস্থার জন্য যে সরকারি সাহায্য দেওয়া হচ্ছে তার বদলে তা দিতে হবে শিল্প ও সেচের জন্য এবং ভবিষ্যতে ভারতের বাণিজ্য ও শিল্পের ক্রমোন্নতির সঙ্গে রেলপথ সম্প্রসারণের কাজকে সমন্বিত করতে হবে। জাতীয়তাবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছিল ১৮৮৪ সালে জি. ভি. যোশির বক্তব্যে: "সরকারের উচিত ছিল পরিবহণের এসব সুবিধার পাশাপাশি দেশে বিভিন্ন শিল্প-ধারার উপযোগী যথার্থ অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং

এটাই শুধু এই সুবিধাকে জাতীয় স্বার্থে কাজে লাগাতে সাহায্য করতে পারত।”[৭৪]

জাতীয়তাবাদীরা এই প্রশ্নও তুলতেন ঃ সরকার রেলপথ নির্মাণের ওপর এত জোর দিচ্ছেন কেন? তাঁদের উত্তর ছিল, সরকারের অভিপ্রায় ব্রিটিশ উৎপাদকের কাছে ভারতের বাজার খুলে দেওয়া, কাঁচামাল ও খাদ্যসামগ্রী রপ্তানিতে সাহায্য করা, ব্রিটেনের ইস্পাত ও যন্ত্রজাত পণ্য বিক্রী বাড়ানো, উদ্বৃত্ত ব্রিটিশ পুঁজি বিনিয়োগের পথ তৈরি করা এবং সশস্ত্র বাহিনীর চলাচলের সুবিধা করা।

১২

বিদেশী পুঁজির প্রতি মনোভাবের ব্যাপারে জাতীয়তাবাদীরা অনেক দিন ধরে দ্বিধাগ্রস্ত ও বিভক্ত ছিলেন। কিন্তু এম. জি. রানাডে ছাড়া প্রায় সবাই ক্রমশঃ এর প্রচণ্ড বিরোধী হয়ে ওঠেন। রানাডে স্বল্প অভ্যন্তরীণ পুঁজির অনুপূরক হিসেবে এবং স্বদেশী উদ্যোগের কাছে দৃষ্টান্ত ও উদ্দীপক হিসেবে বিদেশী পুঁজির ভূমিকার ওপর জোর দেন। অন্যান্য ভারতীয়রা তা মানেন নি। তাঁরা মনে করতেন স্বদেশী পুঁজিকে উৎসাহিত করার বদলে বিদেশী পুঁজি তার জায়গা নিয়ে নিচ্ছে, তাকে দমন করছে এবং তার ভবিষ্যৎ বৃদ্ধিকে করে তুলছে আরো অসুবিধাজনক। এর পরিণাম ভারতীয় জীবনের ওপর আরো বেশি করে বিদেশী প্রভুত্ব ও নিয়ন্ত্রণ। উপরন্তু, বিদেশী উদ্যোগগুলোর কার্যতঃ কোন ইতিবাচক দিক বা পরোক্ষ প্রভাব ছিল না, কারণ তারা তাদের আর্থিক লাভের অধিকাংশটাই পাচার করে দিত। শুধু যে প্রচুর মুনাফা চালান করা হত তাই নয়, বেতন বাবদ প্রদত্ত অর্থের এক বিরাট অংশ দেওয়া হত বিদেশী কর্মচারীদের। তারা আবার তাদের আয়ের বেশির ভাগটাই দেশে পাঠিয়ে দিত। প্রযুক্তি ও পরিচালনা সংক্রান্ত প্রায় সব পদই দখল করতো বিদেশীরা। তারা অবসরগ্রহণ করে এই দেশ ছাড়ত। ফলে ভারতবর্ষ প্রযুক্তিগত ব্যবহারিক জ্ঞান উপজাত ব্যাপার হিসেবেও অর্জন করেনি। বস্তুতঃ, জাতীয়তাবাদীরা বলতেন, অর্থনৈতিক উন্নতির কথা বলতে গেলে ভারতে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের প্রায় কোন ইতিবাচক প্রভাবই ছিল না। তার একমাত্র অবদান কিছু অতিরিক্ত কাজের সুযোগ সৃষ্টি। সেক্ষেত্রেও বিদেশী মালিকানাধীন ক্ষেত-খামার, খনি ইত্যাদিতে অদক্ষ ভারতীয়দের জঘন্য রকমের কম মজুরি দেওয়া হত। দাদাভাই নওরোজি বলেছিলেন, ‘তারা স্রেফ ক্রীতদাসের মত কাজ করত, ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের হাতে উৎপাদিত পণ্য তুলে দেওয়ার জন্য নিজের জমিতে নিজের সম্পদ নিয়ে দাসত্ব করত।”[৭৫] অন্যভাবে বলা যায় ভারতের পরিবেশে বিদেশী পুঁজি দেশকে গড়ে না তুলে তাকে শোষণ করছিল।

তবুও জাতীয়তাবাদীরা তাঁদের বিশেষ অভিযোগ বাণিজ্য, ব্যাংকিং, রেলপথ এবং নিষ্কাশনমূলক ও বাগিচা শিল্পে বিদেশী পুঁজি নিয়োগের বিরুদ্ধেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। পাট ও তুলা বয়নশিল্পে এই বিনিয়োগে তাঁরা কোন আপত্তি করেন নি।

ভারতে বিদেশী পুঁজির অর্থ যে বিদেশী পুঁজি আমদানি করে অভ্যন্তরীণ স্বল্প পুঁজি বাড়ানো নয় এটাও তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন। ভারতীয় পুঁজিই বাণিজ্য, ব্যাংকিং ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে আগে বাইরে চলে গিয়ে পরে আংশিকভাবে ফিরে আসতো বিদেশী পুঁজি রূপে। তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন যে নীট আমদানির মধ্যে সমস্ত বিদেশী ঋণ ও বিনিয়োগ ধরার পর ভারতের রপ্তানির একটা নীট উদ্বৃত্ত থাকে।

বিদেশী পুঁজি ছাড়া ভারতে শিল্পযোজনা সম্ভব নয় এই মত তাঁরা মানেন নি। এটা হল বিদেশী পুঁজি সম্পর্কে তাঁদের ভাবনাচিন্তার একটা অনুসিদ্ধান্ত। তাঁরা বলতেন, ভারতীয় পুঁজিপতিরা যদি শিল্পযোজনার কাজ শুরু করেন এবং তার উন্নতিবিধান করেন একমাত্র তাহলেই যথার্থ অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব। বিদেশী পুঁজি একাজে অপারগ। এ ব্যাপারে রানাডেরও একই মত ছিল।

জাতীয়তাবাদী লেখকরা বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের রাজনৈতিক পরিণামের বিরুদ্ধেও সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তাঁরা বলতেন, বিদেশী পুঁজি সৃষ্টি করে কায়েমী স্বার্থ এবং এই কায়েমী স্বার্থ ক্রমশঃ প্রশাসনের ওপর তার প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করতে থাকে। যে দেশ আগেই বিদেশী শাসনাধীন হয়ে পড়েছে সেখানে এই বিপদ অনেক বেশি, কারণ সেখানে বিনিয়োগকারীরা চায় নিরাপত্তা ও বিদেশী শাসনের স্থায়িত্ব। ১৮৮৯ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর জি. সুব্রহ্মণ্য আয়ারের 'হিন্দু' লিখেছিল :

> কোন দেশে যখন বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়, উত্তমর্ণরা তৎক্ষণাৎ সে দেশের প্রশাসন নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকে।...দেশে বিদেশী পুঁজিপতিদের প্রভাব (যদি) বাড়তে দেওয়া হয়, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাফল্যের সব সম্ভাবনা তবে শেষ। বিদেশী পুঁজিপতিরা নির্ঘাৎ 'সাম্রাজ্য বিপন্ন' বলে প্রচণ্ড শোরগোল তুলবে, আর কংগ্রেসের কণ্ঠস্বর তাতে চাপা পড়ে যাবে।

জাতীয়তাবাদীরা বলেছিলেন, তবে বিদেশী পুঁজির প্রয়োজন হলে ভারতকে শুধু পুঁজিই আমদানি করতে হবে, পুঁজিপতি নয়। ব্যবসায়ীদের লগ্নি করা পুঁজির বদলে তাঁরা চাইতেন ঋণ হিসেবে পুঁজি। প্রথমটি উদ্যোগের পুরো মুনাফা আদায় করে নিয়ে যায়, একচেটিয়া করে 'সমগ্র ক্ষেত্রটিকে' দখল করে নেয়, আর দ্বিতীয়টির অধিকার থাকে শুধু নির্দিষ্ট সুদের উপর, এমন কি আসলও আস্তে আস্তে পরিশোধ করা যায়।

অবশেষে আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে সমকালের জাতীয়তাবাদী রচনায় দেশী মুৎসুদ্দির দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় একেবারেই অনুপস্থিত ছিল।

১৩

ইতিবাচক প্রতিবিধানের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদীদের মতে যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিল্পযোজনা ও অর্থনৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করবে সেগুলি হল শুল্ক নিরাপত্তা ও সক্রিয় সরকারি আনুকুল্য। তাঁরা নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন যে ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণী দুর্বল হওয়ায় কোন সহায়তা ছাড়া উন্নতিলাভ করা তাদের পক্ষে মুশকিল ছিল, বিশেষ করে তাদের যখন সংকীর্ণ বাজার ও অসংরক্ষিত ক্ষেত্রে অনিশ্চিত অবস্থার মোকাবিলা করতে হত। কিন্তু একই সঙ্গে তাঁরা এও বুঝেছিলেন যে সরকারি আনুকূল্য ও নিরাপত্তা পেলে পুঁজিপতি শ্রেণী নিশ্চিতভাবে সাড়া দেবে। তাঁদের মতে মডেলের অন্যদিকটি হল, অনুন্নত দেশে সরকার দায়বদ্ধ অর্থনৈতিক উন্নতিতে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে বাধ্য। আর শিল্প ও কৃষিতে সাহায্য করার সর্বোত্তম পন্থা হল তা সরাসরি ভাবে দেওয়া।

আগেই বলা হয়েছে, শুল্ক-নিরাপত্তার ব্যাপারে তাঁদের বক্তব্য সাধারণ পথেই গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সরকারের ভূমিকার কথা শুধু জোর দিয়েই নয়, কিছুটা মৌলিকভাবেও বলা হয়েছিল।[৪০] তাঁদের মতে যে যে উপায়ে সরকার সাহায্য করতে পারে তার কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হল ঃ

(১) সরাসরি সরকারের দ্বারা অথবা মূলধন বিনিয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে উদ্যোগীদের কম সুদে ঋণ দিয়ে অভ্যন্তরীণ বেসরকারি পুঁজির ঘাটতি পূরণ।

(২) রেল কম্পানিগুলোকে যেমন দেওয়া হয় সেই রকম ন্যূনতম লাভের প্রতিশ্রুতিসহ উদ্যোগগুলোতে ভরতুকি ও নিরাপত্তা দিয়ে ভারতের পুঁজিপতিদের 'অনীহা' দূর করা।

(৩) সরকারি সাহায্য-প্রাপ্ত, পরিচালিত, অথবা নিয়ন্ত্রিত জয়েন্ট স্টক ব্যাংক ও অন্যান্য অনুরূপ ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের উন্নতিসাধনের মাধ্যমে ছড়িয়ে থাকা দেশী পুঁজিকে সহজলভ্য করতে সাহায্য করা।

(৪) সরকার পরিচালিত ও আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত কৃষি ঋণ ব্যাংকগুলোকে সংগঠিত করা।

(৫) স্বাধীনভাবে বিদেশী পুঁজি আমদানি করে এবং তারপর স্থানীয় পুঁজিপতিদের সেই পুঁজি ঋণ দিয়ে ভারতীয় অর্থনীতিতে তাকে

পুরোপুরি নিয়োগ করতে এবং তার প্রভুত্ব থেকে দেশী পুঁজিকে রক্ষা করতে সাহায্য করা।

(৬) যেক্ষেত্রে স্থানীয় পুঁজির ঝুঁকি নেওয়ার আশা নেই সেখানে সরকারি মালিকানাধীন শিল্পের প্রবর্তন করা। যেসব শিল্পের জন্য প্রচুর বিদেশী পুঁজি দরকার যোশি ও নওরোজি সেক্ষেত্রে সরকারি পরিচালনার পরামর্শও দিয়েছেন। এরকম অবস্থায় সরকার তার রাজস্বের নিশ্চয়তার ভিত্তিতে কম সুদে বিদেশ থেকে ঋণ নেবে এবং জনকল্যাণ মূলক কাজকর্ম, খনির কাজ, শিল্প ইত্যাদিতে তা ব্যবহার করবে।

(৭) সেচের সুবিধা আরো বাড়ানো।

(৮) ভারতীয় নির্মাতাদের কাছ থেকে সরকারী ও রেলের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা।

(৯) শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ ও প্রচার করা।

(১০) প্রযুক্তিগত শিক্ষার উন্নতি বিধান করা।

(১১) পুঁজি চালানের অবসান ঘটানো।

১৪

ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের চিন্তাধারার দুর্বলতম অংশ হল তাঁদের কৃষি সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি। অবশ্য উঁচু হারে কর নির্ধারণ, নির্দিষ্ট সময়ান্তরে পুনর্নির্ধারণ এবং কর সংগ্রহের কঠোর পদ্ধতির ওপর প্রতিষ্ঠিত সরকারি ভূমি-রাজস্ব নীতিকে তাঁদের সমালোচনা করার অসুবিধে বিশেষ ছিল না। তাঁরা মনে করতেন এই নীতির জন্য জমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং কৃষিতে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ পুরোপুরি বিকাশলাভ করতে পারেনি। এর প্রতিবিধান ছিল সরকারি দাবিকে স্থায়ীভাবে সীমিত করা, যাতে কৃষিতে 'সম্পত্তির ভেলকি' অবাধে কাজ করতে পারে। পরে আলোচ্য কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছাড়া প্রকাশমান কৃষিসংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে ভারতীয়দের উপলব্ধি অবশ্য এই সম্পর্কে সামান্যীকরণের বাইরে যায়নি। বস্তুতঃ অধিকাংশ ভারতীয় কৃষিসম্পর্কের নূতন প্রকাশমান কাঠামোকে গুরুত্ব দিতে পারেননি, যদিও প্রজা ও ঋণভারাবনত কৃষককুলের জন্য তাঁরা অস্ফুট এক মানবিক উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছিলেন। একই সঙ্গে জমিদার বা ভূস্বামীর স্বার্থের সঙ্গে প্রজার অবাধ মেলবন্ধনও ছিল বিরল ঘটনা।

কিছু ভারতীয় জমিদারী প্রথাকে আক্রমণ করেছিলেন। একথা বিচারপতি রানাডে ও পৃথ্বীশ চন্দ্র রায় ছাড়াও তরুণ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও আর সি দত্ত সম্পর্কেও সত্য। জি. ভি. যোশী রায়তী এলাকার জমিদারতন্ত্র উদ্ভবের

তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। অনুরূপভাবে, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সহ বাংলার জাতীয়তাবাদীদের প্রভাবশালী গোষ্ঠী ১৮৮০র দশকে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিল নিয়ে বিতর্ককালে সম্পূর্ণভাবে প্রজাপক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। কিছু ভারতীয়, যেমন 'সোমপ্রকাশ' (২৪ জুলাই ও ২৭ নভেম্বর, ১৮৮১) এবং 'ইণ্ডিয়ান স্পেকটেটর'-এর (২ অক্টোবর ১৮৮১) সম্পাদকরা জমিদারী ব্যবস্থা বিলুপ্তিরও দাবি করেছিলেন।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের কয়েকজন তৎকালীন আধা-সামন্ততান্ত্রিক কৃষি সম্পর্কের বিরোধিতা করেছিলেন এবং পুঁজিবাদী ভিত্তির ওপর তার আমূল পুনর্গঠনের কথা বলেছিলেন—এঁদের মধ্যে রানাডের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। এই ব্যাপারে রানাডে প্রুশীয় ভূমি আইনের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রজার স্বার্থরক্ষার স্বল্পকাল-স্থায়ী প্রতিবিধান হিসেবে প্রজাস্বত্ব আইনের সমর্থন করলেও তিনি বিশ্বাস করতেন যে এই রকম আইন প্রণয়নের ফলে পুরোন ধাঁচের কৃষিসম্পর্ক স্থায়ী হয়, আরো জটিল হয়ে ওঠে এবং জমিদার ও প্রজা উভয়েরই উদ্যম আরো নষ্ট হয়ে যায়। তিনি সরকারকে কৃষির ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট পুঁজিবাদী-সম্পর্ক গড়ে তুলে অথবা তাঁর ভাষায়, 'ব্যক্তিগত ও স্বাধীন সম্পত্তির' ভিত্তিতে ভৌমসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে নিছক মেরামতির বদলে 'আমূল সংস্কারে' ব্রতী হওয়ার জন্য সনির্বন্ধ আবেদন জানিয়েছিলেন। তাঁর পুঁজিবাদী কৃষির মডেল দ্বিমুখী: অধিকাংশ কৃষক হবে স্বাধীন, জমির অধিকারী ছোট চাষী, একেবারে ওপরে থাকবে পুঁজিপতি খামার মালিকের একটা বড় শ্রেণী যারা, জমিদারদের মত না হয়ে, ব্রিটিশ ভূস্বামী বা জার্মান য়ুংকারের আদলে নিজেদের জমির পুরোপুরি মালিক হবে। সুতরাং তাঁর যুক্তি ছিল, ভারতে কৃষি সম্পর্কের ভবিষ্যৎ উন্নতির ভিত্তি হবে দুটি মৌলিক কৃষিশ্রেণী, এরা পাশাপাশি বাস করবে: (ক) ছোট চাষীদের একটা বিরাট গোষ্ঠী যারা সরকারের হোক বা জমিদারের হোক সব দায় থেকে মুক্ত থাকবে, যারা স্থায়ী ও কম হারে ভূমি-রাজস্বের সুবিধা পাবে এবং কৃষিব্যাংকের মাধ্যমে অল্প সুদে ঋণের সাহায্য পাবে; এবং খ) পুঁজিপতি খামার মালিক ও ভূস্বামীর এক বিশাল শ্রেণী, যারা কোন প্রজাস্বত্ব প্রভৃতির দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হওয়ায় তাদের জমির পূর্ণ অধিকার পাবে এবং পুঁজি বিনিয়োগ ও কৃষির আধুনিকতম উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে সক্ষম হবে। বর্তমান জমিদারদের পুঁজিপতি ভূস্বামীতে পরিণত করে এবং কৃষক সম্প্রদায়ের উচ্চতর শ্রেণীকে জমি পেতে ও নূতন সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সাহায্য করে এই শেষোক্ত শ্রেণীকে গড়ে তুলতে হবে।[৪১]

পক্ষান্তরে জি. ভি. যোশি সমর্থন করতেন ক্ষুদ্র কৃষকের কৃষিকর্ম—যাকে বজায় রাখতে হবে রায়তী ও জমিদারী উভয় অঞ্চলে কঠোর প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন করে, সহজলভ্য অল্প সুদে ঋণ আর কম হারে ভূমিরাজস্বের ব্যবস্থা করে।[৪২]

কিছু বিশিষ্ট ভারতীয় জাতীয়তাবাদী কৃষিউন্নয়ন ও আধুনিক শিল্পোন্নয়নের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কটির ওপরও জোর দিয়েছিলেন। দুটিকেই একই সঙ্গে সংঘটিত হতে হবে। অন্যথা নিছক কৃষিউন্নয়নের কোন চেষ্টাই সফল হবে না। কৃষির ওপর জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপের ফলে এসব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যত দিন জমির জন্য মাত্রাধিক প্রতিযোগিতা ছিল ততদিন কোন আইনই জমির জন্য আকুল প্রজাদের পিঠভাঙা করের বোঝা থেকে রক্ষা করতে পারেনি। একমাত্র শিল্পই পারত বাড়তি কৃষি-জনসংখ্যার ভার লাঘব করতে এবং কৃষির উন্নতির পরিবেশ রচনা করতে।

১৫

অর্থনৈতিক উন্নতির পথে অভ্যন্তরীণ বাধার প্রশ্নে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা আবারও ব্রিটিশ ধারণার সঙ্গে ভিন্ন মত হলেন। ভারতের বৃহৎ জনসংখ্যা এরকম একটি বাধা একথা তাঁরা সজোরে অস্বীকার করলেন। ভারত অতি জনভার-পীড়িত অথবা এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি একথা তাঁরা মানলেন না। বরং, তাঁদের মতে, অতিরিক্ত জনভার বলে যা মনে হচ্ছে তা হল ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা। একইভাবে, ভারতের মানুষ অসঞ্চয়ী, অমিতব্যয়ী অথবা কর্মবিমুখ এই ধারণাও তাঁরা নির্দ্বিধায় নস্যাৎ করে দেন।

অভ্যন্তরীণ পুঁজির ঘাটতিকে অর্থনৈতিক উন্নতির প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখা হত বটে, কিন্তু তাকে ভারতীয় অর্থনীতির সহজাত বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা হত না। ভারতীয়রা দেশে প্রচুর পুঁজির সম্ভাবনা আছে বলে বিশ্বাস করতেন। তাকে সচল করা এবং সদ্ব্যবহার করাই ছিল সমস্যা। সেই সময় এই পুঁজি সরকারি বেহিসাবী ব্যয়ের পথ দিয়ে বেরিয়ে যেত, ব্রিটেনে 'পাচার' হয়ে যেত, গোপনে সঞ্চিত হত, জমিদার ও রাজাদের অমিতব্যয়িতার ফলে অপচয় হত। আধুনিক ঋণদান সংস্থা ও জয়েন্ট স্টক উদ্যোগের পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানের অভাবের ওপরও তাঁরা জোর দিয়েছিলেন।

জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে কিছু সমাজ-সংস্কারক জোর দিয়েছিলেন জাতিভেদ প্রথা ও যৌথ পরিবার, ধর্মীয় ধ্যানধারণা এবং রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের মত চিরাচরিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিকূল প্রভাবের ওপর। বিশেষ করে তাঁরা দেশে কর্মোদ্যমের অভাবের জন্য দুঃখ প্রকাশ করতেন। এর একমাত্র প্রতিবিধান সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এবং জনসাধারণের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আমূল বদলানো। জাতীয়তাবাদীদের অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনায়, লেখায় ও বিক্ষোভে অবশ্য সমগ্র প্রশ্নটি বেশি গুরুত্ব লাভ করেনি। তার কারণ আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি।[৪৪]

১৬

ব্রিটিশ আর্থিক নীতি বা ধারণার সমালোচনা এবং প্রতিটি সমস্যার জন্য নিজস্ব সমাধান বাতলাতে গিয়ে জাতীয়তাবাদীরা বরাবর প্রশ্ন করেছেন: প্রশাসকরা কেন এসব উপলব্ধি করেন নি এবং কেন সঠিক নীতি অনুসরণ করেন নি? প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন যে একটা না একটা ব্রিটিশ অর্থনৈতিক স্বার্থ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ব্রিটিশ বাণিজ্য, শিল্প ও পুঁজির স্বার্থের কাছে ভারতের শিল্পোন্নতির স্বার্থকে গৌণ করে রাখা হয়েছিল। ক্রমশঃ তাঁরা এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছিলেন যে ব্রিটিশ আর্থিক নীতি ও ধারণা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং এই শাসনের মূল উদ্দেশ্য হল ভারতকে ব্রিটিশের প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক স্বার্থের সেবা করতে বাধ্য করা। অন্য ভাবে বলা যায়, ভারতকে আর্থিকভাবে শোষণ করতে সাহায্য করা। ১৯০৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারির 'ইণ্ডিয়ান পিপল' পত্রিকায় তরুণ বুদ্ধিজীবী সচ্চিদানন্দ সিংহ লিখেছিলেন:

> লর্ড কার্জনের বিধানে এদের প্রশাসনিক ক্রিয়াকর্ম হল শোষণকর্মের অনুবর্তী মাত্র। দক্ষ প্রশাসন ছাড়া বাণিজ্যে উন্নতি হয় না, আর শেষোক্তটিতে লাভ না থাকলে পূর্বোক্তটি মনোযোগ পাওয়ার যোগ্য নয়। সুতরাং ভারত সরকার সর্বদাই বণিক সভাগুলির অনুমোদনে এবং প্রায়শঃই তাদের নির্দেশে চালিত হয়। এবং এই হল 'সাদা মানুষের দায়।'

ব্রিটিশ শাসন আর অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক নয়, বরং কার্যতঃ তার প্রতিবন্ধক, এই অর্থনৈতিক বিশ্বাস পৌঁছে দিল এই প্রতীতিতে যে একমাত্র এক ভারতীয় সরকারই পারে অর্থনৈতিক অগ্রগতির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে। ১৯০৫ সালের মধ্যে সমস্ত বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী ও চিন্তানায়ক স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুললেন।

সংক্ষেপে: জাতীয়তাবাদী লেখকদের প্রধান তাত্ত্বিক অবদান হল: (ক) যে-সাম্রাজ্যবাদ লুণ্ঠন ও বলপূর্বক করসংগ্রহ অথবা বণিকবৃত্তির স্থূল পন্থা অনুসরণ না করে, বরং অবাধ বাণিজ্য ও পুঁজি বিনিয়োগের আরো প্রচ্ছন্ন ও জটিল কৌশলের মধ্য দিয়ে চালিত তার প্রকৃতি ও অর্থনৈতিক গঠন বিশ্লেষণ; (খ) উনিশ শতকের শেষ নাগাদ নানা ছদ্মরূপে সাম্রাজ্যবাদই যে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির পথে প্রধান বাধা হয়ে উঠেছিল এই বিশ্লেষণাত্মক সিদ্ধান্ত; এবং (গ) অনুকূল এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন এই তথ্য উপলব্ধি। অভ্যন্তরীণ সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামো, বিশেষত কৃষিকাঠামোর গুরুত্ব যে তাঁরা উপেক্ষা করেছিলেন সেখানেই তাঁদের ব্যর্থতা। উপরন্তু, তাঁদের সমগ্র অর্থনৈতিক চিন্তা ছিল এক পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কাঠামোর অন্তর্গত। ভারতের অর্থনীতি যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ হিসেবে বিশ্বপুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত

হয়েছিল সেই সময় সরকারি সাহায্য নিয়েও তা জাতীয় পুঁজিবাদী পথরেখা ধরে গড়ে উঠতে পারে কিনা এ প্রশ্ন তাঁরা কখনো করেননি। স্বাধীনতার পরে শেষোক্তটির এক শক্তিশালী জাতীয় আন্দোলনের দিকে এবং এক লক্ষণীয় অর্থনৈতিক উদ্যোগের পথে চালিত করার কথা থাকলেও পূর্বোক্তটির ব্যাপক প্রভাব এবং সংকীর্ণ শ্রেণীস্বার্থের চাপে শেষোক্ত ধারণার ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্তি উত্তর-জাতীয়তাবাদী যুগের ভারতীয় নেতৃত্বের উদ্যোগে দ্বিধাও বাধা হয়েছিল এবং হয়ত অবশেষে সেই উদ্যোগ পরিত্যাগ করতে তাঁদের বাধ্যও করেছিল। উত্তর-স্বাধীনতা কালে প্রাক্তন জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি বর্জন, উত্তর-স্বাধীনতা কালের নেতৃত্বের 'বিশুদ্ধ' ও 'বৈজ্ঞানিক' দৃষ্টিভঙ্গির নামে সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ভূমিকা, আধা-সামন্ততান্ত্রিক কৃষি সম্পর্ক এবং রাষ্ট্রশক্তি ও অর্থনীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থেকে মনোযোগ সরিয়ে নেওয়া এবং কিছু গালভরা তথাকথিত আধুনিক অর্থনৈতিক তত্ত্ব নির্বিচারে গ্রহণ এই অবক্ষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। তবে এই ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের ব্যাপারটা অর্থনীতিবিদদের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

টীকা

1. ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদরা একটিমাত্র ভারতীয় অর্থনৈতিক সমস্যার প্রতি খুব বেশি মনযোগ দিয়েছেন, আর সেটি হল মুদ্রা ব্যবস্থা; কিন্তু এ বিষয়ে আলোচনা কালে উন্নয়নের ব্যাপকতর সমস্যা নিয়ে কদাচিৎ আলোচনা করা হত।

2. এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ভারতের কেবল অর্থনৈতিক নয় অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কেও ঐ সময়ে, বিশেষ করে 1880 সালের পরে প্রকাশিত ব্রিটিশ পুস্তকাদির সংখ্যা খুবই নগণ্য ছিল।

3 বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য আমরা অবশ্য উভয় পক্ষেরই স্বল্পসংখ্যক বিরোধী মতাবলম্বীকে বাদ দিয়েছি। গোড়া থেকেই হিন্ডম্যান, কনেল, অসবোর্ন ও ডিগবি প্রমুখ কতিপয় ব্রিটিশ লেখকের মতামত জাতীয়তাবাদীদের অনুরূপ ছিল, এবং সরকারি দৃষ্টিভঙ্গিতে পুরোপুরি সায় দেওয়া কিছু ভারতীয়ও ছিলেন। কিন্তু, প্রথমোক্তরা ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আর শেষোক্তরা কেবল সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিধ্বনি করেছেন।

4. ভারতীয়দের সম্পর্কে, বিপান চন্দ্র, 'দ্য রাইজ অ্যান্ড গ্রোথ অব ইকনমিক ন্যাশন্যালিজম ইন ইন্ডিয়া' (নয়া দিল্লি 1966), পৃ: 5-7, 24-25, 27 দ্রঃ। ব্রিটিশদের সম্পর্কে জন ও রিচার্ড স্ট্র্যাচি 'দ্য ফিন্যান্সেস অ্যান্ড পাবলিক ওয়ার্কস অব ইন্ডিয়া' 1869-1881 (1882), p 429; এম. ই. গ্র্যান্ট ডাফ 'সি. আর.' ('দ্য কনটেম্পোরারি রিভিউ'), ফেব্রুঃ 1887, পৃঃ 192 এবং সেপ্টেঃ 1891, পৃঃ 328 দ্রঃ।

5. 'দ্য ইভোলিউশন অব ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান, 1858 টু 1947'-এর মুখবন্ধ, 'সিলেক্ট ডকুমেন্টস্' 1962 (1965 পুনর্মুদ্রণ), viii.

6. 'এড. আর.' ('দ্য এডিনবরা রিভিউ'), জুলাই 1882, পৃঃ 68। 'কিউ. আর.' ('দ্য কোয়ার্টার্লি রিভিউ'), এপ্রিল 1880, পৃঃ 491-92-তে এঁর প্রবন্ধও দ্রঃ।

7. 'দ্য ফিন্যান্সেস অ্যান্ড পাবলিক ওয়ার্কস অব ইন্ডিয়া', পৃঃ 6 ও 8। পৃঃ 7, 11, 324-25ও দ্রঃ।

8. 'দ্য রেইন অব কুইন ভিক্টোরিয়া' (সম্পাদিত) গ্রন্থে এইচ. এস. মেইন, "ইন্ডিয়া", টমাস হেনরি ওয়ার্ড, I খন্ড (1887), পৃঃ 486, 494, 518 ও 524; আর. ডি. ম্যাঙ্গল্‌স্‌, 'এড. আর.', জানুঃ 1864, পৃঃ 96; টি. মল্টাব, 'কিউ. আর.' জুলাই 1866, পৃঃ 207-08; "দ্য ক্যারেকটার অব ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া", 'ডব্লু. আর.' ('দ্য ওয়েস্টমিনস্টার রিভিউ'), জুলাই 1868, পৃঃ 22; "দ্য ফিউচার অব দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার", 'ডব্লু. আর.' জুলাই 1870, পৃঃ 51; ডব্লু. লি-ওয়ার্নার, 'কিউ. আর.' এপ্রিল 1879, পৃঃ 386-87, এবং জুলাই 1881, পৃঃ 58, 63, 74; এল. জে. জেনিংস, 'কিউ. আর.' এপ্রিল 1885, পৃঃ 504; এম. ই. গ্রান্ট ডাফ, 'সি. আর.'; জানুঃ 1887, পৃঃ 12-13; এ. লায়াল, 'এড. আর.', জানুঃ 1884, পৃঃ 9, জানুঃ 1889, পৃঃ 421 এবং জানুঃ 1895, পৃঃ 17; চার্লস ডব্লু ডিলকে, 'প্রব্‌লেমস্‌ অব গ্রেটার ব্রিটেন' (1890), II খন্ড, পৃঃ 21; জে. এ. বেন্‌স্‌, 'কিউ. আর.', পৃঃ 313-14, 321: জন স্ট্র্যাচি, 'ইন্ডিয়া' 1894 সম্পাঃ; পৃঃ 301, 303; বিপান চন্দ্র, পৃঃ 28-29ও দ্রঃ।

9. ডব্লু. ডব্লু. হান্টার, 'দ্য ইন্ডিয়া অব দ্য কুইন অ্যান্ড আদার এসেজ' (লন্ডন 1903), পৃঃ 123. পৃঃ 125-26, 147ও দ্রঃ।

10. ঐ, পৃঃ 4। অনুরূপভাবে রিচার্ড টেম্পল, খুব সতর্ক ভাবে হলেও মূলতঃ আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রহণ করেছেন, 'ইন্ডিয়া ইন 1880' (তৃতীয় সংস্করণ 1881), iv, পৃঃ 93 অনুবর্তী, 493, 495।

11. 'অফিসিয়াল পেপার্স' (1926), পৃঃ 289।

12. অগ্রগতির যুগ কেবল 1850-এর দশকে শুরু হয়েছে, আগের যুগ ছিল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংহতির কাল - এই ছিল সাধারণ বিশ্বাস। উদাহরণ স্বরূপ, "ইংলিশ রুল ইন ইন্ডিয়া" 'ডব্লু. আর', জুলাই 1861, পৃঃ 123; আর. ডি. ম্যাঙ্গল্‌স্‌, 'এড. আর', জানুঃ 1864, পৃঃ 97-98; "ইন্ডিয়ান ওয়ার্দি'স", 'ডব্লু. আর.', জানুঃ 1868, পৃঃ 161; ডব্লু. আর. ম্যানসফিল্ড, 'এড. আর', এপ্রিল 1876, পৃঃ 404; জে. এবং আর. স্ট্র্যাচি, পৃঃ 1 অনুবর্তী; জি. ক্যাম্পবেল, 'এড. আর.', জুলাই 1882, পৃঃ 68; মেইন, পৃঃ 484-85।

13. 'এড. আর', জানুঃ 1864, পৃঃ 96-97 (তিনি ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে 'সিপাহী বিদ্রোহে'র তুলনা করেন: '1793 সালের বিপ্লব ফ্রান্সের জন্য যা করেছে, পুনরুজ্জীবনের সংক্ষিপ্ততর এবং অপেক্ষাকৃত কম কন্টকর প্রক্রিয়ার মধ্যে সিপাহী বিদ্রোহও ভারতের জন্য তাই করেছে···প্রচন্ড এই ঝঞ্ঝাবাত্যার ফলে···আবহাওয়া নির্মল হয়েছে, এবং প্রগতি ও বিকাশ বহুলাংশে স্বচ্ছন্দে ও নির্বিঘ্নে সম্ভব হতে পেরেছে", পৃঃ 97-98); 'ইংলিশ রুল ইন ইন্ডিয়া', 'ডব্লু. আর.', জুলাই 1862, পৃঃ 113, 131, 137-38; টি. মল্টাব, 'কিউ. আর.', জুলাই 1866, পৃঃ 214 অনুবর্তী: টেম্পল পৃঃ 5, 501-02; ডব্লু, লি ওয়ার্নার, 'কিউ. আর', জুলাই 1881পৃঃ 60-63, 65; জে. এবং আর. স্ট্র্যাচি, পৃঃ। অনুবর্তী, 185, 325; জি. ক্যাম্পবেল, 'এড. আর', জুলাই 1882, পৃঃ 67-68; এল জে. জেনিংস, 'কিউ, আর.', এপ্রিল 1885, পৃঃ 504; মেইন, পৃঃ 486; চার্লস ডিল্‌কে, পৃঃ 86; হান্টার, পৃঃ 153।

14. এটি একটি স্থায়ী ব্যাপার। উদাহরণ স্বরূপ, 'দ্য ক্যারেকটার অব ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া,' 'ডব্লু. আর', জুলাই 1868, পৃঃ 5-6; হান্টার, পৃঃ 99 অনুবর্তী, 113, 124-25; জে. এবং আর. স্ট্র্যাচি, পৃঃ 11, 101-02; এল. জেনিংস, 'কিউ. আর', এপ্রিল 1885, পৃঃ 504; মেইন, পৃঃ 501; এফ. সি চ্যানিং, "ইকনমিক রিভিউ", জানুঃ 1902, পৃঃ 121।

15. হান্টার, পৃঃ 100 অনুবর্তী, 106 অনুবর্তী; জে. এবং আর. স্ট্র্যাচি, পৃঃ 11 মেইন, পৃঃ 520; এল. জে. জেনিংস, 'কিউ, আর', এপ্রিল 1886, পৃঃ 454; জে. স্ট্র্যাচি, পৃঃ 159।

16. অ্যাডাম স্মিথ সম্পর্কে বার্ট এফ. হোসলিজ সম্পাদিত "থিয়োরিজ অব ইকনমিক গ্রোথ" (ইলিনয়, 1960)-এ জে. এম. লেটিশ কৃত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ; রিকার্ডো সম্পর্কে ডোনাল্ড উইন্‌চ, "ক্ল্যাসিকাল পলিটিক্যাল ইকনমি অ্যান্ড কলোনিজ" (1965), পৃঃ 60, 91 দ্রষ্টব্য।

17. "প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্‌ অব পলিটিক্যাল ইকনমি", ডব্ল্যু. জে. অ্যাশলি সম্পাদিত (1926 মুদ্রণ), পৃঃ 18, 113-14, 121।

18. ঐ, পৃঃ 189, 701।

19. "ম্যানুয়াল অব পলিটিক্যাল ইকনমি" (1883 সং), পৃঃ 87।

20. ঐ, পৃঃ 453।

21. ঐ, পৃঃ 87। গুরুত্ব আরোপিত।

22. 34-39 পাদটীকায় উল্লেখিত অধিকাংশ লেখকই এ কথা বলেছেন।

23. চার্লস ডিলকে, "গ্রেটার ব্রিটেন" (1868), পৃঃ 531 ; হান্টার, পৃঃ 97 ; টেম্পল, পৃঃ 497 ; জে. ই. সি. বর্ডাল, 'কিউ. আর', এপ্রিল 1890, পৃঃ 556 ; জি. সি. লুইস, "অ্যান এসে অন দ্য গর্ভনমেন্ট অব ডিপেনডেন্সিস" (1981 সং) গ্রন্থে সি. পি. লুকাস কৃত ভূমিকা।

24. মিল, পৃঃ 121-22।

25. জে. এবং আর. স্ট্রাচি, পৃঃ 312, 316-17, 324 ; আর. ডি. ম্যাঙ্গল্‌স্‌, 'এড, আর', জানুঃ 1864, পৃঃ 100-01 ; 'দা ফিউচার অব দা ব্রিটিশ এম্পায়ার', 'ডব্ল্যু. আর', জুলাই 1870, পৃঃ 50-51 ; টি, মন্টীথ, 'কিউ. আর', জুলাই 1866, পৃঃ 207 ; হান্টার, পৃঃ 122 অনুবর্তী : টেম্পল, পৃঃ 309, 311, 316 ; 'দা রিলেশন অব সিলভার টু গোল্ড কয়েন', 'ডব্ল্যু. আর', জানুঃ 1880, পৃঃ 136 ; ডব্লু. লি. ওয়ার্নার, 'কিউ. আর.', জুলাই 1881 পঃ 61 ; জে. স্ট্রাচি, পৃঃ 155, 304।

26. মেইন, পৃঃ 521 ; জে. স্ট্রাচি, পৃঃ 146 ; হান্টার, পৃঃ 125 ; টেম্পল্‌, পৃঃ 91 ; ফসেট, পৃঃ 61 দ্রষ্টব্য।

27. টেম্পল্‌, পৃঃ 91 ; এম. ই, গ্র্যান্ট ডাফ, 'সি আর', জানু : 1887, পৃঃ 17-18।

28. মিল, পৃঃ 922।

29. এইচ. সিজউইক, 'দা প্রিন্সিপল্‌ অব পলিটিক্যাল ইকনমি' (1683), ভাগ III, অধ্যায় V ; এ. মার্শাল, 'প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্‌ অব ইকনমিক্‌স্‌' (8 সংস্করণ, লন্ডন 1925), পৃঃ 465 ; এফ. ওয়াই. এজওয়ার্থ, 'ইকনমিক জার্নাল' (1894)।

30. রবার্ট রোডস্‌ জেমস্‌, 'লর্ড র‍্যান্ডলফ চার্চিল' (1959), পৃঃ 138।

31. লক্ষণীয় যে এই মত বা ফেবিয়ানবাদ কোনটাই তদানীন্তন ব্রিটিশ আধিকারিকদের মধ্যে খুব বেশী সাড়া জাগাতে পারে নি, অথচ এর আগে কিন্তু ভারতে উপযোগবাদের বহু সমর্থক মিলেছিল। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ব্রিটেনে প্রচলিত ভাবধারাগুলি যখন কোন না কোন ভাবে ভারতে সাম্রাজ্যবাদের শক্তিবৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছে, একমাত্র তখনই সেগুলি ব্রিটেনের ভারতের নীতি নির্ধারক ও আধিকারিকদের প্রভাবিত করেছে।

32. জে. এবং আর. স্ট্র্যাচি, পৃঃ 429 ; এছাড়া, 'ঐ' IX, পৃঃ 3, 7, 86, 105, 401-02 ; আর. ডি. ম্যাঙ্গল্‌স্‌, 'এড আর', জানুঃ 1864, পৃঃ 118 অনুবর্তী ; জন ক্লার্ক মার্শম্যান, 'কিউ. আর', জুলাই 1868, পৃঃ 77 ; ফসেট, পৃঃ 61 ; মেইন, পৃঃ 491-92 ; এ. মার্শাল, 'প্রিন্সিপলস', পৃঃ 225।

33. হান্টার, পৃঃ 98-99, 159 ; জে. এবং আর. স্ট্র্যাচি, পৃঃ 105 অনুবর্তী ; মেইন, পৃঃ 491 ; টেম্পল, পৃঃ 263 ; জে. স্ট্র্যাচি, পৃঃ 171 অনুবর্তী।

34. মিল, পৃঃ 189-90।

35. 'ডব্ল্যু. আর.' পৃঃ 222-23।

36. 'এড. আর.', জানুঃ 1864, পৃঃ 98।

37. 'কিউ. আর.', জুলাই 1881, পৃঃ 61, 78 ; এছাড়া, 'কিউ. আর.' জুলাই 1883, পৃঃ 248, 250-তে তাঁর প্রবন্ধ।

38. 'সি. আর.', জানুঃ 1887, পৃঃ 15।

39. 'বক্তৃতাবলী', খন্ড I (1900), পৃঃ 34। 'ইংলিশ রুল ইন ইন্ডিয়া', 'ডব্লু. আর.' জুলাই 1862, পৃঃ 138 ; জে. এবং আর. স্ট্র্যাচি, পৃঃ 404, 425 ; টেম্পল, পৃঃ 106 দ্রষ্টব্য।

40. জে. এবং আর. স্ট্র্যাচি, পৃঃ 405 ; টেম্পল, পৃঃ 88 ; জে. স্ট্র্যাচি, পৃঃ 159-60।

41. মিল, পৃঃ 738-39। আরও বিশদ আলোচনার জন্য পৃঃ 724-39 দ্রষ্টব্য। বেনথাম, ওয়েকফিল্ড্ এবং টরেন্সের অনুরূপ মতামতের জন্য উইন্চ, পৃঃ 33, 77-81, 87 দ্রষ্টব্য।

42. 'ডব্লু. আর.', জুলাই 1862, পৃঃ 136-38।

43. আর. ডি. ম্যাঙ্গলস, 'এড. আর', জানুঃ 1864, পৃঃ 96 অনুবর্তী ; 'দা ফিউচার অব ইন্ডিয়া' 'ডব্লু. আর', জুলাই 1870, পৃঃ 63-65 ; টেম্পল, পৃঃ 496 ; হার্বার্ট টেলর, 'সি. আর', মার্চ 1881, পৃঃ 476 ; সি. পি. লুকাস, পৃঃ 'এল'।

44. বক্তৃতাবলী, খন্ড III (1904), পৃঃ 134।

45. 'কিউ. আর', জুলাই 1868, পৃঃ 48।

46. টেম্পল, পৃঃ 497।

47. 'দা ফিউচার অব দা ব্রিটিশ এম্পায়ার', 'ডব্ল্যু. আর.', জুলাই 1870, পৃঃ 64-65 ; এ. এইচ. হ্যাগার্ড, 'সি. আর.', আগস্ট 1883, পৃঃ 267 ; গোল্ডউইন স্মিথ, 'সি. আর.', এপ্রিল 1884, পৃঃ 526 ; জি. বেডেন পাওয়েল, 'সি. আর.', অক্টোঃ 1886, পৃঃ 499 ; এম. ই. গ্রান্ট ডাফ, 'সি. আর.', জানুঃ 1887, পৃঃ 15 ; মেইন, পৃঃ 486। প্রকৃতপক্ষে, গ্রান্ট ডাফের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে : "সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে বহুব্যক্তি 'ভারতীয় হোম রুলের' লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে যে সব সুপারিশ করেন, ব্রিটিশ সংসদ সেগুলি অগ্রাহ্য না করলে, ভারতকে আমরা যে বহু মিলিয়ন পাউন্ড ধার দিয়েছি, শেষ পর্যন্ত সেগুলির মূল্য বহু মিলিয়ন পেনিতে পর্যবসিত হবে।"

48. স্যার জর্জ পেশের মতে ভারত ও সিংহলে ব্রিটিশ মূলধনের পরিমাণ 1909 সালে 365 মিলিয়ন পাউন্ডে দাঁড়িয়েছিল। এর মধ্যে বাণিজ্যিক ও শিল্প সংস্থাগুলিতে বিনিয়োগ করা হয় মাত্র 25 মিলিয়ন পাউন্ড। 'জার্নাল অব দা রয়াল স্ট্যাটিস্টিক্যাল সোসাইটি', ভাগ II, জানুঃ 1911, পৃঃ 180।

49. এল. এইচ. জেঙ্কস, 'দা মাইগ্রেশন অব ব্রিটিশ ক্যাপিটাল টু 1875', (লন্ডন 1927) দ্রঃ।

50. ভারতীয়দের হাতে যথেষ্ট পুঁজি ছিল না এ ধারণা মেনে নিয়েও রিচার্ড টেম্পল্ 'দেশীয় পুঁজির কি হল ?' এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণে অর্থনৈতিক যুক্তি খুব একটা নেই। পৃঃ 93-97 দ্রঃ।

50(a). হান্টার, পৃঃ 98, 116 ; জে. এবং আর. স্ট্র্যাচি, পৃঃ 16 ; টেম্পল, পৃঃ 82, 105, 230 ; ফ্রেড জে. অ্যাটকিনসন, 'জার্নাল অব দা রয়াল স্ট্যাটিস্টিক্যাল সোসাইটি', ভাগ II, জুন 1902, পৃঃ 215-20, 269।

50(b) উপরে পাদটীকা 33 দ্রষ্টব্য।

51. হান্টার, পৃঃ 112 অনুবর্তী ; এ. লায়াল, 'এড. আর.' জানুঃ 1884, পৃঃ 28-29।

52. এ. লায়াল, 'এড. আর.', জানুঃ 1884, পৃঃ 28-29।

53. ঐ, পৃঃ 28-34, গুরুত্ব আরোপিত।

54. ঐ, পৃঃ 34।

55. হান্টার, পৃঃ 224 অনুবর্তী ; সি. ডব্লু. ম্যাকমান, 'সি. আর.', জানুঃ 1890, পৃঃ 82 অনুবর্তী। দখলি প্রজা-তথা-মধ্যস্বত্বভোগীদের নয়, বরং প্রকৃত কৃষিজীবীদের রক্ষণাবেক্ষণের এবং 'পরজীবী জমিদারদের' পাওনা মিটিয়ে দিয়ে জমি থেকে অপসারিত করার জন্য আলোচ্য শ্রেণী ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত লেখকরা মাঝে মাঝে প্রগতিশীল ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেছেন। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, 'সি আর', অক্টোঃ 1883 পৃঃ 596 ; এবং ভি. ন্যাশ, 'সি. আর.', নভেঃ 1900, পৃঃ 690।

56. জে. স্ট্র্যাচি, পৃঃ 333। তিনি মূলতঃ কৃষি বিকাশের পূর্বতন তত্ত্বকেও দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে গেছেন।

57. টেম্পল, পৃঃ 115। এ. লায়াল, 'এড. আর,', জানুঃ 1884, পৃঃ 32 ; হান্টার, পৃঃ 24 ; এম. ই. ডি প্রথেরো, 'কিউ. আর', অক্টোঃ 1895, পৃঃ 446।

58. পূর্বতন শাসকদের কাজের সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। জানা গেছে যে ওঁরা উদ্বৃত্তের সম্পূর্ণটাই, এমন কি মাঝে মাঝে আরও বেশি নিয়ে নিতেন।

59. বিশদ আলোচনার জন্য ডব্লু. লি. ওয়ার্নার, 'কিউ. আর', এপ্রিল 1879, পৃঃ 380-92। এই মতের বিভিন্ন দিক 'ডব্লু. আর, জানুঃ 1880, পৃঃ 196 ; ডব্লু. রডফুট, 'কিউ. আর', অক্টোঃ 1897, পৃঃ 558 ; হান্টার, পৃঃ 146 ; টেম্পল, পৃঃ 221-22 ; এল. অ্যাশবার্নার, 'ডব্লু. আর', জানুঃ 1898, পৃঃ 65 ; এস. এস. থরবার্ণ, 'প্রবলেমস্ অব ইন্ডিয়ান পোভার্টি' (1902), পৃঃ 9 অনুবর্তী।

60. ডব্লু. লি. ওয়ার্নার, 'কিউ. আর', এপ্রিল 1879, পৃঃ 390, 395 ; 'ডব্লু. আর', জানুঃ 1880, পৃঃ 196 ; টেম্পল, পৃঃ 116-17 ; ডব্লু. রডফুড', অক্টোঃ 1897, পৃঃ 559 ; এফ সি. চ্যানিং, 'ইকনমিক রিভিউ', অক্টোঃ 1900, পৃঃ 456।

61. 'কিউ আর', এপ্রিল 1879, পৃঃ 391 ; বিস্তারিত বিবরণের জন্য ঐ, পৃঃ 380, 383-84, 394-96, 401 ও দ্রষ্টব্য। এ. লায়াল' 'এড আর', জানুয়ারি 1884, পৃঃ 32-33 হান্টার, পৃঃ 162 ও দ্রষ্টব্য।

62. ডব্লু. লি. ওয়ার্নার, 'কিউ আর', এপ্রিল 1879, পৃঃ 377 অনুবর্তী ; এ. লায়াল, 'এড আর', জানুয়ারি 1884, পৃঃ 33 ; ডব্লু. রডফুট, 'কিউ আর', অক্টোবর 1897, পৃঃ 558-59। এম. ই ডি. প্রথেরো, 'কিউ আর', অক্টোবর 1895, পৃঃ 446 অনুবর্তী ; এবং এল. অ্যাশবার্নার, 'ডব্লু. আর', জানুয়ারি 1898, পৃঃ 65-66 দ্রষ্টব্য।

63. ডব্লু লি. ওয়ার্নার, 'কিউ আর', এপ্রিল 1879, পৃঃ 396 অনুবর্তী ; এ. লায়াল, 'এড আর.', জানুয়ারি 1884, পৃঃ 33, ডব্লু. রডফুট, 'কিউ আর', অক্টোবর 1897, পৃঃ 558-59।

64. হান্টার, পৃঃ 4, 42, 99, 133-34, 138 অনুবর্তী ; 146-47, 184-85 ; আর. গিফেন, 'ইকনমিক এনকোয়ারিজ এন্ড স্টাডিজ' (1904). II খন্ড, পৃঃ 18, 20, 230, 238 ; মেইন, পৃঃ 518 অনুবর্তী ; ডব্লু. নাইটন, 'সি আর', ডিসেঃ 1880, পৃঃ 896 ; ডব্লু. লি. ওয়ার্নার, 'কিউ আর', জুলাই 1881, পৃঃ 55 অনুবর্তী ; এম. ই. ডি প্রথেরো, 'কিউ আর', অক্টোঃ 1895 পৃঃ 449 ; 'দ্য ডেভলপমেন্ট অব ইন্ডিয়া', 'ডব্লু. আর', মার্চ 1888, পৃঃ 348 ; জে. ডি. অ্যান্ডারসন, 'ডব্লু. আর', এপ্রিল, পৃঃ 456.

65. টেম্পল্, পৃঃ 80 অনুবর্তী ; জে. স্ট্র্যাচি, পৃঃ 304-05।

66. অবশ্যই তাঁরা অন্যান্য ক্ষেত্রে ভারতবর্ষীয় সমাজের নানা দুর্গ্রহ যেমন, ঋণগ্রস্ততার কারণ হিসাবে সামাজিক উন্নতি বা অমিতব্যয়িতা ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক কিছু লিখেছেন।

67. হান্টার, পৃঃ 146 ; মেইন, পৃঃ 519 ; এস. স্মিথ, 'সি আর', ডিসেঃ 1880, পৃঃ 70-71।

68. মার্শাল, টীকা 29, পৃঃ 225।

69. টেম্প্‌ল্‌, পৃঃ 100 ; 'দ্য ডিভলপমেন্ট অব ইন্ডিয়া', 'ডব্ল্যু আর', মার্চ 1888, পৃঃ 348।

70. 'ইংলিশ রুল ইন ইন্ডিয়া', 'ডব্ল্যু. আর', জুলাই 1862, পৃঃ 121 ; ডব্ল্যু. লি-ওয়ার্নার, 'কিউ আর', জুলাই 1881, পৃঃ 62-63 ; হান্টার, পৃঃ 32 অনুবর্তী ; টেম্প্‌ল্‌, VII অধ্যায়।

71. টেম্প্‌ল্‌, পৃঃ 447, 450 ; হান্টার, পৃঃ 167, 176, 182 ; এ. মার্শাল, 'অফিসিয়াল পেপার্স', পৃঃ 290 অনুবর্তী।

72 ভারতবর্ষ সম্পর্কে বেশির ভাগ ব্রিটিশ লেখকই এ কথা বলেছেন যেমন, হান্টার, পৃঃ 135 অনুবর্তী ; জন আডাই, 'এড আর', জানুঃ 1880, পৃঃ 89 ; 'দ্য পোভার্টি অব ইন্ডিয়া', 'ডব্ল্যু. আর', নভেঃ 1887, পৃঃ 999-1001, 1004 ; কার্জন 'স্পিচেস্‌' IV খণ্ড, পৃঃ 37 দ্রষ্টব্য।

73. যেমন, হান্টার, পৃঃ 184-85, 191 ; টেম্প্‌ল্‌, পৃঃ 493 দ্রষ্টব্য।

73.(a). ডব্ল্যু. লি-ওয়ার্নার, 'কিউ আর', জুলাই 1881, পৃঃ 74-75 ; টেম্প্‌ল্‌, পৃঃ 447, 450 ; এ. লায়াল, 'কিউ আর', এপ্রিল 1893, পৃঃ 316, 'এড আর', জানুঃ 1897, পৃঃ 12-13, এম. ই. ডি. প্রথেরো, 'কিউ আর', অক্টোঃ 1895, পৃঃ 440 ; এইচ. জি. কীন, 'ডব্ল্যু. আর', এপ্রিল 1897 পৃঃ 358-59.

74. এটা ঠিকই যে এই সব চিন্তাধারা ও মডেল সম্পর্কে লেখা বহু ঐতিহাসিক রচনাই আজও প্রযোজ্য। 'তথ্যে'র প্রতি আনুগত্য এবং 'সমাজতাত্ত্বিক কল্পনা'র যে সব 'প্রবণতা' ব্যবহার করা হয় সেগুলি এড়িয়ে চলার ইচ্ছার নামে সমসাময়িক সরকারি নথিপত্র এবং রচনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতার ফলেই প্রধানতঃ এটা ঘটেছে। ফল—উনবিংশ শতাব্দীর সরকারি প্রবণতার কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ।

74(a). প্রবন্ধটির গোটা ভারতীয় অংশ লেখকের উপরোক্ত অনুশীলনের ভিত্তিতে রচিত।

75. 'এসেস্‌', পৃঃ 99।

76. 'সাম ইকনমিক আসপেক্টস্‌ অব ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া' (1903), পৃঃ 357।

77. জি. ভি. যোশী, 'রাইটিংস এন্ড স্পিচেস', (পুণা 1912), পৃঃ 687-88 ; তিলক, রামগোপাল রচিত 'লোকমান্য তিলক' (বোম্বাই 1956) গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ 145।

78. যোশী, টীকা 77, পৃঃ 696।

79. 'ইন্ডিয়া', 20 মার্চ 1903, পৃঃ 140-এ 'পোর্টসমাউথে বক্তৃতা'।

80. লক্ষণীয় যে 1948-পরবর্তী কালে ভারত সরকারের শিল্পনীতি আগেকার জাতীয়তাবাদীদের তৈরি নকশা থেকে খুব একটা এগোতে পারেনি। জওহরলাল নেহরুকে এক্ষেত্রে আদৌ রূপকার বলা যায় না। কেবল আগেকার জাতীয়তাবাদীরা যে কর্মসূচীকে রাষ্ট্র-সমর্থিত পুঁজিবাদ বলে বর্ণনা করেছিলেন, নেহরু প্রথমে তাকে মিশ্র অর্থনীতি বলে এবং পরে 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ' বলে অভিহিত করেছিলেন।

81. বিপান চন্দ্র, টীকা 4, পৃঃ 486 অনুবর্তী।

82. ঐ, পৃঃ 441-42।

83. ঐ, পৃঃ 84-85।

84. এই উপলব্ধি থেকেই তাঁরা অর্থনীতিক হয়ে উঠলেন। এই কারণেই তাঁরা চিরায়ত অর্থনীতিবিদদের কতকগুলি মৌলিক বক্তব্যকে খণ্ডন করলেও তাঁদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি চিরায়ত অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। অপর পক্ষে, আলফ্রেড মার্শাল এঁদের উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারেননি বললেই হয়।

পুস্তক বিষয়ক টীকা ঃ উনিশ শতকের ব্রিটিশ পত্রপত্রিকায় অজ্ঞাতনামা লেখকদের পরিচয় 'ওয়েলেস্‌লি ইনডেক্স টু ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডিক্যাল্‌স্‌' 1966 থেকে গৃহীত।

ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনের উপাদান :
আদি জাতীয়তাবাদী ক্রিয়াকলাপ

সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয়েছে যে ১৯০৫ সালে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে এক মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছিল এবং সম্ভবত দ্বিতীয় পরিবর্তন ঘটেছিল ১৯১৯ সালে। ফলে এই আন্দোলনকে পরিষ্কারভাবে তিনটি আলাদা পর্যায় বা কালপর্বে ভাগ করাই রীতি। এই বিভাজনের সমর্থনে অনেক যুক্তি আছে। তা হলেও, এই কালবিভাজনের সঙ্গে জড়িত মৌলিক ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনের ব্যাপারটা নিয়ে কিছুটা বিতর্ক রয়েছে। এই প্রবন্ধের মূল প্রকল্প হল এই যে জাতীয়তাবাদী যুগের গোড়া থেকেই একটা সাধারণ প্রবণতা ছিল কিছু মৌলিক ধারাবাহিকতাকে উপেক্ষা করা, ধারাবাহিকতার ছেদ বা পরিবর্তন না ঘটলেও তা ঘটেছে বলে মনে করা, এবং যেসব পরিবর্তন ঘটেছে তার ওপর মাত্রাধিক জোর দেওয়া বা তার ভুল ব্যাখ্যা করা।

কোন আন্দোলনের মূল উপাদান হল : রাজনৈতিক লক্ষ্য, কর্মসূচী ও মতাদর্শ, রাজনৈতিক সংগ্রামের পরিচালন দক্ষতা ও পদ্ধতি ও প্রয়োগকৌশল, সামাজিক ভিত্তি, এবং শ্রেণী অথবা সামাজিক চরিত্র। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনের ব্যাপ্তি ও বৈশিষ্ট্য এই প্রতিটি উপাদানের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে এবং গেছেও, যদিও এদের পরস্পরের মধ্যে চীনের প্রাচীরের মত দুর্লঙ্ঘ্য কোন বাধা নেই এবং এগুলো অনিবার্যভাবেই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। প্রথম দিকটি অর্থাৎ রাজনৈতিক লক্ষ্য, কর্মসূচী ও মতাদর্শের দিকটি নিয়ে এখন আলোচনা করা হচ্ছে না। শুধু সংক্ষেপে বলে নেওয়া হচ্ছে যে প্রথম দিকের জাতীয়তাবাদীদের মূল রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল : ভারতবর্ষের মানুষকে একটি জাতিতে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে সাহায্য করা, জনসাধারণের সার্বভৌম ক্ষমতার মতবাদের ভিত্তিতে এবং রাজনীতি শুধু শাসক শ্রেণীর সংরক্ষিত বস্তু নয় এই ধারণার ভিত্তিতে আধুনিক রাজনীতির সূচনা করা, এ দেশের মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগানো, এক সর্ব-ভারতীয় জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা কেন্দ্র গড়ে তোলা, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মতাদর্শ সৃষ্টি, রূপদান ও সংগঠন করা, আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির ক্রমোন্নতি সাধন করা,

এই প্রবন্ধটি ১৯৭২ সালে মুজঃফরপুরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসে এক আলোচনাচক্রে প্রথম উপস্থাপিত হয়েছিল এবং নয়া দিল্লি থেকে বিকাশ পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত 'স্টাডিজ ইন হিস্ট্রি', প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, ১৯৭৯, তে প্রকাশিত হয়েছিল।

এবং সবশেষে এক ব্যাপক সর্বভারতীয় জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলা। এই কাজ করতে গিয়ে তাঁরা ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের মূল চরিত্র বিশ্লেষণ করেন এবং তার শোষণমূলক চরিত্র সম্পর্কে নিজেদের উপলব্ধি ভারতীয় জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে নিরত হন। তাঁরা এমন এক জাতীয় রাজনৈতিক মঞ্চ ও কর্মসূচী গড়ে তুললেন যেখানে বিভিন্ন অঞ্চলের, ধর্মের ও সামাজিক শ্রেণীর সব ভারতীয় মিলিত হতে পেরেছে। সর্বভারতীয় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ভিত্তি হিসেবে এই মঞ্চ কাজ করবে এবং যার মূল লক্ষ্য হবে গণতান্ত্রিক স্বশাসন অর্জন, শুধু ভাল সরকার গঠনই নয়। তাঁদের কর্মসূচী এবং ব্রিটিশ শাসনের চরিত্রের যে স্বরূপ তাঁরা উদ্ঘাটন করেছিলেন প্রধানত তারই ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিলেন উত্তর কালের জাতীয়তাবাদীরা। বিষয়টি নিয়ে আর আলোচনা না করে আমি একথাও বলতে পারি যে প্রাক্তন জাতীয়তাবাদী বা নরমপন্থী এবং চরমপন্থী বা জঙ্গী জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে মূল রাজনৈতিক পার্থক্য সঠিকভাবে নির্ধারণ করার জন্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দিক থেকে একটা পার্থক্য অর্থাৎ, উপনিবেশগুলোর মত স্বশাসন এবং পূর্ণ স্বাধীনতার মধ্যে পার্থক্য, ভুলভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যাই হোক না কেন, নরমপন্থী জাতীয়তাবাদীরা জঙ্গী জাতীয়তাবাদীদের মতই রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্নের ব্যাপারে মৌলিকভাবে একই রকম আগ্রহী ছিলেন।[1] ভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষমতার দাবিকে যথাযথভাবে ভাষা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল সমকালের আবেগে এবং কৌশল ও বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির সম্পর্কের প্রয়োজনে। তা সত্ত্বেও, পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি থেকে স্বায়ত্তশাসনের অথবা তারও কম দাবিতে বারবার পিছু হটতে তিলক ও গান্ধী কোন দ্বিধা করেন নি।[2] একথা অস্বীকার করা যাবে না যে কোন এক বিশেষ মুহূর্তে, যেমন ১৯০৫-০৮ সালে বা ১৯২৭-২৯ সালে, কৌশল ও কর্মপদ্ধতি সংক্রান্ত মৌলিক প্রশ্ন জড়িত হতে পারত, কিন্তু ঐতিহাসিক বিশ্লেষণকে তাহলে শাব্দিক রূপের খোলস বা আবেগের প্রলেপ বা প্রতীক ছেড়ে এইসব বাস্তব প্রশ্নের দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

২

তিনটি কালপর্বেই জাতীয় আন্দোলনের সামগ্রিক কৌশল মূলত একই ছিলো। শুধু তার একটি মাত্র পর্যায়ে এক মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছিলো।

(ক) প্রথমতঃ, নরমপন্থী জাতীয়তাবাদীরা বলেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রাম হবে শান্তিপূর্ণ ও রক্তপাতহীন। রাজনৈতিক প্রগতি হবে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও তার ওপর প্রতিষ্ঠিত। জাতীয় আন্দোলনের মুখ্য নেতৃত্বের এটাই ছিল আগাগোড়া মূল মতবাদ। শুধু কিছু চরমপন্থী নেতা তাত্ত্বিক দিক দিয়ে ভিন্নমত পোষণ

করতেন। কিন্তু কার্যত তাঁরাও এর মূলে কাঠামোর ভেতরেই কাজ করেছেন। এই মতবাদ বিত্তশালী শ্রেণীর কাছে ছিল এক মৌলিক প্রতিশ্রুতি। সে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তারা কখনোই এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে না যাতে তাদের স্বার্থ সাময়িকভাবেও বিপন্ন হতে পারে।

(খ) দ্বিতীয়তঃ, নরমপন্থীরা জনসাধারণ বা জনসংগ্রামের ওপর কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অরোপ করেন নি। তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ আপাতত সমাজের শিক্ষিত স্তরে বা তাঁদের ভাষায় "শিক্ষিত শ্রেণীর" মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। অংশতঃ, এইরকম ধারণার পেছনে এই বিশ্বাস ছিল যে এই ক্ষুদ্র সামাজিকশ্রেণীর কাজকর্মই যথেষ্ট হবে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল, তাঁরা এইরকম একটা সীমাকে বস্তুগতভাবে অবশ্যম্ভাবী বলে মনে করতেন। এমনকি যখন তাঁরা জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রয়োজন বিমূর্ত ভাবেও উপলব্ধি করলেন তখনও আধুনিক রাজনীতিতে আগামী দীর্ঘ সময়ের জন্য ভারতীয় জনগণের অংশ নেওয়ার ক্ষমতার প্রতি তাঁদের আস্থার অভাব ছিল। ভারতের জনগণের দিকে তাকিয়ে তাঁরা তাদের ঔদাস্য ও অজ্ঞতা, তাদের অতি বাস্তব সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পশ্চাদ্বর্তিতাই শুধু দেখেছিলেন, কিন্তু দেখেননি তাদের কর্মশক্তি, তাদের জেদ এবং ত্যাগের ও বীরের মত লড়াই করার ক্ষমতা।[৪] ফলে, জনগণকে রাজনীতিতে দীক্ষিত করার এবং লড়াইয়ের জন্য তৈরি করার কাজকে অত্যন্ত মন্থর বলে মনে করা হত। তাঁরা বিশ্বাস করতেন ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন উপাদানকে এক জাতিতে পরিণত করার পর এবং নিষ্ক্রিয় জনগণ সম্পূর্ণভাবে রাজনীতিতে দীক্ষিত, শিক্ষিত ও সংগঠিত হওয়ার পরই কেবল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় গণসংগ্রাম ঘোষণা করা যেতে পারে। ফলে গণ-ভিত্তির অভাব তাঁদের ঠেলে দিয়েছিল রাজনৈতিক নরমপন্থার দিকে। গণ-সমর্থনের অভাবে তাঁরা সতর্কভাবে চলতেন, তাঁদের রাজনৈতিক কাজকর্মকে সীমাবদ্ধ রাখতেন বিক্ষোভ ও প্রচারের মধ্যে এবং ধরে নিয়েছিলেন যে শক্তিমান বিদেশী শাসককে লড়াইতে আহ্বান জানানোর উপযুক্ত সময় আসেনি। তা করতে গেলে বর্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনের অকাল-দমন ও ধ্বংস ডেকে আনা হবে।[৫] লক্ষ্য করা যেতে পারে যে রাজনৈতিক দিক দিয়ে নিষ্ক্রিয় জনগণকে রাজনৈতিক ভাবে দীক্ষিত করা, লড়াইয়ের জন্য তৈরি করা এবং সক্রিয় করে তোলার কাজটি যে বিপুল একথা বুঝতে নরমপন্থীরা খুব একটা ভুল করেন নি। কিন্তু সে কাজের ভার নেওয়ার বদলে তা সম্পন্ন করার চিন্তাতেই তাঁরা অভিভূত হয়ে পড়লেন।

জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক কৌশলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এবং সম্ভবতঃ একমাত্র তাৎপর্যপূর্ণ, পরিবর্তন ঘটেছিল এই বিষয়টি কেন্দ্র করেই। জনগণের লড়াই করার শক্তিতে এবং ভারতীয় জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ-মেয়াদী সংগ্রামের চাপ সহ্য করার ক্ষমতায় তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল ও অন্যান্য চরমপন্থী নেতাদের অপরিসীম আস্থা ছিল। তাঁরা বিশ্বাস করতেন সরকারের

দমননীতি গণ-আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করতে পারবে না। বরং তা জনগণকে শিক্ষিত করে তুলবে, আরো জাগিয়ে তুলবে, সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করার জন্য তাদের সংকল্প দৃঢ়তর করবে এবং তীব্রতর রাজনৈতিক সংগ্রামের দিকে নিয়ে যাবে। তাই তাঁরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণসংগ্রাম গড়ে তোলার এবং তার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে জনগণের কাছে রাজনীতি পৌঁছে দেওয়ার কথা বলেছিলেন।[5] তাঁরা বলেছিলেন শিক্ষিত সম্প্রদায় ও জনগণের মধ্যে ব্যবধান দূর করার কথা। তাঁদের কেউ কেউ জনগণের কাছে পৌঁছে ছিলেন, যেমন বরিশালে অশ্বিনী কুমার দত্ত।

নরমপন্থী যুগ থেকে এই চ্যুতিটা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আশা ও এই আশা-পূরণের মধ্যে একটা পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি। বাংলায় চরমপন্থী আন্দোলনের তুঙ্গ অবস্থাতেও কৃষক সম্প্রদায়কে লড়াইতে সামিল করা হয়নি। শিক্ষিত চরমপন্থী রাজনৈতিক কর্মী ও জনগণের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বিশেষ দূর হয়নি। বস্তুত কাজটা কিভাবে করা যায় চরমপন্থীরা তা জানতেনই না। কার্যত তাঁরা যা পেরেছিলেন তা হল আন্দোলনকে আরো গভীরে নিয়ে গিয়ে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া, এই শ্রেণীকে এর আগে নরমপন্থী যুগেই জাতীয়তাবাদের গন্ডির মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছিল। তিলক ও অন্যান্যরা জনগণের কথা বলতেন, কিন্তু তাঁদের জনগণ ছিল শহুরে ও আধা-শহুরে পাতি বুর্জোয়া শ্রেণীর শিক্ষিত ও আধা-শিক্ষিত অংশমাত্র এবং তার মধ্যে অধিকাংশই ছিল শিক্ষিত তরুণ। সুতরাং তিলক 'নিজেকে জনগণের মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছিলেন' অথবা 'জনসাধারণের অধিকাংশকে' রাজনীতিতে নিয়ে এসেছিলেন সেটা বলা ঠিক নয়। তিলক নিজেই ১৯০৭ সালে স্বীকার করেছিলেন যে প্রাথমিকভাবে তিনি শিক্ষিত ভারতীয়দের নেতা।[6] ১৯০৮ সালে লাজপত রাইও স্বীকার করেছিলেন যে ভারতে জনগণের পশ্চাদ্‌বর্তিতা ও ঔদাস্যের কারণেই এখানকার রাজনৈতিক আন্দোলনকে শিক্ষিত শ্রেণীর ওপর নির্ভর করতে হয়েছে।[7]

অনুরূপভাবে চরমপন্থীরা রাজনৈতিক 'লড়াইয়ের' একটা সন্তোষজনক কৌশল গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। নিছক বিক্ষোভ প্রকাশের মধ্যে আন্দোলন আবদ্ধ রাখার জন্য নরমপন্থীদের তীব্র সমালোচনা করলেও তাঁরা নিজেদের কাজকর্মে মূলতঃ বিক্ষোভ প্রকাশের বাইরে যেতে পারেন নি যদিও তাঁদের বিক্ষোভ অনেক বেশী জঙ্গী ও কার্যকর ছিল। সংগ্রামের বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে তাঁরা নিঃসন্দেহে একটা উচ্চতর ধারণা গড়ে তুলেছিলেন,[8] কিন্তু এই উচ্চতর ধারণাকে তাঁরা কাজে পরিণত করতে পারেন নি। তাঁরা ভাবাদর্শগত-সমালোচনা-মূলক স্তরেই পড়ে ছিলেন। চরমপন্থীদের এই ব্যর্থতার অনিবার্য পরিণাম বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদ। অধিকাংশ চরমপন্থী নেতা নরমপন্থীদের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে না পারার ফলে 'লড়াই' ও ত্যাগের আদর্শে

লালিত তরুণরা অবিলম্বেই সংগ্রামী বিক্ষোভের প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়ল, তারা লড়াইয়ের দাবি জানাল এবং ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় নিল। কারণ চরমপন্থীরা এক ভিন্ন ধরনের রাজনীতি গড়ে তোলার প্রয়োজনের চেয়ে 'লড়াই' ও ত্যাগের ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করেছিলেন। মজার ব্যাপার, এই বীর তরুণদের রাজনৈতিক সংগ্রাম বা 'লড়াই'ও, রাজনৈতিক প্রভাবের দিক দিয়ে, হয়ে দাঁড়াল এক ধরণের বিক্ষোভ, অথবা তাদের নিজেদের সংজ্ঞায় "কাজের দ্বারা প্রচার"।

গান্ধীরও অগাধ আস্থা ছিল ভারতীয় জনগণের ওপর[০]। জনগণের সংগ্রামী মনোভাব ও আত্মত্যাগের সাহসের উপর তিনি তাঁর সমগ্র রাজনীতিকে স্থাপন করেছিলেন। জনগণের কাছে পেঁছে, রাজনৈতিক কর্মে তাদের উদ্বুদ্ধ করে এবং সংগ্রামের পুরোভাগে তাদের নিয়ে এসে তিনি নরমপন্থী ঐতিহ্য থেকে এক ধাক্কায় সরে এসেছিলেন। এটা হল জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের গান্ধী পর্যায়ের বৈপ্লবিক দিক। উপরন্তু, গান্ধী একাই রাজনৈতিক সংগ্রাম ও গণ-লড়াইয়ের এক নূতন ও সম্ভাব্য পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন, যার ফলে তিনি অবিলম্বে আন্দোলনের নেতৃত্বে যেতে এবং শেষ পর্যন্ত তা ধরে রাখতে পেরেছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারেও চারটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতার কথা সতর্কভাবে খেয়াল করা দরকার: (১) গান্ধীবাদী আন্দোলন জনগণকে কতদূর পর্যন্ত রাজনীতিতে দীক্ষিত ও জড়িত করেছিল তা নিয়ে আজও সতর্কভাবে গবেষণা করে দেখা হয়নি এবং এক্ষেত্রে প্রায়শঃই অতিকথন ঘটেছে। আমি ঝুঁকি নিয়েই মন্তব্য করতে পারি যে দেশের অধিকাংশ অঞ্চলের কৃষি-শ্রমিক ও দরিদ্র কৃষককে এবং বেশ কিছু অঞ্চলের সাধারণ মানুষকে রাজনৈতিক কর্মপ্রবাহের মধ্যে আনা হয়নি বা জাতীয়তাবাদী রাজনীতির স্পর্শও তারা পায়নি। ফলে জাতীয় আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি ১৯৪৭ সালেও বেশি পোক্ত ছিল না।

(২) জনগণকে আন্দোলনে নামানো হল, কিন্তু চার আনার সদস্যপদ সত্ত্বেও তারা কখনোই রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হয়নি। তারা থেকেছে কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাঠামোর বাইরে—অভিনয়ের জন্য মঞ্চের পাশে সদাই অপেক্ষমান।

(৩) জনগণের মধ্যে গান্ধীপন্থীদের কিছু কাজ সত্ত্বেও যে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী তখনও আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিল তাদের সঙ্গে জনগণের ব্যবধান তখনও অনেক ক্ষেত্রে অতিক্রম করা সম্ভব হয় নি। এমনকি বামপন্থীরাও একাজে ব্যর্থ হয়েছিল।

(৪) সর্বোপরি, শীর্ষনেতৃত্ব জনগণের রাজনৈতিক কাজকর্ম কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করত। জনগণ কখনই স্বাধীন রাজনৈতিক শক্তি হয়ে উঠতে পারেনি। সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজে তাদের অংশ নেওয়ার প্রশ্ন কখনই তোলা হয়নি। বিশিষ্টার্থক শব্দে বলা যায় জনগণকে বরাবর থাকতে হয়েছিল 'নিষ্ক্রিয় অভিনেতা' বা 'অতিরিক্ত' হিসেবে। তাদের রাজনৈতিক কাজকর্ম ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতাদের কঠোর নিয়ন্ত্রণে এবং বুর্জোয়া সামাজিক উন্নতির প্রয়োজনের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। যেভাবে গান্ধী অহিংসার সংজ্ঞা দিয়েছিলেন ও তার

অনুশীলন করেছিলেন তার চূড়ান্ত ভূমিকাও এখানেই ছিল। একথাও আমি এখানে বলতে পারি যে গান্ধীবাদী আন্দোলন এবং বুর্জোয়া কাঠামোর মধ্যে আন্দোলনকে আবদ্ধ রাখার পুরোন ঐতিহ্যের সঙ্গে তার অপরিহার্য ধারাবাহিকতার চূড়ান্ত দুর্বলতা, সক্রিয় সংগ্রামে সামিল হতে অস্বীকার করার মধ্যে বা অহিংস রূপের প্রাধান্যের মধ্যে ছিল না—এম. এন, রায় থেকে তাঁর পরবর্তী অন্যান্য বামপন্থী সমালোচকরা এ কথাই বলেছেন। লড়াই কি ধরনের হবে সে প্রশ্ন মোটের ওপর স্থান-কালের, বাস্তব ঐতিহাসিক পরিস্থিতির একটা পর্যায়। রাজনৈতিক লড়াইয়ে জনগণের ভূমিকা যে অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত ও অধস্তন ছিল সেটাই হল দুর্বলতা। লড়াইয়ের গতিপথ বা তার ফলাফলকে তারা প্রভাবিত করতে পারে এমন কোন ব্যবস্থা বা পথ ছিল না। আন্দোলনের প্রথম পর্বে এই প্রশ্ন ওঠেনি, কারণ রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ স্পষ্টতঃই বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে জনগণকে যখন আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করা হল তখনও নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের ধরন ১৯০৫ সালের আগেকার মতই থেকে গিয়েছিল।[10]

(গ) তৃতীয়তঃ, রাজনৈতিক অগ্রগতির ব্যাপারে নরমপন্থী কৌশলের ক্ষেত্রে আরেকটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। এই বৈশিষ্ট্য পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদী কৌশলেরও মূল ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। আর এটাই প্রমাণ করেছিল আন্দোলনের তিনটি পর্যায়ের মধ্যেই প্রবহমান মূল ধারাবাহিকতাকে। নরমপন্থীরা ধরে নিয়েছিলেন রাজনৈতিক ও স্বশাসন গড়ে উঠবে ধীরে ধীরে, কিন্তু দৃঢ়ভাবে, 'নজির থেকে নজিরে', এবং এক পর্যায় থেকে উন্নততর পর্যায়ে এগিয়ে চলবে। এইভাবে জাতীয় মুক্তির প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ বিপ্লবের প্রক্রিয়া না হয়ে হল দীর্ঘকালীন পর্যায়ানুক্রমিক বিবর্তনের প্রক্রিয়া। উপরন্তু সেই অগ্রগতি ঘটেছিল চাপ—আলোচনা, আপস ও সুবিধাদান—চাপ বা চা-ছা-চা (প্রেশার-কনসেশন-প্রেশার বা পি-সি-পি) এই কৌশলের মাধ্যমে, ক্ষমতা দখল ও বিদেশী শাসক বিতাড়নের মাধ্যমে নয়। চারটি মৌলিক ধারণা এই কৌশলে জড়িত ছিল: (১) কি ভারতে কি ব্রিটেনে তাৎক্ষণিক দাবিগুলো মেনে নেওয়ার জন্য রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও বিক্ষোভ ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। (২) যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করা হলে কর্তৃপক্ষকে দাবি মেনে নিতে রাজি করানো যেতে পারে। এটি একটি পরীক্ষামূলক ধারণা। ব্রিটিশ অবশ্যই এই পদ্ধতিতে সহযোগিতা করবে **কারণ পরিবর্তন ঘটাতে হবে তাদের কাজের মাধ্যমেই।** (৩) প্রতিটি সুবিধাকে অবশ্যই সদ্ব্যবহার করতে ও কাজে লাগাতে হবে। ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে 'যতটা সম্ভব' সহযোগিতা এর সঙ্গে অনিবার্যভাবে জড়িত করবে। (৪) প্রতিটি মীমাংসা থেকে পরবর্তী পর্যায়ে দ্রুত উপনীত হতে হবে এবং সেই কারণে বিক্ষোভ বা চাপ তাড়াতাড়ি নূতন করে তৈরি করতে হবে। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা যতক্ষণ পর্যন্ত না অর্জন করা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে এই সর্পিল উর্ধ্বগতি। ১৯০৭ সালে গোপালকৃষ্ণ

গোখলে অত্যন্ত স্পষ্ট ও দক্ষভাবে পুরো কৌশলটার মূল কথা সংক্ষেপে বিবৃত করেছিলেন : "গঠিত কর্তৃপক্ষের কাজের মাধ্যমে বাঞ্ছিত পরিবর্তন ঘটানোর জন্য বিক্ষোভের যে পদ্ধতি গ্রহণ করার অধিকার তাদের ছিল, সেই সংবিধানসম্মত বিক্ষোভ পদ্ধতির বহিঃপ্রকাশ দ্বারা **গঠিত কর্তৃপক্ষের ওপর জনমতের চাপ সৃষ্টি করে শুধু তাদের কাজের মাধ্যমেই বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনতে হবে**...তিনটি জিনিস বাদ ছিল—বিদ্রোহ, কোন বিদেশী আক্রমণে সাহায্য বা সহযোগিতা করা, এবং অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত থাকা। মোটামুটি বলা যায়, এই তিনটি ব্যাপার বাদ দিলে আর সব কিছুই ছিল সংবিধানসম্মত।...**গঠিত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমেই প্রতিকার পেতে হবে** এই দ্বিতীয় শর্তের **স্পষ্ট নিহিতার্থ হল কর্তৃপক্ষের ওপর অবিরাম চাপ সৃষ্টি করে যেতে হবে** এবং তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই এমন ধারণাকে আমল দেওয়া চলবে না। **জনমতের শক্তি ও দৃঢ়তার ওপরই এই প্রযুক্ত চাপ নিঃসন্দেহে নির্ভর করে** এবং সেই শক্তিকে গড়ে তোলার এবং সংকল্পকে দৃঢ়তর করার প্রয়োজন স্পষ্টতঃই সবার ওপরে স্থান দিতে হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নির্দয়ভাবে সম্পর্ক ছেদ করতে হবে **এবং তাদের বাদ দিয়েই স্বাধীনভাবে নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছনোর চেষ্টা করতে হবে** এই ধারণা **মেনে নেওয়া যায় না এবং তা অবাস্তব**"।[11]

অনরূপভাবে, ১৯০৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে গোখলে বলেছিলেন :

> ভারত শাসিত হবে ভারতবাসীর নিজেদের স্বার্থে, এবং কালক্রমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বশাসিত উপনিবেশগুলোর মতই এই দেশেও অনরূপ সরকার গঠনের অভীষ্ট লক্ষ্যে পেঁছিতে হবে এটাই হল কংগ্রেসের লক্ষ্য। উপরন্তু, এই অগ্রগতি কেবল ধীরে ধীরে হতে পারে, কারণ অগ্রগতির প্রতিটি ধাপ থেকে পরবর্তী ধাপে যেতে পারার আগে সংক্ষিপ্ত শিক্ষানবিশী করার প্রয়োজন আমাদের হতে পারে।[12]

নরমপন্থীদের ধরণা ছিল শিক্ষিত ভারতীয় জনমত ও ব্রিটিশ গণতান্ত্রিক মতামতই চাপ সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট হবে এবং তাই পুরো ব্যবস্থাটাকে সক্রিয় করতে পারবে। এইসব ধারণা নিয়ে পরবর্তী কালের জাতীয়তাবাদীরা যেমন উপহাস করেছেন তেমনি করেছেন সমকালীন ঔপনিবেশিক প্রশাসক ও রাষ্ট্রনায়করাও। এটা অবশ্য স্পষ্ট করে বুঝতে হবে যে ১৯০৫ সালের পরে শাসকদের ওপর রাজনৈতিক চাপের বৈশিষ্ট্যই শুধু বদলেছিল, চাপ-আপস-চাপের মূল কৌশল বদলায়নি যা 'যথাযথভাবে গঠিত কর্তৃপক্ষের' কাজের মাধ্যমে অগ্রগতি ঘটাবে। তিলক এবং গান্ধীও ব্রিটিশ শাসনকে সরাসরি উৎখাত করার জন্য কাজ করেন নি। 'নিয়ন্ত্রিত জন-আন্দোলনের দ্বারা সমর্থিত আলাপ আলোচনার কৌশলের' ওপর তাঁরাও জোর দিয়েছিলেন। তাঁদের প্রতিটি আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশকে আপস-আলোচনা করতে এবং বিশেষ সুবিধা দিতে বাধ্য করা।

এবং প্রায় প্রতিটি আন্দোলনই শেষ হত মীমাংসা ও আলোচনায়, তা প্রকাশ্য হোক বা গোপন হোক, সরাসরি হোক বা পরোক্ষে হোক।

উত্তরকালের জাতীয়তাবাদীরা অবিলম্বে স্বাধীনতার জন্য অনেকবার আহ্বান জানিয়েছিলেন বলে এই ভ্রান্ত ভাবনা জন্মানো স্বাভাবিক যে তাদের কৌশলগত পথ আলাদা ছিল। বস্তুত এইসব আহ্বানও একই প্রধান পরিকল্পনার অংশ ছিল। উদাহরণস্বরূপ, এটা খুবই কৌতূহলের ব্যাপার যে এরকম প্রতিটি আহ্বানের পরই গান্ধী এক গুচ্ছ আশু দাবি পেশ করতেন। যেমন ১৯৩০ সালের সেই বিখ্যাত এগারো দফা দাবি যার সঙ্গে কয়েক দিন আগেই অনুষ্ঠিত লাহোর কংগ্রেসের তাৎক্ষণিক ও পূর্ণ স্বরাজের দাবির প্রত্যক্ষ যোগ সামান্যই ছিল।

নব্য জাতীয়তাবাদীরা অবশ্য বোঝানোর বা চাপ দেওয়ার পদ্ধতি বদলেছিলেন—এবং ঐতিহাসিক দিক দিয়ে এটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁদের দাবির পেছনে বৃহত্তর ও জনগণের চাপ যাতে থাকে সেটা তাঁরা করেছিলেন। বুদ্ধিজীবীদের ছেড়ে তাঁরা জনগণের কাছে চলে গিয়েছিলেন। স্মারকলিপি, আবেদন এবং প্রস্তাব ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন মিছিল, বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ব্যাপক গণ আন্দোলনের। তাঁদের দাবির পেছনে প্রেরণা ছিল পৃথক ও প্রবলতর। কিন্তু তখনও রাজনৈতিক অগ্রগতি ঘটছিল ধাপে ধাপে এবং আপস-মীমাংসার মাধ্যমে অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশের সম্মতি ও কাজের মাধ্যমে।[13]

লড়াইয়ের যে পদ্ধতি নেওয়া হয়েছিল সেগুলি ছিল এই কৌশলগত পরিকল্পনারই উপযুক্ত। গান্ধীপন্থী গণআন্দোলনে ক্ষমতা দখলের কোন কৌশলই ছিলনা। এক্ষেত্রে হিংসা বা অহিংসার প্রশ্ন ছিল একেবারেই অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা—তা সে দক্ষিণ পন্থীরাই করুক আর বামপন্থীরাই করুক। গান্ধীপন্থী লড়াই শুধু একটা নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারতো—আর সেটাই ছিল বাস্তব। ইতিবাচক বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ, যেমন শান্তিপূর্ণভাবে স্কুল-কলেজ দখল (সেগুলো বয়কটের বদলে), পুলিশ থানা, কাছারি (আদালত) দখল (নিছক বয়কটের পরিবর্তে বিকল্প বিচারালয় সৃষ্টি), এমনকি বিদেশী প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও কারখানা দখল, অথবা শান্তি-পূর্ণভাবে সেনাবাহিনীকে নিরস্ত্রীকরণ করা এর দ্বারা সম্ভব ছিল না।[14] এইসব লড়াই সামাজিক ব্যবস্থাপনার বা ক্ষমতার বিকল্প ব্যবস্থা অথবা এমনকি কোন বিকল্প শাসনব্যবস্থার প্রাথমিক অনুষঙ্গও গড়ে তুলতে পারে নি বা তোলেনি, অথচ হিংসা নয়, ঐ অনুষঙ্গই যে কোন বিপ্লবের মূল ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। এমনকি অহিংস আন্দোলনও বিদেশীর সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে পারতো এবং শুরুতে অহিংস থেকে ক্ষমতা দখলের সূচনা বিন্দু হয়ে উঠতে পারত, ঠিক চাপ-আপস-চাপ কৌশলের মত হিংসার একটা ধাপকে চাপ হিসেবে ব্যবহার করা যেত। কিন্তু গান্ধীপন্থী কৌশলের মূল বৈশিষ্ট্যই ছিল শত্রুকে আপস আলোচনা ও দাবি মঞ্জুর করতে

বাধ্য করা। প্রধানতঃ এই কারণেই গান্ধীপন্থী কর্মসূচীর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক—কর না দেওয়া—সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতার বিরুদ্ধে একে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে ব্যবহার করা যেত, অথচ কখনই তা উল্লেখযোগ্যভাবে করা হয়নি। মীমাংসার টেবিলে বসানোরও দাবি মেনে নেওয়ার জন্য সরকারের উপর তা প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করতে পারত, কিংবা তা পুরোপুরি লড়াইতে পরিণতি লাভ করতেও পারত।

এই কারণে গান্ধীবাদী রাজনৈতিক দর্শনে, শত্রুর হৃদয় পরিবর্তন ঘটানো, আলাপ-আলোচনার দরজা খোলা রাখা, শত্রুকে চিন্তায়, বাক্যে বা কর্মে আঘাত করতে না চাওয়া এবং তাকে পরিবর্তন করাকে অহিংসার সংজ্ঞা হিসাবে নির্ধারণ করা এবং আইন অমান্য আন্দোলন ও 'আইনগত অধিকারের' মধ্যে সুস্পষ্ট প্রভেদ নির্ণয়—এইসব ধারণার চূড়ান্ত তাৎপর্য ছিল। সেইজন্য কোন আন্দোলন শুরু করার পর গান্ধী শুধু গ্রেপ্তার হওয়া বা আলোচনার টেবিলে বসার ডাক পাওয়ার জন্যই অপেক্ষা করতে পারতেন। পূর্বোক্তটির ফলে ঘটত সাময়িক অচলাবস্থা এবং অচিরেই তার অবসান হত—সরাসরি বা মধ্যস্থদের দ্বারা পরিচালিত নূতন দফার আলোচনায়। উভয় ক্ষেত্রেই নূতন রাজনৈতিক সুবিধার লাভ ঘটত। কখনও কখনও বিশেষ সুবিধাগুলো মীমাংসা আলোচনার ফলে এবং সরকারি-ভাবে আপসের ফলে পাওয়া যেত। অন্যান্য সময় প্রকাশ্যে কোন আলোচনাই হত না। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে, অধিকাংশ সময়ই সন্তোষজনক না হলেও, সুবিধা পাওয়া যেত। গান্ধী তখন আরো ক্ষতি হওয়ার আগেই আন্দোলন ত্যাগ করে যে সংশোধন ঘটেছে তা নিয়েই কাজ করতে নীরবে রাজি হয়ে যেতেন। তিনি চুক্তিতে সই করতেন না কারণ তা মনোবল একেবারে ভেঙে দেবে, এমনকি তা কাপুরুষোচিতও হবে। কিন্তু নিজে দূরে সরে থাকলেও তিনি তাঁর সহযোগী নেতাদের সরকারি রাজনৈতিক কর্মধারায় অংশগ্রহণ করার অনুমতি দিতেন, যেমনটি করেছিলেন ১৯২৪ ও ১৯৩৫-৩৬ সালে। এমনকি ১৯৪৭ সালেও ক্ষমতা হস্তান্তর যেভাবে ঘটেছিল তাতে অসুখী হলেও, তিনি আপস মীমাংসা মেনে নিতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে রাজি করানোর জন্য ব্যক্তিগত প্রভাব-প্রতিপত্তি কাজে লাগিয়েছিলেন। বস্তুত, ১৯৪২ সালের আগে ও ১৯৪৫ সালের পরে গান্ধী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও কৌশলের মধ্যে চাপ ও আপসের এই কৌশল এবং তার সব জটিলতা ও সমস্যা লক্ষণীয়।

৩

জাতীয় আন্দোলনের পরিবর্তনশীল সামাজিক ভিত্তি ছিল এর তিন পর্বে পরিবর্তনের এক অন্যতম অঙ্গ। গোড়ার দিকের নরমপন্থী পর্বে এই ভিত্তি ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ, শহরবাসী শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যেই তা

সীমিত ছিল। এদিকে লক্ষ্য রেখে একথা অবশ্যই বলা দরকার যে নতুন নতুন সামাজিক শ্রেণীকে বিশেষ করে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলোকে, অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এই পর্বেও আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। মাতৃভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর নিরবচ্ছিন্ন ক্রমোন্নতি ও প্রসারের ঘটনায় এই ব্যাপরটি স্পষ্ট হয়। এই উন্নতি আকস্মিক ছিল না। প্রথম দিকের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই, যথা দাদাভাই নওরোজি, সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কে টি তেলং, রানাডে, ভি ভি আগারকর, তিলক, গোখলে, জি সুব্রহ্মণ্য আয়ার, কে কে মিত্র, গঙ্গাপ্রসাদ ভার্মা, মদন মোহন মালব্য, এবং রামপাল সিং ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

একই সঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে এই সামাজিক ভিত্তির মধ্যে শিল্প ও বাণিজ্যিক বুর্জোয়া সম্প্রদায়—বা জমিদার ও ভূস্বামীরা অন্তর্ভুক্ত ছিল না, যদিও বেশির ভাগ সময় সেটাই ধরে নেওয়া হয়। বস্তুতঃ প্রভাবশালী ভূস্বামী, শহুরে ধনী ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতি এবং বয়স্ক প্রাচীনপন্থী রাজনীতিকদের সাহায্যেই ব্রিটিশ আমলারা ১৮৮০র দশকে কংগ্রেসের 'র‍্যাডিক্যাল', 'চরমপন্থী' এবং 'সরকার বিরোধী ও রাষ্ট্রদ্রোহী' রাজনৈতিক শক্তিগুলোকে জব্দ করতে চেয়েছিল। সমাজের উঁচু শ্রেণীর ভারতীয়রা অর্থাৎ ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, জমিদার এবং সফল আইনজীবী, ডাক্তার ও সিভিল সার্ভিসের অফিসাররা তখনো পর্যন্ত আন্দোলনের জন্য কোন উল্লেখযোগ্য আর্থিক সাহায্য দেননি।[15] ফলে প্রথম দিকের অধিকাংশ রাজনৈতিক কর্মীকে নিজের জীবিকার সংস্থান নিজেকেই করতে হত[16] এবং জাতীয় কংগ্রেসের মত রাজনৈতিক সংগঠনের তহবিল কার্যতঃ শূন্যই থাকত, স্বল্প ব্যয়বরাদ্দের মধ্যে তাঁদের কাজ করতে হত এবং ফলে তাঁদের রাজনৈতিক কাজকর্ম খুবই ব্যাহত হত। ব্যাপারটার একটা উলটো দিকও ছিল। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সীমিত ছিল বলেই ধনী-সম্প্রদায়ের বিপুল আর্থিক সাহায্য ছাড়াও তা সম্ভব হয়েছিল। ব্যাপক গণ আন্দোলন, ব্যাপক নির্বাচনী প্রচার, ব্যাপক বিক্ষোভ এবং কর্মী বাহিনী নির্ভর বিরাট রাজনৈতিক সংগঠন—১৯১৯ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত গান্ধী যুগের এটাই ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য। সম পরিমাণ বিপুল আর্থিক সংস্থান ছাড়া এই সংগঠন সম্ভব হত না। এর ফলে গোটা আন্দোলন ধনীর বদান্যতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিল। প্রথম দিকের জাতীয়তাবাদীরা তাঁদের রাজনৈতিক কাজকর্মের বৈশিষ্ট্যের জন্যই বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের ওপর এই নির্ভরতা এড়াতে পেরেছিলেন।

এটা ভাল করেই জানা যে মুলতঃ শহুরে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই চরমপন্থীদের সামাজিক ভিত্তি ছিল। চরমপন্থীরা দেশের কোন কোন অংশে তাদের রাজনৈতিক চেতনা জাগাতে সফল হয়েছিলেন। স্বদেশী ও বয়কটের পক্ষে চরমপন্থীদের প্রবল প্রচার সত্ত্বেও পুঁজিপতিরা যে তাঁদের প্রতি সমর্থন তুলে নিয়েছিল এটা খুবই কৌতুহলকর বিষয়। পরবর্তীকালে এই হোম রুল লীগের দিনগুলোতে অল্প কিছু বিক্ষিপ্ত পুঁজিপতি লীগ দুটিকে আর্থিক সাহায্য

দিয়েছিলেন। চরমপন্থীরাও ভাবাবেগের সঙ্গে জনগণের কথা বললেও যখনই বাস্তবের জনগণ—কৃষক বা শ্রমজীবী শ্রেণীর মুখোমুখি হতেন তাঁরাও তখন নরমপন্থীদের মতই মধ্যবিত্ত আত্ম-সচেতনতায় ফিরে যেতেন।

জনসাধারণ, কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষ, জাতীয় আন্দোলনে সামিল হয়েছিল প্রধানতঃ গান্ধীযুগেই। জাতীয় আন্দোলনের ক্রমোন্নতির এটাই সম্ভবতঃ গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিন্তু বেশির ভাগ সময় উপেক্ষা করা হলেও এই ব্যাপারটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই যুগেই শ্রেণী হিসেবে পুঁজিপতিরাও আন্দোলনে সামিল হয়েছিল এবং সক্রিয়ভাবে তাতে সমর্থন জানিয়েছিল, যদিও প্রাথমিকভাবে সে সমর্থন আর্থিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। নরমপন্থী কি চরমপন্থী কেউই এই শ্রেণীর সমর্থন লাভ করতে পারেনি, কারণ এই শ্রেণী এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এর বিরোধিতা দুটোই পুরোপুরি পরিণতি লাভ করেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ও তার পরবর্তীকালেই। উপরন্তু, পুঁজিপতি শ্রেণী নরমপন্থী ও চরমপন্থী আন্দোলনগুলিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে কখনই এমন অর্থবহ বলে মনে করে নি যে জন্য তারা সেগুলোর ওপর কর্তৃত্ব বিস্তার করার জন্য সুনিশ্চিত ভাবে চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু জাতীয় আন্দোলন যখন শক্তিশালী গণ আন্দোলনে পরিণত হল বুর্জোয়া সম্প্রদায় তখন তার প্রতি আগের মত উদাসীন ও অবহেলার নীতি বজায় রেখে তাকে নিজের প্রতিকূল করে তুললো না। এইভাবে আবার বলতে গেলে, গান্ধী যুগে আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি পুঁজিপতি শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারণ শ্রমজীবী ও কৃষক শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারণের মতই এক গুরুত্বপূর্ণ ও নূতন বৈশিষ্ট্য।

১৯১৮ সালের পর আন্দোলনের গণ-চরিত্র এবং তার জাতীয়তাবাদী সংগ্রামী চরিত্রের আরেকটি দিক হল, ছোট জমিদার ও ভূস্বামী এবং ব্যবসায়ী ও মহাজনদের বিরাট সামাজিক স্তরকে সর্বপ্রথম সাধারণভাবে এর অন্তর্ভুক্ত করা। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত বাংলায় কেবল অল্প কালের জন্য এ কাজটি হয়নি। এই সময়েই শহুরে ও আধা শহুরে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেও সারা দেশ জুড়ে আন্দোলনে পুরোপুরি টেনে নেওয়া হল।

উপরন্তু, বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী ও স্তরকে নিয়ে আন্দোলনের ক্রিয়াকলাপ সত্ত্বেও তার তিন পর্যায়েই মূল উদ্যোগ এসেছিল প্রাথমিকভাবে পাতি বুর্জোয়া সম্প্রদায় অথবা সাধারণভাবে যাদের বলা হয় 'মধ্যবিত্ত শ্রেণী' সেই বিবিধ ও বিচিত্র সামাজিক স্তরের কার্যকলাপ ও অঙ্গীকার থেকে। আন্দোলনের সাধারণ ও সক্রিয় কর্মী বাহিনী ও তার মনস্তত্ত্ব ও আত্মিক বৈশিষ্ট্যেরও প্রধান উৎস ছিল এই পাতি বুর্জোয়া সম্প্রদায়।

৪

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের শ্রেণী চরিত্র বা সামাজিক চরিত্রে যে পরিবর্তন ঘটেছিল [illegible] থেকে, সে কথা জোরের সঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে। জাতীয়তা-

বাদী লেখকদের একটি গোষ্ঠী দাবি করেন যে প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদীরা ছিলেন উঁচু বা শ্রেণীর বড় জোর মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মানুষের প্রতিনিধি এবং চরমপন্থীরা ছিলেন জনগণের অথবা অন্তত পক্ষে সমাজের নিম্নস্তর, যারা উচ্চশ্রেণীর নয় সেই শ্রেণীর প্রতিনিধি। আর গান্ধী ছিলেন অন্নহীন, বস্ত্রহীন, উৎপীড়িত কৃষক শ্রেণীর প্রতিনিধি এবং তিনিই জাতীয় আন্দোলনকে এক গণ আন্দোলনে পরিণত করেছিলেন। অন্য গোষ্ঠীটি, বহু মার্কসবাদী ও আধা মার্কসবাদী লেখক যার অন্তর্ভুক্ত, বলেন, প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদীরা ছিলেন উচ্চতর বা বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণী বা বৃহৎ ব্যবসায়ী বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি, যে শ্রেণী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল ব্রিটিশের সহযোগী। আর চরমপন্থীরা প্রতিনিধিত্ব করতেন পাতি বুর্জোয়া শ্রেণীর, গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলন হয়ে উঠেছিল পুরোপুরি এক বুর্জোয়া আন্দোলন। সাধারণভাবে তা প্রতিনিধিত্ব করত বুর্জোয়া শ্রেণীর এবং বিশেষভাবে শিল্প-পুঁজিপতি শ্রেণীর সামগ্রিক স্বার্থের।

আমার মতে দুটি গোষ্ঠীই জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন পর্বের শ্রেণী চরিত্র নির্ণয়ে ভুল করেছে। বস্তুত, আমরা এখানে আরেকটি মৌলিক, সম্ভবতঃ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, ধারাবাহিকতা দেখতে পাই। কারণ জাতীয় আন্দোলনের শ্রেণী চরিত্র তার শুরু থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বরাবরই একই ছিল। এই আন্দোলন ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলন অর্থাৎ তা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সমাজের সমস্ত শ্রেণী ও অংশের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করত, কিন্তু পরিচালিত হত শিল্প-বুর্জোয়া গোষ্ঠীর কর্তৃত্বাধীনে। এই ব্যাপারে তিলক ও গান্ধী নরমপন্থীদের থেকে একটুও আলাদা ছিলেন না। তাঁরাও কম বুর্জোয়া ছিলেন না।

কোন আন্দোলনের শ্রেণী চরিত্র নির্ধারণ করতে অথবা আন্দোলন কাদের প্রতিনিধিত্ব করে এবং কিভাবে করে এই প্রশ্নের জবাব দিতে ইতিহাস প্রণয়নে যেসব নীতি সাহায্য করে এবং ভারতের জাতীয় আন্দোলনের বাস্তবতায় সেইসব নীতির প্রয়োগ এই দুটি বিষয়ই এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন চিন্তাধারার ঐতিহাসিকেরা কোন আন্দোলনের শ্রেণী বা সামাজিক চরিত্র নির্ণয় ও প্রমাণ করার জন্য সাধারণভাবে তিনটি সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি ব্যবহার করেছেন।

(১) আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি অথবা তাতে বিভিন্ন সামাজিক স্তর ও শ্রেণীর অংশগ্রহণ।

(২) যেসব নারী-পুরুষ প্রকৃত পক্ষে নেতৃত্ব দেন এবং সেই কারণে যাঁদের সংকীর্ণ ও কার্যকর অর্থে আন্দোলনের নেতা বলে বর্ণনা করা যায় তাঁদের শ্রেণী বা সামাজিক উৎস ও বৈশিষ্ট্য।

(৩) আন্দোলনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী, নীতি ও মতাদর্শের বৈশিষ্ট্য।

আমি বলবো যে (১) প্রথম দুটি মাপকাঠি ইতিহাস রচনার দিক দিয়ে বা সমাজতাত্ত্বিক দিক দিয়ে উক্ত কাজের পক্ষে ভুল পন্থা; (২) বিভিন্ন পর্বে

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সামাজিক বা শ্রেণীচরিত্র সম্পর্কে যে দুটি মতের কথা সাধারণত শোনা যায় উক্ত মাপকাঠিগুলোর প্রয়োগে সেই মতগুলো প্রমাণও হয় না ; এবং (৩) তৃতীয় সঠিক মাপকাঠির প্রয়োগে এই চরিত্রে কোন উল্লেখ-যোগ্য পরিবর্তন বা অবচ্ছিন্নতা প্রমাণ করে না।

(ক) কোন আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি আন্দোলনের ওপর অনেক রকমের চাপ সৃষ্টি করে এবং সেই দিক দিয়ে তা স্বভাবতঃই আন্দোলনের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক, কিন্তু আন্দোলনের শ্রেণীগত উপাদান তা নির্ধারণ করতে পারে না। একই কথা আরেকভাবে বলা যায়। কোন আন্দোলনে সামাজিক অংশগ্রহণের প্রকৃতি এবং তার শ্রেণীগত উপাদান বা সামাজিক চরিত্র হল দুটি ভিন্ন দিক। কোন সেনাবাহিনী তার সৈন্যদের স্বার্থের জন্য যতটা লড়াই করে অথবা কোন দল তার ভোটদাতাদের স্বার্থের জন্য যতটা সংগ্রাম করে, কোন আন্দোলন তার অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব তার চেয়ে বেশি করে না।

কোন আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি সংকীর্ণই হোক বা বিস্তৃতই হোক তার শ্রেণী চরিত্র একই রকম হতে পারে। একইভাবে, জনগণের সক্রিয়তার ব্যাপ্তি এবং সংগ্রামের জঙ্গীপনাও এক্ষেত্রে চূড়ান্ত নির্ধারক নয়। এগুলো বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা-সমাবেশের বিষয়। বিশেষ ঐতিহাসিক পরিবেশে পুঁজি-পতিরাও সংগ্রাম চাইতে পারে, তার উন্নতিতে সাহায্য করতে পারে, অথবা, অন্ততপক্ষে তা মেনে নিতে পারে। ইতিহাসে বুর্জোয়া সম্প্রদায় অনেকবারই জনগণকে জাগিয়ে তুলেছে, তাদের সক্রিয় করে তুলেছে এবং এমনকি সশস্ত্র সংগ্রামও গড়ে তুলেছে। আসল প্রশ্ন সামাজিক ভিত্তি অথবা রাজনৈতিক লড়াইয়ের ধরন নিয়ে নয়, প্রশ্ন হল আন্দোলনের সামাজিক নেতৃত্ব নিয়ে। ফলে, ভারতে যতদিন পর্যন্ত কোন গণ আন্দোলন একটা সীমার মধ্যে থেকে সামাজিক উন্নতির ওপর বুর্জোয়া গোষ্ঠীর কর্তৃত্বের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে ওঠেনি ততদিন সেই গোষ্ঠী কোন গণ আন্দোলনকেই তার স্বার্থের পক্ষে আশঙ্কাজনক বলে মনে করেনি। এবং এখানে একথা বলা যেতে পারে যে নরমপন্থীরা যেক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্ষুদ্র সামাজিক অংশের ওপর বুর্জোয়া মতাদর্শগত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেক্ষেত্রে গান্ধীযুগে কৃষক, শ্রমিক ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিশাল জনগণের ওপর রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বুর্জোয়া মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কর্তৃত্ব।[17] এই ভাবে নরমপন্থীদের, চরমপন্থীদের ও গান্ধীর গণ-ভিত্তিতে এত পার্থক্য থাকলেও তাঁদের পরিচালিত আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ছিল একইভাবে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী।

অবশেষে, যদি কোন আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি তার সামাজিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে তাহলে নরমপন্থী ও চরমপন্থী পর্বগুলোকে আদৌ বুর্জোয়া বলা যায় না, কারণ আমরা আগেই দেখেছি যে পুঁজিপতিরা ও তাদের টাকা আন্দোলনে কার্যকরভাবে যুক্ত হয়েছিল মাত্র ১৯১৮ সালের পরে।

(খ) একটা সাধারণ নীতি হিসেবে একথাও জোর দিয়ে বলা যায় যে কোন আন্দোলনের কর্মসূচী, নীতি, মতাদর্শ ও কর্মধারার ওপর আন্দোলনের নেতৃত্বের সামাজিক উৎসের প্রবল কিন্তু অপ্রত্যক্ষ প্রভাব নিঃসন্দেহে থাকলেও তা তার সামাজিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে না। যেমন আধুনিককালে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতাদের সামাজিক উৎসটি লক্ষ্য করা যেতে পারে। বর্তমান ক্ষেত্রে যা একই রকম তাৎপর্যপূর্ণ তা হল জাতীয় নেতৃত্বের সামাজিক উৎস ও জীবনযাত্রা প্রণালী তিনটি পর্যায়েই কার্যতঃ একই ছিল। ১৮৮০ সাল থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে জাতীয় নেতৃত্বকে জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী বললে সব চেয়ে ঠিক বলা হয়। আন্দোলনের প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব কখনোই পুঁজিপতি বা জনগণ বা নিম্নমধ্যবিত্তের হাতেও ছিল না। মধ্যবিত্ত জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীদের তা পুরোপুরি কুক্ষিগত ছিল। নরমপন্থীরা, তিলক, গান্ধী, নেহরু ও অন্যান্যরা একথা অকপটে স্বীকার করেছেন। ফলে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে উদ্ভূত আইনজীবী, ডাক্তার, সাংবাদিক ও নিজের জীবিকার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে পেরেছে এমন ধরনের সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মীরাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নেতৃত্ব কুক্ষিগত করে রেখেছিল।

সাধারণভাবে একথা স্বীকার করা হয় যে চরমপন্থী পর্বে ও গান্ধীপর্বে নেতৃবর্গ নিজেরা যে সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্গত তার বাইরেও অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করতেন। কিন্তু প্রথম দিকের জাতীয়তাবাদী নেতারা একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ শ্রেণী গড়ে তুলেছিলেন বলে প্রায়শঃই মনে করা হয়, তা হল শিক্ষিত ভারতীয়দের শ্রেণী। কিন্তু বস্তুত 'শ্রেণী' হিসেবে সে সময় তাঁদের সংখ্যা এত কম ছিল যে সহজেই তাঁদের ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে খাপ খাইয়ে নেওয়া যেত, রিপন ও অন্যান্যরা তাই চেয়েছিলেন। ডাফরিন এ ব্যাপারে খুবই চেষ্টা করেছেন। প্রশাসনের সঙ্গে শিক্ষিত ভারতীয়দের সক্রিয় ভাবে যুক্ত হওয়ার এবং সরকারি চাকরিতে তাঁদের কর্মসংস্থান করা ছাড়াও বিধান পরিষদগুলোর সদস্যসংখ্যা বাড়িয়ে—'তাঁদের নিজেদের দেশের ব্যাপার পরিচালনার' পক্ষে তিনি ওকালতি করেছিলেন। প্রথম দিকের রাজনৈতিক কর্মীরা যতদিন পর্যন্ত এক সীমাবদ্ধ শ্রেণীর মত আচরণ করেছিল ততদিন তিনি তাদের তুষ্ট করেছিলেন। কিন্তু যখন তারা নিজেদের শ্রেণীগত দাবি ছাড়া সাধারণ দাবিও পেশ করতে লাগল, দাবি জানাল বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের মুখপাত্র হওয়ার, যখন তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচী ও ক্রিয়াকলাপকে ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে আর খাপ খাওয়ানো গেল না, তখন আর ডাফরিন সাহেব তাদের হয়ে ওকালতি করেন নি। ত্রিশ বছর পরে মণ্টফোর্ড রিপোর্টে শিক্ষিত ভারতীয়দের মুখপাত্র হিসেবে জাতীয়তাবাদীদের প্রতি অনুরূপ নীতির কথা বলা হয়েছিল। বস্তুতঃ, ব্রিটিশ ভারতে নরমপন্থীদের পালন করার মত ভূমিকা প্রদান ও তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করার ব্যাপারে রক্ষণশীল চিরাচরিত ব্রিটিশ অভিজাত শাসকবর্গের ব্যর্থতায় উদারনৈতিক শ্রমিক দলের নিরবচ্ছিন্ন শোকের ভিত্তি হল এই ভ্রান্ত

যুক্তি। কিন্তু নরমপন্থীদের মৌলিক শর্তাবলী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী হওয়ায় সামরিক মীমাংসা ছাড়া এধরনের সমঝোতা সম্ভব ছিল না। ডাফরিন ও অন্যান্য রক্ষণশীলদের এটা বোঝার মত অন্তর্দৃষ্টি ছিল। তাঁরা যথার্থই আদি জাতীয়তাবাদীদের একটা 'শ্রেণী' হিসেবে না দেখে দেখেছিলেন জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত বুদ্ধিজীবী হিসেবে। যাঁদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অনিবার্য পরিণাম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা। সুতরাং প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদীদের জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবী বললেই সবচেয়ে ঠিক বলা হয়। চিন্তায় ও জীবনচর্যায় তাঁরা ছিলেন বুর্জোয়া। তাঁরা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ছিলেন বুর্জোয়া দৃষ্টিকোণ থেকে, তথাকথিত কোন মধ্যবিত্ত দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

(গ) আদি জাতীয়তাবাদীদের কর্মসূচী ও মতাদর্শ ছিল সমকালীন প্রাগ্রসর বুর্জোয়া রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও সমাজের আদলে এক আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও সমাজ নির্মাণের অনুসারী। সমস্ত শ্রেণীর যেসব স্বার্থের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের সংঘাত ছিল তাঁদের কর্মসূচীতে সেইসব স্বার্থই তুলে ধরা হত। সেইসঙ্গে, যেসব সমস্যা ও দাবি ভারতীয় সমাজের এক অংশের সঙ্গে আরেক অংশের বিরোধ সৃষ্টি করত সেগুলোকে তাঁরা এড়িয়ে যেতেন। অশিক্ষিত কৃষক, শ্রমিক বা শহরের দরিদ্রদের উদ্বুদ্ধ করার কর্মসূচী তাঁদের বিশেষ কিছু ছিল না। তাঁদের সমগ্র কর্মসূচী ছিল ততটাই বুর্জোয়া যতটা তা বুর্জোয়া সামাজিক উন্নতির প্রশস্ত পরিধির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। বুদ্ধিজীবী হিসেবে তাঁরা শিল্প-বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের স্বার্থ প্রচার করতেন যদিও তারা তাঁদের পৃষ্ঠপোষণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

বিষয়টিকে এভাবে উপস্থাপিত করা হলেই এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে চরমপন্থী ও গান্ধীযুগের জাতীয় নেতৃত্বও অনুরূপ বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করত। কি তিলক, কি গান্ধী কেউই নরমপন্থী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচী বা সামাজিক দৃষ্টিশক্তিকে ছাপিয়ে যাননি। তিলক অথবা বাংলার চরমপন্থীরা জনগণের স্বার্থ তুলে ধরার ক্ষেত্রে নরমপন্থীদের চেয়ে বেশি এগোতে পারেন নি। অন্তত ১৯৪০-এর দশক পর্যন্ত গান্ধীও চিন্তায়, বাক্যে বা কর্মে এই ব্যাপারে নরমপন্থীদের ছাড়িয়ে যেতে পারেন নি। 'দীন ও উৎপীড়িত মানুষের সঙ্গে আবেগময় একাত্মতাবোধ' সত্ত্বেও তিনি তাঁর কোন বড় রকমের রাজনৈতিক প্রচার অভিযান ও আন্দোলনেই খাজনা হ্রাস, ঋণভার লাঘব এবং পুলিশ ও অন্যান্য নিম্নপদস্থ সরকারি কর্মচারীর অত্যাচার থেকে রক্ষার জন্য কৃষকের দাবি অন্তর্ভুক্ত করেন নি। ভূমি পুনর্বণ্টনের কথা নাই বা উল্লেখ করা হল। ১৯৩০ সালে সরকারের কাছে পেশ করা বিখ্যাত এগারো-দফা দাবির কথাই ধরা যাক। এগুলিকে আপস মীমাংসার ন্যূনতম জাতীয় শর্তাবলী বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল এবং গান্ধীর নিজের ভাষায় এর মধ্য দিয়ে "স্বাধীনতার সারমর্ম" প্রকাশিত হয়েছিল। পুঁজিপতিদের মুদ্রা বিনিময় হারকে আবার ১ শিলিং ৪ পেনিতে

নিয়ে আসা, বিদেশী কাপড়ের বিরুদ্ধে শুল্কের প্রাচীর এবং ভারতীয় জাহাজের জন্য উপকূল অঞ্চলের বাণিজ্য সংরক্ষণ করার দাবিগুলিকে গান্ধী গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কৃষকের একমাত্র যে দাবি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল তা হল ভূমি রাজস্ব হ্রাসের দাবি। এই শেষ দাবিটি নরমপন্থীদের হাতেও আন্দোলনের অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল।

এইভাবে গান্ধী ও তিলক নরমপন্থীদের মতই শিল্প-বুর্জোয়া গোষ্ঠীর মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক প্রতিনিধি ছিলেন এই অর্থে যে তাঁরা জাতীয় স্বার্থকে দেখতেন উক্ত গোষ্ঠীর দৃষ্টিকোণ থেকে এবং ভারতীয় জনমানস থেকে সাম্রাজ্যবাদী মতাদর্শগত কর্তৃত্ব যখনই তাঁরা দূর করলেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সবাই ভারতীয় শহুরে সমাজের ওপর বুর্জোয়া প্রভুত্ব তৈরির কাজে সাহায্য করতে লেগে গেলেন। ঔপনিবেশিক উন্নতির একমাত্র বিকল্প হল সামাজিক উন্নতির বুর্জোয়া পন্থা এই কথা মেনে নিতে জনগণকে তাঁরা প্ররোচিত করতেন ও সেই ভাবে শিক্ষা দিতেন। এটা অবশ্য লক্ষ্য করা যেতে পারে যে ভারতীয় জনসাধারণ ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কাছে কি তত্ত্বে কি বাস্তবে যখন সামাজিক উন্নতির আর কোন আদর্শ ছিল না, সেই সময়েই নরমপন্থী ও চরমপন্থীরা এই পথ বেছে নিয়েছিলেন। আর গান্ধী যুগের জাতীয়তাবাদীরা এই পথ বেছে নিয়েছিলেন সেই সময়েই সমাজতান্ত্রিক বিকল্প যখন আদর্শগতভাবে ও বাস্তবজীবনে উভয়তঃ শুধু সহজলভ্যই ছিল না, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিক দিয়ে কার্যতঃ হয়ে উঠেছিল এক তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী। উপরন্তু, গান্ধীযুগে জাতীয় আন্দোলনের ওপর বুর্জোয়া প্রভুত্ব আগের চেয়েও দৃঢ়ভাবে চেপে বসেছিল। পক্ষান্তরে, কেউ যদি বলে যে ব্যক্তিগতভাবে দাদাভাই নওরোজি, সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা গোপাল কৃষ্ণ গোখলে উচ্চ আদর্শ ও জনগণের প্রতি ভালবাসার ব্যাপারে তিলক বা গান্ধীর তুলনায় কম অনুপ্রাণিত ছিলেন না, তাহলে তা দোষের হবে না।

টীকা

1. তিলক বারবার বলেছেন যে জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্যে তাঁর ও নরমপন্থীদের মধ্যে সাত্যিকারের কোন পার্থক্য ছিল না। তাই 1907 সালে নরমপন্থীদের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক লড়াইয়ের তুঙ্গে তিনি তাঁর "দ্য টেনেটস্ অব দ্য নিউ পার্টি" শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে বলেছেন. "...একটি দেশ আর একটি দেশে শাসন চালানোর জন্য সরকার তৈরি করলে তা কখনই সফল সরকার হতে পারে না, আর সে সরকার তাই স্থায়ীও হতে পারে না। মূল এই প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে নতুন ও পুরানো পন্থীদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই।" 'বাল গঙ্গাধর তিলক, হিজ রাইটিংস এন্ড স্পিচেস', পরিবর্ধিত সংস্করণ, 1919, পৃঃ 56.

2. 1907 সালে তিলক এইচ. ডাব্লিউ. নেভিনসন-কে বলেন: "এখানে খুব ছোট একটি দল অবশ্যই আছে, তারা অবিলম্বে ব্রিটিশ শাসন সমূলে উৎখাত করার কথা বলে। তা নিয়ে

আমরা মাথা ঘামাই না ঃ সেটা সুদূর ভবিষ্যতের কথা। আমরা অসংগঠিত, নিরস্ত্র, এবং আজও আমরা বহুধাবিভক্ত, ব্রিটিশ অধিরাজত্বের ভিত কাঁপানোর কোন সুযোগ আমাদের নেই। অনাগত দিনে আমরা এসব ভাবব।" এইচ. ডব্লিউ. নেভিনসন কৃত 'নিউ স্পিরিট ইন ইন্ডিয়া', 1908, পৃঃ 72-তে উদ্ধৃত। 1916-র ব্যাপারে বেলগাঁওয়ে প্রদত্ত তাঁর বিখ্যাত হোম রুল বক্তৃতা দ্রষ্টব্য, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ 108-18. 1920-22 সালে 'পূর্ণ স্বরাজে'র আহ্বান দেওয়ার পর গান্ধী আবার ডোমিনিয়ন স্টেটাসের দাবিতে ফিরে গেলেন। অনুরূপভাবে, 1929 সালে কংগ্রেস অধিবেশনে গৃহীত পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবের ভিত্তিতে 1930 সালে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার পরও তিনি 1931 সালে এর চেয়েও কম দাবির ভিত্তিতে আপস করতে আগ্রহী ছিলেন।

3. সক্রিয় রাজনৈতিক সংগ্রাম গড়ে তোলার পথে যে সব বাধা ছিল, তা বর্ণনা করে গোখলে 1907 সালে বলেন, "এ দেশের বিরাট সংখ্যক মানুষ জড় পদার্থের মত পড়ে আছে, সব কিছুতেই তাদের অনীহা…তারা শোচনীয়ভাবে বহুধাবিভক্ত…নিঃসীম দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার অন্ধকারে তারা নিমজ্জিত, নানা প্রথা, নানা বিধিনিয়মের নিগড়ে তারা আবদ্ধ…অগ্রগতির উদ্দেশ্যে কোন দারুণ জোরদার, দীর্ঘস্থায়ী বা সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা ঠিক ঐ সব প্রথা বা নিয়মের উদ্দেশ্য ছিল না।" 'স্পিচেস্,' দ্বিতীয় সংস্করণ, নটেসন এন্ড কোং সংস্করণ, তারিখ নেই, পৃঃ 1103.

4. 1907 সালে সুরাট কংগ্রেসে গোখলে চরমপন্থীদের বলেন "সরকারের পেছনে যে কি বিপুল শক্তি সংহত আছে তা আপনারা বুঝতে পারছেন না। আপনাদের প্রস্তাব মত কংগ্রেস যদি কিছু করতে যায়, তবে তা দমন করতে সরকারের 5 মিনিটের বেশি লাগবে না।" অ্যান্ড্রুজ এন্ড মুখার্জি কৃত 'দ্য রাইজ এন্ড গ্রোথ অব দ্য কংগ্রেস ইন ইন্ডিয়া,' 1938, পৃঃ 215-তে উদ্ধৃত।

5. 1907 সালে বিপিন চন্দ্র পাল তাঁর বিখ্যাত মাদ্রাজ বক্তৃতামালায় তাই বলেন ঃ "আর একটি দৃষ্টিভঙ্গি হল বিদেশি জাতি এবং বিদেশি সরকারের উপর আস্থা হ্রাস পাওয়ার ফলে, বিদেশি যে প্রশাসন আমাদের উপর এসে গেছে, তার প্রতি আস্থা হ্রাস পাওয়ার ফলে আমরা আমাদের ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে আরম্ভ করেছি। সরকারি ভবন থেকে, সংসদের দুই কক্ষ থেকে, সিমলা ও কলকাতা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে আমরা এখন তাকিয়ে দেখছি এ দেশের বুভুক্ষু, নগ্ন, শান্ত এবং দীর্ঘদিন ধরে নিপীড়িত ৩০ কোটি মানুষকে। দেখছি তাদের মধ্যে নতুন এক শক্তি। কারণ আজ যে ভালবাসার চোখে আমরা এদের দিকে তাকাচ্ছি সে ভালবাসা আগে আমরা কখনও অনুভব করিনি। আর ভারতবর্ষের অগণ্য, পরিশ্রমী, বুভুক্ষু ও নগ্ন জনসাধারণের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি <u>সম্ভাবনা, শক্যতা, পাচ্ছি সে সব বীজ যা থেকে নতুন এই আন্দোলন গড়ে উঠেছে। তাই হল এই আন্দোলনের মূল বস্তু, অর্থাৎ জনগণে বিশ্বাস, জাতির প্রতিভায় বিশ্বাস</u>, ঈশ্বরে বিশ্বাস, কারণ ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যুগে যুগে এই জাতির প্রতিভা তাঁর নির্দেশেই পরিচালিত হচ্ছে এবং ভারতবাসীর চিরন্তন অদৃষ্টে বিশ্বাস। বিদেশি সরকার এবং বিদেশি জাতির উপর থেকে আমাদের আস্থা কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের মানুষের উপর এই উচ্চতর, এই প্রিয়তর, এই গভীরতর, এই আরও গুরুত্বপূর্ণ এবং আরও স্বর্গীয় আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে (হর্ষধ্বনি)। এবং নতুন এই আন্দোলন যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে গেলে ভারতবর্ষের মানুষের প্রতি নতুন এই আস্থা নিয়েই তা দেখতে হবে।" 'স্বদেশী এন্ড স্বরাজ', 1954, পৃঃ 137-38. গুরুত্ব আরোপিত।

6. তিলক, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ 69-73, 374 এবং 382.

7. লাজপৎ রাই, 'ইয়ং ইন্ডিয়া' 1965 ভারতীয় সংস্করণ, পৃঃ 91-92.

8. তিলক, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ 65 ; বিপিন চন্দ্র পাল, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ 216-20 এবং 241-49 ; লাজপৎ রাই, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ 141 ; অরবিন্দ ঘোষ, 'ডকট্রিন অব প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স', 1948.

9 1915 সালে মাদ্রাজে এক স্বাগত ভাষণের উত্তর দেওয়ার সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী সাধারণ মানুষের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আপনারা বলছেন ঐসব মহান নরনারীকে আমি অনুপ্রাণিত করেছি, কিন্তু এ কথা আমি মানতে পারি না। এরং তারাই, ঐ সব সরলমনা মানুষই, গভীর বিশ্বাসে যারা কাজ করেছে, বিনিময়ে সামান্যতম পুরস্কারও প্রত্যাশা করেনি, আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে তারাই, আমাকে স্থির, অবিচল রেখেছে তারাই, এবং আমি যে কাজ করতে সক্ষম হয়েছি সে কেবল তাদের জন্যই। নিজেদের মহান আত্মত্যাগ, সুগভীর বিশ্বাস, মহান ঈশ্বরে পবিত্রতম আস্থা দিয়ে তারা আমাকে সে কাজ করিয়েছে।" 'কালেকেটড ওয়ার্কস', খণ্ড XIII, 1964, পৃঃ 52-53.

10. ইতিমধ্যেই, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ কোন কোন নেতা অভিযোগ করতে আরম্ভ করেছিলেন যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সত্যিকারের সব ক্ষমতার মালিক শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের কবজায়, সাধারণ কর্মীদের কথা কেউ ভাবে না। পরবর্তী কালে কংগ্রেস কর্মীরা সব সময়ই এই অভিযোগ করতেন।

11. গোখলে, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ 1105-06, গুরুত্ব আরোপিত। এই নীতির একটি দিক বিচারপতি রানাডে নিম্নলিখিত ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: "নরমপন্থা বলতে অসম্ভব বা একেবারে ধোঁয়াটে কোন আদর্শের জন্য কখনই বৃথা আক্ষেপ না করে বোঝাপড়া ও ন্যায্যতার মনোভাব নিয়ে আম দের একেবারে হাতের কাছে স্বাভাবিক বিকাশের যে ক্রম বিন্যস্ত রয়েছে, তদনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রাত্যহিক চেষ্টার শর্তাদিই বোঝায়।" টি. ভি. পরাবতে, 'গোপাল কৃষ্ণ গোখলে', 1959, পৃঃ 463

12. গোখলে, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ 829-30, গুরুত্ব আরোপিত। লক্ষণীয় যে পরবর্তী পর্যায়ে উত্তরণের ব্যাপারটা সংক্ষিপ্ত শিক্ষানবিশী ক্রম সম্পন্ন করা বা প্রতি পর্যায়ে থামার মতই গুরুত্বপূর্ণ।

13. 1907 সালে তিলকের এক বক্তৃতা থেকে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি এ ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ। "(1858 সালের) ঘোষণা কোনদিন কাজেই লাগল না, কারণ আপনারা সেটা প্রয়োগ করাতে পারলেন না…প্রতিজ্ঞা একটা করা হল, কিন্তু দেখা গেল যে প্রয়োগ করানোর মত ক্ষমতাই আপনাদের নেই…মিঃ মর্লি কি এটা পালন করবেন? সমস্যাটা ঘোষণা ব্যাখ্যা করা নিয়ে নয়। সমস্যা এই প্রতিজ্ঞা পালন করতে কি করে ওঁকে বাধ্য করা যাবে। (জাতীয়তাবাদীদের সে দায়িত্বটা নিতে হবে, কিন্তু পালন করবেন উনি – বি. চ)…স্বীকার করছি আমাদের প্রশ্ন করতেই হবে; কিন্তু দাবি প্রত্যাখ্যান করা চলবে না এই সচেতনতা নিয়েই আমাদের প্রশ্ন করতে হবে…আমরা বলি শক্তি সংগ্রহ করুন, ক্ষমতা সংহত করুন, এবং তারপর কাজে নামুন। তাহলে আপনারা যা দাবি করবেন, তা ওরা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না…গোটা রুটিটাই আমরা চাই এবং এখনই চাই। কিন্তু গোটাটা যদি না পাই, তবে আমার কোন ধৈর্য নেই ভাববেন না। ওরা যে অর্ধেকটা আমাকে দিচ্ছে সেটাই নেব এবং তারপর বাকিটুকুর জন্য চেষ্টা করব।" পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ 62, 64, 66, পৃঃ 45ও দ্রষ্টব্য। গুরুত্ব আরোপিত। এইচ. ডব্লিউ নেভিনসন বলছেন তিলক তাঁকে 1907 সালে বলেছিলেন: "আমলাতন্ত্রের উপর আমরা কিভাবে চাপ সৃষ্টি করব সেটাই এখন আমাদের কাছে আশু সমস্যা…ঐ প্রশ্নের যে উত্তর আমরা দেব তা থেকেই বোঝা যাবে তথাকথিত নরমপন্থীদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য কোথায়। ওঁরা এখনও আশা করেন প্রতিনিধিদল (ইত্যাদি) পাঠিয়েই ওঁরা ইংলণ্ডে জনমত প্রভাবিত করতে পারবেন… আমরা চরমপন্থীরা অন্য পন্থা স্থির করেছি।" নেভিনসন, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ 73-74-তে উদ্ধৃত। অনুরূপভাবে, 1939 সালে দেশীয় রাজ্যগুলির জনগণের সংগ্রামের নেতাদের দেওয়া রাজনৈতিক পরামর্শে গান্ধী তাঁর মূল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষেপে ব্যক্ত করেন: "আমি বিশ্বাস করি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করতে হবে। এতকাল, দেশীয় রাজ্য কংগ্রেসের লোকেরা স্ব স্ব রাজ্যের শাসকদের সঙ্গে মন্তব্যের চাপান উতোর করেছেন, ফলে উভয়পক্ষের মধ্যে

ফারাক বেড়েই গেছে। মীমাংসার উদ্যোগ উভয়পক্ষেরই নেওয়া উচিত এই যুক্তিতে সত্যাগ্রহী ব্যর্থ হবেন…সম্মানজনক মীমাংসার সুযোগ খোঁজা, এটাই হবে সত্যাগ্রহীর প্রথম ও শেষ কর্তব্য…নেতাদের মনে সক্রিয় অহিংসা যদি বিরাজ করে, তবে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির যথার্থ সম্ভাবনা ও প্রয়োজনে বিশ্বাস তাঁদের থাকতেই হবে। আর এ বিশ্বাস তাঁদের যদি থাকে, তবে পথ তাদের সামনে নিশ্চয়ই খুলে যাবে। সবাই জানেন যে আমার নিজের ক্ষেত্রে আমি সর্বদাই এই নীতি নিয়ে কাজ করে গেছি। আমাদের লক্ষ্য যে স্থির থাকে, কিন্তু সমগ্রের চেয়ে কিছু কম পেলেও আমরা যেন আপস-আলোচনা করতে তৈরি থাকি। তবে যা পাচ্ছি সেটা যেন যা চাইছি অবশ্যই সেই একই জিনিসের অঙ্গ হয় আর ভবিষ্যতে সেটা সম্প্রসারিত হবে এ সম্ভাবনা যেন তার মধ্যে থাকে।" 'কালেক্টেড ওয়ার্কস্', খণ্ড LXIX, 1977, পৃঃ 323.

14. মজার কথা, অসহযোগ আন্দোলনের সময় শান্তিপূর্ণ জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাঝে মাঝে ঠিক এই কাজটিই করেছে। 1930 সালে শোলাপুরের মানুষ কার্যত পুলিশের স্থান অধিকার করেছিল—স্বেচ্ছাসেবকদের সংগঠিত করে শৃংখলা রক্ষা করেছে এবং পুলিশ খুঁচিয়ে গন্ডগোল না বাধানো পর্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় যানবাহন চলাচলও নিয়ন্ত্রণ করেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পাঞ্জাবের কায়দায় সামরিক আইন জারি ও গণহত্যা করতে হয়েছিল। পাঠান জনতার উপর গাড়োয়ালি সৈন্যদের গুলি চালাতে অস্বীকার করা এবং নিজেদের রাইফেল ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা সুপরিজ্ঞাত—সবটাই হয়েছিল খুব শান্তিপূর্ণভাবে।

15. জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি জে. এন টাটার বদান্যতা একেবারেই গালগল্প। কংগ্রেসকে তিনি দু বছরে মাত্র 1000 টাকা দিয়েছেন এবং সেটাও দিয়েছেন 1896 সালে সুতীবস্ত্রের উপর শুল্ক বসানোর কারণে রাগের চোটে। কয়েকজন দেশপ্রেমিক জমিদার ও রাজাই কেবল জাতীয় উদ্দেশ্যে উল্লেখযোগ্য ভাবে দান করেছেন; কিন্তু তাঁরা ব্যক্তিগত অধিকারেই তা করেছেন, স্ব শ্রেণীর মুখপাত্র এমনকি সদস্য হিসাবেই সে দান করেন নি।

16. টাকার এই অভাবই অংশত প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে আইনজীবী ও সাংবাদিকদের প্রাধান্যের কারণ—এই দুই শ্রেণীই ছিল স্বাধীন পেশায় রত। এঁরা স্বাধীন ছিলেন দুটি অর্থেঃ তাঁদের উপর কোন সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকত না এবং তাঁদের রাজনীতি চর্চাটা ধনী ব্যক্তিদের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল না। পক্ষান্তরে, গোখলে ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অস্নাতকদের পড়ানোর জন্য অনেক সময় ব্যয় করতে হত। তিলকের খবরের কাগজ ঋণমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কয়েক বছর ধরে তাঁকে আইন ছাত্রদের নিয়ে কোচিং ক্লাস করতে হত। জি. সুব্রহ্মণ্য আয়ার ও বিপিনচন্দ্র পাল সাংবাদিকতা পেশা অবলম্বন করেছিলেন।

17. গান্ধী সম্পর্কে প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে তাঁর চিন্তা ও কর্মধারা সর্বদাই কৃষককে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। আমি এই মত মানি না। তাঁর কোন মূল দাবিই জমিদার, ভূস্বামী, ব্যবসায়ী ও মহাজনদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়নি। তাঁর চিন্তাধারা সমাজ উন্নয়নের বুর্জোয়া কাঠামোর মধ্যে সাধারণভাবে সীমাবদ্ধ জাতীয় স্বাধীনতার ধারণাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। কৃষকদের জন্য তাঁর নিঃসন্দেহে গভীর সমবেদনা ছিল, তিনি তাদের তাগিদ ও মনস্তত্ব বুঝতেন। কিন্তু এই উপলব্ধি থাকা এবং কোন শ্রেণীকে সক্রিয় করে তুলতে তাদের মনস্তত্ব প্রয়োগ করার সঙ্গে 'তাঁর চিন্তা ও কর্মধারা' এই শ্রেণীকে 'কেন্দ্র করে আবর্তিত হত' বলার পার্থক্য অনেক। যেমন, হিটলার ত' গান্ধীর একেবারে 'বিপরীত' মেরুর লোক—জার্মান পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীর মনস্তত্ব সম্পর্কে হিটলারেরও খুব পরিষ্কার ও গভীর বোধ ছিল এবং সাধারণের এক আন্দোলন সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে সেই বোধকে তিনি সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। হিটলার ও গান্ধীর মধ্যে তফাৎ হল এই যে হিটলার পেটি বুর্জোয়া মনস্তত্বকে কাজে লাগিয়েছেন একচেটিয়া পুঁজিবাদ বজায় রাখা এবং বর্বর ফ্যাসীবাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থা তৈরির মত ঐতিহাসিক দিক থেকে পশ্চাদগামী কাজে আর গান্ধী কৃষক মনস্তত্বকে প্রয়োগ করেছেন সাম্রাজ্যবাদ উৎখাত এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করার মত প্রগতিশীল উদ্দেশ্যে।

ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদ
১৯৪৭ সালের আগে

ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম যখন গড়ে উঠেছিল, ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক তখনই উদ্ভূত হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ে এই সংগ্রামকে মুখ্যতঃ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় বুর্জোয়া গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধিতার নিছক প্রতিফলন হিসেবে দেখা উচিত হবে না। এই সংগ্রাম ছিল মূলতঃ সাম্রাজ্যবাদ ও সমগ্র ভারতীয় নীতির মধ্যে বিরোধিতার প্রতিফলন। বুর্জোয়া গোষ্ঠী সেই ভারতীয় জাতিরই এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ মাত্র ছিল। উপরন্তু, এই সংগ্রামের সূচনা থেকে এর বিকাশের পরবর্তী ধাপ পর্যন্ত কখনই পুঁজিপতি শ্রেণী এই সংগ্রাম বা তার উদ্দীপনার পেছনে চালিকা শক্তি হিসাবে দেখা দেয় নি।[1]

সুতরাং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন সৃষ্টি করা হবে, কি হবে না অথবা তাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, কি হবে না এটা বুর্জোয়া গোষ্ঠীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করত না। বরং, স্বাধীনভাবে জেগে ওঠা ও বিকাশমান এক আন্দোলনের প্রতি এই শ্রেণীকে সব সময়ই, নিরবচ্ছিন্নভাবে, পর্যায় থেকে পর্যায়ান্তরে, তারা কি আচরণ করবে তা স্থির করে নিতে হয়েছিল। সেই আন্দোলন কিন্তু কোন পর্যায়েই তার প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে পরিচালিত হয়নি। আন্দোলনের বিরোধিতা করে, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বা তার প্রতি নিঃস্পৃহ থেকে এই শ্রেণী আন্দোলনকে নিজেদের প্রতিকূল করে তুলতে পারতো। অথবা এই আন্দোলনকে সমর্থন করার মধ্য দিয়ে এবং তার দ্বারা তার গতিপথ, পদ্ধতি, সামাজিক-অর্থনৈতিক কর্মসূচি ও সংগঠন নিয়ন্ত্রণ করে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারতো। অথবা অন্যভাবে বলা যায়, নিজেদের শ্রেণী স্বার্থের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিমাপের মধ্যে আন্দোলন সীমাবদ্ধ করতে পারতো। এই শ্রেণী যে পথ বেছে নিয়েছিল তা আদৌ আকস্মিক ছিল না। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এই শ্রেণীর বাস্তব সম্পর্ক থেকে এবং জাতীয় আন্দোলনকে স্বশ্রেণীর কর্তৃত্বাধীনে আনার জন্য তার সঙ্গে একটা সঠিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষমতা থেকে এই আন্দোলনকে সমর্থনের সম্ভাবনা, প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনও, উদ্ভূত হয়েছিল।

এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর সম্পর্ককে আলোচনা করতে হবে।

এই পর্যায়ে আরেকটি ধারণাকেও পরিষ্কার করতে হবে। সমগ্র পুঁজিপতি শ্রেণী পুরোপুরি সমপ্রকৃতিসম্পন্ন ছিল না। ফলে তার বিভিন্ন অংশ বা ভাগ এবং সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে বিরোধিতা প্রকাশের মাত্রার ক্ষেত্রে, এবং সেই কারণে, এই সব অংশের মনোভাবের ক্ষেত্রে অবশ্যই পার্থক্য ছিল। যেমন, বাণিজ্য ও শিল্প, আর্থিক সংস্থান ও শিল্প, অঞ্চল ও আয়তন ভিত্তিক পার্থক্য ছিল। একেবারে ব্যক্তিগত পর্যায়েও পার্থক্য ছিল। যাই হোক, বর্তমান উদ্দেশ্যের জন্য আমি শ্রেণীটিকে সামগ্রিকভাবে নিয়েছি। কারণ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর মধ্যে ব্যক্ত হয়েছিল এক মৌলিক সমধর্মিতা। এই সমধর্মিতা ১৯২৭ সালের পর পরিস্ফুট হল, কারণ তখন ফেডারেশন অব ইনডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাসট্রিকে এবং পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস ও জি. ডি. বিড়লার মত কিছু ব্যক্তিকে এই শ্রেণী এবং সরকারও বিশিষ্ট মর্যাদা দিয়েছিল।

১

এই গবেষণা-পত্রের মূল প্রকল্প হল, ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এক দীর্ঘমেয়াদী বিরোধিতা গড়ে তুলেছিল, আবার একই সঙ্গে তার ওপর নির্ভরতার এবং তার সঙ্গে মানিয়ে চলার এক স্বল্পমেয়াদী সম্পর্ক বজায় রেখেছিল।[২]

২

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে এবং বিশেষ করে ১৯১৪ সালের পরে ভারতবর্ষে এক স্বাধীন পুঁজিপতি শ্রেণী গড়ে উঠল। শুরু থেকেই এই শ্রেণীর এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিলঃ **মুখ্যত ব্রিটিশ পুঁজিবাদের সঙ্গে এই শ্রেণী কোন সংগঠনিক সম্পর্ক গড়ে তোলেনি, ভারতে বিদেশী পুঁজির সঙ্গে তা যুক্ত ছিল না।** এই ব্যাপারটাকে আরো বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। বিশ শতকের ভারতীয় পুঁজিপতিরা ব্রিটেন বা ভারতের ব্রিটিশ পুঁজিপতি এবং ভারতের বাজারের মধ্যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দালালের ভূমিকা পালন করে নি। এমন কি তাদের কোন কোন পূর্বপুরুষ উনিশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি থেকেই নিজস্ব আর্থিক সঙ্গতিতে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করত। তারা ব্যবসা শুরু করেছিল ব্রিটেন ও ভারত বা ভারত ও দূর প্রাচ্যের মধ্যে এবং অনেক সময়ই তাদের ব্রিটিশ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ব্যবসা করতে হয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দেশি দালাল হিসাবে তারা বড় একটা কাজ

করেনি। ভারতীয় শিল্পপতিদের অধিকাংশই ভারতে ব্রিটিশ শিল্পোদ্যোগীদের ছোট অংশীদার হিসেবেও গড়ে ওঠেনি।[৩] ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রধান অংশ কোন পর্যায়েই শিল্প বা মহাজনী মূলধনের জন্য আর্থিক ক্ষেত্রে কোন বিদেশী পুঁজির কাছে আত্মসমর্পণ করেনি।[৪] ভারতীয় শিল্পপতিরাও অর্থের জন্য ব্রিটিশ মহাজনী মূলধনের ওপর নির্ভর করেনি। বস্তুতঃ, ভারতীয় শিল্প ও মহাজনী পুঁজি ব্রিটিশ পুঁজির সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতা করে গড়ে উঠেছিল। এবং ভারতীয়দের একটা প্রধান অভিযোগ ছিল ভারতীয় শিল্পে আর্থিক সংস্থানের ব্যাপারে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকগুলির ব্যর্থতার বিরুদ্ধে। সহযোগিতার এই অভাবের কারণ একটা ছিল; সেটা হল এই যে, ভারতে নিজেদের প্রত্যক্ষ ও সুপ্রতিষ্ঠিত প্রশাসন থাকায় ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের কোন দেশীয় মধ্যস্থ শ্রেণীর প্রয়োজন ছিল না, যেমনটি ছিল আঠারো শতকের ভারতে এবং উনিশ ও বিশ শতকের চীনে।

বিশ শতকের ভারতীয় শিল্পপতিদের মধ্যে পুরোগামী কয়েকজনের পারিবারিক ইতিহাস থেকে এই ব্যাপারটি বেশ পরিষ্কার হয়ে যায়। টাটা, বিড়লা, শ্রীরাম. ডালমিয়া, জৈন, বিঠলদাস থ্যাকারসে, ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ, নরোত্তম মোরারজী, সিংহানিয়া, কস্তুর ভাই লাল ভাই, অম্বালাল সরাভাই, যমনালাল বাজাজ, লালুভাই সমলদাস, লালজি নারানজি, কির্লোস্কর, মোদি, কিলাচাঁদ দেবীচাঁদ, হরকিষণ লাল ইত্যাদি পরিবারের সঙ্গে বিদেশী পুঁজির কোন বড় রকমের যোগাযোগ বিশেষ দেখা যায় না। বিদেশী পুঁজির অধীনতার কথা সেক্ষেত্রে ওঠেই না।[৫]

অতএব অর্থনৈতিক অস্তিত্বের জন্য ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী বিদেশী পুঁজির ওপর নির্ভর করেনি। এবং সেভাবে "বাঁধা" পড়েনি বলে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের তারা মিত্র হয়েও ওঠেনি। বস্তুতঃ ঘটেছিল ঠিক উলটো ব্যাপার। পরবর্তী অংশে এ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

এর অর্থ এই নয় যে ব্রিটেন বা ফ্রান্স, এমনকি জার্মানি বা জাপানে যথাক্রমে সতেরো, আঠারো ও উনিশ শতকে সংশ্লিষ্ট দেশের পুঁজিপতি শ্রেণীও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে সেই একই ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু পার্থক্য এইটা নয় যে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী 'মুৎসুদ্দি' ছিল, অথচ সেটাকেই পার্থক্য বলে ব্যাপকভাবে ধরে নেওয়া হয়। পার্থক্য এইখানে যে ভারতের বুর্জোয়া গোষ্ঠী ছিল এমন এক অনুন্নত দেশের পুঁজিপতি শ্রেণী, যে দেশ উপনিবেশ হিসেবে বিশ্ব পুঁজিবাদী কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্যভাবে বলা যায় ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী একটি অধীনস্থ শ্রেণী হিসেবে ব্রিটিশ পুঁজির অন্তর্ভুক্ত ছিল না বটে, কিন্তু এই শ্রেণী যে অর্থনীতির অংশ সেটাই ছিল ঔপনিবেশিক দিক দিয়ে বিশ্ব পুঁজিবাদের সঙ্গে যুক্ত ও তার অধীনস্থ। অর্থনৈতিক রাজনৈতিক উভয় দিক দিয়েই যে দুর্বলতা ও চাপের মধ্যে এই শ্রেণী

কাজ করতো তা এই পরিস্থিতি থেকেই উদ্ভূত, মুৎসুদ্দিগিরি থেকে নয়।[6] এই ঘটনাটি তিনটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ ঃ

(১) এই শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সামর্থ্য ও দুর্বলতা বোঝার জন্য আমরা ঔপনিবেশিক অর্থনীতির কাঠামোর দিকে তাকাবো, পুঁজিপতি শ্রেণীর তথাকথিত অধীনস্থ ভূমিকার দিকে নয়। অনুরূপভাবে, ভারতীয় অর্থনীতিকে উন্নত করার ক্ষেত্রে উপনিবেশবাদ ব্যর্থ হয়েছে বলেই এই সিদ্ধান্ত করা উচিত হবে না যে ভারতীয় বুর্জোয়া গোষ্ঠীও এই কাজটি পরিত্যাগ করেছিল। এই শ্রেণী যদি ঔপনিবেশিক পুঁজি ও উপনিবেশবাদের সঙ্গে যুক্ত থাকতো তাহলেই কেবল এরকম সিদ্ধান্ত করা যেত।

(২) পুঁজিপতি শ্রেণী নয়, অর্থনীতিটাই যেহেতু ঔপনিবেশিকভাবে পরাধীন ও সেভাবেই গড়ে উঠেছে, এই শ্রেণীটি তাই এক দিকে লড়াই করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীন পুঁজিবাদী উন্নতির জন্য এবং অন্যদিকে বাধ্য হয় সাম্রাজ্যবাদেব সঙ্গে আপস। কবতে কারণ বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্গে গঠনগত যোগ ঔপনিবেশিক ও প্রাক্তন-ঔপনিবেশিক সমাজে পুঁজিবাদের ভূমিকাকে দুর্বল করে দেয়।

(৩) বিশেষভাবে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর ক্ষেত্রেই শুধু এটা ঘটেনি। যেহেতু বিশ্ব পুঁজিবাদ গঠনগত ভাবে সাম্রাজ্যবাদ হিসেবে বিরাজ করে, সে জন্য তার এক অংশেব উন্নতিসাধন হয় অন্য অংশের অবনতির বিনিময়ে, তার এক্তিয়ারের অন্তর্গত যেসব রাষ্ট্র উন্নত ও মুখ্য কর্মকেন্দ্র হয়ে ওঠে না, তারা যদি সেই কাঠামো থেকেই বেরিযে যাওযার ব্যবস্থা করতে না পারে, তবে তারা হযে পড়বে অনগ্রসর, পরিণতি লাভ করবে উপনিবেশত্বে।

৩

(দীর্ঘমেয়াদী সংগ্রাম)

প্রতিটি মৌলিক অর্থনৈতিক বিষয়েই ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের তীব্র বিরোধ বেধেছিল।[7] [illegible]পের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারতীয় পুঁজি হয় ব্রিটেনের দেশী পুঁজি [illegible] ভারতে ব্রিটিশ পুঁজির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হযেছিল। এইসব মৌলিক বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদ হার মানে নি। আবার অন্যদিকে ভারতীয় পুঁজিপতিরা তাদের স্বাধীন [illegible] বজায় রাখার জন্য রুখে দাঁড়িয়েছিল। এখানে আমি বিরোধের বড় [illegible] মোটামুটি উল্লেখ করবো।

(ক) প্রথমে ব্রিটেনের দেশী শিল্পের সঙ্গে বিরোধ। ভারতীয় পুঁজিপতিরা স্পষ্ট বুঝেছিল যে তাদের অভ্যন্তরীণ বাজারের ওপর ব্রিটিশ [illegible]

বিদেশী শিল্পের প্রভুত্ব সীমাবদ্ধ করতেই হবে এবং তার অবসান ঘটাতে হবে তারপরে। ফলে তারা বরাবরই তাদের শিল্পে "কার্যকরী ভাবে" শুল্ক নিরাপত্তার দাবিতে বিক্ষোভ প্রকাশ করে আসছিল। পরবর্তী কালে যখন সাম্রাজ্যিক অগ্রাধিকার বা ব্রিটিশ শিল্পে শুল্ক ছাড়ের নীতি ঘোষণা করা হলো তখন ভারতীয় শিল্পের ওপর তার ক্ষতিকর প্রভাব ও সাম্রাজ্য বহির্ভূত দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক ব্যবস্থার অবনতির কারণে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী তার বিরুদ্ধে এক জোরদার আন্দোলন চালায়। এই শ্রেণী ভারতীয় শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু কাঁচামালের ওপর চড়া রপ্তানি শুল্ক ধার্যের জন্যও লড়াই করেছিল। পুরো ১৯৩০-এর গোটা দশক জুড়ে তারা শুল্ক নির্ধারণের ব্যাপারে ভারত সরকারের স্বাধীনতার জন্যও আন্দোলন চালিয়েছিল।

(খ) ১৯১৮ সালের পরে ভারতীয় শিল্পে বিপুল পরিমাণ বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের ফলে উক্ত পুঁজির বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ ঘটেছিল। বিদেশী পুঁজি ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটতে পারে না, ভারতীয় পুঁজিপতিরা এই ব্যাপক প্রচারিত তত্ত্ব নাকচ করে দেয়। তারা মনে করতো ভারতে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের ব্যাপারটাই দেশের অর্থনৈতিক শোষণের ফল এবং এর দ্বারা দেশকে উন্নতির দিকে না নিয়ে গিয়ে আরো শোষণের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে, অতি বৃহৎ ব্রিটিশ শিল্প কর্পোরেশনগুলি ১৯২০র দশক ও ১৯৩০-এর দশকের অনুমোদিত শুল্ক-নিরাপত্তা, অপেক্ষাকৃত সস্তা ভারতীয় শ্রমিক এবং বাজারের নৈকট্যের সুবিধা নেওয়ার জন্য ভারতীয় সহায়ক প্রতিষ্ঠান গড়ে (যেগুলো ইণ্ডিয়া লিমিটেড বলে পরিচিত ছিল) ভারতে নিজেদের বাজার রক্ষা ও প্রসারের যে চেষ্টা করেছিল তার বিরুদ্ধে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী প্রবল প্রতিবাদ করেছিল। এইসব 'দানবীয়' কর্পোরেশন বাস্তব ক্ষেত্রে অনেক ছোট ভারতীয় উদ্যোগগুলির সামনে এবং সাধারণভাবে ভারতীয় পুঁজির দীর্ঘমেয়াদী উন্নতির স্বার্থের সামনে কি বিপদ ঘনিয়ে তুলেছে, সেটাও তারা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছিল। এই 'অন্যায্য' অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে তারা সরকারের কাছে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করে। তারা 'ভারতীয় শিল্পের ওপর ভারতীয় কর্তৃত্ব' এই শ্লোগান তোলে। মজার কথা, এইসব ইণ্ডিয়া লিমিটেডে ব্রিটিশ পুঁজির সঙ্গে অংশীদারিতে প্রায় কোন ভারতীয় পুঁজিপতিই যুক্ত হয়নি।

১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকে ভারতীয় পুঁজিপতিরা "জাতীয় স্বার্থ বহির্ভূত" অর্থাৎ ব্রিটিশ পুঁজির বিরুদ্ধে বিশেষ সুবিধার অধিকার ও প্রয়োজন হলে তাকে বর্জন করার অধিকারকে আন্দোলনের একটি মুখ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছিল। ১৯৩১-৩৫ সালে সংবিধান সংক্রান্ত আলোচনায় তারা বিদেশী পুঁজিকে কোন রকম সাংবিধানিক রক্ষাকবচ দেওয়ার বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই চালিয়েছিল এবং তার বদলে ব্রিটিশ ও বিদেশী পুঁজির বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করার অবাধ ক্ষমতার দাবি করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আরো অনেক বেশি শক্তিশালী মার্কিন পুঁজির ভারতে প্রবেশ এবং তার ফলে যুদ্ধোত্তর কালে "ভারতের ওপর মার্কিন অর্থনৈতিক প্রভুত্ব" এবং "নূতন বিদেশী কায়েমী স্বার্থ" সৃষ্টির আশঙ্কার বিরুদ্ধে ভারতীয় পুঁজিপতিরা তৎক্ষণাৎ প্রবল আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

এটা লক্ষণীয় যে ভারতীয় পুঁজিপতিরা যে বিদেশী পুঁজি তখন খুঁটি গেড়ে বসেছিল, তার বহিষ্কারের জন্য লড়াই করেনি। উক্ত বিদেশী পুঁজির পরিমাণ আপেক্ষিকভাবে কম হওয়ায় এবং তার এক ক্ষুদ্র অংশই কেবল ব্রিটেনের দেশী একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হওয়ায় এবং সরকার কর্তৃক তাদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যাহারের পরিকল্পনা করায় ভারতীয় পুঁজিপতিরা নিজেদের উক্ত বিদেশী পুঁজির সঙ্গে সমানে সমানে লড়াই করার মত শক্তিশালী বলে মনে করেছিল। কিন্তু কোন অবস্থাতেই ভারতীয় অর্থনীতিতে বিদেশী পুঁজিকে পাকাপোক্ত জায়গা করে নিতে দেওয়া যাবে না। এবং আগেই দেখা গেছে যে বড় বড় দেশের অতি বৃহৎ শিল্প কর্পোরেশনগুলো যথা, ইমপিরিয়াল কেমিক্যাল কোম্পানি, লিভার ব্রাদার্স, বার্মা অয়েল কোম্পানি ও মার্কিন কর্পোরেশনগুলির প্রবেশের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

বিশেষ করে যন্ত্রপাতি, মেসিন টুলস, মোটর গাড়ি, বিমান, জাহাজ, ভারি রাসায়নিক শিল্প, সার এবং খনিজ ও পেট্রোলিয়ামের সমগ্র ক্ষেত্রের মূল ও ভারী শিল্পগুলিতে বিদেশী পুঁজির প্রবেশের বিরুদ্ধে তারা বরাবর বিক্ষোভ প্রকাশ করেছে। তাদের দাবি ছিল এইসব শিল্পকে ভারতের বেসরকারি বা সরকারি পুঁজির জন্য পুরোপুরি সংরক্ষণ করতে হবে এবং এগুলির যে কোনটির ওপর "বিদেশী বা অভারতীয় মালিকানা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে বিধিবন্ধ নিষেধাজ্ঞা" জারি করতে হবে।

(গ) ভারতীয় পুঁজিপতিরা ভারতীয় ব্যাংকিং ব্যবস্থার ওপর ব্রিটিশ আর্থিক পুঁজির আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল এবং প্রায় ১৯১৩ সাল থেকে তারা দাবি করে যেতে থাকে যে একটি নিয়ন্ত্রণকারী কেন্দ্রীয় ব্যাংক গঠন করে সেটিকে হয় ভারতীয় অংশীদারদের অথবা ভারতীয় আইনসভার, কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে কারণ এই আইনসভা খানিকটা পরিমাণে ভারতীয় প্রভাবাধীনে ছিল। কোন ক্ষেত্রেই 'লনডন নগরী'কে, এর মধ্যে বিশেষ নাক গলাতে দেওয়া হবে না। বিশ শতকে ভারতে ব্যাংকিং ও বীমার ক্ষেত্র থেকে ব্রিটিশ পুঁজি হটিয়ে সেখানে আধিপত্য লাভের জন্য ভারতীয় পুঁজিপতিরা এক তীব্র অর্থনৈতিক লড়াই চালায়। বিদেশী বীমা কোম্পানিগুলির তৎকালীন কাজকর্ম এবং নূতন বীমা কোম্পানির প্রবেশের ওপরও আইনগত ও অন্যান্য বিধিনিষেধ আরোপ করার জন্য সরকারের কাছে আবারও আবেদন জানানো হয়। ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে ভারতীয় পুঁজিপতিরা টাকার সঙ্গে পাউন্ড স্টার্লিং যুক্ত করার বিরুদ্ধে এবং তার প্রকৃত মূল্যের তুলনায় অধিকতর

মূল্য নির্ধারণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল, কারণ এসব ব্যবস্থা বিদেশী পণ্য ও বিদেশী পুঁজি আমদানিতে উৎসাহ দেয় এবং ভারতীয় পুঁজি তা ফলে বাধা পায়।

(ঘ) বৈদেশিক বাণিজ্য ও জাহাজ ব্যবসা ছিল উদ্বৃত্ত অর্থ সংগ্রহের এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস এবং গোটা ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী এগুলির আরও বেশি অংশ এবং ব্যালান্স অব পেমেন্টের অন্যান্য অপ্রকাশ্য বিষয় কবজা করার জন্য ব্যক্তিগত ভারতীয় প্রয়াসের পেছনে মদত দিয়েছিল। জাহাজ ব্যবসায়ে ব্রিটিশ একচেটিয়া আধিপত্যের বিরুদ্ধে ভারতীয় সংগ্রাম শুরু হয়েছিল ১৮৯০-এর দশকে এবং বারবার ব্যর্থতা সত্ত্বেও তখন থেকেই একইভাবে তারা সেই সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিল। ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে পুঁজিপতিরা ভারতীয় উপকূল অঞ্চলের জাহাজ ব্যবসা ভারতীয়দের জন্য সংরক্ষিত করার জন্য আইন পাস করানোর উদ্দেশ্যে জোরদার চেষ্টা চালিয়েছিল।

(ঙ) ভারতীয় পুঁজিপতিরা তাদের কাজকর্মে সরকারের সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ সাহায্যের প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিল এবং এই ক্ষেত্রে তারা এক দীর্ঘ ও সর্বাত্মক লড়াই চালিয়েছিল। শিল্প, ব্যাংকিং, বীমা, সামুদ্রিক ও বিমান পরিবহণ, অন্তর্দেশীয় পরিবহণ ও কৃষি—প্রায় প্রতিটি অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রেই সরকারি সাহায্য দাবি করা হয়েছিল।

নিঃসন্দেহে ব্রিটিশের দেশী শিল্পের বিরুদ্ধে শুল্ক নিরাপত্তা দিতে একমাত্র সরকারই পারত।

ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী বিদেশী পুঁজির সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নিজেদের দুর্বলতা উপলব্ধি করেছিল বিপুল পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজনের জন্য, যেক্ষেত্রে বিকল্প হল ভারতীয় নয়, বিদেশী পুঁজির ব্যবহার। সেখানে সরকারি ক্ষেত্রের উদ্যোগের মাধ্যমে ছাড়াও সরাসরি প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে বিদেশী পুঁজিকে ঢুকতে না দেওয়ার এবং নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যও ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী সরকারি ব্যবস্থাকে এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে দেখত। উদাহরণস্বরূপ, ভারী শিল্প, অত্যাবশ্যক খনিজ দ্রব্য ও বিস্তৃত পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে এই ধরনের ব্যাপার ছিল।

ভারী মেশিন ও রাসায়নিক শিল্প ও জাহাজ ব্যবসার মত যেসব শিল্পের গর্ভাবস্থা দীর্ঘ অথবা যাতে বড় রকমের ঝুঁকির ব্যাপার আছে সেসব শিল্পে জামিন ও ভরতুকি হিসেবে প্রত্যক্ষ সাহায্য দেওয়ার জন্যও সরকারকে সনির্বন্ধ আবেদন জানানো হয়েছিল।

ভারতীয় পুঁজিপতিরা উপলব্ধি করেছিল যে ভারী মেশিন ও রাসায়নিক শিল্প এবং অন্যান্য অনুরূপ শিল্প যথা, মোটর গাড়ি, বিমান ও জাহাজ-নির্মাণে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ছাড়া কোন সত্যিকারের ও দীর্ঘমেয়াদী শিল্পোন্নতি ঘটতে পারেনা। কিন্তু ঠিক এসব ক্ষেত্রেই ঔপনিবেশিক প্রশাসন উপনিবেশে প্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পগুলির উন্নতিতে সাহায্য করতে অনিচ্ছুক ছিল। তথাপি

জামিন, ভরতুকি, সরকারী ক্রয়ের প্রতিশ্রুতি, বাজার-সংরক্ষণ এবং অন্যান্য সমস্ত সম্ভাব্য উপায়ে সরকারী সাহায্য ছাড়া এই সব শিল্পের উন্নতি সাধন করা ভারতীয় পুঁজিপতিদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ এসব ক্ষেত্রে প্রয়োজন হত বিরাট পুঁজির, দীর্ঘ গর্ভাবস্থার এবং বিরাট ঝুঁকির। ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকে এসব ক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য ভারতীয় পুঁজিপতিদের বারংবার চেষ্টা সরকারি ঔদাস্য ও বৈরী মনোভাবের দেওয়ালে বাধা পেয়েছিল। ফলে এসব ক্ষেত্রে তাদের উদ্যোগে সরকারের সক্রিয় ও বড় রকমের সাহায্যের জন্য তারা অবিরাম আন্দোলন চালিয়েছিল। এবং আগেই বলা হয়েছে যে, একই সঙ্গে তারা এসব ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজি ঢোকানোর সবরকম চেষ্টার বিরোধিতা করেছিল।

ভারতীয় পুঁজিপতিরা এটাও আশা করেছিল যে সরকার তাদের অন্যতম বড় দুর্বলতা—অর্থাৎ প্রযুক্তি কর্মীর ঘাটতি এবং দেশী প্রযুক্তিবিদ্যার নিচু মান কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে। ভারতে বিদেশী উদ্যোগের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য সরকারেব কাছে যে সব আবেদন জানানো হয়েছিল তার একটি ছিল ভারতীয় কারিগরী কর্মীদের বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যাপারে।

বিদেশী উদ্যোগকে সাহায্য এবং ভারতীয় উদ্যোগে বাধা সৃষ্টি করায় আমলাতন্ত্রের চূড়ান্ত ভূমিকাও স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা গিয়েছিল এবং অর্থনীতি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদগুলির ভারতীয়করণের দাবি জোরালভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছিল।

এইসব দাবি মেটাতে সরকারকে বড় রকমের আর্থিক দায় নিতে হতো। একই সময়ে ভারতীয় পুঁজিপতিরা লক্ষ্য করেছিল যে সরকারি রাজস্ব, অথবা ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক সংগৃহীত সামাজিক উদ্বৃত্ত সাম্রাজ্যিক স্বার্থের অনুকূলে এবং অভ্যন্তরীণ পুঁজিবাদী ক্রমোন্নতির প্রতিকূলে ব্যবহৃত হতো। ফলে, ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী রাষ্ট্রের আর্থিক ব্যাপারে ভারতীয় নিয়ন্ত্রণকে তার অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দাবি করে তোলে। এমন কি যে সময়ে তারা সবচেয়ে বেশি আপস করেছে সে সময়েও তারা এই দাবির ক্ষেত্রে কিন্তু আপস করতে অনিচ্ছুক ছিল। উদাহরণস্বরূপ, গোল টেবিল বৈঠকে আলোচনাকালে তাদের প্রতিনিধি আর্থিক রক্ষাকবচের প্রশ্নে দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। শিল্পে সরকারি সাহায্যের প্রশ্নে তারা সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ ও প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে বিশাল সেনাবাহিনী পোষার জন্য বিপুল সামরিক ব্যয়, স্ফীত প্রশাসনিক ব্যয় ও বিপুল সরকারি ঋণের বিষয়গুলোকে আক্রমণ করেছিল, কারণ এসব খাতে ব্যয়ের ফলে সরকারের হাতে এমন কিছুই প্রায় থাকত না যা দিয়ে শিল্পকে সাহায্য করা যেত।

ভারতীয় পুঁজিপতিরা ভারতের সামাজিক উদ্বৃত্ত পাচার বা রপ্তানির বিষয়টিও লক্ষ্য করেছিল। অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের জন্য এর খুবই প্রয়োজন ছিল এবং এ বিষয়ে রক্ষামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তারা সরকারের কাছে আবেদন করেছিল।

(চ) সুতরাং, আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছিল যে ভারতে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক শোষণ তাদের দীর্ঘমেয়াদী ক্রমোন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল এবং যে তিনটি প্রধান পথে সাম্রাজ্যিক বাণিজ্য কেন্দ্র ভারতের সামাজিক উদ্বৃত্ত জোর করে আদায় করেছিল তারা সেগুলির বিরোধিতা করেছিল। এগুলি হল ভারতীয় বাজারের ওপর আধিপত্য, কি শিল্পগত, কি আর্থিক ; বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ এবং সরকারি আয়ব্যয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এবং বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী প্রয়োজনে বিপুল সামরিক ব্যয়ের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত সরাসরি আত্মসাৎ করা।

বিরোধের যেসব মূল বিষয় নিয়ে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী সুস্পষ্ট জাতীয় নীতি রচনা করেছিল সেগুলির কোনটির ক্ষেত্রেই সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা নতি স্বীকার করেনি। ফলে এই শ্রেণী এক নিজস্ব জাতীয় রাষ্ট্রের স্বচ্ছ ও জরুরী প্রয়োজন অনুভব করেছিল। ১৯২৯ সাল থেকে তাঁরা দ্ব্যর্থহীনভাবে এই রাজনৈতিক দাবি পেশ করতে থাকে। তাদের যুক্তি ছিল, এই দাবি রূপায়িত না হলে দেশের প্রকৃত কোন অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নয়।[৪] কিছু কিছু রাজনৈতিক ও স্বল্পমেয়াদী অর্থনৈতিক প্রয়োজনে পুঁজিপতি শ্রেণী এই দাবি ও অন্যান্য দাবির ব্যাপারে আপস করতে ইচ্ছুক ছিল, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বিরোধের দীর্ঘমেয়াদী ও মৌলিক বিষয়গুলো সেই আপসের ক্ষেত্রটি সীমাবদ্ধ করে দিয়েছিল।

৪

(স্বল্পমেয়াদী নির্ভরতা ও সহযোগিতা)

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় পুঁজিপতিদের বিরোধিতা বেশ কয়েকটি কারণে বন্ধ হয়েছিল।

(ক) প্রথমতঃ তারা নিরবচ্ছিন্ন ক্রমোন্নতির সুযোগ পেয়েছিল। এবং মাঝেমাঝে তারা যতই উৎপীড়িত বোধ করুক না কেন, কখনোই তাদের প্রত্যক্ষ বা নগ্নভাবে দমন করা হয়নি। বিশেষতঃ, দুটি বিশ্বযুদ্ধ তাদের কাছে এনে দিয়েছিল অপ্রত্যাশিত লাভ ও দ্রুত উন্নতির সুযোগ। ফলে তাদের মধ্যে যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভাবপ্রবণতা জেগে উঠেছিল অচিরেই তাতে ছেদ পড়ল ;

(খ) দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী অত্যন্ত সীমিত অবস্থা থেকে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উঠতে শুরু করেছিল। ভারতের ব্যাংক ব্যবসার ও বাণিজ্যের চিরাচরিত মূলধন আঠারো শতকে এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল বা অন্যপথে চালিত করা হয়েছিল। ফলে শুরু করার মত বুনিয়াদি বা প্রারম্ভিক মূলধন প্রায় কিছুই ছিল না।[৭] উপরন্তু

মূলধন যেটুকু ছিল তাও অসংখ্য ব্যবসায়ী ব্যাংক মালিক ও মহাজনদের মধ্যে খুব সামান্য পরিমাণে ছড়িয়ে ছিল। ফলে খুব নিচু স্তর থেকে স্বাভাবিক পুঁজি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। ঔপনিবেশিক লুন্ঠন বা অসম বাণিজ্যের মাধ্যমে আকস্মিক মুনাফা লাভের সুযোগ না পাওয়ায়, কোন সরকারি সহায়তা না পাওয়ায়, এমনকি বৈদেশিক বাণিজ্য, ব্যাংক ব্যবসা ও তাদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ বাজারের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ স্বাভাবিক উন্নতির সুযোগ দিতে না চাওয়ায় ভারতের বাণিজ্যিক ও শিল্প বুর্জোয়া গোষ্ঠীর পুঁজি সঞ্চয়ের হার ছিল অতি মন্থর। কেন এই শ্রেণী সক্রিয় রাজনীতিতে দেরীতে প্রবেশ করেছিল এবং কেন তাদের রাজনৈতিক মনোভাব উগ্র হয়নি এর বিভিন্ন ফলাফল থেকেই তা স্পষ্ট হয়।

(১) ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী বহু বছর ধরেই দুর্বল ছিল এবং তার ফলে তৎকালীন প্রবল পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যবাদের প্রতিস্পর্ধী হতে গেলে যে আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজন তা তাদের ছিল না।

(২) ভারতীয় পুঁজির মন্থর হারে বৃদ্ধি ও তার অতি স্বল্প পরিমাণ সঞ্চয়ের ব্যাপারটা সাম্রাজ্যবাদ মানিয়ে নিতে পারতো। ভারতীয় পুঁজির পরিমাণ এত কম ছিল যে সাম্রাজ্যবাদ তাকে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখতো না। সামাজিক উদ্বৃত্তে ভারতীয় পুঁজির অংশ যত দিন কম ছিল, উদ্বৃত্ত নিষ্কাশনের সাম্রাজ্যবাদী পথগুলির ক্ষতি না করে ততদিন তাকে বৃদ্ধিলাভের যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া সম্ভব ছিল, তার পুনর্বিনিয়োগের পথ খুঁজে বার করারও অসুবিধে ছিল না। ফলে ভারতীয় পুঁজির বৃদ্ধি প্রায় কখনোই পুরোপুরি বন্ধ হয়নি বা তা বিলুপ্তির মুখোমুখি হয়নি।

(৩) সেই কারণে দুই পুঁজিবাদের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত অনেক আগে হলেও তা পরিণত ও প্রগাঢ় হতে কয়েক দশক সময় লেগেছিল। দুই পক্ষ সব সময় মনে করত যে এই বিরোধটি ঘটবে ভবিষ্যতে—এটি ছিল এক দীর্ঘমেয়াদী বিরোধ। ভারতীয় বুর্জোয়া গোষ্ঠী রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত লড়াইয়ের মাধ্যমে নিজের অনুকূলে এই দীর্ঘমেয়াদী বিরোধের সমাধান করতে চেষ্টা করেছিল, আর নিজেরা ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সঙ্গে স্বল্পকালীন আপস, সমন্বয় ও সহযোগিতায় অংশ নিচ্ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী যখন বেশ বড় আকার ধারণ করল তখন একটা তীব্র উত্তেজনাকর অবস্থা আশা করা যেতে পারতো। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই গণরাজনৈতিক চাপ ও বিশ্বের শক্তিসাম্যে পরিবর্তনের ফলে এলো রাজনৈতিক স্বাধীনতা। তার ফলে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে সর্বাঙ্গীণ বিরোধিতায় যেতে হল না। তারা দ্রুত উন্নতির এক নূতন পর্বে প্রবেশ করল।

(৪) উন্নতিলাভের দৃঢ় ও নিরবচ্ছিন্ন সুযোগ এবং তার সঙ্গে মার্কস কথিত দ্বিতীয় পথে, অর্থাৎ ওপর থেকে উন্নতিলাভের পথে, অন্তত ১৯১৮ সাল

পর্যন্ত ভারতীয় শিল্পের ক্রমাগত উন্নতিও ভারতীয় বুর্জোয়া গোষ্ঠীকে রাজনীতিতে একেবারে রক্ষণশীল করে তুলেছিল।

(খ) আধুনিক ভারতের প্রায় সব প্রধান পুঁজিপতি পরিবার বলতে গেলে দীনাবস্থা থেকে উনিশ শতকে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছিল। তাদের কেউই আগেকার দিনে ধ্বংসপ্রাপ্ত পরিবার থেকে আসে নি। বরং তাদের ব্রিটিশ শাসনের সদ্য স্মৃতি ছিল পুরোপুরি ইতিবাচক। এই ব্যাপারটিও অন্তত প্রথম বা দ্বিতীয় প্রজন্মের উদ্যোগীদের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে একটা সার্বিক সন্তোষের মানসিকতা সৃষ্টি করেছিল।

(গ) তৃতীয়তঃ, ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী ব্রিটিশ পুঁজির ওপর নির্ভর না করলেও সেই সময়ের জন্য নির্ভর করেছিল ঔপনিবেশিক প্রশাসনের ওপর। বেশির ভাগ সময়েই এই দিকটি উপেক্ষা করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ ভারতীয় সরকার ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের হাতিয়ার ছিল। কিন্তু দেশের দৈনন্দিন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের প্রতিও পুঁজিপতি শ্রেণী পুরোপুরি বৈরী হতে পারতো না এবং অনেক কারণেই তার ওপর তারা নির্ভর করতো। একমাত্র সরকারই পারত ব্রিটিশ ছাড়া অন্যান্য প্রতিযোগীদের বিরুদ্ধে তাদের অন্ততঃ কিছুটা পরিমাণে শুল্ক নিরাপত্তা দিতে। প্রধান অভ্যন্তরীণ পরিবহণ ব্যবস্থা এবং সমগ্র বন্দর ব্যবস্থা ছিল সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। এই দুটি জিনিস তাকে দিয়েছিল বাণিজ্য ও শিল্পের ব্যাপারে প্রধান সুবিধা। একমাত্র সরকারই দিতে পারতো খনির ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা (যা কয়লা, লোহা, ইস্পাত এবং অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ), পাট্টা জমি, এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জমি ও অন্যান্য সুবিধা।[10] পুঁজি সংগ্রহের এক প্রধান ক্ষেত্র অর্থাৎ সরকারি ঠিকাদারি ছিল সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। সরকারি শিল্প দপ্তর বহু সুযোগ-সুবিধা দিতে পারত বা প্রত্যাহার করে নিতে পারত। অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার মধ্যে ছিল ব্যবসায়িক সিন্ডিকেট, বিভিন্ন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের মিলিত সংস্থা (Cartel) ও একচেটিয়া সুবিধা সৃষ্টি। বিশেষ বিশেষ জায়গায় কারখানা শুরু করার অনুমতি দেওয়া বা প্রত্যাহার করার ক্ষমতা সরকারের ছিল। কোন শিল্পপতির ঋণের পরিমাণ বেশি বেড়ে যাওয়ায় সে যদি তা পরিশোধ করতে গিয়ে বিপন্ন হত সরকারই কেবল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে তাকে সাহায্য বা সংকোচন করতে পারত। তার রাজস্ব নীতির এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল সংগ্রহের হারের ওপর। তার শ্রমনীতি ছিল উদ্দেশ্য সাধনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

সর্বোপরি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে প্রচণ্ড সামাজিক বিশৃঙ্খলা এবং রাজনৈতিক ও শ্রমিক অস্থিরতার সময় পুঁজিপতি শ্রেণী আইন-শৃঙ্খলা ও সামাজিক শান্তির প্রতিশ্রুতির জন্য সরকারের ওপর নির্ভর করত। তারা এ ব্যাপারেও সচেতন ছিল যে সরকার যদি আপসহীন মনোভাব নিয়ে থাকে এবং সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে আপস করতে ও তাকে

সুযোগ-সুবিধা দিতে অস্বীকার করে তাহলে আন্দোলন এক চরম পর্যায়ে চলে যেতে পারে। এইভাবে, এরকম প্রতিটি পর্বে ভারতীয় বুর্জোয়া সম্প্রদায় জাতীয় আন্দোলনকে একটা নিরাপদ কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য সরকারের ওপর অংশত নির্ভরশীল ছিল।[11] এই কারণে প্রতিটি জাতীয়তাবাদী উত্থানের সময় পুঁজিপতিদের সরকারের কাছে আপসের জন্য আবেদন জানাতে হত। বিদেশী সরকারের ওপর এই নির্ভরতা অবশ্য মুৎসুদ্দি শ্রেণীর নির্ভরতা ছিল না, ছিল গণআন্দোলন ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে পুঁজিপতি শ্রেণীর নির্ভরতা।

সরকারের ওপর বহু রকমের নির্ভরতার ফলে পুঁজিপতি শ্রেণী এক নরমপন্থী রাজনৈতিক পথ অবলম্বন করতে এবং সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল। সরকারের বিরুদ্ধে কিছু দিন অন্তর তার বৈরিতা যতদিন খুশি দীর্ঘায়িত করা যেত না। বস্তুতঃ তা একেবারে হঠাৎ হঠাৎ হত। একই সঙ্গে, আবারও একই কথা বলছি, এই ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিল তৎকালীন সরকারের সঙ্গে এক স্বাধীন পুঁজিপতি শ্রেণীর সম্পর্ক, ব্রিটিশ ভারতীয় প্রশাসনের নিয়ন্তা ব্রিটিশ শাসক শ্রেণীর মুৎসুদ্দি বা ছোট অংশীদারের সম্পর্ক নয়।

(ঘ) স্বল্পকালীন আপস-অবস্থার আরেকটি কারণ হল ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রতি, ঔপনিবেশিক কাঠামো থেকে স্বতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদী নীতি। ব্রিটিশ সরকার যেমন এই শ্রেণীর মৌলিক, সর্বাঙ্গীণ ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নতির স্বার্থের বিরোধিতা করেছে বা তাকে অবহেলা করেছে তেমনি আবার ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য তাকে সময়মত বিশেষ সুবিধা দেওয়ার নীতি অনুসরণ করেছে। এক্ষেত্রে দুটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিশ শতকে ব্রিটিশ শাসন দুটি মৌলিক বিষয় নিয়ে বিপদগ্রস্ত হয়েছিল এবং সেগুলিকে তাদের সামাল দিতে হয়েছিলঃ একটি হল ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সংকট, কৃষির অচলাবস্থায় ও শহরের বিপুল বেকারত্বে তা প্রতিফলিত হয়েছিল। আর অপরটি ছিল উত্তরোত্তর গণভিত্তিক হয়ে ওঠা এক জনপ্রিয় জাতীয় আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি। অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক অসন্তোষকে সংযত রাখার প্রয়োজনেই ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েছিল ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিতে, বিশেষত যেসব ক্ষেত্রে বড় কোন ব্রিটিশ স্বার্থ জড়িত ছিল না।

ঔপনিবেশিক অনুন্নত অবস্থার সংকট ও তার ফলে উদ্ভূত অসন্তোষকে সীমার মধ্যে রাখার জন্য ভারতীয় শিল্পের কিছুটা উন্নতি অত্যন্ত অপরিহার্য ছিল। অন্যভাবে বলা যায়, ভারতের বাণিজ্য ও শিল্পকে একটা অর্থনৈতিক সেফটি ভালভ বা নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র হিসেবে কাজ করতে হয়েছিল, বিশেষ করে ভারতে কোন বড় রকমের উৎপাদনশীল বিনিয়োগ করার কোন প্রবণতাই যখন ব্রিটিশ পুঁজির মধ্যে দেখা যায়নি।

রাজনৈতিক দিক দিয়ে, ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীকে জাতীয় আন্দোলনে

বড় রকমের ও সক্রিয় সাহায্য করতে না দেওয়া এবং আন্দোলনকে 'যুক্তিসম্মত' ও নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রাখার জন্য পুঁজিপতি শ্রেণীকে আন্দোলনের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে প্ররোচিত করা খুব জরুরী ছিল।

পরিণামে, ঔপনিবেশিক প্রশাসন ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর উন্নতি লাভের সুযোগ-সুবিধা আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। এবং অর্থনৈতিক ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত সরকারি কমিটি ও কমিশনে এই শ্রেণীর মুখপাত্রদের ও সংগঠনগুলিকে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দিয়েছিল। অন্য ভলা বলা যায়, মৌলিক সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষার জন্য এই শ্রেণীর সঙ্গে প্রশাসন একটা দর কষাকষির অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম যখনই উত্তাল হয়ে উঠতো বা যখনই ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী অর্থনৈতিকভাবে এত বিপন্ন হয়ে পড়তো যে সে প্রশাসনের কাছে হাত পাততে পারতো, বিশেষ করে তখনই এই নীতি সোৎসাহে অনুসরণ করা হতো। পুঁজিপতিদের তখন সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হতো অথবা সংগ্রামের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি অন্তত ঝিমিয়ে পড়তো। এই নীতি ছিল ভাগ করা আর শাসন করার নীতির এবং গাজর আর কাঠির নীতির একটা অঙ্গ।

ঠিক এইসব মুহূর্তেই ভারতীয় পুঁজিপতিরাও চাইত বোঝাপড়ায় আসতে, কারণ একদিকে তারা যেমন জাতীয় আন্দোলনের তীব্রতায় আতংকগ্রস্ত হতো তেমনি অন্যদিকে আশঙ্কাজনক অর্থনৈতিক সংকট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অধীর হত। এই দিক দিয়ে বলা যায় তারা কাঠি আর গাজরের উলটো নীতি অনুসরণ করত।

এইভাবে, উদাহরণস্বরূপ, ১৯০৫ সালে খোলা হল শিল্প দপ্তর। ১৯১৬ সালে নিযুক্ত হল শিল্প কমিশন। ১৯২২ সালে ঘোষিত হল শুল্ক-সংরক্ষণ নীতি। কাপড় আমদানির ওপর শুল্ক ১৯৩০ সালে ২৫ শতাংশ এবং ১৯৩৩ সালে ৭৫ শতাংশ বাড়ানো হল এবং সেই সঙ্গে ১৯৩২ সালে চিনি শিল্পকে সংরক্ষিত করা হল।[১২] ১৯৩২ সালে রিজার্ভ ব্যাংক গঠনের কাজও হাতে নেওয়া হল। ১৯৩২-৩৩ সালে সিন্ধিয়া স্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানীকে তার ব্যবসা বাড়াতে সাহায্য দেওয়া হল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ধর্মঘট নিষিদ্ধ করা হল, মহাযুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর সঙ্গে বিভিন্ন চুক্তিতে অংশ নেওয়া হল এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করার ও ভারতীয় শিল্পকে বড় রকমের রাষ্ট্রীয় সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল। এবং উল্লিখিত প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারতীয় পুঁজিপতিরা প্রতিদান দিয়েছিল একটা আপসমূলক রাজনৈতিক পথ অবলম্বন করে। ১৯৩০ সালে তারা গোল টেবিল বৈঠক ও বিধান পরিষদ বয়কট করেছিল, কিন্তু ১৯৩২ সালে গোল টেবিল বৈঠকের সাব-কমিটির সঙ্গে সহযোগিতায় সম্মত হয়েছিল এবং ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেস ও সরকারের মধ্যে একটা আপস-মীমাংসা করানোর জন্য তারা প্রবল চেষ্টা করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পুরো সময়টাতে তাদের

রাজনীতি ছিল নিচু পর্দায় বাঁধা। ১৯২০ ও ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে তারা যেমন জোরালো সমর্থন জানিয়েছিল ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে তারা সেভাবে সমর্থন করতে পারে নি।

(ঙ) আবারও একথা বলা যেতে পারে যে, যেসব ব্যাপার নিয়ে ওপরে আলোচনা করা হল তা শুধু ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে বিরোধ বন্ধ করে দিয়েছিল এবং তার ফলে এল স্বল্পকালীন সুযোগ-সুবিধা, আপস ও সমন্বয়সাধন। উভয়ের মধ্যে দীর্ঘকালীন বিরোধ চলেই ছিল, কারণ সাম্রাজ্যবাদ কতকগুলি মৌল নীতির প্রশ্নে আত্মসমর্পণ করেনি। সেগুলি হল, ভারতীয় বাজারের ওপর ব্রিটেনের আধিপত্য, বিশেষ করে বৃহৎ কর্পোরেশন-গুলির সহায়ক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্রিটিশ পুঁজি বিনিয়োগ, বিপুল সামরিক ব্যয় এবং ভারী শিল্প প্রবর্তন, দেশী প্রযুক্তির উন্নতিসাধন ও ভারতীয় শিল্পে সাধারণ আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্যের প্রসার।

৫

(পুঁজিপতি শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম)

ভারতীয় পুঁজিপতিরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলনকে উদার ভাবে সমর্থন জানিয়েছিল। একদিকে, এই আন্দোলন তাদের সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা পেতে সাহায্য করেছিল। অন্যদিকে, তা ব্রিটিশ পুঁজি ও ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে তাদের দীর্ঘমেয়াদী লড়াইয়ে মিলিত হয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে যে আরেকটি কারণেও তারা জাতীয়তাবাদী লড়াইকে এড়িয়ে যায়নি। তারা বুঝেছিল যে জীবনযাত্রার অবস্থা ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বিরোধের কারণে ভারতীয় জনগণ রাজনৈতিক বশ্যতা মানতে রাজি নয় এবং তারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই চালিয়ে যাবে। ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী উপলব্ধি করেছিল যে তারা জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করুক বা না করুক সে আন্দোলন চলবেই এবং ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। অতএব তাদের কর্তব্য যে জাতীয়তাবাদের মত এই রকম মৌল ও শক্তিশালী এক সামাজিক শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক রাখা এবং তার কর্মসূচি, সংগঠন ও লড়াইয়ের কৌশল ও রূপের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, এটা তারা বুঝেছিল।

সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে পুঁজিপতি শ্রেণীর দ্বিমুখী সম্পর্ক অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদী বিরোধ এবং স্বল্পমেয়াদী আপস-মীমাংসা ও নির্ভরতা তাদের চালিত করেছিল এক অ-বৈপ্লবিক ধাঁচের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম গড়ে তোলার লক্ষ্যে। সংগ্রামকে অবশ্য সব সময় নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে রাখতে হতো। কোন পর্যায়েই স্থায়ী বৈরিতা ও সার্বিক সংঘর্ষের পথে যাওয়া সংগ্রামের লক্ষ্য

ছিল না। বরং লক্ষ্য ছিল আপস-মীমাংসায় বাধ্য করার জন্য যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করে সুযোগ-সুবিধা আদায় করা এবং সেই সুবিধাকে কাজে লাগানোর মত শান্তির যুগ সৃষ্টি করে পরবর্তী পর্যায়ের লড়াইয়ের জন্য তৈরি হওয়া। সংগ্রামকে এইভাবে চাপ (সংগ্রাম)-আপস-চাপ (সংগ্রাম) বা চা-আ-চা কৌশলের ওপর প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল এবং বুর্জোয়া জাতীয় রাষ্ট্র গঠন ও স্বাধীন অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে পর্যায়ক্রমে (বা ধাপে ধাপে) এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল। হঠাৎ সাম্রাজ্যবাদকে তাড়িয়ে দিয়ে বা ক্ষমতা দখল করে নয়, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার দ্বারা রাজনৈতিক লক্ষ্যে পেঁছনোই ছিল উদ্দেশ্য।

(ক) যখনই কোন গণ জাতীয় সংগ্রাম শুরু হবে তখন তা যেন সীমার মধ্যে থাকে এবং কখনোই 'নিয়ন্ত্রণের বাইরে' চলে না যায়—এটাই ছিল পুঁজিবাদী রাজনৈতিক কৌশল। সরকার বিরোধিতা কখনোই যেন সর্বাত্মক না হয়, সার্বিক পরিবেশ যাতে প্রতিকূল হয়ে না যায় এবং তার ফলে পরবর্তী সময়ে'আন্তরিকতার অভাব যাতে না ঘটে সেজন্য তা কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। এবং আন্দোলন হবে অল্পকালের জন্য এবং তার দ্রুত মীমাংসা যেন উপযুক্ত অগ্রগতির সহায়ক হয়। বস্তুতঃ, জনগণের যে-কোন প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি পুঁজি-পতি শ্রেণীর এক ধরনের বিরূপতা ছিল (সাধারণতঃ, জি. ডি. বিড়লা যাকে 'বিশৃঙ্খলার' পদ্ধতি বলে অভিহিত করেছেন)। কিন্তু আবার এইরকম কিছু কার্যাকলাপের প্রয়োজন এবং অনিবার্যতাও মেনে নিয়ে তারা একটা সংকীর্ণ রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত কাঠামোর মধ্যে এসব কার্যাকলাপকে সীমিত রাখার এবং একটা আপস-মীমাংসায় পেঁছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাতে যবনিকা টেন্যে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। **কোন ক্ষেত্রেই পুঁজিপতি শ্রেণী দীর্ঘস্থায়ী গণ-রাজনৈতিক কার্যকলাপে উৎসাহ দেয়নি, এমনকি তা অহিংস হলেও নয়।** এর কারণ ছিল অনেকগুলি ঃ

(১) আগেই বলা হয়েছে, সীমিত ও স্বল্পমেয়াদী উন্নতির উদ্দেশে তাৎক্ষণিক আপস করা হত। পুঁজিপতি শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদের বাস্তব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেই এই আপসের সম্ভাবনা নিহিত ছিল। দীর্ঘায়িত লড়াই ও গণবিক্ষোভ চলতে থাকলে তৎকালীন অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে সুযোগ পাওয়ার উৎসাহ কমে যেতে পারত।

(২) প্রশাসনের ওপর নির্ভরতার অর্থ ছিল এই যে পুঁজিপতি শ্রেণী এক দীর্ঘস্থায়ী ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সংগ্রাম এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চরম বৈরিতা করে সর্বাত্মক ও দীর্ঘমেয়াদী সরকার-বিরোধিতা করতে পারত না। সেই কারণে তারা এই কথার ওপর জোর দিত যে 'জনগণ' ও প্রশাসনের মধ্যে ব্যবধান কখনোই খুব বেশি হবে না। উপরন্তু, তারা বিত্তশালী ছিল বলে কঠোর প্রশাসনের সাহায্যে তাদের সহজেই দমন করা যেত।

(৩) সর্বোপরি ছিল বামপন্থী বা র‍্যাডিক্যাল রাজনৈতিক শক্তিগুলির উন্নতি রোধ করার ইচ্ছা। তারা বুঝতে পেরেছিল যে সাম্রাজ্যবাদের

বিরুদ্ধে যে-কোন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও দীর্ঘায়িত এবং তার ফলে, কঠিন লড়াই, অহিংস হলেও জনগণকে 'গঠনমূলক পন্থায়' প্রশিক্ষণ দেওয়ার বদলে 'ধ্বংসাত্মক রাজনৈতিক শিক্ষা' দেবে এবং তার পরিণামে দেখা দেবে বৈপ্লবিক ভাবনা-চিন্তা ; তা আবার উৎসাহিত করে তুলবে শ্রেণী বিদ্বেষের ধারণাকে। উপরন্তু, জনগণ এই 'ধ্বংসাত্মক', বৈপ্লবিক ও শ্রেণী বিভেদের ধারণা স্বাধীনোত্তর কালেও বহন করে নিয়ে যাবে। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে জাগ্রত অবিশ্বাস তখন ভারতীয় সরকারের বিরুদ্ধে চালিত হবে। এমনকি বিপ্লব তার আগেও অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে। তাতে শুধু ব্রিটেনেরই 'অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া' হবে না, হবে ভারতেরও। মনে করা হতো, অধিকতর তাৎক্ষণিক রাজনীতি ও সংগ্রামী মানসিকতা কংগ্রেসের ভেতরে বামপন্থীদের আরো শক্তিশালী করে তুলেছিল, ক্ষতি হয়েছিল দক্ষিণপন্থীদের।

এটা অবশ্য লক্ষ্য করা দরকার যে বামপন্থী ভীতি ভারতীয় পুঁজিপতিদের শুধু দীর্ঘস্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্ন লড়াই ও 'সংগ্রামের মানসিকতার' ক্ষেত্রে সাবধানী করে তুলেছিল। এর দ্বারা তাদের সাম্রাজ্যবাদের কবলে ঠেলে দেওয়া হয় নি, (যদিও তা পুঁজিপতি শ্রেণী ও সরকারের মধ্যে যোগাযোগ ও পারস্পরিক সাহায্যের আরেকটি পথ খুলে দিয়েছিল)। কংগ্রেসের ভেতরকার দক্ষিণপন্থীদের অর্থাৎ দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদীদের সাহায্য করে ভারতীয় পুঁজিপতিরা বাম-পন্থীদের ঠেকিয়ে রেখেছিল, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে নয়। শুধু বামপন্থীদের বিরুদ্ধেই নয়, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও দক্ষিণপন্থীদের লড়াইয়ে মদত দিয়ে তারা এক দ্বিমুখী রাজনৈতিক সংগ্রাম চালিয়েছিল।[18] অন্য ভাবে বলতে গেলে, ভারতীয় পুঁজিপতিরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে দক্ষিণ পন্থীদের সমর্থন করেছিল। ভারতের বামপন্থীরা যদি খুব শক্তিশালী হত তাহলে তারা কি করতো অথবা তারা তখনও জাতীয়তাবাদী শিবিরে থাকত কিনা সেকথা নিয়ে আজ গবেষণা করা অবান্তর।

(খ) ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী একদিকে যেমন কোন দীর্ঘস্থায়ী গণ-রাজনৈতিক সংগ্রামে উৎসাহ দিতে অনিচ্ছুক ছিল এবং প্রতিটি লড়াইকে তাড়াতাড়ি একটা সমাপ্তিতে নিয়ে আসার জন্য নিজের প্রভাবকে কাজে লাগাতো, তেমনি আবার সেই লড়াই যাতে জাতীয়তাবাদীদের আত্মসমর্পণের ভেতর দিয়ে শেষ না হয়ে উভয় পক্ষের আপস-মীমাংসার ভেতর দিয়ে শেষ হয় তার জন্য নিজেদের ক্ষমতার মধ্যে যতটা রাজনৈতিক চাপ দেওয়া সম্ভব তা দিত।

আপস হতে হবে 'যুক্তিসম্মত'। কখনোই যেন তার উচ্চাভিলাষ না থাকে। দাবি কখনোও এত বড় হবে না সাম্রাজ্যবাদ যাতে আপসে অসুবিধে বোধ করে। সঙ্গে সঙ্গে আপসের অর্থ কখনোই আত্মসমর্পণ হবে না। আপসের মধ্য দিয়ে সর্বদাই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে ইতিবাচক সুবিধা অর্জন করতে হবে। আপসের মাধ্যমে পুঁজিপতি শ্রেণীর অবস্থানের অবশ্যই উন্নতি ঘটবে। প্রত্যেক নূতন আপসের অর্থ হবে বুর্জোয়া শক্তির সম্প্রসারণ,

তার লক্ষ্য হবে ভারসাম্যে ক্রমশঃ মৌলিক পরিবর্তন আনা। কিন্তু সে পরিবর্তন আসবে কোন সর্বাত্মক লড়াই ছাড়াই, বিপ্লব ছাড়াই, এমনকি চরমপন্থী শক্তিগুলিও কোন বড় রকমের সাফল্যের সুযোগ পাবে না। সুতরাং ১৯২০র দশকে পুঁজিপতি শ্রেণী আন্দোলন করেছিল সাংবিধানিক অগ্রগতি ও দায়িত্বশীল সরকার এবং শুল্ক ও মুদ্রার ব্যাপারে স্বশাসনের অধিকারের জন্য। ১৯৩০ এর দশকে তারা আন্দোলন করেছিল রক্ষাকবচ সহ স্বায়ত্তশাসনের জন্য, কিন্তু তার মধ্যে তাদের দাবি ছিল যে আর্থ ও শুল্ক বিষয়ক ব্যাপার পুরোপুরি ভারতীয় নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং বিদেশী পুঁজির প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের অধিকার তাদের হাতে থাকবে। ১৯৩৯ ৪৫ সালে তারা লড়াই করেছিল যুদ্ধোত্তর কালে পরিকল্পনা রচনার ক্ষমতাসহ অর্থনীতির ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সম্পন্ন এক 'জাতীয় সরকার'-এর হাতে কার্যকরী ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য। এবং যুদ্ধের পরে এরা আন্দোলন করেছিল পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য।

আপস ও সুযোগ সুবিধাগুলি থেকে আরেকটি রাজনৈতিক কাজও হয়েছিল। গণ-রাজনৈতিক কার্যকলাপের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখতে এবং জনগণের রাজনৈতিক তাপমাত্রা নিয়মিতভাবে কমিয়ে আনতে এগুলো বুর্জোয়া সম্প্রদায়কে সাহায্য করেছিল। ব্যাপক জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগের কাছে গ্রহণযোগ্য না করে এটা করা সম্ভব ছিল না। আপস সম্ভব না হলে শুধু বামপন্থীরাই শক্তিশালী হয়ে উঠতো তাই নয়, জাতীয় আন্দোলনের দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীও একটা জোরদার সংগ্রামী কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য হত।

যে দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যের জন্য অবিরাম সংগ্রাম চলে, আপস ও সুযোগ সুবিধার ব্যাপারগুলির কারণে সেগুলি অবশ্য পুঁজিপতি শ্রেণীর দৃষ্টির আড়ালে সরে যায় না। প্রতিটি আপস মীমাংসাকে পরবর্তী ক্ষেত্রে উত্তরণের কাজে ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি আপসের পর তার পরের পর্যায়ের জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয় এবং সেটাও করা হয় খুব দ্রুত গতিতে ও যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে। **এইভাবে সাম্রাজ্যবাদের ওপর একটা নিরবচ্ছিন্ন চাপ বজায় রাখা হয়, যাহা নিরবচ্ছিন্ন সংঘর্ষ বা সংগ্রামের অবস্থা নয়।** একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সংবিধানের ব্যাপারে একটা আপস মীমাংসার জন্য জি. ডি. বিড়লা ১৯৩৫-৩৬ সাল ব্যাপী প্রবল প্রয়াস চালান। এই উদ্দেশ্যে তিনি মহাত্মা গান্ধী এবং ব্রিটিশ নেতৃবৃন্দ ও কর্তৃপক্ষকে স্বমতে আনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তবু, সাফল্য যখনই অর্জিত হল তখনই তিনি ১৯৩৭ সালের ৩০ জুলাই লন্ডন থেকে মহাদেব দেশাইকে (সুতরাং গান্ধীকে) লিখলেন, "সাফল্যের সঙ্গে দুই বা তিন বছর সংবিধান চালু রাখার পর" ভারতীয়দের ব্রিটিশকে বলা উচিত যে "তারা সম্পূর্ণ অচল অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, কারণ নূতন একটা আইন ছাড়া আরো অগ্রগতি সম্ভব নয়।...ভারতীয়রা বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। আর স্থায়ী সমঝোতা না হলে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সম্ভাবনা রয়েছে।" আপসের সীমিত

স্থায়িত্বের কথা আবারও বিশেষভাবে উল্লেখ করে তিনি লর্ড লোথিয়ানকে বলেন "যে দুই বা তিন বছর পরে যদি কোন অগ্রগতি না ঘটে তবে ভারত প্রত্যক্ষ লড়াইতে নামতে বাধ্য হবে।"[14]

(গ) ধারাবাহিক লড়াই ও আপসের মাধ্যমে ধাপে ধাপে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অগ্রগতির এই পুরো কৌশলটা ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর পুঁজিবাদী চরিত্র থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। উদ্ভূত হয়েছিল এই ঘটনা থেকে যে এই বিত্তশালী শ্রেণী এমন একটা যুগে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল যখন শোষিত শ্রেণীগুলি নিজেদের অধিকারের জন্য একই সাথে লড়াই করছিল, এই সব শ্রেণী এমনকি শ্রেণী বিভক্ত সমাজের মূল ধারণাটার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। উক্ত কৌশল উদ্ভূত হয়েছিল এই ঘটনা থেকেও যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ ও জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে স্বশ্রেণীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঐ শ্রেণীর মুখপাত্র ও নেতা হিসেবে যেসব পুঁজিপতিকে গ্রহণ করা হয়েছিল তারা ছিল দূরদর্শী, তীক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন ও বিচক্ষণ। সুতরাং এই কৌশল ব্রিটিশ পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগী সম্পর্কে আবদ্ধ কোন মুৎসুদ্দি শ্রেণী বা ব্রিটিশ পুঁজির ছোট অংশীদারের রাজনীতির প্রতীক ছিল না। নিঃসন্দেহে ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণী নিজস্ব লড়াই চালিয়েছিল আপসমূলক ও অবৈপ্লবিক পন্থায়। তার সমগ্র কৌশলের **লক্ষ্য ও নীট ফল কিন্তু** জাতীয় আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ছিল না। বরং তা ছিল সাম্রাজ্যবাদের অধীনেও ক্রমোন্নতির পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং সেই সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনের ওপর স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, দক্ষিণপন্থীদের প্রভাবাধীনে শহর ও গ্রামের পাতি বুর্জোয়া গণতন্ত্রী ও র‍্যাডিক্যালদের রাখা এবং এইভাবে বিপ্লবী বামপন্থীদের নিয়ন্ত্রণে রাখা। ১৯৪৭ সালে এক বুর্জোয়া জাতীয় রাষ্ট্রের জন্ম হল। বামপন্থী শক্তিগুলিকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াইয়ের সময় দুর্বল ও বিভক্ত করে রাখা হল, যাতে স্বাধীনতার পরে বুর্জোয়া শক্তির বিরুদ্ধে তাদের চ্যালেঞ্জ দুর্বল থাকে। পুঁজিপতি শ্রেণীর কৌশল বিশেষভাবে সফল হয়েছিল এইখানেই।

(ঘ) ভারতীয় পুঁজিপতিরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে দুভাবে যুক্ত ছিল: ভারতীয় সমাজের অংশ হিসেবে এবং আলাদা ও স্বতন্ত্র রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে। কিন্তু তারা প্রধানতঃ প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের মাধ্যমে যুক্ত হয়নি। ব্যক্তিগত রাজনীতিতে তাদের অধিকাংশই উদারনৈতিক। সংবিধানসম্মত আন্দোলনের বাইরে তারা বড় একটা যেত না। তাদের অধিকাংশই সরকারি খেতাব সানন্দে গ্রহণ করতো (যদিও তার জন্য কিছু খেতাবধারী পুঁজিপতিকে দেশভক্ত বলা থেকে গান্ধী, সর্দার প্যাটেল প্রভৃতি বিরত থাকেন নি)। সুতরাং অধিকাংশ পুঁজিপতিকে সক্রিয় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বলা যায় না। তাদের কেউ কেউ অবশ্য কংগ্রেসকে আর্থিক সাহায্য দিয়েছিল, কিন্তু এই পরিমাণকে সম্ভবত বাড়িয়ে বলা হয়েছে।

এর চেয়ে আরো অনেক বেশী তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, সামগ্রিকভাবে এই শ্রেণী রাজনৈতিক দিক দিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতা **কখন করেনি** এবং সব সময়ই জাতীয় আন্দোলনের মূল ধারার মধ্যে থেকেছে, এদের মধ্যে কিছু রক্ষণশীল সদস্যও ছিল। এমনকি নিজেদের ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত রাজনৈতিক অবস্থানকে স্বনিয়ন্ত্রিত রাখছে এবং কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন ও বয়কটের কর্মসূচির প্রতি বিশেষ সহানুভূতি তখনও দেখাচ্ছে না পুঁজিপতি মুখপাত্ররা, বিশেষতঃ ১৯২৮ সালের পর, কংগ্রেসের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সমর্থন জানিয়ে ছিল। এমনকি যখন তারা ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অর্থনৈতিক মধুচন্দ্রিকা উপভোগ করছে তখনও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয় বিষয়ে ব্যাপারে আত্ম-সমর্পণ বা আপসের জন্য প্ররোচনা বা উৎসাহ দেয়নি। শ্রেণী হিসেবে ভারতীয় পুঁজিপতিরা ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের **তোষামোদ করা সত্ত্বেও কংগ্রেসের আড়ালে উক্ত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোন আলাদা রাজনৈতিক চুক্তি করতে সম্মত হয়নি**। সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে যোগ দেওয়ার প্রশ্ন তো ওঠেইনি। অন্তর্নিহিত এক দায়িত্ব বন্টন মেনে সব সময়ই তারা ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিত সংগঠন হিসেবে কংগ্রেসের কাছে এবং নেতা হিসেবে গান্ধীর কাছে যাওয়ার জন্য, কারণ তাঁদের সঙ্গেই ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষকে রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা চালাতে এবং আপস-মীমাংসায় পেঁছিতে হবে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবশ্য পুঁজিপতিরা সরাসরি মীমাংসা-আলোচনা চালাত। কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থীদের বদলে দক্ষিণপন্থীদেরই পছন্দ ও সমর্থন করা হলেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কংগ্রেসকে সামগ্রিকভাবে জাতীয় মুখপাত্র হিসেবে দেখা হত। এমনকি বামপন্থীদেরও খোলাখুলি আক্রমণ করা হত না। ১৯৩৬ সালে পুঁজিপতি শ্রেণীর এক ক্ষুদ্র অংশ এরকম চেষ্টা করলে বিপুল সংখ্যাগুরু অংশ তা দৃঢ়ভাবে দমন করেছিল। অন্যদিকে জাতীয় উদারনীতিকদের ও হিন্দু-মহাসভাকে কখনই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি এবং রাজনৈতিক সমর্থনও বিশেষ করা হয়নি।

৬

রাজনৈতিক পন্থার প্রশ্ন)

ঔপনিবেশিক বা আধা-ঔপনিবেশিক দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের রূপ নেয়। এই জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে বুর্জোয়া সম্প্রদায় যে ভূমিকা পালন করতে পারে সে সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক মার্কসবাদী লেখকদের মধ্যে মোটামুটিভাবে দুটি ঐতিহাসিক মডেলকে মেনে

নেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এই মডেল দুটি আজও বর্তমান ও সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে সব মৌলিক বিষয়ে প্রাসঙ্গিক বলে মনে করা হয়।

প্রথমটি হল ফরাসী মডেল, বুর্জোয়া সম্প্রদায় এতে নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েছিল। বামপন্থী শক্তির পাশাপাশি উত্থান সত্ত্বেও নিবৃত্ত না হয়ে সার্বভৌম রাজতন্ত্র ও সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত শ্রেণীকে সাহসের সঙ্গে উৎখাত করেছিল এবং এইভাবে নিজের নেতৃত্বাধীনে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সাধন করেছিল।

দ্বিতীয়টিতে অর্থাৎ চীনা (এবং রুশ) মডেলে, বুর্জোয়া সম্প্রদায় যাত্রা শুরু করে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে (গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ভূমি-সংস্কারের জন্য)। কিন্তু আধা-সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী শ্রেণী ও উপনিবেশবাদের সঙ্গে তাদের শ্রেণীগত যোগাযোগ ও তার ফলে রাজনৈতিক স্বনির্ভরতার অভাব। এবং রাজনৈতিকভাবে জাগ্রত শ্রমজীবী ও কৃষক শ্রেণীর একই সময়ে বেড়ে ওঠা র‍্যাডি-ক্যাল শক্তিগুলোর সম্পর্কে ভীতির কারণে উক্ত বুর্জোয়া শ্রেণী অস্থির চিত্ততায় ভোগে এবং শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব ত্যাগ করে বা তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। তারা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াই করতে ব্যর্থ হয় এবং কার্যতঃ সাম্রাজ্যবাদী ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক শিবিরে যোগ দেয়। এইভাবে নিজেদের সংকীর্ণ শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য তারা জাতীয়তাবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। দুটি উপ-ঘটনা এ থেকে বেরিয়ে আসে : (১) এই বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতি হয় প্রতিবিপ্লবী আধিপত্যে অথবা সাম্রাজ্য-বাদ ও আধা-সামন্ততন্ত্রের পুনরুত্থানে। (২) বিকল্পে, প্রতিবিপ্লবী পর্যায়ের পরে শ্রমজীবী শ্রেণী তার রাজনৈতিক শক্তি বাড়িয়ে তোলে, কৃষক সম্প্রদায় ও শহরবাসী পাতি বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে তারা মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং তার নেতৃত্বাধীনে সফল করে তোলে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব যার দ্রুত উত্তরণ ঘটে সমাজতন্ত্রে। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে বুর্জোয়া সম্প্রদায় জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে—এই ধারণা হল এই মডেলের গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয়। এবং এই পরিণতিতে নির্ধারক ভূমিকা নেয় দুটি বিষয় : (১) স্বাধীন অথবা মূলতঃ বিদেশী পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল নয় (অথবা চরিত্রে মুৎসুদ্দি নয়) এ ধরনের শিল্প পুঁজিপতিদের নিয়ে গঠিত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক স্তরের অনুপস্থিতি। এবং (২) শ্রমজীবী ও কৃষক সম্প্রদায়ের এক শক্তিশালী বৈপ্লবিক আন্দোলনের অস্তিত্ব এবং এই ভীতি বুর্জোয়া সম্প্রদায়কে সাম্রাজ্যবাদের কবলে ঠেলে দেয়।

বিশ শতকে ভারতীয় বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ভূমিকা নিরীক্ষা করলে দেখা যায় যে ভারতের উন্নতির প্যাটার্ন এই দুটি মডেলের কোনটিকেই অনুসরণ করেনি।[15] নিঃসন্দেহে তারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কোন বৈপ্লবিক গণ-সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়নি বা তাকে সমর্থন করেনি। একই সঙ্গে, আমরা আগেই দেখেছি যে তারা জাতীয়, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের

প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যোগ দেয়নি। এই সম্প্রদায় সর্বদাই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শিবিরে থেকেছে। জাতীয় মুক্তির কাজে অংশ নিতে তারা ইচ্ছুক ছিল। এমনকি তারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার কিছুটা ক্ষমতাও দেখিয়েছিল, যদিও তাদের লড়াইয়ের ধরন কখনই বৈপ্লবিক ছিল না। এবং অবশেষে, জাতীয় আন্দোলনের পাতি-বুর্জোয়া নেতৃত্বকে তারা নিয়মিত সমর্থন করেছে। অন্য ভাবে বলতে গেলে, তারা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দায়িত্ব সম্পন্ন করার ক্ষমতা দেখিয়েছিল, কিন্তু তা করেছিল অবৈপ্লবিক পন্থায় এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাজ একই সঙ্গে তারা সমাধা করে নি। এই পরিণাম অবশ্য আকস্মিক ছিল না।

প্রথমতঃ, ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী বেড়ে উঠেছিল এক আত্মনির্ভর পুঁজিপতি শ্রেণী হিসেবে এবং তারা ব্রিটেনের পুঁজিপতি শ্রেণীর অধীন ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রমজীবী শ্রেণী ও বিপ্লবী বামপন্থীরা জাতীয় মুক্তি ও কৃষি বিপ্লবের কাজে অন্যান্য অধীন শ্রেণীগুলিকে সংগঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং তারা এতই দুর্বল ছিল যে জাতীয় আন্দোলন ও সামাজিক উন্নতির ওপর বুর্জোয়া কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারেনি। রাশিয়া ও চীন দুই দেশেরই বিপ্লবী শ্রমজীবী শ্রেণীর দলগুলি নিজেরাই অর্থাৎ **স্বাধীনভাবে** বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক কর্তব্য পালনের জন্য সংগ্রামের দায়িত্ব নিয়েছিল। ভারতে তা করা হয়নি। না ছিল প্রলেতারিয়েতরা এই কাজের জন্য প্রস্তুত, না হয়েছিল কৃষক সম্প্রদায় ও শহরবাসী পাতি বুর্জোয়া শ্রেণীকে তার প্রভাবাধীনে আনা। ফলে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীকে বামপন্থীদের কাছ থেকে কখনোই সে ধরণের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয়নি। অথচ রাশিয়া বা চীনে তার সমব্যবসায়ীদের এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। **সুতরাং শ্রমজীবী শ্রেণী ও তার রাজনৈতিক নেতৃত্বের রাজনৈতিক, মতাদর্শগত ও সাংগঠনিক দুর্বলতা ভারতীয় বুর্জোয়াদের তৃতীয় পন্থা অবলম্বনের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।**

তৃতীয়তঃ, ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী গ্রাম ও শহর উভয় অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক পাতি বুর্জোয়া জনগণকে নিজেদের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রভাবের অধীনে রাখতে সফল হয়েছিল এবং তার ফলে এই জনগণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই এক বুর্জোয়া উন্নয়ন কর্মসূচির প্রশস্ত গণ্ডির মধ্যে নিজেদের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রেখেছিল। **কিন্তু ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী যে এটা করতে পেরেছিল তার যথার্থ কারণ হল তারা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ পরিত্যাগ করতে ও তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে চায়নি। তাছাড়া বামপন্থীদের রাজনৈতিক দুর্বলতাও ছিল আর একটি কারণ।** এই ব্যাপারে গান্ধীর ভূমিকাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এমন একটা রাজনৈতিক কৌশল গড়ে তোলেন যা একই সঙ্গে জনগণকে রাজনৈতিকভাবে প্রস্তুত করে তুলতো এবং সাথে সাথে তারা যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে বা নিজেরাই

নিজেদের রাজনৈতিক কর্তা হয়ে উঠতে না পারে, সে ব্যবস্থা করত, এবং তারা যাতে আকস্মিকভাবে নয়, নিরবচ্ছিন্নভাবে রাজনৈতিক কাজ করতে না পারে তার ব্যবস্থা করত। ফল হল এই যে ভারতীয় পুঁজিপতিরা একদিকে গান্ধীকে পূর্ণ সমর্থন জানাল এবং অন্যদিকে, এটা শিখলো যে জনগণকে যতদিন কঠোর রাজনৈতিক অভিভাবকত্বে রাখা যাবে এবং তাদের রাজনৈতিক চেতনা নিচু স্তরে থাকবে ততদিন তাদের কাছ থেকে খুব বেশি ভয় পাওয়ার দরকার নেই। রাশিয়া বা চীনে পুঁজিপতিরা জনগণের সঙ্গে যে ধরনের সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল ভারতীয় পুঁজিপতিরা তার থেকে এক ভিন্নতর সম্পর্ক গড়ে তুলল।

ভারতীয় বুর্জোয়া সম্প্রদায় শেষ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এই তত্ত্ব কখনো কখনো পেশ করা হয়। এর যুক্তি হল ভারতীয় পন্থার লক্ষ্য ছিল ক্ষমতা হস্তান্তর, সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক স্বার্থের বহিষ্কার নয়। এই ঘটনাটি ভারতের সামাজিক উন্নতি বিষয়ক যে কোন গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও এবং ভারতীয় পন্থার এক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অংশ হলেও তা ১৯৪৭ সালে যে পরিবর্তন এসেছিল তার কেন্দ্রীয় বিষয়ের গুরুত্ব হ্রাস করে না। বর্তমান প্রশ্নে এটা খুব প্রাসঙ্গিকও নয়। কোন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে জরুরী প্রশ্নটা হল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা। এই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তখন কাজে লাগান হয় পুঁজিবাদী বিকাশ সাধনের জন্য, আগের মত তাকে বাধা দেওয়ার জন্য নয়। এবং এক্ষেত্রে একটি চূড়ান্ত পরিবর্তন ঘটেছিল।[16] অনুরূপভাবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সফলতার প্রশ্নটিকে স্বনির্ভর অর্থনৈতিক বিকাশ গড়ে তোলার ক্ষমতা অথবা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক কর্তব্য অবিলম্বে সম্পাদন করার সঙ্গে মিলিয়ে ফেলা উচিৎ হবে না। মূলে গণ্ডগোল এ জায়গাতেই যে, বহু মার্কসপন্থী প্রাক্তন-ঔপনিবেশগুলোর সমগ্র ভবিষ্যৎ (ঔপনিবেশিকোত্তর) সামাজিক উন্নতির প্রশ্নটিকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্তর্ভুক্ত করতে চান। আমার মতে এটা ভুল। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান কাজ হল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রশ্নটির মীমাংসা করা এবং সমাজের পুঁজিবাদী বিকাশের পথ উন্মুক্ত করা যাতে সামন্ততন্ত্র এবং অথবা সাম্রাজ্যবাদ তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান গতিপথ আর নির্ধারণ করতে না পারে। স্বনির্ভর অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটে কি ঘটে না সেটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। বিশ্ব পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজবাদের যুগে অনুন্নত পুঁজিবাদের বিকাশ লাভ করার ক্ষমতার বৃহত্তর প্রশ্নের সঙ্গে এটি যুক্ত, নিছক মুৎসুদ্দিগিরির সঙ্গে নয়। এই ধরণের বিকাশ যখন ঘটতে পারে না অথবা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্যান্য কিছু কাজ যখন সম্পন্ন হয় না, অন্যান্য সামাজিক বৈপ্লবিক শক্তির উদ্ভব তখন নিশ্চিতভাবে ঘটে। কিন্তু তারা তখন কোন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটায় না, বরং **শুধু নূতন সমাজ-বিপ্লবের প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে তার ফেলে রাখা কাজ সম্পূর্ণ করে।** লক্ষ্য করা যেতে পারে যে ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে কোন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবই সঙ্গে

সঙ্গে বা পরবর্তী কয়েকটি দশকেও তার সমস্ত কাজ শেষ করেনি। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যকে বর্তমানে অনেকে যেমন ভাবে ব্যাখ্যা করতে চান সেইভাবে করা হলে, কোন সমাজ সমাজতান্ত্রিক হয়ে গেলেই এইরকম সব বিপ্লব সফল বা সম্পূর্ণ হয়ে যেতে পারে।[17] উদাহরণস্বরূপ, ১৬৪৮ সালে ব্রিটেনে যখন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটেছিল তার মূল বৈশিষ্ট্য ছিল বুর্জোয়া গোষ্ঠীর হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরে। বুর্জোয়া গোষ্ঠী তখন নিজের স্বার্থে অর্থাৎ পুঁজিবাদী পথে সমাজ ও অর্থনীতিকে সংগঠিত করার কাজ শুরু করতে পারতো। স্বনির্ভর অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য কঠোর সময় সূচির নিশ্চয়তা ছিল না (নানারকম বাধার ফলে তা বানচাল হয়ে যেতে পারতো)। আবার সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কও আকস্মিক ভাবে, নাটকীয়ভাবে বা সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যক্ত হয়নি। এই ব্যাপারটা আরো বেশি সত্য ছিল জার্মানি, ইটালি ও জাপানের ক্ষেত্রে। আমার একথাও মনে হয় যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আকস্মিক পরিবর্তনের ব্যাপারটাই যেখানে অংশতঃ ও মূলতঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ফল সেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে আকস্মিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন না হওয়ার উলটো যুক্তির মানে হল চক্রবৎ পরিবর্তনশীল যুক্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া।

বুর্জোয়া বিপ্লব এই কথাটির মধ্যে বিপ্লব শব্দটির ওপর জোর দেওয়ার ফলে হয়তো কখনো কখনো বিভ্রান্তি ঘটে তবে এর দ্বারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের মৌলিক পরিবর্তনের কথা বলা হয়। কোন গণ-বিপ্লবের মাধ্যমে এবং বিপ্লবী গণতন্ত্রী বুর্জোয়া গোষ্ঠীর দ্বারা এই পরিবর্তন ঘটার দরকার নেই। সম্পূর্ণ অবৈপ্লবিক বা এমনকি প্রতিক্রিয়াশীল পথেও তা ঘটানো যেতে পারে। এখানে আবারও সেই জার্মানি ও জাপানের দৃষ্টান্ত আসছে।

১৯৪৭ সালের পর অর্থনৈতিক প্রশ্নের মূল সমস্যা ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদন করা নয়, সমস্যা ছিল বিশ্ব পুঁজিবাদের সঙ্গে ভারতীয় অর্থ-নীতির কাঠামোগত যোগ ছিন্ন করা। ব্রিটিশ পুঁজির অনুপ্রবেশ দুর্বল হয়ে পড়লেও এই কাজটি মূলতঃ অসম্পাদিত থেকেই যেত। ভারতীয় অর্থনীতির ও তার পুঁজিপতি শ্রেণীর মূল দুর্বলতা ছিল অধীন বা নির্ভরশীল অবস্থায় বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্গে তার সংযোগ, পুঁজিপতি শ্রেণীর মুৎসুদ্দি চরিত্রে নয়। যতদিন এই কাঠামোগত যোগ টিকে থাকবে ততদিন কোন না কোন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পুঁজিপতি গোষ্ঠী অনুপ্রবেশ করতেই থাকবে এবং তার স্বাধীন বিকাশকে বিপন্ন করবে। এই কাঠামোগত যোগ আত্মশক্তি-নির্ভর ক্রমোন্নতির পথেও অন্তরায় হবে। এই কাঠামোগত যোগ ছিন্ন করার জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক, মতাদর্শগত ও অর্থনৈতিক রূপান্তর কতটা দরকার, জনগণকে প্রস্তুত কতটা করা দরকার এবং বিশ্বপুঁজিবাদের বিরুদ্ধে

লড়াই কতটা জোরদার করা প্রয়োজন কিউবার দৃষ্টান্ত থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেখানে এই কাজের জন্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজন হয়েছিল।

উপরন্তু, এই কাঠামোগত যোগ আধা-উপনিবেশবাদ বা নয়া উপনিবেশবাদের প্রাদুর্ভাবের ফল নয়। এটা হল আধুনিক যুগে পুঁজিবাদী বিকাশ প্রক্রিয়ার একটা অঙ্গ। ফলে ১৯৪৭ সালের পর ভারতের সামনে কাজ ছিল জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সংগঠিত করা নয়, পুঁজিবাদ-বিরোধী সংগ্রাম তাহলে তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠতো। কাজ ছিল এক পুঁজিবাদ-বিরোধী লড়াই সংগঠিত করা যার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াই। তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে এই বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং আজও তাই আছে। কারণ পূর্বোক্ত চিন্তাধারার পরিণতি হতে পারতো সত্য থেকে বিযুক্ত এক রাজনৈতিক লড়াইয়ের দিকে অথবা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বা নয়া-উপনিবেশবাদ-বিরোধী লড়াই অনগ্রসর পুঁজিবাদের সঙ্গে সহযোগ। আজ আত্মশক্তি-নির্ভর অর্থনৈতিক বিকাশ ও গণতন্ত্রর রক্ষার জন্য প্রয়োজন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম নয়, প্রয়োজন পুঁজিবাদের বিরুদ্ধেই লড়াই। সমাজতান্ত্রিক দেশের সাহায্য পেলেও অনগ্রসর পুঁজিবাদের স্বাধীন ভাবে উন্নতি লাভ করার, জাতীয় সমস্যা সমাধান করার এবং দৃঢ়মূল সামাজিক সংকট সমাধান করার ক্ষমতা না থাকায়, নয়া-উপনিবেশবাদ মাথা চাড়া দেওয়ার আশংকা সত্যিই দেখা দেয়। এই দিকটা নিয়ে অবশ্য পৃথক ও বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

টীকা

1. ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী এবং ভারতের জাতীয় আন্দোলনের জন্ম একই সঙ্গে এই চিন্তাধারা ইউরোপীয় ইতিহাসের যান্ত্রিক প্রয়োগের ফল। তাছাড়া, আন্দোলনের কোন পর্যায়েই মূল নেতৃত্ব বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে ছিল না বলে, কোন পর্যায়েই এ আন্দোলনের বিকাশ প্রধানতঃ বুর্জোয়া শ্রেণীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করেই কেবল বোঝান যাবে না। 1920 থেকে 1948 সাল পর্যন্ত মার্ক্সবাদীদের মধ্যে রাজনৈতিক আলোচনায় যে প্রবণতাটি বারবার ঘুরে ঘুরে এসেছে, এই প্রবন্ধের ভেতর দিয়ে আমি অবশ্যই সেই প্রবণতাকে পুষ্ট করতে চাই না।

2. এ বিষয়ে যে সব মার্ক্সীয় লেখক লিখেছেন তাঁরা 1947 সালের আগে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর সম্পর্ককে দ্বৈত বলে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু মূল প্রশ্নটির উত্তর এতে পাওয়া যায় না: সম্পর্কের দুটি দিকের কোনটি শেষ পর্যন্ত এবং বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে মুখ্য বিষয় হিসাবে দেখা দিয়েছে? সম্পর্কের দুটি চরিত্র আছে এটা স্বীকার করে নিলেই অনেকটা অগ্রগতি হল বটে, কিন্তু বিশ্লেষণ এর ফলে খুব বেশি দূর এগোয় না।

3. ব্রিটিশ পুঁজির কিছু মুৎসুদ্দি ও কনিষ্ঠ অংশীদার ছিল। কিন্তু এরা ভারতীয় ব্যবসায়ের মূল ধারার মধ্যে ছিল না, ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর ব্যবসা ও শ্রেণী সংগঠনের ক্ষেত্রেও

এদের কোন গুরুত্ব ছিল না। রাজনীতির এবং অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করে এরা স্বশ্রেণীর মূল ধারা থেকে নিজেদের পৃথক করে রেখেছিল।

4. বৃহৎ (ভারতীয় অর্থে) বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্ষেত্রেও এটা সত্য। কিন্তু, ভারতবর্ষে ছোট ও মাঝারি পুঁজিপতিদের প্রাদুর্ভাবের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে সেটা ঠিক।

5. এই সব পুঁজিপতি পরিবারের হাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জমিও ছিল না। এদের কারও কারও অবশ্য বৃহদাকার পুঁজিবাদী খামার ছিল না। চীনের মত এখানেও এদের আধা-সামন্ত-তান্ত্রিক স্বার্থ থাকায় এরা সাম্রাজ্যবাদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল—এটুকু বাদ দিলে এদের ব্যাপারটা প্রত্যক্ষভাবে প্রাসঙ্গিক নয়।

6. প্রকৃতপক্ষে, এগুলি মূলতঃ প্রত্যক্ষ প্রশাসনিক উৎপীড়নের ফলেও সৃষ্ট হয়নি। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতি প্রধানতঃ ব্রিটিশ অর্থনীতির সঙ্গে ভারতীয় অর্থনীতির ঔপনিবেশিক সংহতির লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়েছে, ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী সরাসরি দমন করার লক্ষ্যে নয়।

7. পুঁজিপতি শ্রেণীর ভাবাদর্শগত বা রাজনৈতিক প্রবক্তাদের মাধ্যমে না গিয়ে সংগঠন এবং সংশ্লিষ্ট প্রবক্তাদের মাধ্যমে এই শ্রেণী প্রত্যক্ষভাবে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এই প্রবন্ধে আমি সেটাই আলোচনা করেছি। বাকিটুকু পৃথক একটি আলোচনার বিষয় হতে পারে।

8. 1930 সালের 16 ফেব্রুয়ারি তারিখে ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি-র তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতির জবাবি ভাষণে জি. ডি. বিড়লা বলেন: "আমরা যে সরকারকে প্রভাবিত করতে বা তাদের আমাদের মতে আনতে পারিনি সেজন্য আমি খুবই দুঃখিত, কিন্তু এটা আমরা কখনই আশা করিনি। বর্তমান পরিস্থিতিতে এবং আমাদের দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় সরকারকে আমাদের মতে নিয়ে আসা অসম্ভব; কিন্তু আমি মনে করি যে আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা লড়াই করেছেন তাঁদের হাত শক্তিশালী করলেই কেবল আমাদের বর্তমান অসুবিধাগুলি দূর করা যাবে···স্বরাজ (স্বাধীনতা) কোন আবেগের প্রশ্ন নয়। এটা রুটির প্রশ্ন। দেশের সমৃদ্ধি পুরোপুরি নির্ভর করে আমরা কতটা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাই তার উপর এবং আমি মনে করি কেবল দেশের স্বার্থে নয়, পুঁজিপতি, মালিক এবং শিল্পপতিদের স্বার্থে আমাদের উচিত স্বরাজের জন্য যারা লড়াই করছে তাদের জন্য লড়াই করার এবং তাদের হাত শক্তিশালী করার চেষ্টা করা।" (গুরুত্ব আরোপিত)। 'রিপোর্ট অব দা প্রসিডিংস অব দা অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং অব দা এফ. আই. সি. সি. আই', খন্ড III, তৃতীয় বার্ষিক সভা (1930), পৃঃ 264-65.

9. চীনে আফিমের ব্যবসা ছিটেফোঁটা এবং ব্রিটেনের সঙ্গে সুতোর ব্যবসা, ছোট ছোট সরকারি ঠিকা, মার্কিন গৃহযুদ্ধের ফলে তুলোর ব্যবসায়ে তেজীভাব, ব্রিটিশ ভারত বা করদ রাজ্যগুলিতে আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতির উপজাত আয়, এবং আভ্যন্তরীণ মুদ্রা প্রচলন জনিত স্বাভাবিক লাভ ইত্যাদি মিলেই ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর আদি মূলধনের সংকীর্ণ ভিত্তি রচিত হয়েছে।

10. যে সব শিল্পপতির স্বার্থ প্রধানতঃ নিহিত ছিল খনি, লৌহ ও ইস্পাত এবং বিদ্যুৎ শক্তিতে এর ফলে তাদের উপর দারুণ চাপ পড়ল, তারা রাজানুগত থাকতে বাধ্য হল। এই ব্যাপারটিই সম্ভবতঃ অন্যান্যদের মধ্যে টাটা পরিবারকে প্রভাবিত করেছিল, তাছাড়া সরকার যে তাদের ইস্পাতের সামগ্রীর সবচেয়ে বৃহৎ ক্রেতা ছিল সে কারণটিও ছিল।

11. ইংলণ্ডে গিয়ে জি. ডি. বিড়লা সেখানকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের যা বলেছিলেন তার সংক্ষিপ্তসার সম্বলিত এক স্মারকলিপিতে (লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের কাছে পাঠানো অনুলিপি সহ) তিনি 1935 সালে লিখলেন: "সুতরাং দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসীরা সরকার এবং সমাজতন্ত্রী এই দুই শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছে। শেষোক্তরা নেতাদের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ করছে, তাঁরা 'কিছুই অর্জন করতে পারেন নি' এই অভিযোগে তাঁদের হেয় করছে। দক্ষিণপন্থীদের অবজ্ঞা

করার মাধ্যমে সরকার সমাজতন্ত্রীদের সাহায্য দিচ্ছে ; এই দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে দক্ষিণপন্থীরা চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে…সচেতন ভারতীয় নারীপুরুষ ব্রিটিশ সাহায্যের প্রয়োজনীয়তাটা বোঝেন ; তাঁরা ব্রিটেনের সঙ্গে মৈত্রী চান।" জি. ডি. বিড়লা, 'ইন দা শ্যাডো অব দা মহাত্মা ; এ পার্সোন্যাল মেমরের', কলিকাতা, 1935, পৃঃ 193-95. 1937 সালের মার্চ মাসে আবার ভাইসরয়কে লিখিত এক পত্রে, কংগ্রেস কর্তৃক কার্যভার গ্রহণ সংক্রান্ত ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব উল্লেখ করে বিড়লা জানাচ্ছেন্ ঃ "আমি মনে করি কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থার পক্ষে এটা এক বিরাট বিজয় এবং এই প্রস্তাবের যথাযথ সাড়া মিললে তাদের হাত অনেক শক্তিশালী হবে।" আশা করি মহামান্য (ভাইসরয়) বাহাদুর পরিস্থিতিটা বুঝতে পারবেন।" (গুরুত্ব আরোপিত), ঐ, পৃঃ 214.

12. বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের স্বাভাবিক পথ যখন রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল সে সময় এ ব্যবস্থার ফলে ভারতীয় পুঁজিপতিদের সামনে নতুন এক দ্বার খুলে গেল। অবিলম্বে 30টি চিনি কল খুলল এবং 1931 সালে 32 থেকে বেড়ে 1934 নাগাদ এগুলির সংখ্যা দাঁড়াল 130. দেশের প্রায় সব বড় শিল্পপতিই চিনির বাজারে এই তেজী অবস্থায় অংশগ্রহণ করল। তাছাড়া, বহু শিল্পপতিই দেখতে পেল যে কেবল তার চিনির কলের মুনাফার বলেই সে তার পুরনো হারে লভ্যাংশ পেয়ে যাচ্ছে।

13. চীনের মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক আচরণের সঙ্গে এর কোন মিল নেই। প্রথমোক্তরা তিন বার—1911 সালে, 1926-27 সালে এবং 1945-49 সালে বামপন্থীদের কেবল আক্রমণই করেনি, সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণও করেছিল।

14. 'ইন দা শ্যাডো অব দা মহাত্মা', পৃঃ 225-56.

15. ঔপনিবেশিক মডেলটা একেবারেই অস্থায়ী বা সাময়িক এবং ঔপনিবেশিক (বা রুশ) মডেল শেষ পর্যন্ত প্রযুক্ত হবেই এ রকম কথা বলার একটা প্রবণতা মাঝে মাঝে দেখা যায়। প্রকৃত পক্ষে 1920-র দশক থেকেই এ কথা বলা হচ্ছে—1928 সালে কমিনটার্নের বিখ্যাত ঔপনিবেশিক তত্ত্বে এটি সূত্রায়িত হল। কিন্তু 1947 সালে ভারতবর্ষকে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব হস্তান্তর করার পর এবং তারপর থেকে প্রায় 25 বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এর একটা বিরতি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি, পক্ষান্তরে ব্যাপারটাকে দুর্বোধ্য করে তোলা হচ্ছে. কেবল যুক্তিতর্কের কচকচানিতে কালহরণ করা হচ্ছে। যাই হোক, কার্যকরী বিশ্লেষণমূলক চিন্তাধারার একটা সুনির্দিষ্ট সময় কাল থাকবে।

16. এমন কি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনাদি ঘটছিল। ভারতীয় বাজারের উপর সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য মারাত্মকভাবে খর্বিত হয়েছিল এবং ভারতীয় সামাজিক উদ্বৃত্ত সরাসরি আত্মসাৎ করা একরকম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। চালু বিদেশি পুঁজির অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল, নতুন বিদেশি পুঁজির প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত হল।

17. 1849 সালে ইউরোপে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পটভূমিতে কার্ল মার্কস এই কথা বলেছিলেন ঃ "বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণী বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি বিপ্লবী অভ্যুত্থানই ব্যর্থ হতে বাধ্য, তা শ্রেণী সংগ্রাম (বুর্জোয়া ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে) থেকে তার লক্ষ্য যত সুদূরই প্রতিভাত হোক না কেন…প্রলেতারীয় বিপ্লব এবং সামন্ততান্ত্রিক প্রতিবিপ্লবী ব্যবস্থাবলী বিশ্বযুদ্ধে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি সমাজ সংস্কারই আকাশকুসুম থেকে যায়।" 'ওয়েজ, লেবার এন্ড ক্যাপিটাল', মস্কো, 1970 মুদ্রণ, পৃঃ 17-18।

জওহরলাল নেহরু ও পুঁজিপতি শ্রেণী : ১৯৩৬ সাল

বিভিন্ন কারণে জওহরলাল নেহরু ১৯৩৩-১৯৩৬ সালে[১] উত্তরোত্তর র‍্যাডিক্যাল (প্রগতিশীল) হয়ে ওঠেন। এ সবের অন্যতম কারণ ছিল ভারত ও বিশ্বের ওপর পৃথিবীব্যাপী মন্দার প্রভাব ও তার ফলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংকট ও পতন, ফলে সর্বত্র দেখা দিল গভীর সামাজিক পরিবর্তনের পূর্বাভাস। ১৯২৬-২৭ সাল থেকে তাঁর নিজের মননের বিকাশের যে পর্যায় শুরু হয়েছিল, ১৯৩২-৩৫ সালে কারাবাস কালে প্রচুর পড়াশোনার ফলে তা সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছল। সেই বিকাশ থেকে শুরু করে ১৯৩২-৩৪ সালে জাতীয় আন্দোলনের পরাজয় এবং এই বছরগুলিতে তাঁর অবিরাম কারাবাস :এ সবও ছিল তার কারণ। তিনি নিজেকে শুধু বিপ্লবী বলেই দাবি করেছিলেন তাই নয়,[২] তাঁর বামপন্থী ভাবনাচিন্তার ধোঁয়াটে ভাব ও অস্পষ্টতাও ক্রমশঃ কমে আসতে থাকে। চিন্তার স্তরে তিনি ভারতীয় রাজনীতির প্রায় প্রতিটি দিক স্পষ্টতর আলোয় উপলব্ধি করতে শুরু করেন। এবং তাঁর স্বভাব সুলভ ভাবাবেগ সেই উপলব্ধির সঙ্গে অবশ্যই মিশে গিয়েছিল। শুধু তত্ত্বের প্রশ্নেই নয়, জাতীয় আন্দোলনের পটভূমি, সামাজিক গঠন, সামাজিক ভিত্তি এবং রাজনৈতিক কৌশলের বিষয়-গুলিও তিনি দেখেছিলেন আরো প্রগতিশীল ও সুসম্বদ্ধভাবে। এটা হল তাঁর সর্বাধিক 'মার্ক্সবাদী' পর্ব, তাঁর বামপন্থার সবচেয়ে সমৃদ্ধ সময়। তাঁর অতি-সাম্প্রতিক জীবনীকার ১৯২৭-২৮ সালের নেহরুকে বর্ণনা করেছেন এক "আত্মসচেতন বিপ্লবী র‍্যাডিক্যাল" বলে।[৪] ১৯৩৩-৩৬ সালে তিনি প্রায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মার্ক্সবাদী বিপ্লবী হয়ে উঠেছিলেন।[৫]

এই উত্তরণ-প্রক্রিয়া ছিল দীর্ঘ এবং কখনোই তা সম্পূর্ণ হয়নি। তবে তার উপান্ত-পর্ব ১৯৩৩ সালের অক্টোবরে তাঁর লেখা "ভারত কোথায়" (Whither India) শীর্ষক রচনাগুলির মধ্য দিয়ে সুসম্বদ্ধভাবে ও প্রকাশ্যে[৬] শুরু হয়েছিল বলা যায় এবং ১৯৩৬ সালের এপ্রিলে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে তা সাফল্যের চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছয়। মধ্যবর্তী সময়ে ছিল অনেক ভাষণ, রচনা, চিঠিপত্র, কারাবাসের দিনলিপি এবং **আত্মজীবনী**।

র‍্যাডিক্যাল নেহরু ভারতীয় পুঁজিপতি ও দক্ষিণপন্থী কংগেসীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করলেন। তাঁরা তাঁকে প্রতিহত ও সংযত করার জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা নিলেন এবং তাঁকে ও তাঁর মত অন্যদের মোকাবিলা করার জন্য এক দীর্ঘমেয়াদী কৌশল উদ্ভাবন করলেন। নেহরুর যে প্রগতিবাদী ভাবনা-

'ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি', দশম খণ্ড, সংখ্যা ৩৩-৩৫, বিশেষ সংখ্যা, আগস্ট ১৯৭৫, থেকে পুনর্মুদ্রিত।

চিন্তা পর্ন্জিপতিদের আতঙ্কিত করেছিল এবং পর্ন্জিপতিরা যে পাল্টা-কৌশল ব্যবহার করেছিল বর্তমান প্রবন্ধে সেগর্লি বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে।

সমাজতন্ত্রের প্রতি নেহর্র আস্থা স্পষ্টতর ও তীক্ষ্ণতররূপে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৩-৩৬ সালে। ইতিমধ্যে ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে নিজেকে তিনি সমাজতন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু সমাজ-তন্ত্র সম্পর্কে তাঁর ধারণা কিছুটা অস্পষ্ট ছিল।[6] তাঁর ধ্যান ধারণা মার্ক্সবাদ অভিমর্খী হচ্ছিল, কিন্তু তখনো মার্ক্সবাদ গভীরভাবে আত্মস্থ হোয়ে ওঠেনি।[7]

তখন তিনি বার বার সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করছিলেন এবং শব্দদর্টিকে সমার্থকভাবে ব্যবহার করছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন "এগর্লির পক্ষে বিজ্ঞান ও যর্ক্তি" রয়েছে,[8] এবং ১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে "ভারত কোন পথে?" এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন দৃঢ় প্রত্যয়ের সর্রে: "নিশ্চিতভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের মহান মানবিক লক্ষ্যের দিকে, জাতির দ্বারা জাতির এবং শ্রেণীর দ্বারা শ্রেণীর সমস্ত রকম শোষণের অবসানের জন্য, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এক সমাজতান্ত্রিক বিশ্বসংঘের কাঠামোর অন্তর্গত থেকে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য।"[9] এবং ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বরে তিনি লিখলেন: "প্রকৃত নাগরিক আদর্শ হলো সমাজবাদী আদর্শ, কমিউনিস্ট আদর্শ।[10] কমিউনিস্টদের ব্যাপারে তাঁর কিছু আপত্তি ছিল। তিনি কমিনটার্নের কৌশলের সমালোচনাও করেছিলেন।[11] কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি কমিউনিজমের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন: "...মূলতঃ আজ পৃথিবীকে বেছে নিতে হবে: কোন এক ধরনের কমিউনিজম ও কোন এক ধরনের ফ্যাসিজমের মধ্যে একটিকে,...ফ্যাসিজম ও কমিউনিজমের মধ্যে কোন মধ্যপন্থা নেই। দর্টির মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হবে এবং আমি বেছে নিচ্ছি কমিউনিস্ট আদর্শ।"[12] ১৯৩৬ সালের ২০শে এপ্রিল লক্ষ্নৌতে তিনি এই আস্থা প্রকাশ করলেন দ্ব্যর্থহীন ও আবেগময় ভাষায়: "আমি নিঃসন্দেহ যে বিশ্বের সমস্যা ও ভারতবর্ষের সমস্যা সমাধানের একমাত্র চাবিকাঠি রয়েছে সমাজতন্ত্রে।...সমাজতন্ত্র ছাড়া দারিদ্র্য, বিপর্ল বেকারত্ব, অবনয়ন এবং ভারতের জনগণের অধীনতা অবসানের আমি আর কোন পথ দেখছি না।"[13]

নেহর্ 'পর্ন্জিবাদ' ও 'সমাজবাদ' শব্দ দর্টির আরো স্পষ্ট ও বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাও দিয়েছিলেন। ১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে তিনি বলেছিলেন, 'পর্ন্জিবাদ' শব্দটি "একটি মাত্র অর্থই সূচিত করতে পারে: পর্ন্জিবাদ মানে এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা বিকশিত হয়েছে শিল্প বিপ্লবের পর থেকে।...পর্ন্জিবাদের অর্থ হল উৎপাদনের হাতিয়ারের ব্যক্তিগত মালিকানার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং মর্নাফার জন্য উৎপাদনের উন্নত ব্যবস্থা।" অনুরূপভাবে, সমাজতন্ত্রকে তিনি দেখেছিলেন সম্পূর্ণ আলাদা এক

সমাজ-ব্যবস্থা হিসেবে। "ধোঁয়াটে কোন মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে" এর সংজ্ঞানির্ধারণ করলে চলবে না, করতে হবে "বরং বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক অর্থের দিক দিয়ে।" "আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোতে ব্যাপক ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন, ভূমিতে ও শিল্পক্ষেত্রে কায়েমী স্বার্থের অবসান,"[14] এর সঙ্গে জড়িত। বিশেষ করে তিনি উৎপাদনের হাতিয়ারের ব্যক্তিগত মালিকানার বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছিলেন।[15] লক্ষ্ণৌয়ে এক সমাবেশে তিনি বলেছিলেন, সমাজতন্ত্রের অর্থ হলো, "সীমিত অর্থে প্রয়োগ বাদ দিলে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান, এবং বর্তমান মুনাফা ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার জায়গায় সমবায় ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার উচ্চতর আদর্শের প্রতিষ্ঠা।[16] উপরন্তু, কেউ একই সঙ্গে সমাজতন্ত্রের পক্ষে এবং পুঁজিবাদের পক্ষে অর্থাৎ একই সঙ্গে "উৎপাদনের হাতিয়ারের ও বণ্টনের জাতীয়করণ" এবং এগুলির ব্যক্তিগত মালিকানার পক্ষে দাঁড়াতে পারে না। পথে অবশ্য 'মাঝামাঝি জায়গা' থাকতে পারে, "কিন্তু বিপরীতমুখী ও পরস্পরবিরোধী দুটো পথকে পাশাপাশি নিয়ে কেউ বড় একটা চলতে পারে না। একটিকে বেছে নিতেই হবে এবং সমাজবাদ যার লক্ষ্য তার পক্ষে পছন্দ একটাই থাকতে পারে।[17]

নেহরু শ্রেণী বিশ্লেষণ ও শ্রেণী সংগ্রামের ভূমিকার ওপরও জোর দিয়েছিলেন। ১৯৩৩ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, "প্রতিটি মানুষ নিজে এবং তার শ্রেণী ও গোষ্ঠী কোথায় দাঁড়িয়ে আছে তা সঠিকভাবে বুঝতে" তাকে সাহায্য করতে হবে। শ্রেণী সংগ্রাম সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন যে সারা বিশ্বে এটি জীবন ও ইতিহাসের একটি বাস্তব ঘটনা। "শ্রেণী সংগ্রাম চিরদিন ছিল এবং আজও আছে," "যেসব মানুষ স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে আগ্রহী তারাই কেবল এই ঘটনাটিকে লুকোতে চেষ্টা করে" এবং অন্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে "শ্রেণী সংগ্রামে প্ররোচনা দেওয়ার।" নেহরু বললেন, শ্রেণী সংগ্রাম "সৃষ্টি করা হয়নি, তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।" সত্যকে আড়াল করার জন্য যে আবরণ ব্যবহার করা হয় তা দূর করা হল রাজনৈতিক কর্তব্য। "কিছু কিছু শ্রেণী যে সমাজ ব্যবস্থার ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করে এবং অন্যান্য শ্রেণীকে শোষণ করে," এবং "সেই শোষণের অবসান"[18] ঘটালেই যে কেবল প্রতিকার হতে পারে, এই সত্য তবেই স্পষ্ট হবে।

অর্থনীতির গন্ডি পেরিয়ে নেহরু বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সমালোচনা করতে শুরু করেন এবং এইভাবে ১৮৮০র দশক থেকে জাতীয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা এবং গান্ধীযুগে অক্ষুণ্ণ থাকা বুর্জোয়া রাজনৈতিক মতাদর্শগত আধিপত্যকে ক্রমশঃ দুর্বল করে তোলেন। রাজনৈতিক গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য দায়বদ্ধ হলেও তাঁর মনে এ ব্যাপারে কোন দ্বিধা ছিল না যে "রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি যদি এইরকম পরিবর্তনের অন্তরায় হয় ['সমাজবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা'], তাহলে

সেগংলিকে দংর করতে হবে।"[১৯] উপরন্তু, ১৯৩৬ সালে তিনি লিখেছিলেন, রাজনৈতিক গণতন্ত্রও গ্রহণীয় "শংধং এই আশায় যে তা নিয়ে যাবে সামাজিক গণতন্ত্রের দিকে", কারণ "রাজনৈতিক গণতন্ত্র হলো কেবল লক্ষ্যে পেঁছনোর পথ, সেটাই চংড়ান্ত লক্ষ্য নয়।"[২০] গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাও কার্যতঃ সম্ভব ছিল না—যদিও তাত্ত্বিক দিক দিয়ে তার একটা সম্ভাবনা ছিল—কারণ "সমাজতন্ত্র বিরোধীরা যখন দেখবে তাদের ক্ষমতা বিপন্ন হওয়ার আশংকা রয়েছে তখন তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ত্যাগ করবে।" "রাষ্ট্র বা সমাজের মংল কাঠামোগত বিরোধের সমাধান করতে" গণতান্ত্রিক পদ্ধতি এ পর্যন্ত কোথাও সফল হয়নি। "বেশির ভাগ মানংষ যখন ক্ষমতা লাভের দাবি করে, তখন তারা সেই দাবি করে বলেই রাষ্ট্রে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী গোষ্ঠী বা শ্রেণী সেই ক্ষমতা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেয় না।" বস্তুতঃ, "ক্ষমতাসীন শক্তি ও শ্রেণী স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগ করেছে এমন ঘটনা ইতিহাসে পাওয়া যায় না।"[২১]

এটাও লক্ষণীয় যে, ১৯৩৩ সালের অক্টোবরে তিনি লিখছেন, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা সম্পর্কে পশ্চিম **ইউরোপীয়** রাজনৈতিক মতবাদ শংধং পংজিপতি শ্রেণীরই কাজে লেগেছে। অর্থনৈতিক সাম্যের অভাবে "ভোট ব্যবস্থা বিশেষ কাজে লাগেনি" এবং "মানংষের উপর মানংষের এবং গোষ্ঠীর উপর গোষ্ঠীর শোষণ" কার্যতঃ "বেড়ে গেল"। ফলে "জনগণের, জনগণের দ্বারা গঠিত এবং জনগণের জন্য সরকার" এই উদারনৈতিক মতবাদ বাস্তবে "নিজেদের লাভের জন্য বিত্তবান শ্রেণীর দ্বারা গঠিত সরকারে" পরিণত হয়েছিল। নেহরং তাই উপসংহারে বলছেন, "জনগণ যখন ক্ষমতার অধিকারী হবে", তখনই "অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের অধীনেই"[২২] কেবল এই উদারনৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

নেহরং চরিত্র-পরিবর্তন **বনাম** বল প্রয়োগের গান্ধীবাদী দ্বিবিভাজন থেকেও সরে আসতে শংরং করেন। ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে কারাবাসকালে তাঁর এই সরে আসা শংরং হয়। সেই সময় তিনি গান্ধীকে বলেছিলেন যে তাঁর সাপ্তাহিক **'হরিজন'** "একজন গোঁড়া **সনাতনপন্থীরও** চরিত্র বদলাতে" পারবে কি না সন্দেহ, কারণ জন স্টংয়ার্ট মিলের ভাষায়, "অধিকাংশ মানংষের বিশ্বাস তাদের স্বার্থ বা শ্রেণীবোধের অনংসারী।"[২৩] ১৯৩৩ সালের ৩১শে আগস্ট **'পাইওনিয়ার'**-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি জোরের সঙ্গে বলেছিলেন যে "এক নংতন ভিত্তির ওপর সমাজের আমংল পংনর্গঠন" মানে 'বিত্তবানদের' হাত থেকে মংনাফা ও সম্পত্তি নিয়ে 'বিত্তহীনদের' দেওয়া এবং এটা মনে করা যাবে না "যে কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন গোষ্ঠীরা তাতে কখনো স্বেচ্ছায় রাজি হবে।"[২৪]

১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে "ভারত কোন পথে" শীর্ষক প্রবন্ধাবলীতে তিনি বিষয়টি নিয়ে সংসম্বদ্ধভাবে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার মতই রাষ্ট্রের সমগ্র তত্ত্বটাই বলপ্রয়োগের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

"বলপ্রয়োগ ও চাপিয়ে দেওয়া সাদৃশ্য কি উভয়েরই মূল ভিত্তি নয় ?" তিনি প্রশ্ন করলেন। বস্তুতঃ, "সেনাবাহিনী, পুলিস, আইনকানুন, কারাগার, করব্যবস্থা সবই হল বলপ্রয়োগের পদ্ধতি। যে জমিদার খাজনা ও অনেক সময়ই বহু বেআইনি কর আদায় করে সে নির্ভর করে বলপ্রয়োগের ওপর, প্রজাদের হৃদয় পরিবর্তনের উপর নয়। কারখানার যে মালিক জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনের চেয়েও কম মজুরি দেয় সে মন বদলানোর ওপর নির্ভর করে না। ক্ষুধা ও রাষ্ট্রের সংগঠিত শক্তিগুলিকে উভয়েই ব্যবহার করে বলপ্রয়োগের প্রণালী হিসেবে।" সুতরাং বিত্তশালী শ্রেণীর মুখে "হৃদয় বদলের কথা বলা" মানায় না। প্রকৃত সমস্যা হল কায়েমী স্বার্থের অবসান ঘটানো, অবসান ঘটানো শাসকশ্রেণী ও তাদের শোষণের। এমনকি গান্ধীও কায়েমী স্বার্থের মৌরসী পাট্টা বাতিল করার নীতি মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু কিভাবে তা করা যাবে ? "কোন সুবিধাভোগী শ্রেণী বা গোষ্ঠী বা জাতি তার বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বা স্বার্থ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছে এমন দৃষ্টান্ত" ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এর জন্য সব সময়ই "কিছু বলপ্রয়োগের" প্রয়োজন হয়েছে। ভারতেও তার ব্যতিক্রম ঘটবে না। এক্ষেত্রেও "রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন ঘটানোর জন্য বলপ্রয়োগ বা চাপের প্রয়োজন।" বস্তুতঃ, ১৯১৯ সালের পর থেকে ভারতে অহিংস গণ আন্দোলন ছিল যথার্থই এই রকম বলপ্রয়োগ বা চাপ সৃষ্টির প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য ছিল "অন্য পক্ষের উপরে বল প্রয়োগ করা।" এমনকি অহিংস অসহযোগকেও "নেতিবাচক ও নিষ্ক্রিয় প্রণালী হিসেবে" দেখলে চলবে না, দেখতে হবে "গণ-ইচ্ছাকে প্রয়োগ করার এক সক্রিয়, বেগবান ও জোরালো পদ্ধতি হিসেবে।"[২৫]

বিষয়টি নিয়ে নেহরু তাঁর 'আত্মজীবনী'তেও আলোচনা করেছিলেন। সেখানে তিনি গান্ধীর ভাবাদর্শের এই মৌলিক দিকটির বিরুদ্ধে ধীরভাবে লড়াই করার জন্য গোটা একটি অধ্যায় ব্যবহার করেছেন। তিনি বলছেন, "অর্থনৈতিক স্বার্থই, গোষ্ঠী বা শ্রেণীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে। যুক্তি বা নৈতিক বিচার-বিবেচনা কিছুই এই স্বার্থকে প্রভাবিত করতে পারে না।" সুতরাং "বলপ্রয়োগের মত কার্যকরী তুল্যমূল্য চাপ সৃষ্টি করতে না পারলে কোন প্রবল প্রতাপ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কোন দেশের ওপর তার কর্তৃত্ব ত্যাগ করবে, অথবা কোন শ্রেণী তার উচ্চতর অবস্থান ও সুবিধা ছেড়ে দেবে" একথা "ভাবা ভুল।"[২৬] উক্ত অধ্যায়ের শেষে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশিত হয়েছেঃ "সকলের জন্য সমান অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ও সমান সুযোগ সম্পন্ন এক শ্রেণীহীন সমাজের" লক্ষ্য যদি বাস্তবায়িত করতে হয় তাহলে "পথে যে বাধাই আসুক না কেন তা দূর করতে হবে, সম্ভব হলে শান্তভাবে, দরকার হলে জোর করে। এবং জোরের প্রয়োজন যে প্রায়ই হবে এ ব্যাপারে সন্দেহের বোধহয় বিশেষ অবকাশ নেই"।[২৭]

এইসব বছরগুলিতে তিনি তৎকালীন জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের অসম্পূর্ণতা

তুলে ধরেন এবং এক নূতন মতাদর্শ প্রচারের প্রয়োজনের ওপর জোর দেন, জনসাধারণকে যা নিজেদের অবস্থা বৈজ্ঞানিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করবে।[৩৮] আইন অমান্য আন্দোলনের কার্যত পরাজয়ের পরেও সে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর সমর্থন ছিল কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে নিরবচ্ছিন্ন রাজনৈতিক সংকট জনগণ ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্যে নূতন চিন্তাধারা প্রসারে সাহায্য করে।[৩৯]

"নূতন মতাদর্শ" এই শব্দগুলি তাঁর তৎকালীন চিঠিপত্র, প্রবন্ধ ও ভাষণে প্রায়ই দেখা যেত—এগুলি আসলে বোঝাতো মার্ক্সবাদ। কারণ স্পষ্টতই তিনি 'ইতিহাস এবং রাজনীতি ও অর্থনীতির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা" হিসেবে এবং "এক অস্পষ্ট ও ভাববাদী সমাজতন্ত্রের" পরিবর্তে "বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের" প্রকাশ হিসেবে মার্ক্সবাদের সাধারণ যুক্তি গ্রাহ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন।[৪০] ১৯৩৬ সালের ১৫ই মে তিনি বম্বের ইনডিয়ান প্রগ্রেসিভ গ্রুপকে বলেছিলেন, 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বা মার্ক্সবাদ হল বিশ্বের সব জ্বালা যন্ত্রণার একমাত্র দাওয়াই।"[৪১] ১৭ই মে কংগ্রেসী সমাজতন্ত্রীদের এক সভায় বলেছিলেন যে ইতিহাস ও সমসাময়িক পরিস্থিতিকে "সমাজতন্ত্র বা মার্ক্সবাদের সাহায্য ছাড়া ব্যাখ্যা করা যায় না।[৪২] নেহরু একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক সংকট ও তা দূর করার প্রয়োজন সম্পর্কে মার্ক্সবাদী বিশ্লেষণ পুরোপুরি মেনে নিয়েছিলেন। ১৯৩৩ সালে তিনি লিখেছিলেন, পুঁজিবাদের সংকট মূলতঃ "কারণ বিশ্বের সম্পদের অসম বণ্টন ; মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে তা সঞ্চিত হওয়া।" উপরন্তু, "রোগটা বোধহয় পুঁজিবাদের মূল বৈশিষ্ট্যের এবং তারই সঙ্গে বৃদ্ধি পায়।" ব্যাপারটার মূল কথা হল এই যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা "আর বর্তমান উৎপাদন-প্রণালীর সঙ্গে খাপ খায় না।" অতএব এর উত্তর নিহিত রয়েছে "নূতন কৌশলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নূতন এক ব্যবস্থার" মধ্যে ; অর্থাৎ অন্যভাবে বলতে গেলে "সমাজতন্ত্রের পথে।"[৪৩]

নেহরু ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে সমকালীন মার্ক্সবাদী বিশ্লেষণও পুরোপুরি গ্রহণ করেছিলেন। এবং সেটা এমন একটা সময় যখন বহু 'সাধারণ' প্রগতিপন্থী মানুষ ইউরোপ ও এশিয়ায় ফ্যাসিবাদের বাহ্য 'বামপন্থী' কর্মসূচী ও মনোভাব, সাধারণ ভিত্তি, শৃংখলা ও সাংগঠনিক সফলতার দ্বারা আকৃষ্ট হচ্ছিলেন। নেহরু লিখলেন, ফ্যাসিবাদের উদ্ভবের কারণ হল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ব্যর্থতার ফলে শ্রমজীবী শ্রেণীর চ্যালেঞ্জ তীব্র আকারে দেখা দিয়েছিল। "এই চ্যালেঞ্জ যখন বিপজ্জনক হয়ে উঠল তখন বিত্তবান শ্রেণীগুলি সচেতন হল নিজেদের ভেতরকার ক্ষুদ্র-তুচ্ছ পার্থক্য সব মিটিয়ে ফেলে একজোট হয়ে তাদের শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে। এরই পরিণতি হল ফ্যাসিবাদ।"[৪৪] লক্ষ্ণৌতে নেহরু বিশ্ব-পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণের উপসংহারে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সফলতার পাশাপাশি পুঁজিবাদের ব্যর্থতার তুলনা করেন এবং পুঁজিবাদের সামাজিক বিকল্প হিসেবে সোভিয়েত ও

সমাজতন্ত্রকে খোলাখুলিভাবে সমর্থন করেন।[৩৫] নূতন রাষ্ট্রকে নেহরু শুধু প্রশংসাই করেননি, "ত্রুটি, ভ্রান্তি ও নির্মমতাও" সেখানে ছিল।[৩৬] তাঁকে "কষ্ট" দিয়েছে এমন অনেক কিছুই সেখানে ছিল।[৩৭] তথাপি সেই "নবযুগ" আর "ভবিষ্যতের স্বপ্ন" রইল না, কারণ তা সোভিয়েত রাশিয়াতে "ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ জীবন্ত রূপ" নিচ্ছিল, "মাঝে মাঝে হোঁচট খাচ্ছিল বটে, কিন্তু ক্রমাগত এগিয়েও চলছিল সামনের দিকে।"[৩৮] এই "নূতন ব্যবস্থা ও নূতন সভ্যতা" হল "আমাদের বিষাদময় যুগের সবচেয়ে আশাপ্রদ দিক।"[৩৯]

বিশ্ব পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের মূলগত সমালোচনা করে নেহরু এশিয়ার উপনিবেশবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে এবং "নিপীড়িতের মুক্তির জন্য" পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে **বিশ্ব-সংগ্রামের** সঙ্গে ভারতের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামকে **মিলিত** করার সপক্ষে যুক্তি দিতে শুরু করলেন।[৪০] লক্ষ্ণৌ অভিভাষণে নেহরু এই **সংযোগ**-কে আরো প্রসারিত করেন। ভারতের সমস্যা "বিশ্ব পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের সমস্যার একটা অঙ্গ মাত্র।" উপরন্তু, ইউরোপ ও আমেরিকায় সমাজতন্ত্র এবং আফ্রিকা ও এশিয়াতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ফ্যাসিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের বিরুদ্ধে এক অবিভাজ্য শিবির গড়ে তুলেছিল।[৪১] সুতরাং নেহরুর তৎকালীন আন্তর্জাতিকতাবাদ ছিল রাজনৈতিক দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ এবং পুরোপুরি **র‍্যাডিক্যাল**। তিনি আশা করেছিলেন ভারতীয় রাজনীতির **মৌলিক সংস্কারের** জন্য এবং ভারতীয় জনগণের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চেতনা ও মতাদর্শ প্রসারেরর উদ্দেশ্যে একে ব্যবহার করবেন।

২

১৯৩৩-৩৬ সালে নেহরু তাঁর মতাদর্শের উপলব্ধিকে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে উত্তরোত্তর সঞ্চারিত করেন এবং তার মৌলিক কৌশল ও সাংগঠনিক কাঠামোর পরিবর্তন দাবি করেন।

প্রথমে, ১৮৮০র দশক থেকে কংগ্রেস নেতৃত্ব যে মূল জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নীতি অর্থাৎ, ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শক্তিকে একের পর এক আপস-মীমাংসা করতে বাধ্য করা এবং পর্যায়ক্রমে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও স্বাধীনতার দিকে এগোনর নীতি অনুসরণ করে আসছিলেন, তিনি তার বিরোধিতা করলেন। আগের প্রবন্ধগুলিতে আমি এই কৌশলকে বর্ণনা করেছি চাপ-আপস-চাপ বা চা-আ-চা কৌশল হিসেবে।[৪২]

এই কৌশলে রাজনৈতিক চাপ সাধারণতঃ গণআন্দোলনের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়, আদায় করা হয় রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা, এবং যতই প্রচ্ছন্ন হোক না কেন ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে 'শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার'

একটা পর্যায় থাকে। উভয় পক্ষে যখন এইরকম 'শুভেচ্ছা' বর্তমান থাকে তখন প্রস্তুতি চলে আরেক দফা চাপ বা গণ আন্দোলনের, তারপর চক্রের পুনরাবর্তন হয়—এবং এই পুনরাবর্তন ক্রমান্বয়ে উর্ধ্বমুখী হয়। এই কৌশল অনুযায়ী রাজনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব হয় নিযুক্ত কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক বা সাংবিধানিক কাজের মাধ্যমে। এইভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের ব্যাপারটা এই নীতির অন্তর্নিহিত যুক্তি বলেই খারিজ হয়ে যেত।

১৯৩৪-৩৬ সালের বাস্তব রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর নেতৃবর্গ উপলব্ধি করেছিলেন যে চাপ বা সক্রিয় লড়াইয়ের পর্যায় শেষ হয়ে গেছে এবং আপস-মীমাংসা, সহযোগিতা ও 'শুভেচ্ছার' নূতন পর্যায়ের সূচনা করতে হবে। ১৯৩৩ সালের শেষ থেকে তাঁরা বস্তুতঃ একটা রাজনৈতিক আপসের জন্য নীরবে কাজ করে যাচ্ছিলেন, কারণ আইন অমান্য আন্দোলন তখন নিশ্চিতভাবেই নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল।

তৎকালীন পরিস্থিতিতে এর প্রয়োজন ছিল সাংবিধানিক সংস্কার সাধন এবং শেষ পর্যন্ত তা ঘোষিত হয়েছিল ১৯৩৫ সালে। গান্ধী সম্ভবত **সংস্কার সাধনের** বিরুদ্ধে ছিলেন, যদিও তাঁর নীতি ছিল যেসব কংগ্রেস সদস্য আইন পরিষদগুলিতে কাজ করতে চেয়েছিলেন তাঁদের তা করতে দেওয়া এবং অন্যান্যরা তখন গঠনমূলক কর্মসূচীতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সে নীতি কার্যতঃ ছিল আপস ও সহযোগিতার পর্ব প্রকারান্তরে মেনে নেওয়ার সমান। উপরন্তু, গান্ধী ও কংগ্রেসের প্রভাবশালী দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব ১৯৩৫ সালের আইনানুযায়ী প্রদেশগুলিতে **সরকার গঠনের** আহ্বান কংগ্রেস যাতে প্রত্যাখ্যানের নীতি গ্রহণ না করে সে জন্য **সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন** যদিও সেই সময় তাঁরা উক্ত আইনের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে সোচ্চার ছিলেন।[43] এই ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট হয় এই ঘটনায় যে শাসকবর্গের সঙ্গে সাধারণভাবে কংগ্রেস নেতৃত্ব ও বিশেষভাবে গান্ধীর পারস্পরিক আস্থা ও 'ব্যক্তিগত সম্পর্কের' আবহাওয়া তৈরির জন্য গান্ধী জি. ডি. বিড়লাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। বার বার বিড়লা, এবং তাঁর মাধ্যমে, যদিও কার্যতঃ চুপিসাড়ে, গান্ধী ব্রিটিশ রাষ্ট্রনায়ক ও সরকারি আমলাদের এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে দু পক্ষের মধ্যে 'ব্যক্তিগত সম্পর্ক' স্থাপিত হলে অন্যত্র ধিকৃত সংস্কারগুলি নিয়েও কাজ করা যেতে পারে।[44]

পক্ষান্তরে নেহরুর যুক্তি ছিল এই যে লক্ষ্য যদি হয় 'এক নূতন রাষ্ট্র', নিছক 'একটা নূতন প্রশাসন' নয়, তাহলে পর্যায়ক্রমে এবং শাসক শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করে ক্ষমতা অর্জন করা যাবে না।[45] এবং ভারতের জাতীয় আন্দোলন এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত না করা পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন বিরোধিতা এবং স্থায়ী সংগ্রাম ও সংঘর্ষ চালিয়ে যাওয়া দরকার।[46] সাময়িক বাধা-বিপত্তির অজুহাতে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে অল্প কালের জন্যও সহযোগিতা বা আপস করা চলবে না,

নিরবচ্ছিন্ন বৈরিতা চালিয়ে যেতে হবে, যদিও আন্দোলনে জোয়ার আবার না আসা পর্যন্ত সেই বৈরিতা অনিবার্যভাবেই নিচু পর্যায়ে থাকবে।[47]

প্রথমতঃ, নেহর্ বললেন, সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় জনগণের মধ্যে বিরোধ ম্লগত, এর কোন মাঝামাঝি রফা হবে না। "...ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতের স্বাধীনতার মধ্যে মতৈক্যের কোন স্থান নেই এবং কোন শান্তি সম্ভব নয়।"[48] এর অর্থ হল কোন গণআন্দোলন না থাকলেও সংস্কারের কাজ করা যায় এমন সাংবিধানিক পর্বে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়তঃ, জাতীয় বা সামাজিক প্রতিটি আন্দোলন আগে হোক বা পরে হোক এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছত যখন তা তৎকালীন ব্যবস্থাকে বিপদগ্রস্ত করে তুলত। তখন সংগ্রাম হয়ে উঠত স্থায়ী ও জর্রি, অসাংবিধানিক ও অবৈধ। আপস-মীমাংসার আর কোন স্যোগ থাকত না। "জনগণ যখন রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করল" তখনই এটা ঘটল। এই অচলাবস্থা থেকে বেরোনর কোন মাঝামাঝি পর্যায় বা মধ্যপন্থাও ছিল না। সংগ্রাম "চালিয়ে যাওয়ার একমাত্র বিকল্প" ছিল সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কিছ্টা সহযোগিতা।" কিন্তু ভারত ও বিশ্ব ইতিহাসের এই পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যে কোন রকম আপস "হোত উদ্দেশ্যের প্রতি প্রতারণা।" এর উত্তর একটাই ঃ "শেষ প্রান্ত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়া" এবং "আপসহীনভাবে বা পিছিয়ে না এসে বা ভয় না পেয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়াই একমাত্র পথ।"[49] অহিংস গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে হলেও নেহর্ ক্ষমতা দখলের কৌশল সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। প্রকৃত ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে, পর্যায়ক্রমে, "একট্ একট্ করে" বা "দ্ আনা চার আনা করে" লাভ করা যায় না। হয় সাম্রাজ্যবাদ ক্ষমতায় থাকবে অথবা ভারতীয়রা "দ্র্গের" দখল নেবে।[50] এখানে তিনি চা-আ-চা কৌশলের বির্দ্ধে সরাসরি চা-বি কৌশল ('বি' অর্থাৎ বিজয়) উপস্থাপন করলেন। ভারতে একমাত্র সম্ভাব্য সংগ্রাম-পদ্ধতি হিসেবে অহিংস গণ-আন্দোলনকে তিনি প্রোপ্রি মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মতে, এই পদ্ধতি সংগ্রামের পথ তৈরি করেছে, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস ও সহযোগিতার পথ নয়। লড়াইয়ের 'পদ্ধতি'র বদলে, যা তাঁর মতে সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল, তিনি বার বার জোর দিয়েছিলেন সংগ্রামের রণনীতির ওপর।[51]

১৯৩৫-৩৬ সালে তিনি আরো স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করলেন যে ১৯৩৫ সালের আইনান্যায়ী প্রদেশগ্লিতে সরকারি পদ গ্রহণের অর্থ হোল জাতীয় আন্দোলনকে আপসের পর্যায়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। এবং সরকারি পদগ্রহণের বির্দ্ধে তাঁর এত প্রবল আপত্তির কারণ 'সেটা ছিল দ্টি নীতিগত পন্থার মধ্যে লড়াইয়ের প্রশ্ন।' লড়াই তিক্ত হয়ে ওঠার প্রকৃত কারণ হল নেহর্ গান্ধী ও জাতীয় আন্দোলনের 'ম্ল কৌশলটিকেই' চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছিলেন। এই কারণেও

তিনি এমন মারাত্মকভাবে পরাভূত হন যে আর কখনো তিনি গান্ধী বা প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরোধিতা করেননি।

লক্ষ্ণৌ অভিভাষণে তিনি এই প্রশ্নে এক দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ করেন। তাঁর মতে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ "এর পেছনে ছিল নীতি সংক্রান্ত জটিল প্রশ্ন।" তিনি বলেছিলেন, "এর পেছনে কিছুটা প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে স্বাধীনতার প্রশ্ন এবং আমরা ভারতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন চাই কিনা অথবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিশ্চিত আশ্রয় থেকে ছোটখাট সংস্কার সাধনের জন্য কাজ করছি কিনা এই প্রশ্ন।" সরকারে অংশগ্রহণ করার "অনিবার্য অর্থ হবে সাম্রাজ্যবাদের দমনযন্ত্রের সঙ্গে আমাদের কিছুটা সহযোগিতা, এবং আমরা এই দমনের কাজে এবং আমাদের দেশের মানুষকে শোষণের কাজে অংশীদার হয়ে পড়বো।" কার্যতঃ এর অর্থ হবে সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ। কংগ্রেসীদের পক্ষে এটা হোল "আমাদের অস্তিত্বের মূল ভিত্তি ও প্রেক্ষাপটকেই" ত্যাগ করার সমান। কংগ্রেসের যে শুধু সরকারে অংশ নেওয়া উচিত হবে না তাই নয়, এমন কি তারা "এই ব্যাপারে ইতস্তত বা দ্বিধা করতেও" পারবে না। সরকারে কংগ্রেসের অংশগ্রহণ "হবে এমন এক খাদের মধ্যে পড়া যা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা হবে দুঃসাধ্য।" অবশেষে, এইরকম পদক্ষেপ "আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে বৈপ্লবিক মানসিকতা গড়ে তোলার"[৫২] প্রয়াসের পক্ষে সর্বনাশা হোত এবং এই ব্যাপারটি তৎকালে তাঁর কাছে একটা বড়ো উদ্বেগের বিষয় ছিল।

বিস্তৃততর ক্ষেত্রে নেহরু সাধারণতঃ সংসদীয় কাজকর্মের ওপর অযথা গুরুত্ব দেওয়ার বিরোধী ছিলেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে আইনসভার কাজকে একেবারে গৌণ ভূমিকা দেওয়ার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। এ কাজের প্রয়োজন ছিল ততটুকুই যতটুকু প্রত্যক্ষ গণ-রাজনৈতিক লড়াইয়ের জন্য জনগণকে তৈরি করার কাজে লাগানো যেত।[৫৩] তিনি কংগ্রেসীদের এই 'প্রকৃত বিপদ' সম্পর্কেও সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে তাঁরা নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে "দ্বিধাগ্রস্ত ও আপসকামী গোষ্ঠী ও ব্যক্তিদের" "স্বমতে আনার জন্য" নিজেদের কর্মসূচি ও নীতি শিথিল করে ফেলতে প্রলুব্ধ হতে পারেন।[৫৪] যে ব্যবস্থা আইন সভার কাজকে "আমাদের অন্য কাজের পক্ষে প্রতিবন্ধক" হয়ে উঠতে দিত না তা হল সেই কাজের ওপর কংগ্রেস ও তার ওয়ার্কিং কমিটির সরাসরি নিয়ন্ত্রণ রাখা এবং আধা-স্বশাসিত সংসদীয় বোর্ডগুলি, ভেঙ্গে দেওয়া।[৫৫]

তিনি অবশ্য স্বীকার করেছিলেন যে কোন না কোন ধরনের সংসদীয় ক্রিয়াকলাপের অস্তিত্ব থাকতে বাধ্য এবং সেইজন্য তার প্রতি অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস না করেই তাকে সমর্থন জানাতে হবে। উপরন্তু, যে উপায়ে সফল জাতীয়তাবাদ ক্ষমতা দখল করবে এবং পরিচালনা করবে তাও জনগণের কাছে পেশ করতে হবে। কনস্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি (সি. এ.) গঠনের বাস্তব সম্মত ও চমৎকার স্লোগানের দ্বারা এ দুটি উদ্দেশ্যই

সাধিত হতে পারত। ১৯৩৩ সালেই নেহর্ প্রথম প্রকাশ্যে দাবি তুলেছিলেন যে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচিত হওয়া উচিত ভারতের জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত এক কনস্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির দ্বারা। সি. এ.-এর স্লোগান হল তৎকালীন আইনসভাগুলির কাজের তত্ত্বের সরাসরি বিরোধিতা এবং সেই কারণে তা পর্যায়ক্রমে ও শাসকদের রাজনৈতিক কাজের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করার কৌশলেরও বিরোধিতা। কারণ ব্রিটিশ কর্তৃত্ব শেষ হওয়ার পরই কেবল সি. এ. গঠিত হতে পারত। সুতরাং এই স্লোগান সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করার জন্য জনগণকে তৈরি করতে পারত।[৫৬] নেহর্ লক্ষ্ণৌতে বারবার, এই একই কারণে কনস্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির দাবির কথা তুলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অথবা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কোন নূতন আইনের ফলে সি. এ. তৈরি হবে না। সি. এ. হবে ভারতীয় জনগণের ক্ষমতা দখলের এক অভিব্যক্তি, "অন্তত এক আধা-বৈপ্লবিক পরিস্থিতির" অর্থাৎ জাতীয় সংগ্রামের নূতন কৌশলের প্রকাশ।[৫৭]

নেহর্ জাতীয় আন্দোলনের আরেকটি দুর্বলতার প্রতি ক্রমশঃ আরো বেশি করে দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলেন। এটি হোল তার মুখ্যতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণী চরিত্র ও বুর্জোয়া চরিত্র।[৫৮] রাজনৈতিক লড়াই যখন গণ-নির্ভর হয়ে উঠেছিল তখনও এর "মূল অংশ এবং নেতৃত্বে এসেছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে।"[৫৯] ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছিল। সৃষ্টি হয়েছিল স্বাধীনতা সম্পর্কে এক ধোঁয়াটে জাতীয়তাবাদী অনুভূতি ও ভাবাদর্শ যা উপলব্ধিই করতে পারেনি "সেই স্বাধীনতা কোন্ রূপ নেবে।" এছাড়াও সৃষ্টি হয়েছিল এক ধরনের ভাববাদ, চিন্তার অস্পষ্টতা ও এক রকমের ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদ।[৬০] উপরন্তু, মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলি "একই সঙ্গে দুই দিকে" তাকাতে। যখন তাদের অধিকাংশই ঔপনিবেশিক অর্থনীতির চাপে নিষ্পেষিত হচ্ছিল তখন এই শ্রেণীর মানুষরা আশা করত নিজেদের সমৃদ্ধি। ফলে, এই নেতৃত্ব "একই সঙ্গে দুই দিকে" তাকাত এবং সংগ্রামের সময় দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ত। বিত্তবান গোষ্ঠী হিসেবে তাদের ভয় ছিল যে সরকারের কাছ থেকে যে-কোন সময় তাদের সম্পত্তির ব্যাপারে বিপদ আসতে পারে, এবং সরকারের পক্ষেও তাই "তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা ও মানসিক শক্তি নষ্ট করে দেওয়া" সহজ ছিল। জাতীয় আন্দোলনের ওপর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আধিপত্যের অর্থ এও ছিল যে এদের নীতি ও ধারণা, এবং যেসব সমস্যা এরা তুলে ধরত তা "অধিকাংশ মানুষের প্রয়োজনের ভাবনার চেয়ে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা" অনেক বেশি প্রভাবিত ছিল।[৬১]

আন্দোলন ও তার নেতৃত্বের সামাজিক ভিত্তি ও সামাজিক চরিত্রের পরিবর্তনের মধ্যে এর উত্তর নিহিত ছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণী আর "জনগণের প্রতিনিধিত্বের দাবি" করতে পারত না। "নূতন এক সংযোগ" ও নূতন এক সম্পর্ক" প্রতিষ্ঠা করা আন্দোলনের পক্ষে তখন অনিবার্য প্রয়োজন ছিল। এর অর্থ ছিল একটাই এবং তা হল জনগণকে সঙ্গে নেওয়া, "কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর

সক্রিয় অংশগ্রহণ"।[৬৩] যে মৌলিক উপায়ে জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বের শ্রেণী চরিত্রে এবং তার সংগ্রাম কৌশল ও সামাজিক গঠনে এইসব পরিবর্তন ঘটানো যেত তা হল শ্রমিক ও কৃষকের মূলগত সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন ও কিষাণ সভাগুলির কংগ্রেসে যৌথ অন্তর্ভুক্তি।[৬৪] এছাড়া কংগ্রেসের প্রয়োজন ছিল এইসব কিষাণ সভা ও ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে উৎসাহ দেওয়া এবং তাদের অর্থ-নৈতিক দাবিকে কেন্দ্র করে দৈনন্দিন লড়াই চালিয়ে যেতে সাহায্য করা।[৬৫]

জনগণের জন্য গান্ধী যে ভূমিকা নির্দেশ করেছিলেন নেহরু বোধহয় তার থেকে আলাদা কোন ভূমিকা খুঁজতে শুরু করেছিলেন। গান্ধী জনগণকে রাজনৈতিক আন্দোলনে নিয়ে এলেও কখনোই তাদের স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করতে বা তা গড়ে তুলতে উৎসাহ বা অনুমতি দেননি, নিজেদের নেতৃত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিতে তাদের উৎসাহ দেওয়ার কথা বাদই দেওয়া যাক। নেহরু এ দুটি কথাই বলেছিলেন। উপরন্তু, নেহরু ধারণা ও ভাবাদর্শের জগৎ থেকে নেমে আসছিলেন রাজনৈতিক লড়াইয়ের পদ্ধতি ও সংগঠনসংক্রান্ত প্রশ্নের ক্ষেত্রে এবং সেই কারণে গান্ধীর চিঠিতে মৃদু উপহাসের উত্তরে ১৯৩৩ সালের ১৪ সেপ্টেম্বরে তিনি লিখেছেন : "আপনি লক্ষ্যকে স্পষ্ট-ভাবে বর্ণনা করার প্রয়োজনের ওপর জোর দিয়েছেন", কিন্তু ঘটনা হোল "এই যে আমরা যদি লক্ষ্যে পেঁছনোর উপায় না জানি ও তাকে কাজে না লাগাই তাহলে লক্ষ্যের স্পষ্টতম সংজ্ঞা ও তার উপলব্ধিও আমাদের সেখানে পেঁছে দিতে পারবে না"।[৬৬]

নেহরু রাজনৈতিক লড়াইয়ের সঙ্গে সামাজিক লড়াইকে মেলানোর ওপর গভীর মনোযোগ দিয়েছিলেন এবং জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্যেরই সংজ্ঞা এইভাবে নূতন করে নিরূপণ করেছিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি জাতীয়তাবাদের মূল ধারা এবং তার মুখ্য নেতা ও মুখপাত্র ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে পুরোপুরি একাত্ম ছিলেন।[৬৬] তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে জাতীয়তাবাদ দেশের প্রবলতম শক্তি।[৬৭] শ্রেণী থেকে আলাদাভাবে, জাতীয় আন্দোলনের নেতা হিসেবে কংগ্রেসের বহু শ্রেণী বিশিষ্ট চরিত্রও তিনি মেনে নিয়েছিলেন।[৬৮] একই সঙ্গে, তিনি সমালোচনা করেছিলেন সামাজিক লড়াইকে পুরোপুরিভাবে রাজনৈতিক লড়াইয়ের অধীন করার বা তার চেয়েও যা খারাপ, জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় সংগ্রামের নামে সামাজিক লড়াইকে আরো অনেক দিন পিছিয়ে দেওয়ার তৎকালীন প্রবল প্রবণতার। তিনি বিশ্বাস করতেন যে এই ভ্রান্ত প্রবণতা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণী-চরিত্র ও বুর্জোয়া চরিত্রের ফল। মধ্যবিত্ত জাতীয়তাবাদের প্রবণতা ছিল "সহজাত ও মূলগত" অভ্যন্তরীণ শ্রেণী সংঘাত উপেক্ষা করার দিকে এবং তার চেষ্টা ছিল "শ্রেণীবিভাগ বা সমাজের 'তৎকালীন অবস্থায়' অস্থিরতা সৃষ্টির ব্যাপারটি এড়িয়ে যাওয়ার।" সাধারণতঃ যে যুক্তি তখন দেওয়া হত তা হল "জাতীয় সমস্যার সমাধান অবশ্যই আগে করতে হবে"।[৬৯] কিন্তু জনগণের

সামাজিক লড়াই যে লড়াইয়ের অন্তর্ভুক্ত নয় সে লড়াই কখনই যথার্থ হতে পারে না।[70]

বস্তুতঃ, ১৯৩৩ সালের অক্টোবরে নেহর্ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, "এশিয়ার অন্তত কিছ্ দেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক ম্ক্তি একসঙ্গে আসবে"।[71] তিনি বলেছিলেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা জর্রি এই কারণেই যে জনগণকে ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাইরে কিছ্ কিছ্ শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থের বোঝা বহন করতে হচ্ছে। "স্তরাং স্বাধীনতা অর্জনের প্রশ্ন...কায়েমী স্বার্থসম্হকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রশ্নে র্পান্তরিত হয়।" পক্ষান্তরে "কোন স্বদেশী সরকার যদি বিদেশী সরকারের জায়গা নেয় এবং সমস্ত কায়েমী স্বার্থকে অক্ষ্ণ্ন রেখে দেয়, তাহলে তাতে স্বাধীনতার ছায়াপাতও হবে না"।[72] স্তরাং, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রত্যক্ষ ও অনিবার্য উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ছিল ভারতের জনগণের শোষণের অবসান। রাজনৈতিক দিক দিয়ে এর অর্থ ছিল বিদেশী শাসনের হাত থেকে স্বাধীনতা; সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এর অনিবার্য অর্থ ছিল "সমস্ত বিশেষ শ্রেণীগত স্বিধা ও কায়েমী স্বার্থের অবসান"।[73]

১৯৩৩ সালের নভেম্বরে 'ইণ্ডিয়ান লেবার জার্নালে' প্রেরিত এক বার্তায় নেহর্ আবারও জোর দিয়ে বলেন যে সামাজিক ও জাতীয় সংগ্রাম উভয়ই হল মৌলিক এবং এর কোনটির ক্ষেত্রেই আপস করা চলবে না।[74] একই সঙ্গে তিনি শ্রমজীবী শ্রেণীর কাছে আবেদন রেখেছিলেন যেন তাঁরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে তাঁদের যথাযথ ভ্মিকা পালন করেন। শ্রমজীবীদের একতাবদ্ধ ও স্সংগঠিত হতে হবে, সমাজতান্ত্রিক কর্মস্চী অভিম্খী "সঠিক মতাদর্শ" অর্জন ও গঠন করতে হবে, এবং জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে একযোগে তাঁদের রাজনৈতিকভাবে কাজ করতে হবে আন্দোলনকে "শ্রমজীবীদের অন্ক্লে লাগানোর উদ্দেশ্যে"।[75] ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বরে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণে তিনি শ্রমিকদের আশ্বস্ত করেছিলেন যে তাঁরা যদি তাঁদের নিজেদের সামাজিক লড়াই ছাড়াও জাতীয় সংগ্রামে প্রোপ্রিভাবে অংশগ্রহণ করেন তাহলে তাঁরা শ্ধ্ "ভারতের রাজনৈতিক ম্ক্তিই নয়, সামাজিক ম্ক্তিও" সম্ভব করতে পারবেন।[76]

১৯৩৪-৩৫ এর বছরগ্লিতে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃবর্গের থেকে নেহর্র কিছ্টা বিচ্ছিন্নতাও লক্ষ্য করা গিয়েছিল এবং তার ফলে কংগ্রেসের ভেতরে তাঁদের বির্দ্ধে রাজনৈতিক লড়াইয়ের দিকে হয়ত একটা প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবেও তা দেখা দিতে পারত। ১৯৩৪ সালের ১৩ আগস্ট গান্ধীকে লেখা চিঠিতে নেহর্ ক্ষ্ব্ধ স্রে কংগ্রেসের মধ্যে স্বিধাবাদীদের জয়ের কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং অংশতঃ দায়ী করেছিলেন ওয়ার্কিং কমিটিকে যাঁরা "আমাদের আদর্শ ও লক্ষ্যের সংজ্ঞার স্পষ্টতায় ইচ্ছাকৃতভাবে উৎসাহ দিয়েছেন"।[77] ওয়ার্কিং কমিটির প্রতি তিনি ক্ষ্ব্ধ ছিলেন বিশেষতঃ এই কারণে যে কমিটি ১৯৩৩ সালের ১৮ জ্ন এক প্রস্তাব পাস করেছিল যাতে সমাজতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রীদের পরোক্ষভাবে নিন্দা করা হয়েছিল, "শ্রেণীয্দ্ধ অবশ্যম্ভাবী" করে তোলার এবং "ব্যক্তিগত সম্পত্তি

বাজেয়াপ্ত করার” চেষ্টা চালানোর অভিযোগ আনা হয়েছিল। কারাগারে বসে প্রস্তাবটি পড়ে ১৯৩৪ সালের ২০ জ‍ুন তিনি তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন: “চুলোয় যাক ওয়ার্কিং কমিটি—যেসব বিষয় বোঝেনা—‘অথবা হয়তো খ‍ুব বেশি বোঝে’—তাই নিয়ে ভণ্ডামি ভরা আর নির্বোধ প্রস্তাব পাস করেছে!”[78] আগস্ট মাসে তিনি গান্ধীর কাছে অভিযোগ করেছিলেন, “ওয়ার্কিং কমিটি বিষয়টি সম্পর্কে কিছ‍ু জান‍ুক আর না জান‍ুক, সমাজতন্ত্রের সমর্থকদের ওপর দোষারোপ করতে এবং তাদের দলচ্যুত করতে তারা প‍ুরোপ‍ুরি তৎপর”।[79] প্রস্তাবটি “সমাজতন্ত্রের ম‍ূল বিষয়গ‍ুলি সম্পর্কে বিস্ময়কর অজ্ঞতা”র সাক্ষ্য বহন করছে। তিনি কঠোর ভাষায় লিখেছিলেন, “কমিটির বোধহয় অদম্য ইচ্ছা ছিল বিভিন্ন কায়েমী স্বার্থকে যেভাবেই হোক আশ্বস্ত করা, এমন কি আবোল তাবোল বকার ঝ‍ুঁকি নিয়েও।” এবং তারপর তিনি তীক্ষ‍্নধার ছ‍ুরির মত নিদার‍ুণ শ্লেষে বললেন: “...প্রায়শঃই কোন কোন মান‍ুষের পকেটে হাত দেওয়ার বদলে কিছ‍ু কিছ‍ু মান‍ুষকে গভীর মর্মপীড়া দেওয়াই এদের পছন্দ। হৃদয়, ব‍ুদ্ধি, দেহ ও মানবিক ন্যায় ও মর্যাদার তুলনায় পকেট নিঃসন্দেহে বেশি ম‍ূল্যবান এবং প্রিয়তর।”[80] ওই চিঠির প্রায় সমসময়ে লেখা এক টীকায় তিনি এই ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন যে উক্ত প্রস্তাবের লক্ষ্য ছিল তাঁকে ও অন্যান্য সমাজবাদীদের কংগ্রেসের বাইরে রাখা। উপরন্তু, “কংগ্রেসকে কেউ সমাজবাদী না বললেও”, তারা তখন “এই ব্যাপারে আর নিরপেক্ষ নয়। কংগ্রেস সক্রিয়ভাবে সমাজবাদ-বিরোধী এবং গত পনেরো বছরের তুলনায় রাজনৈতিক দিক দিয়ে আরো পশ্চাৎপদ”। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা নিষ্পাপ প্রতিক্রিয়াশীল ছিল না। তারা প্রস্তাবটি পাস করেছিল “সংসদীয় পর্ষদ বা তার নেতাদের প্ররোচনায়, যারা অর্থবান ব্যক্তিদের নিরাপদ সপক্ষতা করতে চায়”।[81]

এমনকি গান্ধীর সঙ্গেও তাঁর এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা বেড়ে চলছিল। এই বিচ্ছিন্নতার পর্যায় শ‍ুর‍ু হয়েছিল ১৯৩৩ সালে জেলে। ৪ জ‍ুন তিনি ডায়েরিতে লিখেছিলেন: “তাঁর প্রতি আমার প্রবল আবেগময় অন‍ুরাগ সত্ত্বেও হয়ত মানসিক দিক দিয়ে আমি ক্রমশঃ তাঁর কাছ থেকে দ‍ূরে সরে যাচ্ছি।” তিনি “লেনিন অ্যান্ড কোং”-এর সঙ্গে গান্ধীর তুলনা করেছিলেন এবং সে তুলনা গান্ধীর পক্ষে অন‍ুক‍ূল হয়নি। নেহর‍ু লিখেছিলেন: “যতই আমি লেনিনদের দ্বন্দ্ববাদের প্রতি বেশি করে আকর্ষণ বোধ করছি এবং ততই আরো বেশি করে উপলব্ধি করছি বাপ‍ুর সঙ্গে আমার ব্যবধান...।” গান্ধী “বর্তমান সমাজব্যবস্থা” মেনে নিয়েছিলেন। আরো খারাপ ব্যাপার হল তিনি “এই ব্যবস্থার স্তম্ভ স্বর‍ূপ স‍ুবিধাভোগী ব্যক্তিদের দ্বারা নিজেকে পরিব‍ৃত রাখেন” এবং তাঁরা নিঃসন্দেহে, কিঞ্চিৎ তিক্ততা মিশ্রিত ভাষায় নেহর‍ু লিখেছিলেন, “আমাদের আন্দোলন থেকে এবং যে-কোন সাংবিধানিক পরিবর্তন ঘট‍ুক না কেন তার থেকে, উভয় দিক থেকেই ম‍ুনাফা ল‍ুটবেন এবং স‍ুবিধা নেবেন।” নিজের দিক দিয়ে নেহর‍ু প‍ুরোপ‍ুরি স্পষ্ট ছিলেন: “এই গোষ্ঠী থেকে আমি সম্প‍ূর্ণভাবে

বেরিয়ে আসতে চাই।" তবে তিনি এও জানতেন যে সেটা খুব সহজ হবে না। "আমি ব্যক্তিগত ভাবে জানি যে ভবিষ্যতে অসুবিধে ভোগ করতেই হবে। প্রতিদ্বন্দ্বী অনুগতদের মধ্যে আমাকে একটা কঠিন লড়াই করতে হবে।" তিনি জানতেন বেছে নেওয়ার কাজটা সহজ হবে না, এবং তাই তিনি লিখলেন: "সম্ভবত আমার পক্ষে সবচেয়ে সুখের জায়গা হোল জেল! বাইরে বেরোনর আরো তিন মাস বাকি এবং ইচ্ছে করলেই ফিরে আসা যায়।"[৮৩]

কয়েক সপ্তাহ পরে ভাইসরয়ের সঙ্গে গান্ধীর আলাপ-আলোচনার প্রয়াস তাঁকে আরো ক্ষুব্ধ করে তুলল। ২৪ জুলাই তিনি ডায়েরিতে লিখলেন: "আমি ক্রমশঃ নিশ্চিত হয়ে উঠছি যে বাপু এবং আমার মধ্যে আর কোন রাজনৈতিক সহযোগ থাকতে পারে না। অন্তত এতদিন যেমন ছিল সেরকম তো নয়ই। আমাদের বরং নিজের নিজের পথে চলাই ভাল।"[৮৪]

১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাসে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘটনায় নেহরুর মনে তীব্র আবেগপূর্ণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল এবং প্রত্যাহারের পক্ষে গান্ধী যে যুক্তি পেশ করেছিলেন সে কারণে প্রতিক্রিয়া হল আরো বেশি। ১৯৩৪ সালের ১২ মে তিনি ডায়েরিতে লিখলেন: "বাপু যদি এভাবে কাজ করেন আর মানুষকে এভাবে বিপদের মধ্যে অসহায়ভাবে ঠেলে দেন তাহলে তাঁর সঙ্গে কাজ করা যাবে কিভাবে?"[৮৪] এর আগে ১৩ এপ্রিল তিনি লিখেছিলেন: "শুধু আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামেই নয়, আমার ব্যক্তিগত জীবনেও এটা এক যুগান্তরের সূচনা। পনেরো বছর পর আমি নিজের পথে চলছি। হয়তো এক নিঃসঙ্গ পথ, বেশি দূর হয়ত যায়নি।"[৮৫] কিছুটা মর্মবেদনার সঙ্গে, কিছুটা উষ্মার সঙ্গে গান্ধীকে তিনি লিখলেন: "আমার এক আকস্মিক ও তীব্র অনুভূতি হল আমার ভেতরে কিছু একটা ভেঙে গেল, একটা বন্ধন যাকে আমি খুব বেশি দাম দিয়েছিলাম তা ছিঁড়ে গেল।...প্রায় শৈশব থেকেই আমি বরাবর কিছুটা নিঃসঙ্গ ছিলাম...কিন্তু এখন আমি একেবারেই একা বোধ করলাম, যেন এক নির্জন দ্বীপে পরিত্যক্ত।"[৮৬] এক অপ্রকাশিত নোটে তিনি তাঁর মোহভঙ্গের কথা এবং গান্ধীর সঙ্গে প্রায় বিচ্ছেদের অনুভূতি অকপটে প্রকাশ করেছিলেন। "বাপু ও অন্যান্য যাঁরা আজ কংগ্রেসের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁদের এবং আমার মধ্যে কোন মতৈক্যের স্থান বলতে গেলে নেইই। আমাদের উদ্দেশ্য আলাদা, আমাদের আত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা, এবং আমাদের পদ্ধতিও সম্ভবত আলাদা হবে।...তীব্র মর্মবেদনার সঙ্গে আমি অনুভব করেছি, যে আনুগত্যের বন্ধন আমাকে অনেক বছর ধরে তাঁর সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল তা ছিঁড়ে গেছে।" গান্ধীর "রাজনীতি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে মনোযোগ," তাঁর "ব্যক্তিগত ও স্ব-সৃষ্ট জটিলতা," এবং তাঁর "লড়াইয়ের মাঝপথে সহকর্মীদের পরিত্যাগ করার (যে কারণেই হোক)" বিরুদ্ধে নেহরু অভিযোগ করেছিলেন। যাই ঘটে যাক না কেন, "যে কাজের দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে তার প্রতি এবং নিজের সহকর্মীদের প্রতি আনুগত্য বলে একটা জিনিস"

আছে, "এবং এটা খ‍ুবই দ‍ুঃখের ব্যাপার যে বাপ‍ু সেটাকে খ‍ুব বেশি ম‍ূল্য দেন নি"।[৪৭]

এটাও লক্ষণীয় যে ১৯৩৪-৩৫ সালে রচিত এবং ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত "আত্মজীবনী"র বেশ কয়েকটি অধ্যায় হলো গান্ধীর বির‍ুদ্ধে ভাবাদর্শগত সওয়াল, যদিও তাতে ছিল ম‍ৃদ‍ু, বন্ধ‍ুত্বপ‍ূর্ণ এমনকি সশ্রদ্ধ স‍ুর। সম্ভবত ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে এক ন‍ূতন ভাবাদর্শগত র‍ূপ দেওয়ার চেষ্টা ছিল।

ফলে ১৯৩৬ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে মনে হয়েছিল নেহর‍ু গান্ধীবাদী নেতৃত্বের এক বামপন্থী রাজনৈতিক বিকল্প গড়ে তুলছেন—এমন এক বিকল্প যা সমস্ত মৌলিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ কর্মস‍ূচি ও মতাদর্শ, আন্দোলন ও তার নেতৃত্বের সামাজিক চরিত্র, এবং তার সংগ্রাম কৌশলের ক্ষেত্রে গান্ধীবাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ। উপরন্তু, তিনি এক উদার সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে শ‍ুর‍ু করছিলেন যে গোষ্ঠী তখনও শিথিল ও দ‍ৃঢ় নয়, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বকে ঘিরে তা র‍ূপলাভ করছিল। নেহর‍ু তাঁর ন‍ূতন পথকে ডায়েরি বা ওয়ার্কিং কমিটিতে আলোচনার মধ্যেও সীমাবদ্ধ রাখেন নি। ইংরেজি ও হিন্দী দ‍ুই ভাষাতেই সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্রে তিনি বিস্তৃতভাবে লিখতে লাগলেন। তাঁর রচনা অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় ব্যাপকভাবে অন‍ূদিত হল এবং অধিকাংশ সময়ই গ্রন্থ বা প‍ুস্তিকা র‍ূপে প্রকাশিত হতে লাগল। প্রায় রোজই তিনি সংবাদপত্রে বিব‍ৃতি দিতে লাগলেন। ১৯৩৬ সালের গোড়ায় ইউরোপ থেকে ফিরে তিনি দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিপ‍ুল সংখ্যক শ্রোতার সামনে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন এবং সর্বত্র ছাত্র ও য‍ুবকদের নিজের প্রতি আকৃষ্ট করলেন। ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচনের পর তিনি জনমানস গঠনের ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ওপর প্রভাব বিস্তার করার আরো বড়ো স‍ুযোগ পেলেন।

৩

নেহর‍ুর ন‍ূতন মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক পথ, বিশেষ করে কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে এ ব্যাপারে তাঁর স্পষ্ট উক্তি ভারতীয় প‍ুঁজিপতি শ্রেণীকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। এক দিকে এই শ্রেণীর প্রভাবশালী ও দ‍ূরদর্শী কংগ্রেসপন্থী নেতারা নেহর‍ুকে সংযত ও সীমার মধ্যে রাখার জন্য নিরাপত্তাম‍ূলক ব্যবস্থা নিতে শ‍ুর‍ু করলেন, আর অন্যদিকে অধিকতর রক্ষণশীল ও কংগ্রেস-বিরোধী গোষ্ঠীগ‍ুলো সরাসরি আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিল। বোম্বাইয়ের ইনডিয়ান মার্চেন্টস চেম্বারের সহ-সভাপতি এ ডি শ্রফ ১৯৩৪ সালের ২৮ এপ্রিল তারিখে আক্রমণ শ‍ুর‍ু করলেন।[৪৪] তিন সপ্তাহ পরে ১৮ মে তারিখে বোম্বের একুশ জন প্রথম সারির ব্যবসায়ী সংবাদপত্রের ভাষায়,

"জওহরলাল নেহরুর বিরুদ্ধে বোম্বে ইস্তাহার প্রকাশ করলেন"।[৪৭] এরপর স্বাক্ষরকারীদের কয়েকজনের ব্যক্তিগত বিবৃতি প্রকাশিত হলো পরপর : আবারও ২০ মে'র 'টাইমস অব ইনডিয়ায়' এ ডি শ্রফ, ২৩ মে'র 'টাইমস অব ইনডিয়ায়' চিমনলাল শীতলবাদ, ২৯ মে'র 'টাইমস অব ইনডিয়ায়' কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর এবং ১১ জুন, ১৯৩৬ এর 'টাইমস অব ইনডিয়ায়' হোমি মোদির এসব বিবৃতি সংবাদপত্রে পূর্ণ প্রচার লাভ করেছিল এবং প্রায়ই সেগুলি বিস্তৃতভাবে বা সম্পূর্ণভাবে পুনঃপ্রকাশিত হত। একুশজন প্রথম সারির ব্যবসায়ীর সমালোচনার আসল ধুয়া ছিল এই :

নেহরু এইরকম একটা ধারণা ছড়াচ্ছেন যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নীতিহীন এবং তাই রাষ্ট্রের কাছ থেকে তা নিরাপত্তা পাওয়ার যোগ্য নয়। এইভাবে তিনি ওকালতি করছেন ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ-সাধনের "ধ্বংসাত্মক ও সর্বনাশা কর্মসূচির" এবং তার ফলে "শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রথাটিকেই নয়, শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মাচরণ এবং এমনকি ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকেও" বিপন্ন করছেন। তাঁর লক্ষ্নৌ ভাষণে এই অভিযোগটি স্পষ্টভাবে সমর্থিত হয়েছিল। সেখানে তিনি সমাজতন্ত্রের পক্ষ সমর্থন করে ভাষণ দিয়েছিলেন এবং সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মুনাফা ব্যবস্থার অবসান হিসেবে। উপরন্তু, তিনি সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর ধারণাকে ব্যাখ্যা করেছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘটনাবলীকে "নব সভ্যতার" উদ্বোধন হিসেবে বর্ণনা করে। এইভাবে তিনি "বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধনের" পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন। এইসব ধারণা বিশেষভাবে বিপজ্জনক এই কারণে যে "দেশের বর্তমান অবস্থায় এবং ব্যাপক অর্থনৈতিক দুর্দশায় সেগুলি বিচার বিবেচনাহীন হলেও হয়তো সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন লাভ করবে"। যে সব মতবাদ "পরিণামে বিশৃংখলার" দিকে চালিত করে তার দ্বারা জনগণ হয়তো ভুল পথে চালিত হবে। জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতিতে পুঁজিপতিরা এযাবৎ একটা বড়ো ভূমিকা পালন করেছে, কিন্তু নেহরুর কার্যকলাপ হয়তো দেশকে ভাগ করে ফেলবে এবং তার ফলে স্বশাসন লাভ ব্যাহত হবে।[৫০]

নেহরু 'সমাজতন্ত্র' সম্পর্কে সমকালীন ফেবিয়ান, লেবার পার্টি ও সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক সংজ্ঞা বর্জন করে সুস্পষ্ট মার্ক্সবাদী সংজ্ঞা গ্রহণ করার ফলে সমালোচকরা ব্যক্তিগত ভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। চিমনলাল শীতলবাদের ভাষায় : "তিনি তাঁর বিশ্বাসকে সমাজতন্ত্র নামে অভিহিত করলেও প্রকৃতপক্ষে তা রাশিয়ান ছাঁচের কমিউনিজম ও বলশেভিজম"। চিমনলাল বললেন, ভারতে বেশির ভাগ মানুষ, নিঃসন্দেহে "সমাজতন্ত্রকে স্বাগত জানাবে, কারণ পশ্চিম ইয়োরোপের কিছু দেশ তা উপলব্ধি ও প্রয়োগ করেছে"। বস্তুতঃ, নেহরুর সমালোচকদের অনেকেই সমাজতন্ত্রের সমর্থক বলে দাবি করেছিলেন অবশ্য সমাজতন্ত্র বলতে যদি "শ্রম ও পুঁজির মধ্যে মুনাফার আরো ন্যায্য বণ্টন,

সবার জন্য এক যুক্তিসঙ্গত ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান অর্জন, এবং এমনকি বিশেষ পরিস্থিতি ও অবস্থায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের জাতীয়করণ বোঝায়।[৭১] একই ভাবে কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর জোর দিয়ে বলেছিলেন যে নেহরু ছিলেন "একজন মনেপ্রাণে কমিউনিস্ট" এবং "সমাজতন্ত্র আখ্যা দিয়ে তাঁর প্রচারের ওপর একটা ধূম্রাবরণ" সৃষ্টি করেছেন। বস্তুত তিনি ছিলেন "ভারতের কমিউনিস্ট চিন্তাশীল গোষ্ঠীর নেতা"। বিতর্কের আসল বিষয় হল, তিনি বলেছিলেন, "সোভিয়েত ছাঁচের সরকার ভারতের পক্ষে সর্বোত্তম কিনা"।[৭২] এবং হোমি মোদি সতর্ক করে দিয়েছিলেন : "তাঁর উদ্দেশ্য স্পষ্ট এবং কর্মসূচি পুরোপুরি স্বার্থহীন। প্রথমে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং তারপর একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যেখানে কায়েমী স্বার্থ, সম্পত্তির অধিকার ও মুনাফার মতলবের কোন যায়গা থাকবে না। যাঁদের মন ছুটছে মধ্যবর্তী পর্যায় ও মনোরম বিরাম-স্থানের দিকে তাঁরা যেন ভুলে না যান যে তাঁরা আসলে মস্কো পর্যন্ত টানা টিকিট কেটেছেন।"[৭৩] এ. ডি. শ্রফ তাঁর সমালোচনা করেছিলেন 'শ্রেণী বিদ্বেষ' ও 'শ্রেণী যুদ্ধ' লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগে এবং কংগ্রেসকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে আন্দোলনের প্রাথমিক রাজনৈতিক কাজ যেহেতু 'রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করা'' সেহেতু তাদের উচিত হবে না "সেই পূর্ণ ঐক্য" বিঘ্নিত করা কারণ ব্রিটিশের কাছ থেকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য এর প্রয়োজন আছে। লক্ষ্নৌতে নেহরু যে ধরণের ঘোষণা করেছিলেন তা অনেক ভাবেও দেশের স্বার্থের ক্ষতি করতে পারতো। "শিল্পোদ্যোগ ব্যাহত করার এবং ভারত থেকে পুঁজি নিষ্ক্রমণে উৎসাহ দিতে" তা সাহায্য করতে পারতো।[৭৪] হোমি মোদি আরেকটি দিক সম্পর্কে নেহরুর সামনে সত্যের দর্পণ তুলে ধরেন। তিনি বলেছিলেন, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে নেহরুর চিন্তাধারা ও সংজ্ঞা এবং হিংসার প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা ও শান্তিপূর্ণ অহিংস পদ্ধতির প্রতি তাঁর অঙ্গীকারের মধ্যে একটা বড়ো বিরোধ রয়েছে। নেহরু যখন বলেছিলেন যে "হিংসাত্মক ও সর্বনাশা পরিবর্তন ছাড়াই" তাঁর ধারণাগুলির রূপায়ণ সম্ভব তখন তিনি "বিশ্বাস-প্রবণ" হয়ে পড়েছিলেন। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, 'কোন্ যুগে এবং কোন্ দেশে শান্তিপূর্ণ ও রক্তপাতহীন বিপ্লবের দ্বারা সমাজের এমন মৌল পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে ?"[৭৫]

নেহরুর চিন্তাধারার কথা শোনা যাচ্ছিল কিছুদিন ধরেই এবং সাধারণত তা উপেক্ষা করাই হচ্ছিল। কিন্তু কংগ্রেস সভাপতির উঁচু পদ পেয়েও তাঁর সুর নরম হবে না এটা খানিকটা অপ্রত্যাশিত ছিল।[৭৬] আরো খারাপ ব্যাপার হল, এসব বক্তব্য নিছক কোন ব্যক্তিগত মত আর ছিল না, বরং সেগুলি তখন ছিল দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী সংগঠনের সভাপতির অভিমত। নিজের ধ্যানধারণা আরো ব্যাপকভাবে প্রচার করার জন্য, "কংগ্রেসকে বামপন্থার দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য", জাতীয় আন্দোলনের ওপর বুর্জোয়া মতাদর্শের দীর্ঘকাল-প্রতিষ্ঠিত প্রাধান্য নষ্ট করার জন্য, এবং সাধারণভাবে গান্ধীর বামপন্থী বিপ্লবকে

শক্তিশালী করার জন্য নিজের মর্যাদা ও উচ্চপদের প্রতিপত্তিকে তিনি কাজে লাগাবেন এ সম্ভাবনা খুব বেশিই ছিল।[97] এপর্যন্ত সান্ত্বনা ছিল একটাই, কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তাঁকে সমর্থন করেনি। কিন্তু এ অবস্থা বেশি দিন নাও স্থায়ী হতে পারতো। চিমনলাল শীতলবাদ সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, "কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠী শক্তিশালী হচ্ছে, সুবিধা পাচ্ছে, এবং এও হতে পারে যে পন্ডিতের জোরালো ওকালতির ফলে তারা অকল্পনীয় দ্রুত সময়ে কংগ্রেসকে অধিকার করে ফেলবে।"[98]

এসব স্পষ্টভাষী ও কঠোর সমালোচকরা অবশ্য বোম্বাইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন এবং এঁরা প্রধানতঃ পুঁজিবাদী শ্রেণীর ঐতিহ্যগতভাবে উদারপন্থী বা রাজভক্ত এবং কংগ্রেসী-বিরোধী গোষ্ঠীগুলোর প্রতিনিধিত্ব করতেন। তাঁদের কেউ কেউ শুধু যে নেহরুর প্রগতিশীলতার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করেছিলেন তাই নয়, প্রতিবাদ করেছিলেন অসহযোগ আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলনের মত জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের বিরুদ্ধেও।[99] উক্ত একুশ জন স্বাক্ষরকারীর জীবনের বিশ্লেষণ করে নেহরু দেখিয়েছিলেন যে তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন হয় উদারপন্থী বা রাজভক্ত, তাঁরা যুক্ত ছিলেন টাটা পরিবার বা বিদেশী পুঁজির সঙ্গে অথবা তাঁরা ছিলেন একেবারেই নগণ্য ব্যক্তি।[100] উপরন্তু, দেশের বাকি অংশের অথবা এমনকি বোম্বেরও অন্যান্য পুঁজিপতিরা তাঁদের বলতে গেলে একেবারেই সমর্থন করেননি। পক্ষান্তরে, অনেকে তাঁদের বিরোধিতাই করেছিলেন। নিচে চতুর্থ পরিচ্ছেদে এ ব্যাপারে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। 'বোম্বে একবিংশতি'র বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন বিতর্কে নেহরু এই উভয় ঘটনারই সদ্ব্যবহার করেছিলেন।

এই একুশ জনের মধ্যে দলছুট ছিলেন পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস। ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের ফলে বাধ্য হয়ে তিনি ইস্তাহারে সই করেছিলেন বটে, কিন্তু পরের পরিচ্ছেদে আমরা দেখবো যে, পুঁজিপতি শ্রেণীর বৃহত্তর ও অপেক্ষাকৃত সংযত অংশের সঙ্গে তাঁর মতৈক্য ছিল বেশি।

৪

ভারতীয় পুঁজিপতিদের মধ্যে অধিকতর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও কংগ্রেস সমর্থকরা হয়তো নেহরুকে নিয়ে কম চিন্তিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁরা তাকে সংশোধন করার বা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর ক্ষমতা খর্ব করার পথে যাননি। জি. ডি. বিড়লা, পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস ও ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদের মধ্যে ১৯৩৬ সালের এপ্রিল থেকে জুন মাসের ভেতরে যেসব পত্র বিনিময় হয়েছিল তাতে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত।[101] এই বক্তব্য প্রধানত রচনা করেছিলেন জি. ডি. বিড়লা

যিনি ছিলেন পুঁজিপতি শ্রেণীর তীক্ষ্মধী রাজনৈতিক নেতা ও পরামর্শদাতা এবং যাঁর রাজনৈতিক সূক্ষ্মবুদ্ধি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল প্রতিভার পরিচায়ক। তবে এটা লক্ষণীয় যে এই শ্রেণীর অন্যান্যরা তাঁর নেতৃত্ব স্বেচ্ছায় অনুসরণ করেছিলেন। নেহরু সমস্যা সমাধানে বিড়লা ও পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর দাসের প্রয়াস ছিল বহুমুখী।

প্রথমতঃ, নেহরুর সাধারণ মতাদর্শগত ঝোঁক বা সমাজতন্ত্রের পক্ষে তাঁর প্রচার নিয়ে তাঁরা তখনই খুব বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন না। সরকারি পদ গ্রহণের বিরুদ্ধে আপসহীন মনোভাব অবলম্বন করে ১৯৩৫ সালের আইন তৈরির বিরুদ্ধে নেহরু যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন তাঁদের প্রধান দুশ্চিন্তা ছিল তাই নিয়ে। পক্ষান্তরে পুঁজিপতিরা আগ্রহী ছিলেন ১৯৩০-৩৪ সালের আইন অমান্য আন্দোলন ও তৎপ্রসূত সংবিধান সংক্রান্ত মীমাংসা-আলোচনার ফল আত্মসাৎ করতে এবং সেই কারণেই সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে। ব্রিটিশ কর্মকর্তা ও কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে সৌহার্দ্য গড়ে তোলার জন্য বিড়লা বিগত দুই বছর ধরে ভারত ও ইংলন্ড দুই দেশেই নেপথ্যে থেকে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন।[103] কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে নেহরু এইসব প্রচেষ্টা নিষ্ফল করে দিতে এবং সমগ্র চা-আ-চা কৌশলের ক্রিয়া ব্যর্থ করে দিতে পারতেন।[104] সরকারি পদ প্রত্যাখানের পরিণাম হতো সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সংঘাত এবং জাতীয়তাবাদের মূল নীতি চা-আ-চা'র অবৈপ্লবিক নীতিতে রূপান্তরের পক্ষে তা সহায়ক হতে পারত। সুতরাং এটাই ছিল মূল সমস্যা, তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু এবং এ ব্যাপারে নেহরুকে অবশ্যই ঠেকানো দরকার ছিল। সেই সময় আর সব কিছুই ছিল গৌণ সমস্যা এবং সেগুলিকে পরে সমাধানের জন্য মুলতুবী রাখা যেত।[105]

পুরুষোত্তমদাসের ১৮ এপ্রিলের চিঠি এবং বিড়লার ২০ এপ্রিলের চিঠির নেপথ্যে তথ্য থেকে জানা যায় যে কংগ্রেসের সরকারে অংশগ্রহণ প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত যাতে লক্ষ্ণৌতে নেহরু গ্রহণ না করেন গান্ধী সেটা দেখবেন বলে বিড়লাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন। সেই কারণে লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের কার্য-বিবরণীর উল্লেখ করে পুরুষোত্তম দাস বিড়লাকে প্রশ্ন করেছিলেন "মহাত্মা এবং আপনার প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে বলে আপনি মনে করেন কিনা", আর বিড়লা জবাব দিয়েছিলেন যে "যা ঘটেছে তাতে" তিনি 'পুরোপুরি সন্তুষ্ট।" বিড়লা বললেন, "মহাত্মাজী তাঁর কথা রেখেছেন, এবং একটি শব্দও উচ্চারণ না করে তিনি দেখেছেন যে 'কোন নূতন সিদ্ধান্ত যাতে গৃহীত না হয়'।"[106] শেষ কথাটি স্পষ্টতই সরকারি পদ গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের কথা এবং সম্ভবত ট্রেড ইউনিয়ন ও কিষাণ সভাগুলির কংগ্রেসে সরাসরি অন্তর্ভুক্তির প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল। বিড়লার সন্তোষ প্রকাশ সম্পূর্ণ যথার্থ ছিল। কারণ, কংগ্রেস যখন একবার সরকারে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া স্থগিত রাখল এবং সরকারি পদ প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত নিতে অস্বীকার করল, তার মানেই মন্ত্রিত্ব

গ্রহণের পন্থাবলম্বীরা লড়াইয়ের অর্ধেকটাই জিতে গেল।[106] এই পরিস্থিতিতে মূল প্রশ্ন হল সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ভবিষ্যতে যে কোন রকম সংঘাত এড়ানো, এবং নেহরুও এই বিষয়টি মেনে নিয়েছিলেন। তিনি "তাঁর ভাষণে স্বীকার করেছিলেন…যে নিকট ভবিষ্যতে আর কোন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সম্ভাবনা নেই।[107]

একটি সংশ্লিষ্ট সমস্যা ছিল কংগ্রেস সংগঠন ও দলীয় ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ। আর যাই হোক, সভাপতির পদ হল নেতৃত্বের স্তর বিন্যাসের মধ্যে মাত্র একটি পদ। এক্ষেত্রেও সন্তোষের যথার্থ কারণ ছিল। নূতন ওয়ার্কিং কমিটির ১৪ জন সদস্যের মধ্যে ১০ জনই ছিলেন দক্ষিণপন্থী। অথবা বিড়লার ভাষায়, নেহরুর ওয়ার্কিং কমিটিতে "ছিল 'মহাত্মাজীর দলের' বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা।" নূতন ওয়ার্কিং কমিটিতে রাজাজীর অন্তর্ভুক্তি বিড়লার কাছে বিশেষ আনন্দের ব্যাপার ছিল। নূতন বিধানসভাগুলির নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিও অত্যন্ত জরুরী ছিল। সেখানে সঠিক লোকজন থাকলে সরকারে অংশ গ্রহণের ব্যাপারটি আর সুদূর পরাহত থাকবে না। এই দিক দিয়েও ভবিষ্যৎ ছিল খুবই আশাপ্রদ: "যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তা নিয়ন্ত্রণ করবেন 'বল্লভভাই গোষ্ঠী'"।[108]

সুতরাং বিড়লা নিশ্চিত ছিলেন যে রাজনৈতিক ঘটনাবলী "সঠিক পথেই এগোচ্ছে।" তাই তিনি উপসংহারে বলেছিলেন যে, শুধু লর্ড লিনলিথগো যদি পরিস্থিতি ঠিকমত সামলাতে পারেন, তাহলে "কংগ্রেস সদস্যদের সরকারে অংশগ্রহণের সম্ভাবনা যথেষ্টই রয়েছে।"[109] পুরুষোত্তমদাস এই সানন্দ বিশ্লেষণের সঙ্গে একমত ছিলেন।[110]

দ্বিতীয়তঃ, বিড়লার সুস্পষ্ট অভিমত ছিল এই যে সমাজবাদী প্রবণতার বিরুদ্ধে সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হওয়া চলবে না—এবং পুঁজিপতিরা নিজেরা অবশ্যই সে লড়াইয়ে নামবেন না! তা হবে ভুল জায়গায় দাঁড়িয়ে লড়াই করা এবং তার ফলে পরাজয় ডেকে আনা। যারা তা করবে তারা তাঁদের শ্রেণী মিত্র নয়, শ্রেণী শত্রু। ফলে, নেহরুর বিরুদ্ধে বোম্বাই ইস্তাহারে স্বাক্ষরকারীদের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিলেন। ১৯৩৬ সালের ২৬ মে তারিখে ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদকে লেখা এক চিঠিতে তিনি ইস্তাহারে সই করা নিয়ে তাঁর (হীরাচাঁদের) বুদ্ধিমত্তার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করে মন্তব্য করেছিলেন যে এই কাজ "পুঁজিবাদ-বিরোধিতা আরো বাড়িয়ে তোলার পথে সহায়ক" হয়েছে। ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদকে তিনি ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন: "আপনি আপনার নিজের শ্রেণীর জন্য কোন কাজ করেননি।"[111] বস্তুত, "আপনাদের ইস্তাহার পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চরম ক্ষতি করেছে। এই বিষয়ে বিড়লার ক্ষোভ আরো সংযত কিন্তু একই রকম দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছিল তাঁর চেয়ে বয়স ও প্রতিষ্ঠায় বড় পুরুষোত্তম ঠাকুরদাসকে লেখার সময়। তিনি "দলের মধ্যে আপনার নাম দেখে বেদনা মিশ্রিত বিষ্ময় বোধ" করেছিলেন।

ইস্তাহারটির "সাংঘাতিকভাবে ভুল ব্যাখ্যা হওয়ার সম্ভাবনা" ছিল। স্পষ্টতই সৌজন্যের সঙ্গে তাঁর পুঁজিবাদী বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিটিকে তিরস্কার করে বিড়লা লিখেছিলেন "আপনি যে এর ভেতরের বিষয়গুলি খুঁটিয়ে দেখেননি সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এটা আপনার স্বভাববিরুদ্ধ কাজ। ইস্তাহারটি পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় শক্তিগুলিকে অনুপ্রাণিত করেছে—এই পরিণতিও নিশ্চয়ই আপনি চাননি।"[113] অন্যভাবে বলতে গেলে, পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাসের মত দূরদর্শী নেতা পথ ভ্রষ্ট হয়েছিলেন।

বিড়লা বিশ্বাস করতেন যে কংগ্রেসের বামপন্থীদের বিরুদ্ধে সফল যুদ্ধ-ঘোষণা করার সঠিক পথ হল অন্যদের 'মাধ্যমে' লড়াই করা। এই অর্থ হল কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণপন্থীদের শক্তিশালী করা। ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদকে তিনি বলেছিলেন, "আমরা সবাই সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে", কিন্তু প্রশ্ন হল একথা প্রকাশ্যে বলার মত বুকের পাটা কার আছে। নিঃসন্দেহে বিত্তবানদের নেই। "দেশের ব্যাপকতর স্বার্থে আমি কারও স্বত্ব কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে একথা বলা কোন বিত্তবান ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত অভব্য।" যাই হোক না কেন, কোন বিত্তবান ব্যক্তি স্বত্ব-দখলের বিরোধিতা করতে বাধ্য। স্বত্ব-দখল সত্যিই সমাজের উচ্চতর স্বার্থের বিরোধী, "কিন্তু প্রশ্ন হল, 'আপনি বা আমি কি সে কথা বলার উপযুক্ত ব্যক্তি?" 'একথা বলার উপযুক্ত ব্যক্তি' তাহলে কারা? বিড়লা বললেন, "আপনি যা বলতে চান যারা বিত্ত ত্যাগ করেছে তাদেরই সেটা বলতে দিন।" পুঁজিপতিদের কাজ হল এইসব লোকের হাত "শক্ত করা।" এটা করে "আমরা প্রত্যেককে সাহায্য করতে পারি।" কিন্তু ঠিক এই ব্যাপারেই "আমরা ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত অদূরদর্শী" কারণ "বল্লভভাই ও ভুলাভাইয়ের মত যেসব মানুষ সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, তাঁরাও সাহায্য পাচ্ছেন না।"[114] স্পষ্টতই, বিড়লা শুধু সর্দার প্যাটেল আর ভুলাভাই দেশাইয়ের নাম উল্লেখ করলেও গান্ধী, রাজাজী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, যাঁদের কথা তিনি তাঁর ২০ এপ্রিলের চিঠিতে বলেছিলেন এবং কংগ্রেসের অন্যান্য দক্ষিণপন্থী নেতার কথাও তাঁর মনে ছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বত্ব-দখলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এঁদের মদত দেওয়ার দরকার ছিল। এবারও পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস বিড়লার পরামর্শে সম্মতি প্রকাশ করেছিলেন।[115] পরামর্শটি অপাত্রেও দেওয়া হয়নি। জওহরলালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ফৈজপুর অধিবেশনের ব্যয় নির্বাহের জন্য ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ তৎক্ষণাৎ এক লক্ষ টাকা দান করলেন। এবং বিড়লা অবশ্যই মুখে যা বলতেন কাজেও তাই করতেন। বছরের পর বছর তিনি কংগ্রেস ও গান্ধীর অসংখ্য সংগঠনের জন্য অর্থের জোগান দিয়েছেন এবং রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও অন্যান্য নেতাদের অর্থ সাহায্য করেছেন।[116]

বিড়লা এও লক্ষ্য করেছিলেন যে 'মহাত্মার অনুগামীরা' লক্ষ্নৌতে ঠিকমত কাজ করেছিলেন। রাজেন্দ্রবাবু কঠোর ভাষায় বক্তব্য পেশ করেছিলেন এবং কয়েকজন জওহরলালের মতাদর্শকে খোলাখুলিভাবে আক্রমণ করেছিলেন।"

নেহরুর সমর্থকদের সংখ্যা সব সময়ই ছিল খুবই কম, তাছাড়া, "জওহরলালের বক্তৃতা এক রকম বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল বলা যায় কারণ যেসব প্রস্তাব পাস করা হয়েছিল সেগুলি ছিল তাঁর মূল বক্তব্যের বিরোধী।"[117] সরকার গঠন এবং শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনগুলির কংগ্রেসে যৌথ অন্তর্ভুক্তি - নেহরুর এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব যে বাতিল হয়ে গিয়েছিল সেই ঘটনার প্রতি বিড়লা মনোযোগ আকর্ষণ করছিলেন। পরবর্তী মাস-গুলিতে বিড়লার কৌশল যথেষ্ট ফলপ্রসূও হয়েছিল। সাংগঠনিক সংকটগুলি একের পর এক সতর্কভাবে সমাধান করে 'হাই কম্যান্ড' নামে সাধারণ্যে পরিচিত কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী গান্ধীর সহায়তায় লক্ষ্মৌ অধিবেশনের সংগ্রামী নেহরুকে খর্ব করলেন, শাসন করলেন, এবং হীনবল করলেন। নেহরু এই প্রক্রিয়ায় পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছিলেন, লড়াই করে, নতি স্বীকার করে ও তারপর নীরবতা অবলম্বন করে এবং নীতিগত প্রশ্নের বদলে কাজকর্মের ধরন ও রীতির প্রশ্নে দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে লড়াই করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, এই প্রক্রিয়াটিকে আমরা এখানে বর্ণনা করতে পারছি না।[118]

নেহরুর ব্যাপারে বিড়লার কৌশলের তৃতীয় দিক হল ব্যক্তি সম্পর্কে এক সঠিক ধারণা গড়ে তোলা। নেহরুকে সংশোধনাতীত শত্রু হিসেবে দেখলে চলবে না। তাঁকে যথাযথভাবে বুঝতে হবে এবং তৈরি করে নিতে হবে। পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস তাঁর ১৮ এপ্রিলের চিঠিতে জানতে চেয়েছিলেন চরমপন্থী নেহরুকে গান্ধী তাঁর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন কিনা। বিড়লা এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে জওহরলালের প্রশংসা করেছিলেন কারণ তিনি (জওহরলাল) দলে তাঁর সংখ্যালঘুত্ব সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন এবং সভাপতি হিসেবে নিজের ক্ষমতার সুযোগ গ্রহণ করেননি।[119] অনুরূপভাবে বিড়লা পরে অভিযোগ করেছিলেন যে বোম্বাই ইস্তাহারের ভাষা "জওহরলালের প্রতি পুরোপুরি সুবিচার"[120] করেনি। অদূরদর্শী ব্যক্তিরা শুধু লক্ষ্মৌতে নেহরুর অভিভাষণের কন্ঠস্বরই শুনেছিলেন, কিন্তু বিড়লা বিচক্ষণতার সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন যে লক্ষ্মৌতে নেহরু দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। "জওহরলালজী যেন একজন খাঁটি ইংরেজ গণতন্ত্রী, পরাজয়কে তিনি গ্রহণ করেন খেলোয়াড়সুলভ মেজাজে।" বিড়লা সপ্রশংসভাবে লক্ষ্য করেছিলেন যে নেহরু পদত্যাগ করে ভাঙনও ঘটাননি। বিড়লা নেহরুর মূল দুর্বলতাও বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক কাজকর্ম মতাদর্শগত কল্পনার তুলনায় অনেক সংযত ও 'বাস্তবানুগ'। অন্যভাবে বলতে গেলে তাঁর তত্ত্ব ও কর্মের মধ্যে ছিল এক বিস্তৃত ব্যবধান। "তিনি তাঁর মতাদর্শকে যেন প্রকাশ করতে চান, কিন্তু বুঝতে পারেন তা কাজে পরিণত করা অসম্ভব এবং তার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন না।" নেহরু সম্পর্কে এই জ্ঞান ও উপলব্ধি বিড়লা সম্ভবত গান্ধীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন, কারণ গান্ধী ব্রিটেনে আগাথা হ্যারিসনকে ১৯৩৬ সালের ৩০ এপ্রিল একই ভঙ্গিতে লিখেছিলেন :

তাঁর (নেহরুর) অভিভাষণ হল তাঁর বিশ্বাসের অভিব্যক্তি। দেখুন তিনি যে 'পরিষদ' গঠন করেছেন তাতে যাঁদের বেছে নিয়েছেন তাঁদের অধিকাংশই হলেন চিরাচরিত মতের প্রবক্তা অর্থাৎ ১৯২০ থেকে...তবে জওহরলাল তাঁর পদ্ধতির উপস্থাপনায় চরমপন্থী হলেও, কাজে সংযত। আমি যতদূর তাঁকে জানি তিনি অবিবেচকের মত সংঘাত ঘটাবেন না। তাঁর ওপর সেটা চাপিয়ে হলে তিনি তা এড়িয়ে যাবেন না।...আমার নিজের ধারণা জওহরলাল তাঁর অধিকাংশ সহকর্মীর সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন।

আবারও পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস নেহরু সম্পর্কে বিড়লার সার্বিক বিশ্লেষণের সঙ্গে একমত হলেন। তিনি লিখলেন, "জ-র-'আন্তরিকতার' ব্যাপারে আমার কখনো কোন সন্দেহ ছিল না, বস্তুত, আমি সত্যিই তার উচ্চমূল্য দিয়েছিলাম।" বিড়লার বিচারের ধারাকে আরো প্রসারিত করে তিনি অবশ্য অনুভব করেছিলেন যে জ-কে সব সময় ঠিক পথে রাখার জন্য যথেষ্ট যত্ন নিতে হবে।"[১২৩]

ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর অন্যান্য গোষ্ঠী বিড়লা-ঠাকুরদাস কৌশলের এই তৃতীয় দিকের সঙ্গে একমত হয়েছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা নেহরুর 'যত্ন' নিতে শুরু করলেন। একুশজনের আক্রমণ প্রকাশিত হওয়ার পরেই বোম্বাইয়ের অনেকগুলো পুঁজিপতি সংঘ এগিয়ে এল তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে, তাঁর পক্ষে বক্তৃতা দিতে, তাঁর সঙ্গে অভিন্নতা জানাতে, এবং এইভাবে তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারিত ইস্তাহার থেকে সামগ্রিকভাবে নিজেদের শ্রেণীকে বিচ্ছিন্ন করতে। এমনকি তাদের অনেকে শ্রমিক ও কৃষকদের জন্য তাঁর গভীর ভাবনা-চিন্তার পক্ষেও সমর্থন জানাল।

১৯৩৬ সালের ১৮ মে 'বোম্বে বুলিয়্যান এক্সচেঞ্জে'র ব্যবসায়ী ও দালালরা নেহরুকে ১৫০১ টাকা উপহার দিল, দেশের প্রতি তাঁর সেবার প্রশংসা করল এবং "ভারতের কৃষক ও শ্রমিকের উন্নতির ব্যাপারে কাজ করার জন্য তিনি তাঁর অনেকটা সময় উৎসর্গ করেছেন"[১২৪] এই ঘটনায় আনন্দ প্রকাশ করলো। ১৯ মে বোম্বাইয়ের পাঁচটি ব্যবসায়ী সংঘ নেহরুর সম্মানে এক ভাষণ দিল। এর মধ্যে ছিল 'মারোয়াড়ি চেমবার অব কমার্স', 'হিন্দুস্থান নেটিভ মারচেণ্টস অ্যাসো-সিয়েশন', 'বোম্বে কটন ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশন' এবং 'বোম্বে গ্রেইন অ্যান্ড সীডস ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশন'।[১২৫] ২০ মে বোম্বাইয়ের মান্ডভিতে 'গ্রেইন মারচেণ্টস অ্যাসোসিয়েশন', 'সুগার মারচেণ্টস অ্যাসোসিয়েশন' সহ ১৩টি ব্যবসায়ী সংঘ এক সভা আহ্বান করেছিল। সভাপতি ভেলজি লাখামসে নাপ্পু বললেন "ব্যবসায়ীরা পণ্ডিত নেহরুর সব সমাজবাদী মতের সঙ্গে একমত না হতে পারেন, কিন্তু তাঁদের সামনে তিনি যে মতই উপস্থাপিত করুন না কেন, তাঁরা তা শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচনা করবেন।"[১২৬] ঐ দিনেই 'কান্ট্রি-মেড ফ্যান্সি অ্যান্ড গ্রে কটন পিসগুডস মারচেন্টস অ্যাসোসিয়েশন' "দেশের লক্ষ লক্ষ মজুর, শ্রমিক ও কৃষকের", অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য নেহরুর অবিরাম প্রয়াসের

প্রশংসা করে এক ভাষণ দিয়েছিল। স্বাগত ভাষণে অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি গোবর্ধনদাস গোকুলদাস মোরারজি বললেন:

…আপনার সমাজবাদী মতামত ব্যবসায়ী সমাজের একাংশকে আলোড়িত করলেও আমরা মনে করি আমাদের অগ্রগতি এবং জনসাধারণের অগ্রগতি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।…একথা সত্য যে মার্ক্সবাদ বা কমিউনিজম সংক্রান্ত কিছু চরমপন্থী মত ব্যবসায়ী সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষ ও তার অগণিত মানুষের বর্তমান অবস্থার দিকে তাকালে…এটা অস্বীকার করা যায় না যে বর্তমান সমাজব্যবস্থার পুনর্গঠনের প্রয়োজন আছে।[১২৭]

'শ্রীমহাজন সভা'র দালালরাও ২০ মে তারিখে নেহরুর সম্মানে বক্তৃতা দেন।[১২৮] ২২ মে বোম্বের ১৫ জন প্রথম সারির ব্যবসায়ী, এঁরা সবাই 'কমিটি অব দি ইনডিয়ান মারচেন্টস চেম্বার'এর সদস্য, নেহরুর সঙ্গে দেখা করে কংগ্রেসের প্রতি তাঁদের নিরবচ্ছিন্ন সমর্থনের কথা দৃঢ়তার সঙ্গে জানালেন এবং তাঁকে বোঝালেন যে ব্যবসায়ী সমাজ সামগ্রিকভাবে ইস্তাহারকে সমর্থন করেন না। "সমাজতন্ত্র বলতে তিনি কি বোঝেন, সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে কখন পেঁছানো যাবে এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে ব্যবসায়ীরা সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে অংশ নিতে পারেন কিনা এসব কথা তাঁরা তাঁর কাছে জানতেও চাইলেন।"[১২৯]

এটাও লক্ষণীয় যে পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস সম্ভবত মনে করতেন স্বাভাবিক বোধশক্তি ফিরিয়ে আনার জন্য কোন ব্যক্তিকে তীব্র আঘাত দেওয়া তাকে শুশ্রূষার করার কৌশলের অঙ্গ, কারণ শুশ্রূষার জন্য দরকার হলে কটু ওষুধও দিতে হয়। সেই কারণে ইস্তাহার সম্পর্কে বিড়লার তীব্র সমালোচনার সঙ্গে একমত হলেও তিনি তাতে সই করেছিলেন। কারণ তাঁর ইচ্ছা ছিল জওহরলাল যে "কিছুটা আক্রমণাত্মক ভাবে" "কমিউনিজমমুখী সমাজতন্ত্র প্রচার করেছিলেন" তার বিরুদ্ধে তাঁকে (নেহরুকে) সতর্ক করে দেওয়া।[১৩০]

।

আর নেহরুর প্রতিক্রিয়া কি রকম? লক্ষ্ণৌ অভিভাষণ ছিল একধারে তাঁর র‍্যাডিক্যাল চিন্তাধারার সর্বোচ্চ সীমার জোয়ার-রেখা এবং অন্তিম সঙ্গীত।[১৩১] উত্তরোত্তর তাঁর সময় ব্যয়িত হতে লাগলো কংগ্রেসের কাজকর্ম সামলাতে এবং অলক্ষ্যে তিনি ফিরে গেলেন প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদীর ভূমিকায়। কিছুটা তেজ তিনি বজায় রেখেছিলেন। ১৯৩৬ সালের ১৮ মের পরেই তিনি সমালোচকদের পাল্টা আঘাত করলেন কঠোর ভাবে। পরবর্তী সময়ের কিছু রচনা ১৯৩৩-৩৬ সালের নেহরুকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সব সময়ই তিনি তাঁর সাহস ও পৌরুষ বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু ১৯৩০ এর দশকের

গোড়ায় যে ভিত্তি তৈরি হয়েছিল তা ক্রমশ পরিত্যক্ত হতে লাগলো। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের মৌল কৌশল পরিবর্তনের লড়াই তিনি ত্যাগ করলেন এবং চা-আ-চা ধাঁচের মধ্যেই প‍ুরোপ‍ুরি মিশে গেলেন। জনগণের স্বাধীন ক্রিয়াকলাপ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা আর করলেন না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বের কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীনে জনগণের অংশগ্রহণের গান্ধীবাদী ধারণার অন্তর্ভুক্ত হয়ে তিনি কাজ করতে শ‍ুর‍ু করলেন।

এরপর থেকে জনগণের প্রধান ভ‍ূমিকা হয়ে দাঁড়াল তাঁর বক্তৃতা শোনা। চিন্তাধারার দিক দিয়ে মার্ক্সবাদ নয় পরিবর্তে শান্ত র‍ূপের ফেবিয়ানিজম হলো আদর্শ, যদিও মাঝেমাঝে তাঁর মধ্যে আগেকার মার্ক্সবাদী ঝলক দেখা যেতো। রাজনৈতিক ও সামাজিক এই দ‍ুই লড়াইকে একত্র করার কৌশলও তিনি ত্যাগ করলেন। দ্বিতীয়টির সঙ্গে প্রথমটি বাহ্যত য‍ুক্ত রইল বটে, কিন্তু ক্রমশ বিলীন হয়ে যেতে লাগল। আগে তিনি বারবার বড় বড় কথা বলা এবং কাজে কিছ‍ু না করার জন্য ভারতীয় সমাজবাদী ও কমিউনিস্টদের তিরস্কার করেছিলেন। এখন তিনি খোলাখ‍ুলি মেনে নিলেন যে সামাজিক লড়াই একটা বাচনিক আদর্শ হয়েই থাকবে এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপ বলতে শ‍ুধ‍ু জাতীয় সংগ্রামই বোঝাবে।

কেন এসব হল? ব্যক্তির জীবনেতিহাসের পরিবর্তনগ‍ুলি ব্যাখ্যা করা সবসময়ই দ‍ুঃসাধ্য। লক্ষ্ণৌ পরবর্তী কালে নেহর‍ুর গঠনে বহ‍ু উপাদান, কৃষি ও ঘটনা কাজ করেছিল। নেহর‍ুর মার্ক্সবাদ ও সমাজবাদী প্রতিশ্র‍ুতি এবং স্বাধীনতা লাভের বৈপ্লবিক পন্থা সম্পর্কে তাঁর ধারণার মধ্যে সহজাত দ‍ুর্বলতা ছিল। সেগ‍ুলি নিয়ে এই প্রবন্ধের প্রথম পরিচ্ছেদ দ‍ুটিতে আমরা বিচার বিশ্লেষণ করিনি, কারণ একজন সমাজবাদী চিন্তানায়ক বা বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী র‍ূপে তাঁর ম‍ূল্যায়ন করা আমাদের লক্ষ্য ছিল এবং তাঁর রাজনীতি ও চিন্তাধারার সেইসব দিকগ‍ুলি তুলে ধরা যা প‍ুঁজিপতি শ্রেণীকে উদ্বিগ্ন ও সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল।

কিছ‍ু কিছ‍ু দ‍ুর্বলতার কথা সহজেই মনে আসে: নিজস্ব রাজনৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর ব্যর্থতা এবং ১৯৩৬ সালের পর শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে সক্রিয়ভাবে কাজকর্মের বা এমন কি তাদের সঙ্গে যোগাযোগের অভাব। গান্ধীর প্রতি তাঁর অন‍ুরাগ ও বশ্যতা, রাজনৈতিক দিক দিয়ে 'নিঃসঙ্গ' বা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ভয়ে তা আরো জোরালো হয়েছিল। একটি সমাজবাদী গোষ্ঠী গড়ে তুলতে বা তৎকালীন গোষ্ঠীগ‍ুলির সঙ্গে মিলিত হতে বা কংগ্রেসের কাঠমোর বাইরে কোন রকম র‍্যাডিক্যাল কার্যকলাপ সংগঠিত করতে তাঁর অসম্মতি, কংগ্রেসের বাইরের বামপন্থীদের দ‍ুর্বলতা,[১৪] সংগঠন সম্পর্কে তাঁর চ‍ূড়ান্ত অবহেলা, এমন কি তা কংগ্রেসের মধ্যেও। মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে তাঁর ১৯৩৩-৩৬ এর বামপন্থা অংশত ছিল আইন অমান্য আন্দোলনের পরাজয় ও নীতিভ্রষ্টতার ফলে উদ্ভ‍ূত রাজনৈতিক হতাশার ফল। নির্বাচনের উত্তেজনা, দেশব্যাপী প্রচার আন্দোলনের ঘ‍ূর্ণিবাত্যা, দল ও কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাসম‍ূহের

পরিচালনা, চীন ও স্পেনের সঙ্গে সম্পর্ক এবং আসন্ন যুদ্ধ এইসব ঘটনা তাঁকে একটা মনস্তাত্ত্বিক প্রেরণা জুগিয়েছিল এবং হতাশা ও 'নিঃসঙ্গতার' পঙ্ক থেকে ও বামপন্থী ঝোঁক থেকেও তাঁকে উদ্ধার করেছিল। অন্য ভাবে বলতে গেলে তিনি নিজে যেমন তাঁর আত্মজীবনীতে আত্মমূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন তেমনি জি. ডি. বিড়লা ও অন্যান্য পুঁজিপতিরাও হয়তো তাঁর মূল্যায়ণ করেছিলেন।

একই সঙ্গে এ ব্যাপারেও সন্দেহ নেই যে তাঁকে শুশ্রূষা করা, তাঁর বিরোধিতা করা এবং সর্বোপরি কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের সমর্থন করার পুঁজিপতি কৌশল প্রথমে তাঁকে সংযত করা এবং তারপয় তাঁকে বদলানোর ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও নিয়েছিল। যার ফলে, ১৯৪৭ সালের মধ্যে পুঁজিপতি শ্রেণী প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল তাঁকে স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে এবং পুঁজিবাদী পথে দেশের অর্থনীতি গড়ে তোলার কাজে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতে।

সংক্ষেপ

	সংক্ষেপ
১. জওহরলাল নেহরুর রচনাবলা	
(১) 'বাঞ্চ অব ওল্ড লেটার্স', বোম্বাই, ১৯৫৮	বি ও এল
(২) 'ইন্ডিয়া এন্ড দ্য ওয়ার্লড', লন্ডন, ১৯৩৬	আই ডব্লু
(৩) 'রিসেন্ট এসেস এন্ড রাইটিংস', এলাহাবাদ, ১৯৩৪	আর ই ডব্লু
(৪) 'গ্লিম্পসেস অব ওয়ার্লড হিস্ট্রি', এলাহাবাদ, ১৯৩৪ খন্ড ১ ও ২	গ্লিম্পসেস
(৫) 'অ্যান অটোবায়োগ্রাফি', এলায়েড পাবলিশার্স, ১৯৬২ সংস্করণ	অটোবায়োগ্রাফি
(৬) এস গোপাল (সম্পাদক), 'সিলেক্টেড ওয়ার্কস অব জওহরলাল নেহরু'	এস ডব্লু
২. নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়ম এন্ড লাইব্রেরি	এন এম এম এল
৩. পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস পেপার্স	পি টি পেপার্স

টীকা

1. এর সঙ্গে সঙ্গে 1933-র শেষ ভাগ থেকে 1936-র প্রথমাংশ পর্যন্ত তাঁর প্রকাশ্য বিবৃতিগুলিও দেখতে হবে, কারণ 1934-35 সালের বেশির ভাগ সময় তিনি কারাগারে ছিলেন।

2. 1934 সালের 13 আগস্ট তিনি গান্ধীকে লেখেন: "কিন্তু আমি আইনসভার ভেতরেই কাজ করি বা বাইরেই কাজ করি, কাজ আমি বিপ্লবী হিসাবেই করি, বিপ্লবী মানে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক, মৌলিক ও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য কাজ করে। কারণ অন্য কোন

ধরনের পরিবর্তন ভারত ও বিশ্বে শান্তি বা সন্তোষ আনতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না।' বি ও এল, পৃঃ 114.

3. এস. গোপাল, 'জওহরলাল নেহরু—এ বায়োগ্রাফি', খণ্ড I, অধ্যায় 7, 1975.

4. কথাবার্তার এক ধরনের শিথিল ও শান্তভাব, যা তাঁর বামপন্থী সমালোচকদের কাছে তাঁর বিবৃতিগুলির "তাৎপর্য এড়ানো"-র প্রয়াস বলে মনে হয়েছিল। তরুণ এক মার্ক্সবাদীর কাছে লেখা (10 নভেম্বর 1933) এক চিঠিতে নেহরু এ ধরনের কথাবার্তাকে বর্ণনা করেছেন "এই সব ভাবধারা এবং প্রযুক্তিগত শব্দাবলীর সঙ্গে অপরিচিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে" বোঝানোর প্রয়াস হিসাবে, "কেবল সাহসের বড়াই না করে শ্রোতাদের স্বমতে আনার" ইচ্ছা হিসাবে, এবং কংগ্রেসের মত "যে সংগঠনের ভারতবর্ষের জনসাধারণের উপর এত বিপুল প্রভাব রয়েছে সেই সংগঠনকে প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন অন্য ব্যক্তিদের হাতে ছেড়ে দিয়ে' ঐ সংগঠন থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন হওয়া এড়ানোর উদ্দেশ্য হিসাবে। এস ডব্লু, VI, পৃঃ 117-18.

5. 1933 সালের 31 অগাস্ট তারিখে 'পাইওনিয়ার' পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তাঁর নতুন ভাবধারা ও রাজনীতি প্রথম প্রকাশ্যে ব্যক্ত হল। এস ডব্লু দ্রষ্টব্য, V, পৃঃ 506 অনুবর্তী।

6. আই ডব্লু, পৃঃ 27-28.

7. এস. গোপাল, অধ্যায় 8 দ্রষ্টব্য।

8. আর ই ডব্লু, পৃঃ 16.

9. ঐ, পৃঃ 24. একই বিষয়ে পূর্ব প্রদত্ত ঘোষণা সম্পর্কে 1933 সালের 31 আগস্ট তারিখে 'পাইওনিয়ার' পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকার, এস. ডব্লু, V, পৃঃ 508 দ্রষ্টব্য। 'অটোবায়োগ্রাফি', পৃঃ 523 ও দ্রষ্টব্য।

10. আর ই ডব্লু, পৃঃ 139, পৃঃ 136 ও দ্রষ্টব্য।

11. ঐ, পৃঃ 40, 126.

12. ঐ, পৃঃ 126. পৃঃ 124 ও দ্রষ্টব্য।

13. আই ডব্লু, পৃঃ 82-83.

14. লক্ষ্মৌ বক্তৃতা, আই ডব্লু, পৃঃ 82-83.

15. আর ই ডব্লু, পৃঃ 31.

16. আই ডব্লু, পৃঃ 83; 'অটোবায়োগ্রাফি', পৃঃ 543; 'গ্লিম্পসেস', I, পৃঃ 575, I, পৃঃ 852ও দ্রষ্টব্য।

17. বি ও এল, পৃঃ 141-তে 'লেটার টু লর্ড লোথিয়ান', জানুয়ারি 17, 1936. 1936 সালের মে মাসে আই ডব্লু-তে 'এ লেটার টু অ্যান ইংলিশম্যান' নামেও প্রকাশিত। গুরুত্ব আরোপিত।

18. এস ডব্লু, V, পৃঃ 538. ঐ, পৃঃ 541; 'গ্লিম্পসেস', II, পৃঃ 857 ও দ্রষ্টব্য।

19 'অটোবায়োগ্রাফি,' পৃঃ 523.

20. 'লেটার টু লর্ড লোথিয়ান', বি ও এল, পৃঃ 143.

21. ঐ, পৃঃ 141-43.

22 আর ই ডব্লু, পৃঃ 30-31. এর আগে, 1932 সালের 10 অক্টোবর তারিখে ইন্দিরাকে লেখা এক চিঠিতে তিনি লিখছেন: "আইনের চোখে নিছক সাম্য এবং ভোটের অধিকার মানেই যে সত্যিকারের সাম্য বা স্বাধীনতা বা সুখ বোঝায় না, এবং এসব সত্ত্বেও তাদের শোষণ করার অন্য অনেক কায়দা ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের যে জানা আছে, এ সব কথা বুঝতে জনসাধারণের দীর্ঘদিন লেগেছে।" 'গ্লিম্পসেস', I, পৃঃ 575.

23. এস ডব্লু, V, পৃঃ 460.

24. ঐ, পৃঃ 508.

25. আর ই ডব্লু, পৃঃ 33-35.

26. 'অটোবায়োগ্রাফি', পৃঃ 544.

27. ঐ, পৃঃ 551-52.

28. উদাহরণ স্বরূপ, এস ডব্লু, V, পৃঃ 479, 489, 521 ; আর ই ডব্লু, পৃঃ 18, 40 ; এস ডব্লু, VI, পৃঃ 110-11 ; লক্ষ্ণৌ বক্তৃতা, আই ডব্লু, পৃঃ 79.

29. 'অটোবায়োগ্রাফি', পৃঃ 504.

30. আর ই ডব্লু, পৃঃ 135. ঐ, পৃঃ 30, 123 ; 'লেটার টু লর্ড লোথিয়ান', বি ও এল, পৃঃ 140 ; এস ডব্লু, V, পৃঃ 541 ; 'গ্লিম্পসেস', II, পৃঃ 853 ও দ্রষ্টব্য।

31. 'টাইমস্ অব ইন্ডিয়া', 18 মে 1936, পৃঃ 11-তে প্রতিবেদন।

32. 'টাইম্‌স্ অব ইন্ডিয়া', 19 মে 1936, পৃঃ 14-তে প্রতিবেদন। 16 ফেব্রুয়ারি 1933 তারিখে ইন্দিরাকে লেখা পত্র নং 134-এ তাঁর একেবারে বন্ধুজনোচিত এবং প্রায় শিষ্য-সুলভ ভঙ্গিতে মার্ক্সবাদ আলোচনাও দ্রষ্টব্য, যদিও নিজেকে তিনি খোলাখুলিভাবে মার্ক্সবাদী বলে ঘোষণা করছেন না। 'গ্লিম্পসেস', II, পৃঃ 851 অনুবর্তী।

33. আর ই ডব্লু, পৃঃ 10-16.

34. ঐ, পৃঃ 14. লক্ষ্ণৌ বক্তৃতা, আই ডব্লু, পৃঃ 69 দ্রষ্টব্য।

35. লক্ষ্ণৌ বক্তৃতা, আই ডব্লু, পৃঃ 67, 69, 83, 101 ; এবং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে এম আর মাসানি-র গ্রন্থের মুখবন্ধ, 25 ফেব্রুয়ারি 1936, 'নেহরু পেপার্স', এন এম এম এল ; আর ই ডব্লু, পৃঃ 123.

36. মাসানি-র বইয়ের মুখবন্ধ, পূর্বোল্লিখিত।

37. আই ডব্লু, পৃঃ 83.

38. মাসানি-র বইয়ের মুখবন্ধ, পূর্বোল্লিখিত।

39. আই ডব্লু, পৃঃ 18-19.

40. আর ই ডব্লু, 18-19.

41. আই ডব্লু, পৃঃ 70, 81 ; এর আগে, 1933 সালের সেপ্টেম্বরে তিনি গান্ধীকে লিখছেন : "আমি মনে করি আমাদের নিজেদের স্বার্থের সংকীর্ণতর যুক্তিতে এবং আন্তর্জাতিক কল্যাণ এবং মানব প্রগতির বৃহত্তর যুক্তিতে আমাদের বিশ্বের প্রগতিশীল শক্তিবর্গের সঙ্গে সংঘবদ্ধ হওয়া দরকার।" ডি. জি. টেন্ডুলকার, 'মহাত্মা', নয়াদিল্লি, 1969 পুনর্মুদ্রণ, খণ্ড III, পৃঃ 306-এ পত্র তাং 13 সেপ্টেম্বর 1936.

42. আগে প্রদত্ত '1947 সালের আগে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদ' এবং 'প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপে ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনের উপাদান'।

43. নিচে দ্রষ্টব্য।

44. জি. ডি. বিড়লা, 'ইন দা শ্যাডো অব দা মহাত্মা', কলকাতা, 1953, অধ্যায় XI-XVIII.

45. 'অটোবায়োগ্রাফি'।

46. এস ডব্লু, VI, পৃঃ 21, 79, 94, 102-03 ; 1932 থেকেই তিনি এই দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এস ডব্লু, V, পৃঃ 386.

47. ঐ, পৃঃ 67, 74.

48. আর ই ডব্লু, পৃঃ 22.

49. আর ই ডব্লু, পৃঃ 21, 38-40 ; 141-42 ; এস. ডব্লু, V, পৃঃ 532-36 ; এস ডব্লু, VI, পৃঃ 87-88 ; 18 জানুয়ারি 1934 তারিখে কলকাতায় এক বক্তৃতায় নেহরু এই বিবৃতির ব্যাপকতর ব্যাখ্যা দিলেন, এবং সে জন্য তাঁর আরও দু বছর জেল হল। উপরে প্রদত্ত যুক্তিগুলির পুনরাবৃত্তি করে তিনি বললেন যে ক্ষুধাই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের চালক শক্তি বলে, "নেতারা এবং সংগঠনগুলি দুর্বল হয়ে পড়লেও, আপস করলেও এবং বিশ্বাসঘাতকতা

করলেও, এই তাগিদ থেকেই যায় এবং জনগণকে তা ঠেলে নিয়ে যাবেই…" এস ডব্লু, VI, পৃঃ 101-05 দ্রষ্টব্য।

50. এস ডব্লু, VI, পৃঃ 104.

51. উদাহরণ স্বরূপ, এস ডব্লু' V, পৃঃ 532-37, 544 দ্রষ্টব্য।

52. আই ডব্লু, পৃঃ 90-95. জনগণের ভোটে নির্বাচিত মন্ত্রিসভাগুলি মানুষকে কিছুটা স্বস্তি দিতে পারবে এবং নিপীড়নের হাত থেকে তাদের বাঁচাতে পারবে বলে যাঁরা যুক্তি দিয়েছিলেন তাদের জবাবে নেহরু বললেন যে প্রথমতঃ কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলির ক্ষমতা থাকবে খুব সামান্য, স্বস্তি দেওয়ার ক্ষমতা তাদের না থাকারই মত থাকবে। তার উপর তাদের আবার সাম্রাজ্যবাদী শাসন যন্ত্রের সঙ্গে দায়িত্ব ভাগ করে নিতে হবে, "প্রশাসনের ব্যাপারে ঘাটতি বাজেটের, শ্রমিক ও কৃষককে শোষণের।" তিনি বললেন, "ক্ষমতা না পেয়ে দায়িত্ব পাওয়া সর্বদাই বিপজ্জনক।" ঐ, পৃঃ 91. যাঁরা যুক্তি দিলেন যে জনসাধারণ যদি বুঝতে পারে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করবে তবে বেশি লোক তাদের পক্ষে ভোট দেবে, তাঁদের জবাবে নেহরু বললেন: "আইনের চৌহদ্দির মধ্যে থেকে জনসাধারণের জন্য আমরা কি করতে পারি বলে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের যদি প্রতারণা করি, তবেই এটা ঘটতে পারে। কিন্তু এ সব প্রতিশ্রুতি কার্যকরী করতে আমরা ব্যর্থ হলে জনগণ প্রতিশোধ নেবে সঙ্গে সঙ্গে, আর প্রতিশ্রুতি গুলি যদি যুক্তিসঙ্গত হয় তবে ব্যর্থতা অনিবার্য।" ঐ, পৃঃ 93.

53. আই ডব্লু, পৃঃ 89.

54. ঐ।

55. ঐ, পৃঃ 95.

56. আর ই ডব্লু, পৃঃ 70-72.

57. আই ডব্লু, পৃঃ 88-89.

58. আর ই ডব্লু, পৃঃ 3-4 ; বি ও এল, পৃঃ 148.

59. লক্ষ্ণৌ বক্তৃতা, আই ডব্লু, পৃঃ 77.

60. আর ই ডব্লু, পৃঃ 3.

61. লক্ষ্ণৌ বক্তৃতা, আই ডব্লু, পৃঃ 77-78.

62. ঐ, পৃঃ 79-81. ঐ, পৃঃ 95 ; এবং এস ডব্লু, VI, পৃঃ 101 ও দ্রষ্টব্য।

63. লক্ষ্ণৌ বক্তৃতা, আই ডব্লু, পৃঃ 101-04.

64. ঐ, পৃঃ 103.

65. টেণ্ডুলকার, খণ্ড III, পৃঃ 309.

66. আর ই ডব্লু, পৃঃ 42 ; এস ডব্লু, VI, পৃঃ 17-18, 118, 126.

67. আর ই ডব্লু, পৃঃ 128-29.

68. ঐ, পৃঃ 129, 131 ; লক্ষ্ণৌ বক্তৃতা, আই ডব্লু, পৃঃ 84.

69. আর ই ডব্লু, পৃঃ 4-6.

70. ঐ, পৃঃ 17.

71. ঐ। 'লেটার টু লর্ড লোথিয়ান' বি ও এল, পৃঃ 144ও দ্রষ্টব্য।

72. আর ই ডব্লু, পৃঃ 19.

73. ঐ, পৃঃ 21. অনুরূপভাবে নেহরু 1933 সালে গান্ধীকে বলেছিলেন যে "স্বাধীনতা অর্জনের সমস্যা জনগণের স্বার্থে কায়েমী স্বার্থ সংশোধনের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কাজটা যতদূর পর্যন্ত করা যাবে, স্বাধীনতাও ততদূর পর্যন্তই আসবে।" 13 সেপ্টেম্বর 1933 তারিখের চিঠি, টেণ্ডুলকার, খণ্ড III, পৃঃ 305.

74. আর ই ডব্লু, পৃঃ 127.

75. এস ডব্লু, V, পৃঃ 546-47.

76. আর ই ডব্লু, পৃঃ 131-32.

77· বি ও এল, প্ঃ 115.

78. এস ডব্ল্য, VI, প্ঃ 259. গ্রুত্ব আরোপিত।

79. বি ও এল, প্ঃ 115. 'আত্মজীবনী'-তে নেহর্ আবার এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলছেন, "বর্তমান ব্যবস্থার ভিত্তিই হল ক্রমাগত ও নিরবচ্ছিন্ন আত্মসাৎ, এবং এ অবস্থার অবসান ঘটানোর জন্যই সামাজিক পরিবর্তন চাওয়া হয়। শ্রমিকের শ্রমজাত সম্পদের অংশে প্রতিদিন আত্মসাৎ করা হচ্ছে; কৃষকের খাজনা বা রাজস্ব এমন বাড়ানো হয় যে সে আর তা দিতে পারে না, আর এভাবেই ওর জোত শেষ পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়।" প্ঃ 587.

80. বি ও এল, প্ঃ 116. নেহর্ সে সময় জানতেন না যে গান্ধীই ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের খসড়া তৈরি করেছেন।

81. "কংগ্রেস লিডার্স এন্ড দেয়ার পলিসি" সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পত্র, অগাস্ট 1934, 'নেহর্ পেপার্স'। এস ডব্ল্য, VI, প্ঃ 270-73-তেও আছে।

82 এস ডব্ল্য V, প্ঃ 478-79. ডায়েরিতে ঐ একই তারিখে লেখার মধ্যে এম. এন. রায় সম্পর্কে হঠাৎ উল্লেখের মধ্য দিয়ে তাঁর মনের অচেতন প্রবাহের ইঙ্গিতে পাওয়া যায়: "আমি প্রায়ই এম. এন. রায়ের কথা ভাবি। বেচারি দ্নিয়ায় একেবারে একা, তার কথা ভাবারও বোধহয় কেউ নেই।" ঐ, প্ঃ 479.

83. ঐ, প্ঃ 489.

84. এস ডব্ল্য, VI, প্ঃ 251.

85. ঐ, প্ঃ 248.

86. বি ও এল, প্ঃ 113.

87. অগাস্ট 1934-এর পত্র, 'নেহর্ পেপার্স'। এবং এস ডব্ল্য, VI, প্ঃ 271-273. 'অটোবায়োগ্রাফি', প্ঃ 505-08ও দ্রষ্টব্য। গান্ধীর সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা অবশ্য একটা প্রবণতা মাত্র, কখনও বাড়ত কখনও কমত (বাড়ার ঘটনার জন্য এস ডব্ল্য, V, প্ঃ 532, 537-38 দ্রষ্টব্য) এবং শেষ পর্যন্ত গান্ধীর প্রতি আন্গত্যেরই জয় হল, 1936-এর পর থেকে 1946-47 পর্যন্ত।

88. নথি নং 130, নেহর্ পেপার্স", অংশ II.

89. গোটা ইস্তাহারটাই 'ট্রিবিউন', 20 মে 1936 তারিখে প্রকাশিত হয়। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন নওরোজি সাকলাৎওয়ালা, প্র্ষোত্তমদাস, ঠাকুরদাস, চিমনলাল, শীতলবাদ ফিরোজ শেঠনা, কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর, শাপ্রজী বিলিমোরিয়া, হোমি মোদি, ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ, ভি. এন. চন্দ্রভারকর, মথ্রাদাস বিষণজী, চুনিলাল বি মেহতা এবং কে. আর. পি শ্রফ।

90. ঐ।

91. 'টাইম্স্ অব ইন্ডিয়া', 23 মে 1936.

92. 'টাইম্স্ অব ইন্ডিয়া', 29 মে 1936.

93. 'টাইম্স্ অব ইন্ডিয়া', 11 জ্ন 1936.

94. নথি নং 130, 'নেহের্ পেপার্স", অংশ II.

95. 'টাইম্স্ অব ইন্ডিয়া', 11 জ্ন 1936. 'ট্রিবিউন', 13 জ্ন 1936ও দ্রষ্টব্য।

96. উদাহরণ স্বর্প, 'টাইম্স্ অব ইন্ডিয়া', 29 মে 1936-তে কাওয়াসজী জাহাঙ্গীরের বিবৃতি দ্রষ্টব্য।

97. উপরে উদ্ধৃত চিমনলাল শীতলবাদ, কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর, হোমি মোদি এবং এ. ডি. শ্রফের বিবৃতিগ্লি দ্রষ্টব্য।

98. 'টাইমস্ অব ইন্ডিয়া', 23 মে 1936. এ. ডি. শ্রফ, নথি নং 130, 'নেহর্ পেপার্স", অংশ II.

99. উদাহরণ স্বর্প, উপরে উদ্ধৃত এ. ডি. শ্রফ এবং কাওয়াসজী জাহাঙ্গীরের বিবৃতি দ্রষ্টব্য।

100. নথি নং 130, 'নেহর্ পেপার্স", অংশ II. বিশ্লেষণে দেখা যায় যে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে দ্জন মাত্র ভারতীয় প্ঁজিপতি শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এ'রা হলেন প্র্ষোত্তমদাস

ঠাকুরদাস এবং ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ। টীকায় মন্তব্য করা হয়েছে যে শেষোক্ত জন মতামত ও রাজনীতি বারবার পাল্টানোর জন্য কুখ্যাত, আর প্রথম জন তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করতে রাজি হওয়ায় ভারতবর্ষের বণিক সমাজ কর্তৃক নিন্দিত হয়েছিলেন।

101. নথি নং 177/1936-43, পি টি পেপার্স, এন এম এম এল।

102. জি. ডি. বিড়লা, 'ইন দা শ্যাডো অব দা মহাত্মা', পৃঃ 142-45.

103. এই সময়ে পুঁজিপতিদের রাজনৈতিক রণকৌশলের বিশদ বিবরণের জন্য বিপান চন্দ্র, "দ্য ইন্ডিয়ান ক্যাপিটালিস্ট ক্লাস এন্ড ইম্পিরিয়ালিজম বিফোর 1947" দ্রষ্টব্য।

104. এই যুক্তিতেই বিড়লা ব্রিটিশ রাষ্ট্রনায়কদের কাছে আবেদন করেছেন কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণপন্থীদের সুবিধা দেওয়ার জন্য। ঐ, পৃঃ 401 ; এবং জি. ডি. বিড়লা, 'ইন দা শ্যাডো অব দা মহাত্মা', পৃঃ 193-95, পৃঃ 214 দ্রষ্টব্য। ব্রিটেনে ও ভারতবর্ষে বিড়লার আলাপ-আলোচনার উল্লেখ করে পুরুষোত্তমদাস 23 এপ্রিল 1936 তারিখে তাঁকে লিখেছেন : "আমি এটা না ভেবে পারছি না যে গত বছর আপনি লন্ডনে যে দারুণ কাজ করেছিলেন সেটা সুসংহত করার সময় এখন এসেছে।" নথি নং 177/1936-43, পি টি পেপার্স।

105. ঐ, মূলে গুরুত্ব আরোপিত।

106 এস. গোপাল, অধ্যায় 13 দ্রষ্টব্য।

107. পি টি.-কে বিড়লা, 20 এপ্রিল 1936. নথি নং 177/1936-43, পি টি পেপার্স।

108. ঐ ; সরদার প্যাটেলের সভাপতিত্বে গঠিত এক সংসদীয় পর্ষদের দ্বারা প্রার্থীরা নির্বাচিত হতেন। তাছাড়া নির্বাচন তহবিল সংগ্রহের ভারও সরদার প্যাটেল নিজের হাতে নিয়েছিলেন। রাজেন্দ্র প্রসাদ, 'অটোবায়োগ্রাফি', পৃঃ 427, 430 দ্রষ্টব্য।

109. পি. টি.-কে বিড়লা, 20 এপ্রিল 1936, পূর্বোল্লিখিত।

110. বিড়লাকে পি. টি, 23 এপ্রিল 1936, পূর্বোল্লিখিত।

111. নথি নং 177/1936-37, পি টি পেপার্স।

112. এই অংশটি শ্রেণী সচেতনতার এক অসাধারণ নিদর্শন। বিড়লা সহযোগী পুঁজিপতিদের স্বজাতীয় বলে বিবেচনা করছেন, অর্থাৎ, শ্রেনী ঐক্য ও সংহতির গভীরতা এই উক্তির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠছে।

113. পি টি.-কে বিড়লা, 1 জুন 1936, নথি নং 177/1936-43. পি. টি. পেপার্স। বিড়লাও লিখেছেন : "আপনি এত সাবধানী মানুষ যে সতর্কভাবে বিবেচনা না করে এক পাও এগোন না আর তাই...দলিলে আপনি স্বাক্ষর করেছেন দেখে আমি বিস্মিতই হয়েছি।"...

114. বিড়লাকে পি. টি., 29 মে 1936, নথি নং 177/1936-43, পি টি পেপার্স।

115. জি ডি. খানোলকার, 'ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ', বোম্বাই 1969, পৃঃ 342.

116. জি. ডি. বিড়লা, 'ইন দা শ্যাডো অব দা মহাত্মা' দ্রষ্টব্য।

117. পি. টি. কে বিড়লা, 20 এপ্রিল 1936, পূর্বোল্লিখিত। নেহরুর দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকাংশই ছিলেন গুজরাট, বিহার, তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশের অর্থাৎ প্রধানতঃ সরদার প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ ও রাজাজীর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রদেশগুলির প্রতিনিধিরা। 'ইন্ডিয়ান অ্যানুয়াল রেজিস্টার', খন্ড I, 1936, পৃঃ 284.

118. এস. গোপাল, অধ্যায় 13 দ্রষ্টব্য।

119. পি, টি. কে বিড়লা, 20 এপ্রিল 1936, পূর্বোল্লিখিত।

120. পি. টি.-কে বিড়লা, 1 জুন 1936, পূর্বোল্লিখিত।

121, পি. টি. কে বিড়লা, 20 এপ্রিল 1926, পূর্বোল্লিখিত।

122. আগাথা হ্যারিসনকে গান্ধী, 30 এপ্রিল 1936, বি ও এল, পৃঃ 175-76.

123. বিড়লাকে পি. টি., 23 এপ্রিল 1936, পূর্বোল্লিখিত।

124. 'টাইম্‌স্‌ অব ইন্ডিয়া', 20 মে 1936.

125. 'ট্রিবিউন', 20 মে 1936.

126. 'টাইম্‌স্‌ অব ইন্ডিয়া', 22 মে 1 ,36.

127. নথি নং 130, নেহরু পেপার্স", অংশ II.

128. 'টাইম্‌স্‌ অব ইন্ডিয়া', 22 মে 1936.

129. 'ট্রিবিউন', 23 মে 1936 ; 'টাইম্‌স্‌ অব ইন্ডিয়া', 23 মে 1936.

130. বিড়লাকে পি টি , 29 মে 1936, পূর্বোল্লিখিত।

131. এস গোপাল, অধ্যায় 13 দ্রষ্টব্য।

132. বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যদিও এখানে আমরা তা নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। নিজ উদ্যোগে কোন সোস্যালিস্ট বা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার ক্ষমতা নেহরুর ছিল না, কিন্তু কোন বিপ্লবী মার্ক্সবাদী দলের নেতৃত্বে পরিচালিত কোন বামপন্থী ফ্রন্টের স্বীকৃত নেতা হিসাবে কাজ তিনি করতে পারতেন। কিন্তু এ ধরনের কোন স্বাধীন রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করার মত ক্ষমতা ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির তখন ছিল না। আর স্বীয় উদ্যোগে ঐ রকম ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া নেহরুর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

আধুনিক ভারত ও সাম্রাজ্যবাদ

১

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

উনিশ শতকে ভারতবর্ষ বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল, যদিও তা পরাধীন, উপনিবেশ হিসেবে। ব্রিটিশ পুঁজিবাদের বিকাশে এর ভূমিকা হল খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আদর্শ এক উপনিবেশ হিসেবে এর আত্মপ্রকাশ ঘটল। ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লবের সূচনার সমসময়ে ১৭৫০ এর দশকে ব্রিটেনের ভারত-লুণ্ঠন শুরু হয়েছিল, সেটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। উদাহরণ স্বরূপ, ১৭৬৫ সালের পরে ভারত থেকে সম্পদ পাচার বা একতরফা পুঁজি চালানের পরিমাণ ছিল ব্রিটেনের জাতীয় আয়ের ২ থেকে ৩ শতাংশ এবং সেই সময় ব্রিটেনে জাতীয় আয়ের মাত্র ৫ শতাংশের মত বিনিয়োগ করা হচ্ছিল। ১৭৬০ সালের পরবর্তী বছরগুলিতে ব্রিটেন যখন বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর উন্নত পুঁজিবাদী দেশে পরিণত হচ্ছিল, ভারতবর্ষ তখন বিশ্বের 'প্রথম শ্রেণীর' অনগ্রসর, ঔপনিবেশিক দেশ হওয়ার পথে নেমে যাচ্ছিল।

উনিশ শতকে ভারত ছিল ব্রিটিশ পণ্য বিশেষ করে সুতী বস্ত্র এবং পরবর্তী সময়ে লোহা ও ইস্পাত-জাত পণ্য ও রেলপথের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য পণ্যের এক বৃহৎ বাজার। ভারতবর্ষ ব্রিটেনে খাদ্য সামগ্রী ও কাঁচামালের গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহকারীও ছিল। ভারতবর্ষে উৎপাদিত আফিম এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল ত্রিকোণ বাণিজ্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ও চীনা জনগণ পুরোপুরি অর্থনৈতিক শোষণের কাজ এই বাণিজ্যই সুগম হয়েছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ৩৫০ কোটি টাকা (প্রায় ৩৫ কোটি পাউন্ড স্টার্লিং) ব্যয়ে নির্মিত ভারতীয় রেলপথ ব্রিটিশ পুঁজি রপ্তানির বৃহত্তম পথ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভারতবর্ষের পরিবহণ ব্যবস্থা, আধুনিক খনি ও শিল্প, বৈদেশিক বাণিজ্য, উপকূল অঞ্চলের ও আন্তর্জাতিক জাহাজী পরিবহণ এবং ব্যাংক ও বীমা কোম্পানিগুলির অধিকাংশই ছিল ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন। ১৮৫৮ সালের পর প্রায় একশ বছর ধরে ভারতের রপ্তানি পণ্য ব্রিটেনের নিজের আন্তর্জাতিক ব্যালান্স অব পেমেন্টের ঘাটতি মেটানোর জন্য সে দেশকে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সাহায্য করেছে। ব্রিটিশ জাহাজী

পরিবহণ ব্যবসার ক্রমোন্নতিতে ভারতের উপকূল অঞ্চলের ও আন্তর্জাতিক পরিবহণ ব্যবসার ওপর নিয়ন্ত্রণ ছিল একটা বড় উপাদান।

ব্রিটিশ মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর বেকার তরুণদের একটা বড় অংশ ভারতে চাকরি পেয়েছিল (১৮৯২ সালে ভারতবর্ষের বাজেটের এক-তৃতীয়াংশ ব্যয় করা হয়েছিল ভারতের ইংরেজদের জন্য!)। এর ফলে এইসব শ্রেণী একটা মৌলিক নিরাপত্তাই শুধু যে পেয়েছিল তাই নয়, এর ফলে ব্রিটিশ রাজনীতিক কর্মধারা, দক্ষিণ ও বাম দুদিক থেকেই কোন রকম উত্তেজনা ও বাধা-বিপত্তি ছাড়াই স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হতে পেরেছিল, কারণ নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং তার সঙ্গে আদর্শবাদ ও চিন্তার ক্ষেত্রে অসন্তোষের কারণে এই সব শ্রেণীর বেকার শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে উত্তেজনা ও বাধা-বিপত্তি বাড়িয়ে তোলার প্রবণতা দেখা যায়। তার বদলে তাদের লোকহিতব্রতী ও আদর্শবাদী প্রবণতা এখন অভিব্যক্তির পথ পেল দুভাবে—দক্ষিণ পন্থায় মিশনারি কাজকর্ম এবং বামপন্থায় ফেবিয়ানিজমের ভেতর দিয়ে।

'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উজ্জ্বলতম রত্ন' হিসেবে ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করেছিল, ফলে ব্রিটিশ শাসক শ্রেণী প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রবর্তিত হওয়ার পরও নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছিল এবং তাদের সমাজ যে সময় শ্রেণীদ্বন্দ্বে জর্জরিত হচ্ছিল সেই সময় পুঁজিবাদকে কেন্দ্র করে সে সমাজকে দৃঢ়ভাবে সংঘবদ্ধ করতেও পেরেছিল। 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য কখনো অস্ত যায় না' এই স্লোগানের পেছনে যে দম্ভ ও গৌরব ছিল তাকে এই ভাবে ব্যবহার করা হত সেইসব শ্রমজীবী মানুষকে খুশি রাখতে যাদের নোংরা ঘিঞ্জি বস্তির ওপর বাস্তব জীবনে সূর্য কদাচিৎই উঁকি দিত।

প্রায়শঃই উপেক্ষিত আরও একটি ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এসবের জন্য ব্রিটেনের একটা পেনিও খরচা হয়নি।[1] ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর পুনর্বিজয় সহ ভারতবর্ষ বিজয়ের 'সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করেছিল' ভারতই। দ্বিতীয়তঃ, উপনিবেশবাদের স্বার্থে যখন রেলপথ, শিক্ষা, আধুনিক আইন ব্যবস্থা, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রশাসনকে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে ভারতবর্ষের আংশিক আধুনিকীকরণ প্রয়োজন হল তখন ভারতই তার সমগ্র ব্যয়ভার বহন করেছিল।

সর্বোপরি ১৮৭০ সালের পর বিশ্বের বিভাজন এবং তারপর পুনর্বিভাজনের লড়াই যখন তীব্র হয়ে উঠলো তখন ভারতই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রধান রক্ষী হিসেবে কাজ করেছিল এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জোগান দিয়েছিল বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও মানুষ দুইই। ভারতীয় সৈন্য ও ভারতীয় আর্থিক সংস্থানের ওপর নির্ভর করে আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া, তিব্বত, পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল, পূর্ব আফ্রিকা, মিশর, সুদান, বার্মা, চীন এবং কিছুটা দক্ষিণ আফ্রিকাকেও ব্রিটিশ প্রভাবাধীন এলাকার অন্তর্ভুক্ত

করেছিল বা রেখেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পশ্চিম এশিয়ার ক্ষেত্রেও এটাই ঘটেছিল।[৪]

বিশ্বযুদ্ধগুলি চলাকালীন সময় বাদ দিয়ে এই পুরো সময়টাতে ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীই ছিলো ব্রিটেনের একমাত্র বিপুল বাহিনী। ভারতীয় সেনাবাহিনী ও ভারতের আর্থিক সংস্থানের ওপর ব্রিটেন যখনই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল তখনই এশিয়া ও আফ্রিকাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়ার এটা হল একটা বড় কারণ।

এটাও লক্ষ্য করা যেতে পারে যে ১৮৭০ সালের পর ব্রিটিশ অর্থনৈতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী পুঁজিবাদী শক্তিগুলি যখন উঠে দাঁড়ালো, যখন বাজার, কাঁচামাল ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রের জন্য অনুসন্ধান তীব্র হল এবং প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ফলে যখন শ্রমজীবী শ্রেণীর জন্য নূতন ভাবাদর্শগত আবেদন খুঁজে বার করা জরুরী হয়ে পড়ল তখনই ভারতে ব্রিটিশ শাসন আরো কঠোরভাবে ও সচেতনভাবে চেপে বসল। এবং অবাধ বাণিজ্য ও স্বাশাসনের জন্য ভারতীয়দের প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্পর্কে আগে যে সব কথাবার্তা বলা হত সেগুলি বন্ধ করে 'সদাশয় স্বৈরতন্ত্রের' মতবাদ আঁকড়ে ধরা হল। অধিকন্তু, প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যবস্থা এবং আমলাতন্ত্রের উচ্চতর স্তরের অনমনীয় ব্রিটিশ চরিত্রের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ পুঁজিবাদের এক নির্ভরশীল সংরক্ষিত জায়গা করে রাখা হয়েছিল। এর ফলে এক কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা ঘটল এই যে ১৯৪৭ সালের পরে মার্কিন পুঁজিবাদকে ভারতীয় অর্থনীতিতে প্রবেশের পথ শুরু করতে হয়েছিলো কার্যতঃ একেবারে গোড়া থেকে এবং অনেকগুলি মূল্যবান বছর তাকে ব্যয় করতে হয়েছিল সম্পর্ক স্থাপনের এবং দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক ও চিন্তাগত জীবনে নিজস্ব বনিয়াদ তৈরি করার কাজে।

কখনো কখনো বলা হয়ে থকে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষের উপর রাজত্ব করে, বিশেষ করে বিশ শতকে, খুব বেশি একটা কিছু অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় করতে পারেনি, যদিও উগ্র সাম্রাজ্যবাদীরা এবং ভারতীয় ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধীরা উভয় পক্ষই সেরকমই বলে থাকে। আর সেক্ষেত্রে এটা প্রমাণ করার চেষ্টা হয় যে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের কোন অর্থনৈতিক প্রেরণা ছিল না। একথা সত্যি যে বিশ শতকে ভারত আর ব্রিটিশ পণ্যের খুব বড় বাজার ছিল না, যদিও সে রকমই আশা করা হয়েছিল। তাছাড়া ভারতবর্ষে ব্রিটিশ পুঁজি যতটা বিনিয়োগ করার আকাঙ্ক্ষা ছিল, ততটাও করা যায় নি। আশা ও পূরণের মধ্যে ছিল বিরাট ফাঁক। কিন্তু তা থেকে কিছু অপ্রমানিত হয় না। দীর্ঘকাল ধরে ভারতবর্ষকে শোষণ করার ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যেসব অভ্যন্তারীণ বিরোধে জড়িয়ে পড়েছিল এটা তারই একটা বহিঃপ্রকাশ। সাম্রাজ্যবাদকে যদি ভারত ও ভারতের জনগণকে পুরোপুরি শোষণ করতে হয় তাহলে ভারত ও তার জনগণের অর্থনীতির রূপান্তর ঘটানো এবং

সাধারণভাবে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নতি হওয়া দরকার। কিন্তু এই শোষণের ফলেই ভারতের বিকাশ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। এইভাবে, ভারতের তৎকালীন অভ্যন্তরীণ বাজার ব্রিটিশের দখলে চলে যাওয়া মাত্র দারিদ্র্য জর্জরিত ভারতীয় কৃষক যেমন ব্রিটিশ পণ্যের ক্রেতা হিসেবে আরো উন্নতি করতে পারল না এবং ভারতে বিদেশী মালিকানাধীন শিল্পের ক্ষেত্রে ক্রেতা ভিত্তি তৈরি করতে পারল না। অনুরূপভাবে, যখনই কৃষকের ক্ষমতার শেষ সীমা পর্যন্ত কর চাপানো হল, ব্রিটিশ লগ্নী পুঁজির পক্ষে বা ব্রিটিশ উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে ভারতের সরকারি রাজস্ব লুণ্ঠন করা তখন আর সম্ভব হল না। পক্ষান্তরে, ভারতবর্ষের সীমিত বাজারে ভারতীয় পুঁজি যথেষ্ট সাহসের সঙ্গে বহু ক্ষেত্রে ব্রিটিশ পুঁজিকে প্রতিযোগিতায় ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের মুখোমুখি হয়ে সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃপক্ষ একটা নির্দিষ্ট সীমার বাইরে ভারতীয় বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের বিরোধিতা করতে পারল না, কৃষকের ওপর লাগাম ছাড়া কর চাপাতেও পারল না। সেই কারণেই, যে স্বপ্ন এতদিন ভারতে সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে অনুপ্রাণিত করে এসেছে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ সে স্বপ্নকে বাস্তব করে তুলতে পারল না।

যথা সময়ে, ভারতে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠল। ১৯৪৭ সালের পরে বৃহৎ শক্তিগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এর কিছু কিছু দিক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

(ক) উজ্জ্বল ও বিশদ অনুসন্ধান এবং উপনিবেশবাদের অর্থনীতির মূল ও চালিকা শক্তি সম্পর্কে সামগ্রিক বিশ্লেষণের ভিত্তির উপর ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। উনিশ শতক শেষ হওয়ার আগেই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের স্রষ্টারা কর আরোপের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে এবং নিজেদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি ও ভারত থেকে কাঁচামাল কেনার জন্য ভারতকে কৃষি-নির্ভর পশ্চাৎদেশ করে তোলায় পরোক্ষভাবে, ভারতের অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের শোষক হিসেবে উপনিবেশবাদের ভূমিকা সম্পর্কেই শুধু নয়, ভারতীয় শ্রমিককে শোষণ এবং ব্রিটেনের পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে ভারতীয় পুঁজিকে দাবিয়ে দেওয়ার জন্য তার নূতন পর্ব সম্পর্কেও একটা পরিষ্কার ধারণা গড়ে তুলেছিলেন। তাঁরা এটাও স্পষ্টভাবে বুঝেছিলেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সারার্থ হল সামগ্রিকভাবে ভারতের অর্থনীতিকে ব্রিটেনের অর্থনীতির অধীন করে রাখা। উপরন্তু, তাঁরা বুঝেছিলেন এবং তদনুযায়ী বলেওছিলেন যে উপনিবেশবাদ কোন আকস্মিক ঘটনা নয় বা ব্রিটেনের শাসক দলগুলির রাজনৈতিক নীতির ব্যাপার নয়। উপনিবেশবাদের উদ্ভব ব্রিটিশ সমাজ ও অর্থনীতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য থেকে ও তার শাসক শ্রেণীর প্রয়োজন এবং ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক সম্পর্ক থেকে। ১৯১৮ সালের পরে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ সংগ্রাম, রুশ বিপ্লব এবং মার্ক্সবাদী ও লেনিনবাদী চিন্তাধারার প্রসারের ফলে আধুনিক

সাম্রাজ্যবাদের জটিল অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে এই উপলব্ধি আরো জোরদার হল, উন্নত হল। এর ফলে ১৯৪৭ সালের পরেও বিদেশী অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশের বিপদ সম্পর্কে আরো বেশি সচেতনতা জাগল। বিশেষ করে বেসরকারি বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি সত্য। ১৮৭০ এর দশক থেকে ভারতের জাতীয় নেতৃত্ব বিদেশী পুঁজির উপর আক্রমণ শুরু করেছিলেন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় পরিণামই তুলে ধরেছিলেন। বিদেশী পুঁজি ভারতের উন্নতি করছে না, তাকে লুণ্ঠন করছে এবং তার সম্পদ শোষণ করে নিঃস্ব করে তুলছে বলে মনে করা হত। উদাহরণস্বরূপ, ১৯০১ সালের ১ জুন 'বেঙ্গলী'-তে লিখেছিল, বিদেশী বিনিয়োগের প্রসার দেশের সর্বনাশ ত্বরান্বিত করবে এবং নিঃসন্দেহে "আমাদের দেশকে চিরকালের জন্য ব্রিটিশ পুঁজির ওপর অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নির্ভরশীল করে তুলবে"। বিপিন চন্দ্র পাল তাঁর সাপ্তাহিক পত্রিকা 'নিউ ইনডিয়া'র ১২ অগাস্ট, ১৯০১, সংখ্যায় বিদেশী পুঁজির প্রতি জাতীয়তাবাদী মনোভাব এইভাবে সংক্ষেপে বিবৃত করেছিলেন ঃ

> সাহায্যের পরিবর্তে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ নিঃশেষ করার জন্য বিদেশী পুঁজির, প্রধানতঃ ব্রিটিশ পুঁজির প্রবেশ বস্তুত পক্ষে দেশের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার সমস্ত প্রকৃত উন্নতির পথে সব চেয়ে বড় বাধা। বিদেশী পুঁজিপতিদের দ্বারা দেশের এই শোষণের ফলে সরকার ও জনসাধারণ উভয়েরই একই রকম সর্বনাশের আশংকা রয়েছে।...এই বিপদটা যতটা রাজনৈতিক ততটাই অর্থনৈতিক। এবং নূতন ভারতের ভবিষ্যৎ পুরোপুরি নির্ভর করছে এই দ্বিমুখী অশুভকে দ্রুত ও সম্পূর্ণভাবে দূর করার ওপর।

রাজনৈতিক বিপদটিও স্পষ্টভাবে বোঝা গিয়েছিল। ১৮৮৫ সালে জি. ভি. যোশি লিখেছিলেন ঃ

"রাজনৈতিক দিক দিয়ে বলতে গেলে, ইতিহাস পাঠে আমরা যদি ভুল না করি, ক্ষমতা অনিবার্য ভাবেই সম্পদ ও সমৃদ্ধির দিকে আকৃষ্ট হবে, এবং দেশে একটা শক্তিশালী বিদেশী বাণিজ্যিক স্বার্থ সুনিশ্চিতভাবে রাষ্ট্রের প্রতি কাজে বাগড়া দেওয়ার মত শক্তি হয়ে ওঠবে। সে শক্তি নিজের সংকীর্ণ স্বার্থে যথাসম্ভব নিজ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিকে কাজে লাগাতে এবং সরকারের কাজকর্মকে নিজের অনুকূলে প্রভাবিত করতে সব সময় চাইবে।"

২৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৯ তারিখের 'হিন্দু' মন্তব্য করেছিল ঃ

"যে দেশে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ করা হয় সে দেশের প্রশাসন সঙ্গে সঙ্গে উত্তমর্ণদের আগ্রহের বিষয় হয়ে ওঠে।"

জাতীয়তাবাদীরা একেবারে গোড়ার দিকে বিদেশী শিল্পোদ্যোগীদের এ দেশে ঢুকতে না দিয়ে বিদেশী পুঁজি ব্যবহার করার চিন্তা করেছিলেন। এর জন্য একটা শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় (সরকারি) ক্ষেত্র গড়ে তুলতে হবে এবং এই ক্ষেত্র বিদেশী পুঁজিপতিদের দূরে সরিয়ে রাখবে দু'ভাবে। প্রথমতঃ,

সরকারি ক্ষেত্রে এমন সব বড় বড় শিল্প গড়ে তুলতে হবে যা বেসরকারি ভারতীয় পুঁজির পক্ষে তৈরি করা সম্ভব নয় এবং অন্যথা বিদেশী পুঁজিপতিরা তা তৈরি করবে। দ্বিতীয়তঃ, বিদেশী পুঁজি ও ভারতীয় উদ্যোগের মধ্যে সরকারি ক্ষেত্র মধ্যস্থ এবং নিরাপত্তা প্রাচীর হিসেবে কাজ করবে। এরাই বিদেশী পুঁজি ধার করবে এবং হয় তা নিজের জন্য ব্যয় করবে অথবা নিজের আর্থিক সংস্থার মাধ্যমে ভারতীয় পুঁজিপতিদের ধার দেবে।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দেশীয় ভারী তথা মূলধনী শিল্পের ক্ষেত্রে দ্রুত শিল্পায়নের এক বলিষ্ঠ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। গণচেতনার স্তরেও একথা সত্য ছিল। ১৯৪৭ সালের পর ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে নিজ স্বার্থের অনুকূল করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী চাপের সামনে এই চেতনা ছিল এক শক্তিশালী প্রতিবন্ধক।

দেশের সম্পদ বিদেশে পাচারের কৌশল (বিদেশী উদ্যোগ কর্তৃক মুনাফা রপ্তানি ইত্যাদি) এবং অসম বাণিজ্যের মাধ্যম সাম্রাজ্যবাদী শোষণের প্রবণতা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। এর ফলে ১৯৪৭ সালের পরবর্তী কালে বিপুল পরিমাণ বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ এবং উন্নত পুঁজিবাদী দেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যের ধরন সম্পর্কে জনসাধারণ অত্যন্ত স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছিল।[৪]

(খ) জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ক্রমশ বেশি সংখ্যক মানুষকে রাজনৈতিক ভাবে দীক্ষিত এবং আন্দোলনে তাদের সামিল করেছিল। উপরন্তু, ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে অধিকাংশ জাতীয়তা-বাদী ও অন্যান্য গণ সংগঠন গঠিত হয়েছিল গণতান্ত্রিক কায়দায়। ১৯৪৭ সালের পরে এর দুটি ফল দেখা দিয়েছিল : একদিকে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে জনসাধারণের অংশগ্রহণের মূল্য হিসেবে সংসদীয় গণতন্ত্র ও নাগরিক স্বাধীনতা এবং প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছিল এবং তা বাস্তবায়িত করতে হয়েছিল। অন্যদিকে, ১৯৪৭ এর পরে ভারত সরকারকে জনমতের প্রতি সর্বদা মনযোগ দিতে হয়েছিল এবং তার ভিত্তিতে নীতি নির্ধারণ করতে হয়েছিল। নিঃসন্দেহে, এই জনমতকে নিজের কাজে ব্যবহার করার বিরাট ক্ষমতা সরকারের আছে। কিন্তু বামপন্থী দলগুলির তরফ থেকে প্রকাশ্য প্রতিযোগিতা এবং তাদের মধ্যের জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর চাপে এই স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারটি ঘটেছে কিছুটা সীমাবদ্ধতার মধ্যে। সরকার ও শাসক শ্রেণীগুলির পক্ষে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনাকে উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি, যদিও সে রকম ইচ্ছে তাদের ছিল, ঠিক যেমন পাকিস্তান, প্রাক-১৯৪৯-এর চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপিনস, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পশ্চিম এশিয়া প্রভৃতির অগণতান্ত্রিক সরকারগুলি প্রকাশ্যে এবং সম্পূর্ণভাবে এই চেতনাকে উপেক্ষা করতে পেরেছিল।

(গ) ১৯৩০ ও ১৯৪০ এর দশকে একটি উপযুক্ত বামপন্থী গোষ্ঠী গড়ে উঠল। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, যুব সমাজ, শ্রমজীবী শ্রেণী এবং দেশের কোন কোন অংশে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই গোষ্ঠী দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যদিও তারা সাংগঠনিক দিক দিয়ে এতই দুর্বল ছিল এবং রাজনৈতিক দিক দিয়ে ছিল এতই বিভ্রান্ত যে স্বাধীনতার আগে বা পরে রাজনৈতিক দিক দিয়ে পরিণত বুর্জোয়া নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সত্যিকারের যুদ্ধ ঘোষণার ক্ষমতা তাদের ছিল না, তবু প্রতিটি পর্যায়ে সবসময় তাদেরই অগ্রগতির বিপুল সম্ভাবনা ছিল। বলতে গেলে সবসময়ই তারা পর্দার আড়ালে অপেক্ষা করেছে। জনগণের কাছে তাদের দুর্বার আবেদন উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। বুর্জোয়া নেতৃত্ব বস্তুত ১৯৪৭ সালের পরে তাদের বিভ্রান্ত ও বিভক্ত করে রেখেছে এবং তাদের বক্তব্যেরই ধুয়ো তুলে আঘাত করার প্রকৃত কোন ক্ষমতাই রাখেনি। এই ধুয়ো ছিল কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ঠিক দুটি বিষয়ে। একটি হল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা আর অপরটি হল সামাজিক সাম্য ও সামাজিক ন্যায়-বিচারের ভিত্তিতে সামাজিক উন্নতি, সমাজতন্ত্র নামক অস্পষ্ট লক্ষ্যের দ্বারা তা বোঝানো হয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠভাবে জোটবদ্ধ হওয়ার বা সাম্রাজ্যবাদকে মৌলিক সুযোগ সুবিধা দেওয়া থেকে সরকারকে বিরত করার ক্ষেত্রে বামপন্থী-ভীতি একটা গুরুতর কারণ হয়েছে।

(ঘ) ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা নিজেদের সংগ্রামের সময় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার এবং বিশ্বের অন্যান্য অংশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে সংহতির এক বৈদেশিক নীতি গড়ে তুলেছিলেন। ১৮৭০ এর দশক থেকে তাঁরা আফ্রিকা ও এশিয়াতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক সম্প্রসারণের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যবহারে বিরোধিতা করেছিলেন। ব্রহ্মদেশীয় দেশপ্রেমীদের সঙ্গে আফগানদের সঙ্গে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের আদিবাসীদের সঙ্গে, আই হো-তুয়ান (বক্সার) বিদ্রোহের সময় চীনা জনগণের সঙ্গে, তিব্বতী জনগণের সঙ্গে, মিশর ও সুদানের মানুষ এবং আফ্রিকার অন্যান্য মানুষের সঙ্গে ১৮৭৮ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত সংহতির আবেগ জোরদারভাবে ব্যক্ত করা হয়েছিল এবং জনসাধারণের মধ্যে তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৯২০র দশকে এই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নীতি আরো সম্প্রসারিত হয়। ঔপনিবেশিক জনগণের সঙ্গে ভারতীয় জনগণের সংহতি এবং সারা বিশ্বে ভারত যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের রক্ষী হিসেবে পরিচিত সেই অবগতি প্রকাশ করে ডঃ এম. এ. আনসারি ১৯৭২ সালে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন :

> ইউরোপের তরফে লোকহিতব্রতী চৌর্যের ইতিহাস কঙ্গো থেকে ক্যানটন পর্যন্ত রক্ত আর যন্ত্রণার অক্ষরে লেখা রয়েছে। ভারত স্বাধীন হওয়া মাত্রই সাম্রাজ্যবাদের সমগ্র সৌধ ভেঙে পড়বে কারণ সাম্রাজ্যবাদের খিলানের এটাই হলো মূল প্রস্তরখন্ড।

১৯৩০ এর দশকে জাতীয় কংগ্রেস বিশ্বের যেকোন অংশের সাম্রাজ্যবাদের

বিরুদ্ধে দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ করল এবং এশিয়া ও আফ্রিকার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন জানালো। জাপানের নিখিল এশিয়া সম্পর্কিত প্রচার সত্ত্বেও জাতীয় কংগ্রেস ১৯৩৭ সালে চীনের ওপর জাপানী আক্রমণের নিন্দা করল এবং "চীনা জনগণের প্রতি সহানুভূতির নিদর্শণ হিসেবে জাপানী পণ্য ব্যবহার" বর্জন করার জন্য ভারতের মানুষের কাছে আবেদন জানালো। ভারতীয় জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনা এবং একদিকে সাম্রাজ্যবাদ ও অন্যদিকে সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তির শক্তিগুলির মধ্যে বিশ্বব্যাপী সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উত্তরোত্তর উপলব্ধি স্পষ্টভাবে ঘোষণা হল ১৯৩৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্মৌ অধিবেশনের সভাপতি জওহরলাল নেহরুর ভাষণে :

আমাদের সংগ্রাম ছিল ব্যাপকতর স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অংশমাত্র এবং যে সব শক্তি আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে তারা সমগ্র বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনুপ্রাণিত এবং কর্মতৎপর করে তুলেছিল। পুঁজিবাদ তার সংকট মুহূর্তে ফ্যাসিবাদের আশ্রয় নিয়েছিল।...সাম্রাজ্যবাদী সমধর্মীরা অধীন ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে দীর্ঘকাল ধরে যে ভূমিকা পালন করছিল, পুঁজিবাদ তার কোন কোন জন্মভূমিতে সেই রকমই হয়ে উঠেছিল। ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ এইভাবে নূতন ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের দুই চেহারা হিসেবে দেখা দিল।...পাশ্চাত্যের সমাজতন্ত্র এবং প্রাচ্যের ও পরাধীন দেশগুলির নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদ ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের এই জোটের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল।

যদিও জওহরলাল নেহরু ও প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতৃত্ব ১৯৪০ ও ১৯৫০ এর দশকে সাম্রাজ্যবাদকে পুঁজিবাদ হিসেবে দেখার এই দৃষ্টিভঙ্গি দ্রুত বর্জন করেছিলেন তবুও পুঁজিবাদী শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই ব্যাপক সচেতনতার প্রতি তাঁদের গভীরভাবে মনোযোগ দিতে হয়েছিল।

(ঙ) ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনগ্রসর থাকলেও খুব শক্তিশালী এক পুঁজিপতি শ্রেণী গড়ে তুলেছিল। উপরন্তু ভারতীয় পুঁজি অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত ছিল। আর তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, এই শ্রেণী গড়ে উঠেছিল এক স্বাধীন শ্রেণী হিসেবে, মুৎসুদ্দি শ্রেণী বা বিদেশী পুঁজির ছোট অংশীদার হিসেবে নয়। ব্রিটিশ বা আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজি বা উদীয়মান অতিবৃহৎ কর্পোরেশনগুলির সঙ্গে তার প্রভাবশালী অংশগুলির লক্ষণীয় কোন মিত্রতা বা অংশীদারিত্ব ছিল না। তার নিজস্ব আর্থিক ও শিল্প কাঠামোর ওপর ভিত্তি করেই তার নিজের একচেটিয়া কাঠামো গড়ে উঠেছিল। ভারতে বা বিদেশে কার্টেল ও ট্রাস্টের মাধ্যমে ব্রিটিশ পুঁজির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের বদলে ভারতের একচেটিয়া পুঁজি গড়ে উঠেছিল বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত এক বহুমুখী মিশ্র চরিত্র এবং বিভিন্ন ধরনের শিল্পগত, বাণিজ্যিক ও আর্থিক কার্যকলাপের ওপর ভিত্তি করে। ফলে, ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী মোটের ওপর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং বিদেশী পুঁজি-বিরোধী ছিল। উন্নতি-

কামী হলেও এই শ্রেণী বৃহত্তর বিদেশী পুঁজির প্রভুত্বাধীন হয়ে পড়ার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিল। আন্তর্জাতিক বৃহৎ পুঁজির কবলিত হওয়ার বদলে নিরাপত্তা-প্রাচীর হিসেবে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র গড়ে উঠতে দিতে এই শ্রেণী খুবই আগ্রহী ছিল। বিদেশী দৈত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আশা এরা করতে পেরেছিল, তার একচেটিয়া এবং কেন্দ্রীভূত চরিত্রের কারণে, এবং শক্তিশালী প্রশাসনিক ব্যবস্থার সহায়তায় এ কাজে সাহায্য হয়েছিল। এই বিষয়ে কোন বিশদ গবেষণা না থাকলেও একথা বলা যেতে পারে যে ১৯৫০ এর দশকে যখন সহযোগিতা চুক্তির যুগ এল, তখন দেখা গেলো ক্ষুদ্র ও মাঝারি পুঁজিপতিরাই সহযোগিতার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী এবং বিদেশী পুঁজিও বৃহৎ পুঁজিপতিদের বদলে তাদেরই বেশি পছন্দ করল, কারণ তাদের ওপর কর্তৃত্ব করা এবং নিয়ন্ত্রণ রাখা সোজা।

২

১৯৪৭ সালের পর সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্ক এবং 'নয়া উপনিবেশবাদের' বিপদ

ভারতবর্ষ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হল ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট এবং ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী দেশের সামাজিক উন্নতির কর্তৃত্ব লাভ করল। ঔপনিবেশিক পর্বে ভারতীয় অর্থনীতি এক অধীনস্থ অবস্থায় বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং সেটাই ছিল ভারতীয় অর্থনীতিতে ঔপনিবেশিকতার সারমর্ম। উপনিবেশবাদের রাজনৈতিক প্রভুত্বের অবসান কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঔপনিবেশিকতা-মুক্তি সূচিত করেনি এবং করতে পারেনি। বস্তুত পক্ষে, উপনিবেশের পুঁজিপতি শ্রেণী ও পুঁজি-বাদী অর্থনীতির স্বাধীন ক্রমবিকাশ ঔপনিবেশিক অর্থনীতি কিছুটা আত্মস্থ করতে পারত এবং করেছিল।

এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য হল ভারত সরকার ও ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী ১৯৪৭ সাল থেকে এক স্বাধীন ও সুষম জাতীয় পুঁজিবাদী অর্থনীতির ক্রমবিকাশ এবং অধিকতর সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও প্রভুত্ব বর্জনের লক্ষ্যে চালিত হয়েছে। ১৯৪৭ সালের আগে বা ১৯৪৭ সালের পরে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী প্রধানতঃ মুৎসুদ্দি শ্রেণী বা সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়ার ছোট অংশীদার কোনটাই ছিল না। স্বাধীন পুঁজিপতি শ্রেণী হিসেবে উপনিবেশবাদের অধীনে তার বিবর্তন এবং উপনিবেশবাদের বিরোধিতা ও সংগ্রাম থেকে আগেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল যে এরা সহসা সাম্রাজ্যবাদের মুঠোর মধ্যে চলে যাবে না এবং 'নয়া উপনিবেশবাদকে' স্বাগত

জানাবে না। সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার এবং বিশেষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ একচেটিয়া কর্পোরেশনগুলি এবং বিবিধ পণ্য উৎপাদনকারী আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলি ভারতের মধ্যে বড় রকম প্রতিষ্ঠা অর্জন করেনি। মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে, আমদানি সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা ও নিয়ন্ত্রণ এবং শুল্কের চড়া হার ভারতীয় পুঁজিপতিদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পগুলির উন্নতি সাধনের জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে, আন্তর্জাতিক কর্পোরেশনগুলির সহযোগী সংস্থা স্থাপনের সুবিধা করে দেওয়ার জন্য করা হয়নি। যদিও কারিগরী সহযোগিতা সংক্রান্ত চুক্তি আরো বেশি করা হয়েছে এবং বিদেশী বিনিয়োগ বেড়েছে, কিন্তু একথা বলা যাবে না যে ভারতের জাতীয় বুর্জোয়া গোষ্ঠী, বড়ই হোক বা ছোটই হোক, অতি বৃহৎ বিদেশী কর্পোরেশনগুলির সঙ্গে অংশীদারীতে যোগ দিচ্ছে। বস্তুত, ভারতীয় অর্থনীতিতে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ সতর্কতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে যদিও ঘোষিত সীমার মধ্যে এই ব্যাপারে অনেক উৎসাহও দেওয়া হয়েছে। তার ফলে ভারতে প্রবেশ করার ব্যাপারে বিদেশী পুঁজির ভূমিকা এ যাবৎ খুবই 'ভীরু' এবং দ্বিধাগ্রস্ত থেকেছে। উপরন্তু, ভারতীয় অর্থনীতির একটাও এমন কোন বড় বা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র নেই যা বিদেশী পুঁজির প্রভুত্বাধীন। পরিশেষে, আজ ভারতীয় অর্থনীতিতে বিদেশী লগ্নী পুঁজির বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেই, প্রভুত্বের কথা তা ওঠেই না।

ফলে ভারত আর উপনিবেশ হয়নি বা 'নয়া-উপনিবেশে' পরিণত হয়নি এবং আসন্ন ভবিষ্যতে তা আর হওয়ার আশংকাও বোধহয় নেই। বরং অনগ্রসর ভারতীয় পুঁজিবাদ স্বাধীন পুঁজিবাদী ক্রমবিকাশের পথ অনুসরণ করার চেষ্টা করে এসেছে এবং তা করেও যাবে।

একই সঙ্গে, একথাও বলা যাবে না যে ভারতীয় পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল নয় অথবা তার স্বাধীন ক্রমবিকাশ সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা গুরুতরভাবে ব্যাহত হয়নি। ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর ওপর সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রভুত্বের পরিণতি হিসেবেই সাম্রাজ্যবাদের উপর ভারতের নির্ভরতা না ঘটলেও তা ভালভাবেই আছে। তার কারণ সাম্রাজ্যবাদের উপর ভারতীয় অর্থনীতির নির্ভরতা, যার পরিণতি হল এক অধীনস্থ ভূমিকায় তার বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে থাকা। ফলে ভারতীয় অর্থনীতি ও তার ক্রমবিকাশের উপর 'বাহ্যিক' বাধা হল 'কাঠামোগত', অর্থাৎ তার বিশ্ব পুঁজিবাদের এক সুসংগঠিত অংশ হওয়ার ফল, এবং বিশ্ব পুঁজিবাদ তার এক অংশে যখন সুনিশ্চিত ভাবে সমৃদ্ধি গড়ে তোলে তখন আরেক অংশে সৃষ্টি করে অবনতি। অনগ্রসর ভারতীয় পুঁজিবাদ সেই কারণে উভয়-সংকটে পড়েছে। সে চেষ্টা করছে স্বাধীনভাবে উন্নতি লাভ করার, কিন্তু তা করছে বিশ্ব পুঁজিবাদের সঙ্গে কাঠামোগত যোগ ছিন্ন না করেই এবং তার ফলে উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে এবং সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর অর্থনৈতিক

নির্ভরতা থেকেই যাচ্ছে। পক্ষান্তরে, আজকের অবস্থায় বিশ্ব পুঁজিবাদী কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসার যে-কোন রকম প্রয়াস, এমন কি পুঁজিবাদের সীমার মধ্যে হলেও, তা সফল হতে গেলে অনিবার্যভাবেই বৈপ্লবিক রূপ নেবে। বিপ্লবের পরে কিউবার প্রাথমিক অভিজ্ঞতা এই রকমই ইঙ্গিত দেয়। সেইজন্য ভারতীয় পুঁজিবাদ সেই দিকেও কোন মৌলিক চেষ্টা করতে আগ্রহী হয়নি। ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী ও ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব ১৯৪৭ সালের আগে যেমন গণ-সমাবেশ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের এক অবৈপ্লবিক বা 'কোন রকমে উতরে যাওয়ার' নীতি তৈরি করেছিলেন, তখন থেকেই তাঁরা স্বাধীন পুঁজিবাদী ক্রমবিকাশের ঠিক অনুরূপ এক নীতি অনুসরণ করে এসেছেন এই আশায় যে সাবধানতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক সীমার মধ্যে এবং অভ্যন্তরীণ সামাজিক কাঠামোর বৈপ্লবিক পরিবর্তন ছাড়াই অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশ ক্রমশ সাম্রাজ্যবাদ-নির্ভরতার থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। ফলে, ভারত এক বিকাশশীল, কিন্তু এখনও সাম্রাজ্যবাদ-নির্ভর অনুন্নত পুঁজিবাদী অর্থনীতি-সম্পন্ন স্বাধীন দেশ হয়ে আছে।

এই কৌশলের মূল উপাদানগুলি কি যা ব্যবস্থাটিকে এখনও পর্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে টিকে থাকতে সাহায্য করেছে? এবং একে ব্যর্থ করে দিতে পারে সম্ভাব্য এমন কারণগুলিই বা কি?

(ক) প্রথমতঃ, ভারতে যে আজ বিরাজ করছে সেই রাষ্ট্র যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদনের সঙ্গে সাধারণত যে ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার জড়িয়ে থাকে সেই ধরনের সংস্কারের একটা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক কার্যক্রম অভ্যন্তরীণভাবে সম্পাদন করার জন্য ক্রমান্বয়ে চেষ্টা করে আসছে। যদিও সে চেষ্টা চলছে অবৈপ্লবিক পন্থায় এবং বিত্তবান শ্রেণীর স্বার্থে। নেতিবাচক ভাষায় বলতে গেলে, অভ্যন্তরীণ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পুনর্বিন্যাস না করলেও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ভারত চিয়াং কাই-শেকের ঢঙে নয়া-ঔপনিবেশিক বা আধা-সামন্ততান্ত্রিক কার্যক্রমও অনুসরণ করেনি। সামাজিক দিক দিয়ে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে, নারী শিক্ষা ব্যাপক হারে বেড়েছে, নারী নির্যাতনের কায়দা, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক রূপের বদলে উত্তরোত্তর বুর্জোয়া রূপ গ্রহণ করেছে, জাতিভেদ প্রথা অন্তত এতটা দূর হয়েছে যে তা পুঁজিবাদের ক্রমোন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতা করছে না (গ্রামাঞ্চলে নিম্নবর্ণের ওপর অত্যাচার ক্রমশই কৃষি মজুরির হার কম করে রাখার এবং খাজনার হার বেশি রাখার অস্ত্র হয়ে উঠেছে), এবং পারিবারিক সম্পর্ক ক্রমশ আরো বেশি করে বুর্জোয়াসুলভ হয়ে উঠছে। সাংস্কৃতিক ও নৈতিক বৈশিষ্ট্য কার্যত টাকার মাপকাঠিতে নির্ধারিত হচ্ছে। কৃষি সম্পর্কের কাঠামো ক্রমশ ধাপে ধাপে পুঁজিবাদী রূপ নিচ্ছে, যদিও, ব্রিটেন, জার্মানি ও জাপানের ক্ষেত্রে, তা ঘটেছে কৃষক ও কৃষি শ্রমিকের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে। রাজনৈতিক দিক দিয়ে, সংসদীয় গণতন্ত্র ও প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার

গ্রাম থেকে জাতীয় স্তর পর্যন্ত প্রসারিত। এমনকি নাগরিক স্বাধীনতা ও সংসদীয় গণতন্ত্রের অবমাননা এবং তার ওপর আক্রমণও হচ্ছে আধুনিক, পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে। ভারতীয় প্রশাসন যেকোন মানদণ্ডেই আধুনিক, তা সে যতই দুর্নীতিগ্রস্ত হোক না কেন; এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বুর্জোয়াগোষ্ঠীর ইচ্ছার কাছে তা সম্পূর্ণভাবে নতি স্বীকার করেছে।

(খ) দ্বিতীয়তঃ, অতি পরিণত ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এক বুর্জোয়া রাজনৈতিক নেতৃত্ব অর্থনীতিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাহায্যে এবং সরকারি বা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রকে আধুনিক শিল্পে এক অত্যন্ত সক্রিয় ও মুখ্য ভূমিকা দান করে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়েছে। অপেক্ষাকৃত কম অসমভাবে অতি বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া কর্পোরেশন এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক পুঁজির মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটেছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রকে শিল্প এবং পরিকাঠামোর উপাদান তৈরির কাজে লাগানো হয়েছে, দেশী পুঁজি দিয়ে এ কাজ হত না এবং অনিবার্যভাবে প্রয়োজন হত বিদেশী পুঁজির। বিদেশী পুঁজিকে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্জন করতে দেওয়া হয়নি, কিন্তু তাকে অর্থনীতির অঙ্গীভূত করে নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছে। মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ, চড়া শুল্ক ও চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞার সাহায্যে অতি বৃহৎ বিদেশী কর্পোরেশনগুলির পণ্য ঢুকতে না দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে তাদের বিপুলতর আর্থিক ক্ষমতা, প্রযুক্তি-সামর্থ্য ও একচেটিয়া অধিকারের বিরাট সুবিধাকে বহুলাংশে ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছে। এবং প্রতিকূল পরিবেশ থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে অনেক গাছকে যেমন ঘেরা ঘরে কৃত্রিম আবহাওয়ায় পালন করা হয়, দুর্বলতর দেশী পুঁজিকে সাহায্য সেই ভাবে করা হয়েছে। বিপুলসংখ্যক ইঞ্জিনীয়ার, বিজ্ঞানী ও কারিগরী কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রের সম্পদ ব্যবহৃত হয়েছে। এমনকি প্রশাসনিক উপায়ে বিশ্ব পুঁজিবাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক ঐক্য শিথিল করার চেষ্টা হচ্ছে।

(গ) তৃতীয়তঃ, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক সাহায্য ও কারিগরী সহায়তা এবং তাহাদের সঙ্গে বাণিজ্যের প্রসার যাহা অবৈপ্লবিক পদ্ধতিতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক কর্তব্য সম্পন্ন করা এবং স্বনির্ভর পুঁজিবাদ গড়ে তোলা ও তাকে শক্তিশালী করার প্রয়াসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সাম্রাজ্য-বাদী দেশগুলি যাতে ভারতের মাটিতে একচেটিয়া ব্যবসা ফাঁদতে না পারে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সেজন্য দর কষাকষি করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভারতে সরকারি ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করতে, ভারী মূলধনী শিল্প ক্ষেত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে, বিমান শিল্পের মত সামরিক গুরুত্বপূর্ণ শিল্প গড়ে তুলতে, এবং ভারতীয় শিল্প, পরিবহন ব্যবস্থা ও সামরিক কাঠামোর ওপর বিদেশী একচেটিয়া তেল কোম্পানিগুলির বজ্রমুষ্টি খুলতে তারাও সাহায্য করেছে। কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার এই যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে

অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারটা ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণী যেমন সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেছিল তেমনই আবার এই সম্পর্ককে পুরোপুরি এবং অন্য যে-কোন পুঁজিবাদী দেশের তুলনায় অনেক বেশি দূর পর্যন্ত কাজে লাগিয়েছিল।

(ঘ) চতুর্থত, ভারতীয় বুর্জোয়া ব্যবস্থা ১৯৪৭ সালে-এর সূচনা থেকেই গড়ে উঠেছে প্রাগ্রসর রাজনৈতিক বৈধকরণ ব্যবস্থার অর্থাৎ বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ওপর ভিত্তি করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব যেমন এক ধরনের গণ-সমাবেশ ও গণ-সংগ্রামের কায়দা গড়ে তুলেছিলেন, যা একদিকে জনগণকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করিয়েছিল অথচ অন্যদিকে তাদের নিজস্ব কোন রাজনৈতিক উদ্যম বা স্বনির্ভরতা সৃষ্টি করায়নি ঠিক তেমনই ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সংসদীয় গণতন্ত্রকে এমনভাবে ব্যবহার করেছে যে জনগণ সরকারে অংশগ্রহণ করার আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে, অথচ তাতে কোন ফলপ্রসূ হস্তক্ষেপ করার অধিকার পায়নি। তা সত্ত্বেও পরপর প্রতিটি নির্বাচন বহু মানুষকে উত্তরোত্তর রাজনীতির আওতায় এনেছে বা তাদের 'রাজনৈতিকভাবে সামাজিকীকরণ করেছে'। ফলে কোন পর্যায়েই বেশি লোক রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি। এমন কি অতি প্রগতিবাদী সমালোচকদেরও এই ব্যবস্থার বিধিবদ্ধ নিয়মকানুনের মধ্যেই কাজ করতে হয়েছে। রাজনৈতিক গণতন্ত্র এইভাবে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে সাহায্য করেছে পুঁজিবাদী বিকাশের সমগ্র ব্যয়ভার সাধারণ মানুষের কাঁধে চাপিয়ে দিতে। এমনকি, স্বনির্ভর ক্রমোন্নতি ঘটাতে ব্যর্থতা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ব্যর্থতার ফলে এমন কোন অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়নি যার দরুণ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে চূড়ান্তভাবে হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম হয়।

(ঙ) বিশেষ করে রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়তে শুরু করার পর, সর্বোচ্চ রাজনৈতিক নেতৃত্বের চারপাশে বিভিন্ন সামাজিক শক্তিকে জোটবদ্ধ করার কাজে ভারতের বিদেশ-নীতি একটা বড় ভূমিকা নিয়েছে। স্বনির্ভর পুঁজিবাদী ক্রমবিকাশের পথ অনুসরণ করার জন্য, সাম্রাজ্যবাদীদের প্রকাশ্য ব্ল্যাকমেইলের বিরুদ্ধে আঘাত হানার জন্য, এবং বামপন্থী প্রতিপক্ষের শক্তি দুর্বল করার জন্য বিদেশ-নীতি ও তার জোটবদ্ধ ভূমিকাকে সচেতনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

(চ) ভারতে পুঁজিবাদের বিকাশলাভ করতে পারার একটা বড় কারণ হল বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সত্যিকারের চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করতে পুঁজিবাদ-বিরোধী বামপন্থী গোষ্ঠীর ব্যর্থতা, এমনকি বাস্তব অবস্থা যখন এরকম চ্যালেঞ্জ ঘোষণার অনুকূল ছিল তখনও তারা এ কাজে সফল হতে পারল না।[4] ১৯৪৭ সালের আগে যেমন বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব কোন পর্যায়েই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বামপন্থী নেতৃত্বাধীন আত্মনির্ভর গণ আন্দোলনের ওপর প্রতিষ্ঠিত

গুরুতর বামপন্থী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়নি তেমনই ১৯৪৭ সালের পরেও দেশব্যাপী এরকম কোন বামপন্থী গণরাজনৈতিক আন্দোলন ঘটেনি—কৃষি বিষয়ক প্রশ্নে বা সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে অথবা পুঁজিবাদী বিকাশ-পথের প্রশ্নে ও তার পরিণাম নিয়েও এরকম আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। অনেক বামপন্থী ধরে নিয়েছিলেন যে বিপ্লবী শক্তিগুলির ভয়ে এবং 'উৎখাত' হয়ে যাওয়ার আশংকায় বুর্জোয়া সম্প্রদায় দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়বে, অর্থনৈতিক উন্নতি ও রাজনৈতিক গণতন্ত্রসহ অভ্যন্তরীণ বুর্জোয়া সংস্কারসাধন ত্যাগ করবে এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কমিউনিজম-বিরোধী ও জনবিরোধী জেহাদে যোগ দেবে। এই ধরে নেওয়া সিদ্ধান্তের মধ্যে 'একমাত্র' ভ্রান্তি হল এই যে একটা ভীতিকর বিপ্লবী শক্তির যে উপস্থিত আছে সেটা ধরেই নেওয়া হয়েছে!

বাস্তবে কিন্তু তা ঘটেনি। সংস্কারপন্থী বুর্জোয়া গোষ্ঠী এইভাবে আধা-সামন্ততন্ত্রবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে দুর্বল করে দিতে এবং কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই পুঁজিবাদ গড়ে তুলতে উত্তরোত্তর সফল হয়েছে। এর যাথার্থ কারণ হল বামপন্থী গোষ্ঠী তাকে সব সময় সজাগ রাখার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল, কিন্তু যতটা শক্তি থাকলে উক্ত বুর্জোয়া গোষ্ঠী ভীত হয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের কোলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হতে পারত ততটা শক্তি বামপন্থীদের ছিল না। অন্যভাবে বলতে গেলে, এক্ষেত্রে এক দ্বন্দ্বমূলক, পারস্পরিকভাবে শক্তিবৃদ্ধিকারী উন্নয়ন ঘটেছে। বুর্জোয়া উদারনীতি ও সংস্কার, স্বনির্ভর পুঁজিবাদী ক্রমবিকাশ, এবং সাম্রাজ্যবাদী জোট ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে দূরে থাকার নীতি জনগণের ওপর স্বীয় রাজনৈতিক প্রভাব বজায় রাখতে এবং বামপন্থীদের দুর্বল করে রাখতে বুর্জোয়া নেতৃত্বকে সাহায্য করেছে। একই সঙ্গে, বামপন্থীদের দুর্বলতা বুর্জোয়া গোষ্ঠীকে উদার থাকতে ও সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের বাইরে থাকতে এবং পুঁজিবাদকে বিকশিত করতে সাহায্য করেছে।

স্বনির্ভর পুঁজিবাদী ক্রমবিকাশের নীতি অবশ্য দুটি মূল বাধায় আটকে যায়। যে সব মৌলিক অভ্যন্তরীণ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন অর্থনীতিকে অনিবার্যভাবে পুঁজিবাদী পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায় কোন অনগ্রসর পুঁজিবাদী দেশের পক্ষে আজ সেই সব পরিবর্তন ছাড়া উন্নতি করা অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, যতদিন এই অর্থনীতি বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির সুসংগঠিত অধীন অঙ্গ হয়ে থাকবে ততদিন তার উন্নতির পথে মৌলিক বাধাগুলি থাকবে। ফলে, পুঁজিবাদী পথ অনুসরণ করলেও নিজের জাতীয় সমস্যাগুলি সমাধান করা ভারতের পক্ষে অসম্ভব হয়েছে।[৪] তবে এটাও সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করতে হবে যে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় ক্ষেত্রেই এইসব বাধা হোল কাঠামোগত অথবা ব্যবস্থার বাধা, ঐ ব্যবস্থার মধ্যেই এগুলি তৈরি বা তারই অন্তর্ভুক্ত। 'সাম্রাজ্যবাদের ওপর ভারতের নির্ভরতা হোল একটা ব্যবস্থার নির্ভরতা যা বিশ্ব-পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ভারতীয়

পুঁজিবাদের স্থান থেকেই উদ্ভূত। ভারতীয় অর্থনীতির ওপর বিদেশী পুঁজির কব্জা, ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর মুৎসুদ্দি চরিত্র অথবা বিদেশী পুঁজির ছোট অংশীদারিত্ব অথবা প্রত্যক্ষভাবে বা বিদেশী সাহায্যের মারফৎ বা সাধারণভাবে 'লগ্নি পুঁজির' মাধ্যমে ভারতীয় রাষ্ট্রের ওপর সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব এসব থেকে এই নির্ভরতা সৃষ্টি হয় নি।' আগেই যেমন বলা হয়েছে, বিদেশী পুঁজি অথবা আন্তর্জাতিক কর্পোরেশন অথবা লগ্নি পুঁজি কোনটিরই ভূমিকা ভারতীয় অর্থনীতিতে প্রধানও নয়, অথবা ক্রমবর্ধমানও নয়। অথবা ভারতের সামনে পুঁজিবাদী শিল্পের শুধু মাত্র একটি কেন্দ্রও নেই। মার্কিন বেসরকারী বিদেশী পুঁজি ভারতে ব্রিটিশ বিদেশী পুঁজির অনুগামী হিসেবে কাজ করে, তা সে আর্থিক দিক দিয়েই হোক বা সহযোগিতা চুক্তির দিক দিযেই হোক। বাণিজ্য, সাহায্য, বিদেশী পুঁজি ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতায় ভারত 'নিজের খেলা খেলে চলেছে'। এখানেও আবার ভারতের যে অধীনতার সম্পর্ক তা প্রভাবশালী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অধীনতা নয়, সমগ্র বিশ্ব-পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই অধীনতা। সন্দেহ নেই, অন্যান্য অনগ্রসর দেশের মতই ভারত আজ প্রযুক্তিগতভাবে পরনির্ভর এবং বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কিছু শিল্পের ক্ষেত্রে, তা কিছু কিছু ধরনের নিয়ন্ত্রণের দিকে চালিত করতে পারে।[৫] লক্ষ্য করতে হবে যে এটাও সাম্রাজ্যবাদের উপর ভারতীয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নির্ভরতারই ফল।

এসবের অর্থ অবশ্য এই নয় যে স্বনির্ভর পুঁজিবাদের নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে ভারতকে সব সময় নয়া-উপনিবেশবাদের বিপদের মুখোমুখি হতে হয় না। কিন্তু, অনগ্রসর পুঁজিবাদ কাঠামোগতভাবে ও সামাজিকদিক থেকে সামাজিক প্রয়োজনগুলি পূরণের মত একটা ন্যূনতম বাঞ্ছিত স্তর পর্যন্ত নিজেকে ও দেশকে উন্নীত করতে অসমর্থ হওয়ার ফলেই প্রধানত এইরকম বিপদের সৃষ্টি হচ্ছে। সামাজিক ব্যর্থতা যখন উত্তরোত্তর প্রকট হয়ে উঠবে এবং অধিকাংশ মানুষ যখন উত্তরোত্তর তা আর মেনে নিতে চাইবে না এবং এই অসন্তোষকে ব্যক্ত করতে সঠিক নেতৃত্ব এগিয়ে আসতে শুরু করবে তখন পুঁজিপতি শ্রেণী ও তার প্রধান নেতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছ থেকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমর্থন লাভের চেষ্টা করতে বাধ্য হবে। যেসব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা অংশত বিশ্ব-পুঁজিবাদের সঙ্গে তাদের সংযোগের ফলে সৃষ্টি হয়েছে সেগুলি সমাধানের জন্যই তারা বিশ্ব-পুঁজিবাদের সঙ্গে সংযোগ আরো জোরদার করতে বাধ্য হবে। গণ-বিদ্রোহের প্রকৃত আশংকা দেখা দিলে প্রচলিত ব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্য অন্য শক্তির সহায়তা-নির্ভর রাজনৈতিক ও সামরিক সংযোগও গড়ে তোলা হতে পারে। অনুমান করা যায়, এর ফলে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ওপর নির্ভরশীলতাও বাড়তে পারে। কয়েক বছর আগে গণ-বিদ্রোহ দমন করার জন্য কোন পুঁজিবাদী সরকারকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাহায্যের সম্ভাবনা এক কথাতেই বাতিল করে দেওয়া যেত। কিন্তু আজ এরকম

সম্ভাবনা অত অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। নয়া-উপনিবেশবাদকে ঢুকতে না দেওয়ার এবং উন্নয়নশীল পুঁজিবাদের স্বনির্ভরতাকে শক্তিশালী করার জন্য সাহায্যের জিগির তুলেও এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। এও লক্ষ্য করা যেতে পারে যে ভারতের মত প্রাক্তন-উপনিবেশকেই শুধু যে নয়া-উপনিবেশবাদের এই রকম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপদের শাসানির মুখোমুখি হতে হয় তা নয়। অনেক আগেই লেনিন লক্ষ্য করেছিলেন যে অন্যান্য উন্নয়নশীল বা উন্নত পুঁজি-বাদী দেশও এর সম্মুখীন হতে পারে। উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথমার্ধের বিভিন্ন সময়ে পোর্তুগাল, স্পেন, ইটালি বা এমনকি রাশিয়ারও অবস্থা যে রকম ছিল আজকের ভারতবর্ষের অবস্থা অনেকটা সে রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপরন্তু, আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির অত্যন্ত সংগঠিত ব্যবস্থায় কানাডা, স্পেন গ্রীস ও যুগোস্লাভিয়ার মত দেশগুলিকে বা এমনকি জাপান ও স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশগুলিকেও অবিরাম এই আশংকার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ভারতের ক্ষেত্রে কেবল আশঙ্কার মাত্রাও বেশি এবং অধিকতর প্রত্যক্ষ।

ভারতে সাম্রাজ্যবাদ, আধা-উপনিবেশবাদ বা 'নয়া-উপনিবেশবাদের' বিরুদ্ধে লড়াইকে তাই পুঁজিবাদের বিকাশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের রূপ নিতে হবে। বর্তমানে ভারত বিদেশী পুঁজি-শাসিত নয়া-উপনিবেশ বা আধা-উপনিবেশ নয়। ভারত আজ স্বনির্ভর পুঁজিবাদের পথে চলেছে বলে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ ঘটছে এবং 'নয়া-উপনিবেশবাদের' বিপদ সৃষ্টি হচ্ছে। একই ভাবে, সাম্রাজ্যবাদী চাপও প্রধানত রাষ্ট্রদূত, বিশ্বব্যাংকের অফিসার, বিদেশী পুঁজি নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির মাধ্যমে সৃষ্টি করা হচ্ছে না, করা হচ্ছে অর্থনৈতিক বাস্তবতার মাধ্যমে। এই কারণেই ভারতে সমগ্র মার্কিন প্রয়াস ও চাপ মুখ্যতঃ ব্যবহার করা হয়েছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশ বা বেসরকারী উদ্যোগের উন্নতিবিধানের জন্য এ দেশকে আরো বেশি করে আন্ত-র্জাতিক পুঁজিবাদের জালে জড়াতে এবং গৌণভাবে কেবল ব্যবহার করা হয়েছে মার্কিন বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য।[7] ভারতকে সোভিয়েতের অর্থনৈতিক সহায়তার উদ্দেশ্য ও পরিণাম যে স্বনির্ভর পুঁজিবাদ গড়ে তোলা, সমাজতন্ত্র নয়, পুঁজিবাদী শক্তিকেই শক্তিশালী করা, সামাজিক বিপ্লবের শক্তিকে নয়, এই কথা স্পষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই সহায়তার বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঐকান্তিক প্রতিবাদ থেমে যাওয়ার কারণও এটাই। ভারতের উন্নতির জন্য আন্তর্জাতিক দায়ের অংশীদার হিসাবে এই সহায়তা তখন প্রশংসাও পেল।

এখানে স্বীকার করা যেতে পারে যে বিশ্ব-পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিতে নির্ভরশীল ভূমিকায় ভারতীয় অর্থনীতির অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি, অন্যান্য অনুরূপ অনগ্রসর পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্তর্ভুক্তির মতই এখনও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা হয়নি। এক্ষেত্রে যা বোঝা গেল সেটা হচ্ছে এই যে এসব দেশকে নিছক উৎপাদিত পণ্যের বাজার বা কাঁচামালের উৎস বা বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করার ব্যাপারটিই কেবল জড়িত নয়, এছাড়াও

সাহায্য, বাণিজ্য, অর্থ, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, মগজ-চালান, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে সামরিক প্রতিরক্ষা, এবং সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের (যেমন, অনগ্রসর অংশ সহ, সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়ায়, অর্থশাস্ত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন অগ্রগতি) মাধ্যমে এক বিশ্বব্যাপী কাঠামোতে তাদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিও এর সঙ্গে জড়িত।

টীকা

1. ব্রিটেন কর্তৃক ভারতবর্ষ বিজয় এবং সমস্ত ব্রিটিশ-বিরোধী বিক্ষোভ নির্মমভাবে দমন করার বিরুদ্ধে ব্রিটেনের সাধারণ মানুষ কেন যে প্রতিবাদ জানায়নি, এ থেকেই তার কারণ বোঝা যায়। যেমন, তরোয়াল, তীরধনুক নিয়ে লড়াই করার সময় হাজার হাজার আদিবাসীকে ভারতবর্ষে মোতায়েন অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, সুশৃঙ্খল ব্রিটিশ বাহিনী কচুকাটা করেছিল। কিংবা, আর একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—1857 সালে বিদ্রোহী সিপাহীদের হাত থেকে দিল্লি পুনর্দখলের পর ব্রিটিশ বাহিনী সেখানেই কেবল ২৫,000 মানুষকে হত্যা করেছিল, অথচ ব্রিটেনের লোক এই ঘটনাটিকে 'বিদ্রোহে'র উপযুক্ত প্রতিশোধ বলে মনে করেছিল। অনুরূপভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশ বিজয় এবং সেসব স্থানে দমনপীড়ন চালানোর জন্য ব্যবহৃত সৈন্যরা হয় ভারতীয় হত নতুবা হত ব্রিটিশ, আইরিশ এবং ইউরোপীয় সমাজের নিচুতলা থেকে সংগ্রহ করা ইউরোপীয় 'স্বেচ্ছাসেবক'। এক্ষেত্রেও সম্মানিত ব্রিটিশ নাগরিকদের পুত্র হারা হতে হয় নি। সুতরাং ভারত সাম্রাজ্য কোন 'হীন' বা বেদনাদায়ক বিষয় ছিল না। সকাল বেলায় ঘুম ভেঙে চা খেতে খেতে খবরের কাগজে সাম্রাজ্যের ক্ষমতা ও গৌরব এবং মানব-কল্যাণে কি কি কাজ হয়েছে তার ফিরিস্তি পড়তে পড়তে দিনটা ভালই শুরু করা যেত।

2. আসলে, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে লাতিন আমেরিকায় ব্যবহার করা যায় নি, এবং সেই কারণেই বোধহয় ঐ বকলমে সাম্রাজ্যটি ধীরে ধীরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হাতছাড়া হয়ে গেল।

3 সাম্রাজ্যবাদী শোষণ সম্পর্কে এই সচেতনতা এবং 'ভীতি' নতুন করে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে ঐ ভীতি দূর করার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি সমাজ-বিজ্ঞানকে কাজে লাগানো হয়েছে, প্রমাণ করা হচ্ছে যে গোটা ধারণাটাই ভুল বা ফাঁপানো, 'জাতীয়তাবাদী আতঙ্ক'ই তার জন্য দায়ী। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বৈধতা যেমন, জাতীয় মনস্তত্ত্ব, স্বাধীনতার জন্য বিমূর্ত আকাঙ্ক্ষা বা নতুন 'আলোকপ্রাপ্ত' স্বার্থের যুক্তিতে মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু ঔপনিবেশিক সমাজগুলির সব শ্রেণী ও স্তরের উপর সাম্রাজ্যবাদী শোষণের প্রতিক্রিয়া হিসাবে গড়ে ওঠা এদের মূল চরিত্র মেনে নিতে সজোরে অস্বীকৃতি জানানো হয় এবং নিছক 'ভাবাদর্শ' বলে চিহ্নিত করা হয়।

4. ভারতবর্ষে ও বাইরে বামপন্থীদের একটি বড় ভুল হল এই যে তাঁরা সমাজব্যবস্থাকে উৎখাত করতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে 1947 থেকে এই পদ্ধতি বা সমাজব্যবস্থা মূলগতভাবে অনড় হয়ে আছে এবং উৎখাত না হওয়া পর্যন্ত তাই থাকবে। কিন্তু ইতিহাস এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না, পরিবর্তন ঘটে অনবরত। পুঁজিবাদ যে উৎখাত হচ্ছে না অন্যান্য কারণের মধ্যে ঠিক এ জন্যই তার বিকাশ ঘটছে।

5. আবার বলতে চাই, 1947 থেকে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার এটাই মূল দুর্বলতা, 'নয়া-উপনিবেশ' হওয়ার কোন প্রবণতা এ জন্য দায়ী নয়। 'নয়া উপনিবেশবাদ' নয়, পুঁজিবাদী পথই ভারতীয় রাজনীতি ও সমাজ উন্নয়নের মূল বিষয়।

6. বর্তমান কালে সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্প অনুযায়ী কাজের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত প্রাধান্য ক্রমশঃই বেশি বেশি করে যে ভূমিকা পালন করেছে এবং, সে কারণেই, সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে স্বাধীন প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রচনাদিতেও যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। 1920 এবং 1930-এর দশকে ভারী, মূলধনী শিল্পের ক্ষেত্রে যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল, প্রযুক্তিবিদ্যাকে সেই ভূমিকাই দেওয়ার সুপারিশ করা যায়।

7. রাজনৈতিক বা সামরিক দিক দিয়ে ভারতকে মার্কিন শিবিরে যোগদান করানো গত 25 বছরে ভারতের প্রতি মার্কিন নীতির অন্যতম, মূল লক্ষ্য ছিল না বললেই হয়।

১৯২০র দশকে উত্তর ভারতে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী : আদর্শগত বিকাশ

১৯২০র দশকে উত্তর ভারতের বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীরা তাঁদের জীবদ্দশাতেই জনপ্রিয় বীর হয়ে উঠেছিলেন এবং আজও লোকে তাঁদের সে ভাবেই দেখে। কিন্তু লোকচক্ষে তাঁদের ভাবমূর্তি সর্বদাই বিমূর্ত বা "বিশুদ্ধ" জাতীয়তাবাদের আবেগে ভরপুর এবং "দেশমাতৃকার বেদীতে" আত্মোৎসর্গের আকুল আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত বীর তরুণ দল বলে পূজিত। তাঁদের সমালোচকরা অবশ্য তাঁদের সম্পর্কে অনেক রূঢ় মন্তব্য করেছেন। তবে তাঁদের অনুরাগী ও সমালোচক সবাইয়েরই সব সময় অভিমত হল যে এইসব নির্ভীক তরুণের কোন সামাজিক মতাদর্শ ছিল না, তাঁদের কর্মকে পরিচালিত করার মত ছিল না কোন চিন্তা, অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে তাঁরা ছিলেন 'নির্বোধ দেশপ্রেমী'। বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীরা এই ব্যাপক-প্রচলিত অভিমত সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত ছিলেন। প্রকাশ্যে তাঁরা যে সব বিবৃতি দিয়েছিলেন সেগুলির একটিতে বলা হয়েছিল : "যে বিরাট আদর্শ তাঁরা অন্তরে লালন করেন এবং যে মহান ত্যাগ তাঁরা করেছেন তার মহত্ত্বের ব্যাপারে খুব কম মানুষই সন্দেহ পোষণ করেন, কিন্তু তাঁদের সাধারণ কাজকর্ম অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোপন হওয়ার ফলে তাঁদের বর্তমান নীতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে দেশে কেউ কিছু জানেন না।"[1] এই ব্যবধান দূর করার জন্য তাঁরা তখন বহু বিবৃতি ও প্রচার-পত্র প্রকাশ ও বিতরণ করেছিলেন এবং তার কিছু কিছু জাতীয় সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে অনেকগুলি এখন পাওয়া যায়, যদিও আরো অনেকগুলির সন্ধান এখনও মেলেনি। তাছাড়া, বিপ্লবী আন্দোলনে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ইদানিং কয়েকটি চমৎকার আত্মজীবনী প্রকাশ করেছেন। আজ আর পুরোন বিশ্বাস আঁকড়ে থাকার বিশেষ যুক্তি নেই।

২

১৯২০র দশকে উত্তর ভারতে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ছিল তৎকালীন পরিস্থিতিতে নূতন কিছু উপাদানের পরিণতি। নিঃসন্দেহে তার উদ্ভব

১৯৬৮র নভেম্বরে অনুষ্ঠিত 'সোস্যালিজম ইন ইন্ডিয়া, ১৯১৯-৩৯' শীর্ষক আলোচনা-চক্রে পঠিত। 'সোস্যালিজম ইন ইন্ডিয়া'তে প্রকাশিত, সম্পা. বি. আর. নন্দা, নয়া দিল্লি, ১৯৭২।

অপেক্ষাকৃত ভাল শব্দের অভাবে "বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী" এই শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কোন রকম সমালোচনা বা মূল্য-নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়নি। এর বদলে কিছু কিছু হিন্দি লেখকদের মত তাঁদের "সশস্ত্র বিপ্লবী" বলে বর্ণনা করা যেত।

ঘটেছিল আগেকার বিপ্লবী আন্দোলন যথা প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রাসবিহারী বোস ও শচীন্দ্রনাথ সান্যালের প্রয়াস, হার্ডিঞ্জ বোমার মামলা, গদর আন্দোলন, মৈনপুরী ষড়যন্ত্র এবং প্রথম লাহোর ষড়যন্ত্র মামলাকে ভিত্তি করে। বাংলা, মহারাষ্ট্র ও ইউরোপের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

তাছাড়া, অসহযোগ আন্দোলন ও ভারতীয় রাজনীতির ওপর তার স্থায়ী প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে এই আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। নূতন বিপ্লবী আন্দোলনের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ সদস্যই অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন, এবং অভূতপূর্ব গণআন্দোলনের ফলে যে প্রবল উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল এবং গান্ধী এক বছরের মধ্যে স্বাধীনতা অর্জনের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার যে আশার সঞ্চার হয়েছিল তারা ছিলেন তার অংশীদার। অহিংস সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন, যোগেশ চন্দ্র চ্যাটার্জী, চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগৎ সিং, সুখদেব, যতীন দাস, ভগবতী চরণ ভোহরা, যশপাল, শিব ভার্মা, ডঃ গয়া প্রসাদ ও জয়দেব কাপুর। কিন্তু যে উচ্চাশার সৃষ্টি হয়েছিল অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতা তাকে নষ্ট করে দিল। গান্ধী যে ভাবে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন তাতে যে সব তরুণ তাঁর ডাকে স্কুল কলেজ ছেড়ে, এমন কি ঘর-সংসার ছেড়ে ছুটে এসেছিল তাদের মধ্যে গভীর অসন্তোষ দেখা দিল। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সর্বজনীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য গড়ে উঠেছিল, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উন্মত্ততা ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ফলে বিষিয়ে যাওয়া পরিবেশে তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাওয়ায় তাদের হতাশা আরো বেড়ে গেল। এইসব আদর্শবাদী তরুণ চৌরিচৌরার ঘটনাকে ভুল বলে মনে করেনি। যে রাজনৈতিক ও নৈতিক চিন্তাধারা একটি শক্তিশালী গণ-আন্দোলনকে এক আঘাতে ভেঙ্গে দেয় তাকেও তারা মেনে নিতে পারেনি। জাতীয় নেতৃত্ব তাদের কাছে যে দুটি বিকল্প রেখেছিলেন: স্বরাজ্যবাদীদের সংসদীয় গণতন্ত্র অথবা কাউন্সিল-বয়কটপন্থীদের তথাকথিত গঠনমূলক কার্যক্রম তাতেও তারা সন্তুষ্ট হয়নি। যতই এই তরুণেরা চারিদিকের হতাশা ও নৈরাশ্যের কথা ভাবতে লাগল, সর্বোচ্চ জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের মূল কৌশল এবং তার যেটা ভিত্তি গান্ধীর সেই রাজনৈতিক চিন্তাধারার ত্রুটি ততই তারা দেখতে পেল। গান্ধীবাদকে বর্জন করার ফলে তাদের বিকল্পের অনুসন্ধান করতে হল। এই অনুসন্ধানই তাদের একদিকে সমাজতন্ত্রের দিকে এবং অন্যদিকে বিপ্লবী সন্ত্রাস-বাদের দিকে চালিত করলো। তারা দুটিকেই সাগ্রহে গ্রহণ করল বিপ্লবী রুশ তরুণরা অর্ধশতক আগে ঠিক যেমন করেছিল।

তৃতীয় যে ঘটনাটি সূচনায় অস্পষ্টভাবে হলেও, তাদের প্রভাবিত করেছিল, তা হল প্রথম মহাযুদ্ধের পরে শ্রমিকশ্রেণীর জাগরণ। বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের উদীয়মান নেতৃবৃন্দ ছাড়াও প্রবীণতর নেতৃবৃন্দের অনেকেই এই নূতন সামাজিক শক্তির ওপর সতর্ক নজর রেখেছিলেন। তাঁরা এই নূতন

শ্রেণীর বৈপ্লবিক সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং তাকে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন।[২] ১৯২৮ সালে যখন ধর্মঘটের ঢেউ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল সেই সময় শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি ভালভাবে উপলব্ধি করা গেল।[৩]

রুশ বিপ্লব এবং দেশের ভেতরে প্রতিক্রিয়ার প্রচণ্ড বাধা ও শক্তিশালী বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে নিজেকে সংহত করার কাজে নূতন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটির সাফল্য নবীন বিপ্লবীদের খুব বেশি প্রভাবিত করেছিল। এর ফলে তাঁরা মার্ক্সবাদী সাহিত্য ও সমাজতন্ত্র বিষয়ক অন্যান্য বই পড়াশোনায় আগ্রহী হলেন। প্রবীণতর বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীরা সেই ১৯২৪ সালেই[৪] সোভিয়েত বিপ্লব ও কমিউনিজম নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলেন। ক্রমশ সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে বেশি বেশি তথ্য অল্প অল্প করে ভারতে পেঁছিতে লাগল। সোভিয়েত ইউনিয়ন সংক্রান্ত রচনা লাহোরে সহজেই পাওয়া যেত এবং লালা লাজপত রাইয়ের প্রতিষ্ঠিত দ্বারকাদাস লাইব্রেরীতে গভীর আগ্রহের সঙ্গে সেগুলি পড়া হত।[৫] এর একটা তাৎক্ষণিক ফল দেখা গেল। ভগৎ সিং ও সুখদেব সোভিয়েত ইউনিয়নকে তাঁদের আদর্শের সবচেয়ে কাছের দেশ হিসেবে দেখতে শুরু করলেন।[৬] সোভিয়েত ইউনিয়নকে জনপ্রিয় করার জন্য বিপ্লবী আন্দোলনের প্রকাশ্য সংগঠন (গুপ্ত শাখার পরিবর্তে) যে ঐকান্তিক চেষ্টা করেছিল তাতেও সেই দেশের ক্রমবর্ধমান প্রভাব স্পষ্ট হয়েছিল। এই প্রকাশ্য সংগঠন 'নওজওয়ান ভারত সভা', ১৯২৮ সালের অগাস্ট মাসে র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেসীদের সঙ্গে "রাশিয়া সুহৃৎ সপ্তাহ" উদযাপন করেছিল। একই মাসে এই সভা রুশ বিপ্লবের প্রশস্তি করার জন্য একটি সভার আয়োজন করেছিল।[৭] কারারুদ্ধ বিপ্লবীরাও অনুরূপ ভাবে প্রচার করেছিলেন। ১৯৩০ সালের ২৪ জানুয়ারি লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীরা আদালতে "লেনিন দিবস" উদযাপন করেছিলেন এবং মস্কোতে অভিনন্দনবার্তা পাঠিয়েছিলেন।[৮] একই ভাবে ১৯৩০ সালের নভেম্বরে তাঁরা বিপ্লব-বার্ষিকী উপলক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নে অভিনন্দনবার্তা পাঠিয়েছিলেন।[৯]

সোভিয়েত প্রভাবের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য নেওয়া এবং বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার কৌশল, পদ্ধতি ও সংগঠন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য ভারতীদের সেখানে পাঠানোর ব্যাপারে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের আগ্রহ। ১৯২৬ সালে হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের (এইচ. আর. এ.) আশফাকুল্লাহ রাশিয়ায় যাওয়ার পরিকল্পনা করার সময় কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হন।[10] ১৯২৮ সালে সদ্য-প্রতিষ্ঠিত হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান (আর্মি) অ্যাসোসিয়েশন (এইচ. এস. আর. এ.) বিজয় কুমার সিংহকে সোভিয়েত ইউনিয়নে যাওয়ার জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করে।[11] পরবর্তী সময়ে চন্দ্রশেখর আজাদ ব্যর্থ চেষ্টা করেন যশপাল ও সুরেন্দ্র পাণ্ডেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে পাঠানোর।[12] রুশ বিপ্লবের প্রভাব

শুধু বিপ্লবীদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা প্রচারের ক্ষেত্রেই নয়, তাদের অনেককে নিছক সন্ত্রাসবাদী ধারণা থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রেও একটি বড় ভূমিকা নিয়ে ছিল।[13]

তরুণ সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা দেশের সর্বত্র দল বেঁধে গড়ে ওঠা ছোট ছোট কমিউনিস্ট গোষ্ঠীগুলির সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। বিশেষত পাঞ্জাবে এবং কানপুর ও এলাহাবাদেও তাঁরা কমিউনিস্টদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিলেন।[14] ১৯২৮-১৯৩০ সালে কমিউনিস্ট গোষ্ঠীগুলি এবং বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীরা নওজওয়ান ভারত সভায় এক সঙ্গে কাজ করেছিলেন।

ক্রমশ বিপ্লবী গোষ্ঠী ও ব্যক্তিরা হতাশ ও নিরুদ্যম অবস্থা কাটিয়ে উঠতে শুরু করলেন। এক সর্বজনীন সংগঠন সৃষ্টির প্রয়াসে তাঁরা ১৯২৪ সালে "প্রবীণদের" অর্থাৎ শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জী ও রামপ্রসাদ বিসমিলের মত পুরোন বিপ্লবীদের হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্মি গঠন করলেন।[15] ভগৎ সিং, শিব ভার্মা, সুখদেব ও আজাদের মত তরুণরা ছিলেন এইচ. আর. এ-র সদস্য এবং এর কার্যক্রম ও চিন্তাধারা ছিল পুরোন ও নূতনের এক মিশ্রণ। এইচ. আর. এ. নবীন বিপ্লবীদের এক প্রাগ্রসর কর্মসূচি রচনায় সাহায্য করেছিল এবং পুরোন ঐতিহ্যের সঙ্গে নবীনদের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতেও তাদের সাহায্য করেছিল।[16] এর ফলে সৃষ্টি হল প্রাগ্রসর বৈপ্লবিক সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন এক বৈপ্লবিক কার্যক্রম যার মধ্যে তখনও সন্ত্রাসবাদী প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত সশস্ত্র কার্যকলাপকে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। নূতন কার্যক্রম পুরোপুরি স্পষ্ট হল যখন তরুণ বিপ্লবী দল ১৯২৮ সালের ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর মিলিত হলেন ফিরোজশা কোটলা মাঠে, গঠন করলেন এক নূতন নেতৃত্ব, এবং তাঁদের দলের একটু নতুন ধরনের নাম দিলেন দ্য হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন (আর্মি)।[17]

৩

নতুন যুগের এই সব সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী ছিলেন আদর্শবাদী মানুষ, তাঁদের সুনির্দিষ্ট চিন্তাধারাও ছিল।[18] তাঁদের চিন্তাধারা অবশ্য দ্রুত বিকশিত হচ্ছিল এবং বলতে গেলে কিভাবে তা বিকাশ লাভ করেছে তা আনুধাবন না করলে সেটা বোঝা যাবে না। উপরন্তু, সুনির্দিষ্ট চিন্তাধারা সম্পন্ন যে-কোন আন্দোলনের ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে, এই সব চিন্তাধারা এই বিপ্লবীদের সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের কণ্ঠে একই সুরে উচ্চারিত হত না। স্বাভাবিকভাবেই কেউ কেউ তাত্ত্বিক নেতার ভূমিকা নিয়েছিলেন। যেমন, ভগৎ সিং এবং ভগবতীচরণ

ভোহ্‌রার ভূমিকা স্পষ্টতই এই রকম ছিল। এঁদের দুজনের ছিল অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং তাঁদের নিজেদের ভাবনা-চিন্তা লিপিবদ্ধ করার ক্ষমতাও ছিল দারুণ। আন্দোলনের অন্যান্য তাত্ত্বিক নেতাদের মধ্যে ছিলেন শিব ভার্মা, বিজয় কুমার সিংহ, সুখদেব এবং পরবর্তী সময়ে যশপাল। আন্দোলনের লক্ষ্যের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যকে যুক্ত করার ব্যাপারটাও এঁদের (যশপাল ছাড়া, তিনি আন্দোলনে এসেছিলেন পরে) কল্যাণেই সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু সমগুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল এই যে অন্যান্যরা এইসব ভাবনা-চিন্তা সম্পর্কে আলোচনা করতেন, সেগুলি বুঝতেন এবং পূর্ণ দায়িত্বে সেগুলি গ্রহণ করতেন। যেমন, চন্দ্রশেখর আজাদ শুধু সামরিক নেতাই ছিলেন না। ইংরেজীতে লেখা বইপত্র তিনি অন্যদের দিয়ে পড়াতেন এবং সেগুলির মধ্যে নিহিত ভাবনা-চিন্তা নিজে উপলব্ধি না করা পর্যন্ত সেগুলি ব্যাখ্যা করাতেন। চিন্তার ক্ষেত্রে প্রতিটি বড় পরিবর্তন তিনি অনুসরণ করতেন এবং ভালভাবে আলোচনা করে এবং নিজে নিঃসন্দেহ হয়ে তবেই সেগুলি অনুমোদন করতেন।[১৯] আজাদের অনুরোধে এবং তাঁর সঙ্গে ভালভাবে আলোচনা করেই ভগবতী চরণ তৈরি করেছিলেন 'বোমার-দর্শনে'র খসড়া।[২০]

তাত্ত্বিক নেতাদের স্তরে বৈপ্লবিক চিন্তাধারা এত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত এবং চমৎকারভাবে ব্যাখ্যাত ছিল যে নিম্নবর্ণিত দলিলগুলিতে চোখ বোলালেই তা বোঝা যাবে। তরুণ বিপ্লবীরা তাঁদের ব্যাখ্যাকে দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট করার ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান ছিলেন, কারণ এ ব্যাপারে তাঁরা পুরোপুরি সচেতন ছিলেন যে বিপ্লবীদের "বরাবরই ইচ্ছাকৃতভাবে বা স্রেফ অজ্ঞতাবশত ভুলভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে"; তাঁরা চেয়েছিলেন লোকে "বিপ্লবীদের যথাযথভাবে জানুক"।[২১] কিন্তু দলের অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত ও কম সোচ্চার সদস্যরা যখন তাঁদের ভাবনাচিন্তা প্রকাশ করতে লাগলেন তখন স্বভাবতই তা অনেক অস্পষ্ট হয়ে পড়ল। ইন্দর পাল গোষ্ঠীর লেখা **আতশী চক্কর** শীর্ষক প্রচার পত্রগুলো পড়লেই এটা বোঝা যাবে।

৪

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সবচেয়ে বড় অগ্রগতি নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সংজ্ঞা নির্ধারণে ও বিকাশের ক্ষেত্রে। পরিস্ফুট মতাদর্শগত স্তরে যে সব প্রশ্নের উত্তর তাঁরা দেওয়ার চেষ্টা করতেন সেগুলি হল: বিদেশীদের বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রামের লক্ষ্য কি? সমাজ ও রাজনৈতিক সংগঠনে কি ধরনের পরিবর্তন তাঁদের লক্ষ্য? কোন ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর জায়গা নেবে? এবং বিশুদ্ধবুদ্ধিগত স্তরে, নতুন

এক সমাজ-ব্যবস্থা অর্থাৎ শ্রেণী বৈষম্য ও শ্রেণী প্রভুত্বের অবসানের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে সমাজ পুনর্নির্মাণের উদ্দেশ্যে বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর নেতৃত্বে সমাজের শোষিত ও নিপীড়িত অংশের গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা ও সংগঠিত করার দাবির ব্যাপারে তারা সফল হয়েছিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে তাঁদের চিন্তার ক্ষেত্রে এই ক্রমবিকাশের ধারা আরো বিশদভাবে পর্যালোচনা করা হবে। কিন্তু শুরুতেই এই ধারণা খণ্ডন করা দরকার যে বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় সমস্ত বড় পরিবর্তন ঘটেছিল তাঁদের কারাবাস কালে এবং প্রধানত জেলে থাকার সময় তাঁরা যে গভীর পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছিলেন তার ফলে। বস্তুত, ভগৎ সিং-এর মৌলিক চিন্তাধারা গড়ে উঠেছিল কারাবাসের প্রথম দিকে তাঁর আগেকার পড়াশোনা ও ভাবনা-চিন্তার ভিত্তিতে এবং এই ব্যাপারে ১৯২৯ সালের আগেই তিনি অনেকটা উন্নতি করেছিলেন। উপরন্তু, বিভিন্ন মার্ক্সবাদী, সমাজতান্ত্রিক ও বিপ্লবী সাহিত্য ছাড়াও তিনি পড়েছিলেন কার্লমার্ক্সের 'ক্যাপিটাল'। একথা অনস্বীকার্য যে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা, পড়াশোনা বা আলোচনার ফলে বিপ্লবীদের ভাবনা-চিন্তা নিরবচ্ছিন্নভাবে বিকশিত হচ্ছিল। তবে যাঁরা জেলে ছিলেন তাঁরা এসব কাজ জেলে বসেই করেছিলেন, আর যাঁরা গ্রেপ্তার এড়াতে পেরেছিলেন তাঁরা এসব করেছিলেন বাইরে। উদাহরণস্বরূপ, ভগবতী চরণ, চন্দ্রশেখর আজাদ, এবং যশপাল এরকমই করেছিলেন। যাঁরা কোনরকমে গ্রেপ্তারের হাত থেকে বাঁচতে পেরেছিলেন, তাত্ত্বিক দিক দিয়ে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের সবচেয়ে পরিণত গ্রন্থ 'বোমার-দর্শন' প্রকাশ করেছিলেন তাঁরাই।

৫

বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি ছিল ভারতকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করা এবং বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতীয় সমাজের রূপান্তর ঘটানো। "বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক" বা "ইনকিলাব জিন্দাবাদ" স্লোগান এই প্রতিশ্রুতির সংক্ষিপ্ততম রূপ।

উপরন্তু তাঁদের বিপ্লবের প্রতিশ্রুতি ছিল সার্বিক। তাঁদের কাছে বিপ্লব নিছক একটা ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা বা কৌতূহলের বিষয় ছিল না। এটা কেবল ভারতের এক বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতির দাবি নয়। এ হল "মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকার"।[২২] উপরন্তু, এ হল মানবিক প্রগতির চিরন্তন নীতি। মানব সমাজকে যদি নিশ্চল হয়ে পড়তে না হয়, যদি ধ্বংসের অশুভ শক্তির কবলে পড়তে না হয় তাহলে প্রয়োজন বিপ্লবের এক নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। সুতরাং

এ হল মানবতাবাদী নীতিরই যথার্থ বাস্তব রূপ। এইচ. এস. আর. এ-র ইস্তাহারে (১৯২৯) বলা হয়েছিল :

> ক্ষমতাসীন ও সুবিধাভোগীদের কাছে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান বরাবরই এক আতঙ্ক। (কিন্তু) বিপ্লব হল এমন একটি ঘটনা যা প্রকৃতির প্রিয় এবং যাকে বাদ দিয়ে কি প্রকৃতিতে কি মানুষের ক্ষেত্রে কোন প্রগতি ঘটতে পারে না। বিপ্লব হতাশার দর্শন নয় বা কোন বেপরোয়া মানুষের অন্ধবিশ্বাস নয়। বিপ্লব ঈশ্বর-বিরোধী হতে পারে কিন্তু নিঃসন্দেহে মানব-বিরোধী নয়। তা হল এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সক্রিয় শক্তি এবং পুরোন আর নূতনের মধ্যে, জীবন আর জীবন্মৃতের মধ্যে, আলো আর অন্ধকারের মধ্যে শাশ্বত দ্বন্দ্বের ইঙ্গিতবাহী। বিপ্লব ছাড়া কোন সুরসংগতি, কোন ঐকতান, কোন ছন্দ সম্ভব নয়। যে 'মহাজাগতিক সংগীতের' কথা কবিরা বলেছেন মহাজগৎ থেকে এক অবিরাম বিপ্লবকে বাদ দিতে হলে তা অবাস্তব হয়ে পড়বে। বিপ্লবই নিয়ম, বিপ্লবই শৃংখলা, বিপ্লবই সত্য।

সমকালীন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় যে বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য সম্পর্কে আতঙ্কগ্রস্ত ছিলেন বিপ্লবীরা সে ব্যাপারে ভীত ছিলেন না। পুনর্নির্মাণের আগে ধ্বংসের কাজ অপরিহার্য। ১৯২৫ সালের জানুয়ারীতে এইচ. আর. এ. প্রকাশিত 'দ্য রেভল্যুশনারি' ঘোষণা করেছিল : "বিশৃংখলা না ঘটলে নূতন নক্ষত্র সৃষ্টি হয় না, নিদারুণ যন্ত্রণা আর কষ্ট ছাড়া প্রাণের সৃষ্টি হয় না।" এইচ. এস. আর. এ. ইস্তাহারে (১৯২৯) এই নৈরাজ্যবাদী বিশৃংখলা সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করেছিল।

বিপ্লবের অর্থ এক সামগ্রিক লড়াই—আপসহীন লড়াই, এমন এক সংগ্রাম যাতে জয়লাভ হতে হবে সামগ্রিক। 'বোমার-দর্শন' শেষ হয়েছে এই ঘোষণা দিয়ে : "আমরা দয়া ভিক্ষা করি না এবং আমরা ক্ষমাও করি না। আমাদের লড়াই শেষ পর্যন্ত—জয়লাভ অথবা মৃত্যু এই আমাদের লক্ষ্য"।

বিপ্লবকে এমন মহিমান্বিত করা এবং তার বেদীতলে চরম ত্যাগের আগ্রহ অবশ্য কেবল আলোচ্য সময়েই দেখা যেত এটা ঘটনা নয়। বস্তুত এটা তাঁদের পূর্বগামীদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। প্রথমে এইচ. আর. এ. নেতৃবৃন্দ এবং তারপর ভগৎ সিং ও তাঁর সহকর্মীরা যে ক্ষেত্রে এক বিরাট পদক্ষেপ নিয়েছিলেন সে ক্ষেত্রটা ছিল বিপ্লবের লক্ষ্য ও সংজ্ঞা প্রসারিত করার ক্ষেত্র।

ভগৎ সিং ও অন্যান্যরা বারবার বলেছিলেন যে বিপ্লবকে হিংসা অথবা "পিস্তল ও বোমা পুজোর" সঙ্গে অভিন্ন মনে করা চলবে না। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে এগুলি বিপ্লব সংঘটিত করার উপায় মাত্র।[৭৩] বিপ্লবকে আর নিছক রাজনৈতিক ক্রিয়া হিসেবে দেখলে হবে না। এই কারণেই বিদ্রোহ বিপ্লব নয় যদিও তা বিপ্লবের দিকে চালিত করতে পারে।[৭৪] বিপ্লবের এক গভীরতর, ব্যাপকতর সামাজিক তাৎপর্য রয়েছে। এর এখন লক্ষ্য সমাজকে

নূতনভাবে গড়া, "সুস্পষ্ট অবিচারের" ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করা।[২৫] বিপ্লব "উন্নততর অবস্থায় উত্তরণের জন্য উদ্দীপনা, ব্যাকুলতা"[২৬] বিপ্লব জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য তাদের আকুল আকাঙ্ক্ষা।[২৭] তাছাড়া ভগবতী চরণ বিপ্লবের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছিলেন এইভাবে, "সামাজিক, রাজনৈতিক, এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা"।[২৮] ভগৎ সিং ও দত্তর ৬ জুন, ১৯২৯, তারিখের বিবৃতিতে। এঁদের দৃষ্টিভঙ্গি আরো ভালভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল ঃ

> বিপ্লব বলতে আমরা বোঝাতে চাই শেষপর্যন্ত এমন এক ধরনের সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা যা এই রকম (সামাজিক দিক থেকে) ভেঙে পড়ার আশংকা থাকবে না, যাতে প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর ক্ষমতা স্বীকৃত হবে এবং যার ফলে এক বিশ্বসংঘ মানবজাতিকে পুঁজিবাদের দাসত্ববন্ধন ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করবে।

বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে শুরু করে বিপ্লবী সন্ত্রাস-বাদীরা শুধু পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের সম্ভাবনাতেই আর সন্তুষ্ট ছিলেন না। জাতীয় মুক্তিকেও দেখা হল নূতন সমাজ ব্যবস্থায় পৌঁছনোর এক উপায় হিসেবে। প্রাথমিকভাবে এই আকুল আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত হয়েছিল ১৯২৫ সালে এইচ. আর. এ-র ঘোষণায়। তাতে বলা হয়েছিল যে এইচ. আর. এ. "মানুষের উপর মানুষের শোষণের সমস্ত পদ্ধতির অবসানের" পক্ষে।[২৯] পরবর্তী কালের বিপ্লবীরাও শোষণের নিন্দা করেছিলেন। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে সনডার্সের হত্যার পর লাহোরে প্রাচীর পত্রে বলা হয়েছিল যে বিপ্লবীরা কাজ করছেন "এক বিপ্লবের জন্য যা মানুষের উপর মানুষের শোষণের অবসান ঘটাবে"।[৩০] এই লক্ষ্যের কথাই পুনরুচ্চারিত হয়েছিল ১৯২৯ সালের ৭ এপ্রিল সেণ্ট্রাল অ্যাসেম্বলিতে নিক্ষিপ্ত লাল প্রচার পত্রে।[৩১] একটু বেশি পরিমার্জিতভাবে 'বোমার-দর্শন' পাঠকদের আহ্বান জানিয়েছিল "নূতন এক সমাজব্যবস্থা" প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে "যেখানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ সম্ভব হবে না।"

এই সমতাবাদী দাবীর পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হল অতি দ্রুত, সে পদক্ষেপ হল সমাজতান্ত্রিক সমাজের দাবি। ১৯২৮ সালে ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর উত্তর ভারতের বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীরা তাঁদের দল এইচ. আর. এ. পুনর্গঠন করার জন্য দিল্লিতে মিলিত হয়ে সমাজতন্ত্র তাঁদের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করলেন। এখানেই ভগৎ সিং প্রস্তাব করেন দলের নাম বদলে রাখা হোক হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন (আর্মি)। তাঁকে জোরালো সমর্থন জানান সুখদেব, বিজয়কুমার সিংহ এবং শিব ভার্মা। তাঁর প্রস্তাব অবশেষে গৃহীত হয়।

নাম পরিবর্তন নেহাৎই বাহ্যিক ব্যাপার ছিল না। পূর্ণ বিতর্ক ও আলোচনার পর তা গৃহীত হয়। কয়েকজন অংশগ্রহণকারী এই যুক্তিতে আপত্তি জানান যে রামপ্রসাদ বিসমিল, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ও যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জীর মত

নেতারা যুক্ত থাকার ফলে পুরোন নামটি বিরাট মর্যাদা লাভ করেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁরা বুঝতে পারেন যে সংগ্রামের সূচনা তাঁরা করতে চলেছেন তার পরিবর্তিত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য বোঝানোর জন্য নাম পরিবর্তনটা প্রয়োজন।[৪২]

বিপ্লবী আন্দোলনের লক্ষ্য হিসেবে সমাজতন্ত্রের অন্তর্ভুক্তিও সত্যিই আকস্মিক ছিল না। ইতিমধ্যেই এইচ. আর. এ. এই দিকে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিল, যদিও তা ছিল অস্পষ্ট। ১৯২৪ সালের ৩ অক্টোবর কানপুরে অনুষ্ঠিত এইচ. আর, এ. কাউনসিলের মিটিংএ "সামাজিক বৈপ্লবিক এবং কমিউনিস্ট নীতি প্রচার করার" সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।[৪৩] এইচ আর. এ. প্রকাশিত গ্রন্থ 'দ্য রেভোল্যুশনারী'-তে রেলপথ এবং পরিবহন ও যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যম এবং ইস্পাত ও জাহাজ-নির্মাণের মত বৃহদায়তন শিল্পের জাতীয়করণের প্রস্তাব করা হয়েছিল। অন্যান্য বেসরকারি ও ক্ষুদ্রায়তন ব্যবসায়িক সংগঠনের ক্ষেত্রে এইচ. আর. এ-র প্রস্তাব ছিল সমবায় সমিতি গঠন করা।

বিপ্লবীরা ক্রমশই বেশি করে সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার প্রভাবে পড়ছিলেন। ১৯২৪ সালে যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জী সমাজতন্ত্রের সমর্থক হয়েছিলেন।[৪৪] পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশ দুই জায়গারই তরুণ বিপ্লবীরা সমাজতন্ত্রের ব্যাপারে গভীরভাবে আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন।[৪৫] তাঁদের অনেকের সঙ্গেই "কমিউনিস্ট" গোষ্ঠীগুলির যোগাযোগ ছিল।[৪৬]

অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট ধারণা অথবা তারুণ্যসুলভ আবেগের ভিত্তিতে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য স্থির করা হয়নি। প্রচুর পরিমাণে গভীরভাবে পড়াশোনা এবং আলোচনার ভিত্তিতে তাঁদের মতাদর্শ গড়ে উঠেছিল। লাহোরে ভগৎ সিং দ্বারকাদাস লাইব্রেরীকে সাহায্য করেছিলেন, বিশেষ করে রাশিয়া, আয়ারল্যান্ড ও ইটালি সম্পর্কিত বিপ্লবী সাহিত্যের এক অসাধারণ সংগ্রহ গড়ে তুলতে। ১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে তিনি নিজে বিপ্লব সংক্রান্ত বইপত্র গভীরভাবে পড়াশোনা করেছিলেন। সুখদেব ও অন্যদের সহযোগিতায় তিনি বিভিন্ন পাঠচক্র সংগঠন করে গভীর রাজনৈতিক আলোচনা চালিয়েছিলেন।[৪৭] ১৯৩১ সালে লাহোর ষড়যন্ত্র মমেলায় তাঁর সহবন্দী জে. এন. সান্যাল বুদ্ধিজীবী হিসেবে ভগৎ সিংএর মূল্যায়ন করেছিলেন এইভাবে :

'ভগৎ সিং ছিলেন অত্যন্ত পণ্ডিত মানুষ এবং তাঁর পড়াশোনার বিশেষ ক্ষেত্র ছিল সমাজতন্ত্র।...সমাজতন্ত্র তাঁর বিশেষ বিষয় হলেও উনিশ শতকের গোড়া থেকে ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব পর্যন্ত রুশ বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস তিনি গভীরভাবে পড়াশোনা করেছিলেন। এই বিশেষ বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের তুলনা ভারতবর্ষের খুব কম মানুষের সঙ্গেই করা যায় বলে সাধারণভাবে মনে করা হয়। বলশেভিক সরকারের অধীনে রাশিয়ার অর্থনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারও তাঁকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করেছিল'।[৪৮]

কারাবন্দী থাকার সময় ভগৎ সিং এর সমাজতান্ত্রিক মননশীলতা বৃদ্ধি ও বিকাশ লাভ করে। তাঁর মননশীল চর্চার কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী বীরেন্দ্র সন্ধু।[৩৯]—কারাগারকে ভগৎ সিং এক যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করেছিলেন। কারাগারে ভগৎ সিং কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন যার মধ্যে চারটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—সেগুলি হল 'আত্মজীবনী', 'মৃত্যুর দরজা', 'সমাজতন্ত্রের আদর্শ' ও 'ভারতে **বিপ্লবী আন্দোলন**'। দুর্ভাগ্যবশত সমস্ত পাণ্ডুলিপিই হারিয়ে গেছে।[40] একই ভাবে ভগবতীচরণ ও সুখদেবও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা সম্পর্কে ব্যাপক পড়াশোনা করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে যশপাল এ বিষয়ে এক নিষ্ঠাবান ছাত্র হয়ে ওঠেন। তিনি আর পাম দত্তর 'মডার্ন ইনডিয়া' শুধু পড়েননি, হিন্দিতে তার অনুবাদও করেছিলেন।[41]

সমান গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল ভগৎ সিং ও অন্যান্যরা দলের সদস্যদের সমাজতান্ত্রিক মতবাদ সংক্রান্ত শিক্ষার উন্নতিসাধন সক্রিয়ভাবে করেছিলেন। বিপ্লবের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা যে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে সে বিষয়ে তাঁরা পুরোপুরি অবগত ছিলেন। লাহোর হাইকোর্টে ভগৎ সিং বলেছিলেন "চিন্তার শান-পাথরে বিপ্লবের তলোয়ার ধার দেওয়া হয়েছে"।[42] জেলে থাকাকালীন তিনি গান্ধীকে "সহৃদয় মানবহিতৈষী" বলে বর্ণনা করেছিলেন এবং বলেছিলেন "মানবহিতৈষণা নয়, এখন প্রয়োজন প্রগতিশীল বিজ্ঞানসম্মত সামাজিক শক্তি"।[43] ফলে, দিল্লি অধিবেশনের পর পার্টি অফিস যখন আগ্রাতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো, ভগৎ সিং অবিলম্বে সেখানে গড়ে তুললেন ছোট একটি লাইব্রেরী সেখানে অর্থনীতি সংক্রান্ত বই ই ছিল বেশি। সেখানে সদস্যদের সমাজতন্ত্র ও অন্যান্য বৈপ্লবিক ধ্যান-ধারণা চিন্তাধারা সম্পর্কে পড়াশোনা ও আলোচনা করার জন্য সর্বদাই অনুরোধ করা হত।[44] ভগবানদাস মাহুর, নামে তখনকার এক অত্যন্ত অল্পবয়সী সদস্য, জানিয়েছেন কিভাবে ভগৎ সিং তাঁকে মার্ক্সের 'ক্যাপিটাল' ও অন্যান্য বইপত্র পড়ার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতেন।[45]

একথা অবশ্য বলা যেতে পারে যে ভগৎ সিং ও তাঁর বন্ধুরা সমাজতন্ত্র বা মার্ক্সবাদ সম্পর্কে বিরাট পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন না, তবে তাঁরা নিছক অনভিজ্ঞও ছিলেন না। কিছুটা পথ তাঁরা অগ্রসর হয়েছিলেন এবং ভারতের বিপ্লব সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত সমাজতান্ত্রিক উপলব্ধির ও পথের নানা সমস্যা সম্পর্কে ক্রমশঃ সচেতন হচ্ছিলেন, বিচার-বিশ্লেষণ ও ভাবনা-চিন্তা করছিলেন।[46] উদাহরণস্বরূপ, ভগৎ সিং উপলব্ধি করেছিলেন যে ব্যবস্থা হিসেবে সমাজতন্ত্র একটি বাঞ্ছিত ব্যবস্থার জন্য নিছক ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার ফল নয়, বরং, তার চেয়ে অনেক বেশি, সামাজিক পরিস্থিতির প্রয়োজনের বস্তুগত বাস্তব পরিণতি।[47] সংশয়-পীড়িত এবং ভগৎ সিং-এর সঙ্গেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার প্রতীক্ষারত সুখদেবকে লিখতে গিয়ে ভগৎ সিং মন্তব্য করেছিলেন ঃ

আমরা যদি লড়াই শুরু না করতাম তাহলে কি কোন বৈপ্লবিক সংগ্রাম ঘটত না? তা যদি ভাবো তাহলে ভুল করবে। একথা সত্যি যে আমরা (রাজনৈতিক) পরিস্থিতি বদলাতে অনেকটা সাহায্য করেছি। তা সত্ত্বেও আমরা আমাদের যুগের প্রয়োজনেরই সৃষ্টিমাত্র। আমি এও বলব যে কমিউনিজমের উদ্গাতা মার্ক্স বস্তুত এই চিন্তাধারার স্রষ্টা নন। ইউরোপের শিল্পবিপ্লবই এক বিশেষ চিন্তাধারার বহু মানুষকে সৃষ্টি করেছিল। মার্ক্স এঁদেরই একজন মাত্র। তাঁর অবস্থায় মার্ক্স নিঃসন্দেহে সমকালীন আন্দোলনে বিশেষ একটা গতি সঞ্চারে সাহায্য করেছিলেন। তুমি আমি এদেশে সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিস্ট ভাবনা-চিন্তা সৃষ্টি করিনি। পক্ষান্তরে, আমাদের ওপর এগুলি আমাদের সময় ও পরিস্থিতির প্রভাবের ফল। সন্দেহ নেই, এইসব চিন্তাধারা প্রসারের কাজে আমরা সরল ও বিনীতভাবে সাহায্য করেছি।[৪৮]

উপরন্তু, সমাজতান্ত্রিক সমাজ কিভাবে গঠিত হয় এবং তার বিচ্যুতি কিভাবে ঘটে এ সম্পর্কে তাঁদের বাস্তব জ্ঞানের মধ্য দিয়েই সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তাঁদের উপলব্ধির ব্যাপ্তি স্পষ্টত প্রকাশিত হয়েছে। মোটের ওপর এই প্রশ্নেই এইচ. আর. এ. রূপান্তরিত হয়েছিল এইচ. এস. আর. এ-তে। এইচ. আর. এ-র প্রত্যক্ষ লক্ষ্য ছিল যুক্তরাষ্ট্রের এক ফেডারেল প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, তার মৌল নীতি হবে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার[৪৯] অথচ এইচ. এস. আর. এ-র নামের মধ্যেই ঘোষিত ছিল সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য।

৬

এইচ. এস. আর. এ. নেতৃত্ব স্পষ্টই বুঝেছিলেন যে সমাজতন্ত্র এক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফল এবং সেই কারণে ব্যবস্থা হিসেবে তা পুঁজিবাদের বিপরীত। সুতরাং, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রথম সিদ্ধি পুঁজিবাদের অবসানে। ভগৎ সিং ও দত্ত হাইকোর্টে প্রদত্ত তাঁদের বিবৃতিতে এবং ১৯২৯ সালের ৬ জুনের বিবৃতিতে একথা স্পষ্টভাবে বলেছিলেন। 'বোমার-দর্শন'ও একই রকম স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিল: "বিপ্লব পুঁজিবাদের মৃত্যুর ঘণ্টা বাজাবে।"

সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী শক্তির এক নূতন পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতীক হবে সমাজতন্ত্র—সেটা মেনে নেওয়া হল। সমগ্র সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা সমাজের শ্রেণী বিশ্লেষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সমাজের এযাবৎ শোষিত শ্রেণীগুলির, শ্রমিক ও কৃষকের মুক্তি এবং অর্থনীতি, সমাজ ও রাজনৈতিক সংগঠনের উপর তাদের কর্তৃত্বের ভিত্তিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে।[৫০] ভগৎ সিং ও দত্তর ৬ জুনের বিবৃতিতে এই দৃষ্টিভঙ্গির আরো স্পষ্ট ব্যাখ্যা মেলে। "নূতন

অবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত বর্তমান ব্যবস্থা" বিপ্লবই বদলাবে, নিজেদের এই ধারণা উল্লেখ করে তাঁরা ব্যাখ্যা করে বললেন ঃ

> উৎপাদক বা শ্রমিক সমাজের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ হওয়া সত্ত্বেও শোষকরা তার শ্রমের ফসল লুঠ করে এবং মৌলিক অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করে। একদিকে, যে কৃষক সবার জন্য শস্য উৎপাদন করে সে তার পরিবার-সহ অনাহারে থাকে। যে তাঁতী বিশ্বের বাজারকে নিজের বোনা কাপড় জোগায় সে তার নিজের ও সন্তানদের আবরণের জন্য যথেষ্ট কাপড় জোটাতে পারে না। রাজমিস্ত্রি, কামার, ছুতোর, বিশাল প্রাসাদ গড়ে তোলে, কিন্তু তাদের নিজেদের বাঁচা-মরা নোংরা বস্তিতেই এবং অন্যদিকে, পুঁজিবাদী শোষকরা, অর্থাৎ সমাজের পরগাছারা শুধু খেয়াল মেটাতেই লক্ষ লক্ষ টাকা উড়িয়ে দেয়।...তাই প্রয়োজন আমূল পরিবর্তন এবং এটা যারা উপলব্ধি করে তাদের কর্তব্য সমাজতান্ত্রিক বুনিয়াদের ওপর সমাজকে নতুন করে গড়ে তোলা।[৫১]

শোষণ ও শ্রেণী স্বার্থ সম্পর্কিত প্রশ্ন থেকে এ প্রশ্ন স্বতন্ত্র। রাষ্ট্র ক্ষমতা কারা নিয়ন্ত্রণ করে সেই ব্যাপারে এইচ. এস. আর. এ. নেতারা প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, সমাজতন্ত্র এক নূতন রাষ্ট্রীয় কাঠামোরও প্রতীক, ক্ষমতা সেখানে থাকে শ্রমিক ও কৃষকের হাতে।[৫২] পাশাপাশি, যতদিন না শোষক শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীন বর্তমান রাষ্ট্রযন্ত্রকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী শক্তি দখল করতে পারবে ততদিন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। ১৯৩০ সালের অক্টোবরে জেল থেকে পাঠানো এক বার্তায় ভগৎ সিং বলেছিলেন ঃ

> বিপ্লব বলতে আমরা বুঝি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ। এর জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রযন্ত্র এখন সুবিধাভোগী শ্রেণীর হাতে। জনগণের স্বার্থ রক্ষা, আমাদের আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ, অর্থাৎ কার্ল মার্ক্সের সূত্র অনুযায়ী সমাজের ভিত গড়ার জন্য এই যন্ত্রটি আমাদের দখল করা প্রয়োজন।

সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের রূপ কেমন হবে? বিপ্লবীরা এক্ষেত্রে "প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের" ধারণা গ্রহণ করেছিলেন। 'বোমার-দর্শন' ঘোষণা করেছিল, বিপ্লব "প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে", বিপ্লবের মাধ্যমে "প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে" এবং বিপ্লব "রাজনৈতিক ক্ষমতার আসন থেকে সমাজের পরগাছাদের চিরকালের মত উপড়ে ফেলবে।"[৫৩] আদালতে শুনানি চলার সময় ভগৎ সিং ও তাঁর সহবন্দীরা তাঁদের ধারণা অনুসারে মানুষকে বোঝানোর জন্য চেষ্টা করেছিলেন যে শ্রমিক শ্রেণীর সাফল্য ও নেতৃত্বের কর্তব্য সম্পাদনের সঙ্গে বিপ্লবের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ১৯২৯ সালের ১৩ জুন ভগৎ সিং ও বি. কে. দত্ত অ্যাসেম্বলি বোমা মামলায় আদালতের রায় শুনে দৃপ্ত কণ্ঠে দুটি আওয়াজ তুলেছিলেন—"বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক" এবং "প্রলেতারিয়েত দীর্ঘজীবী হোক"।[৫৪]

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালে সমস্ত বন্দী আদালতে এসে তিনটি স্লোগান দিতেন: "বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক", "প্রলেতারিয়েত দীর্ঘজীবী হোক" এবং "সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক, নিপাত যাক"।[৫৫]

৭

ক্রমবর্ধমান সমাজতান্ত্রিক চেতনার ফলে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীরা পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে সবসময় যুক্ত করে দেখতেন। সাম্রাজ্যবাদ ও বিদেশী শাসন সম্পর্কে তাঁদের উপলব্ধি জাতীয়তাবাদের আবেগকে অতিক্রম করে বহু দূরে গিয়েছিল। পুঁজিবাদ ও আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক শোষণ এবং জাতি-সমূহের দাসত্ববন্ধনের মধ্যে তাঁরা এক ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র দেখতে শুরু করেছিলেন।[৫৬]

ভারতবর্ষের ভেতরে বিদেশী শাসনকে এক ধরনের শ্রেণী-শাসন বা বিদেশী পুঁজিপতিদের শাসন হিসেবে দেখা হয়েছিল।[৫৭] সমাজতন্ত্রকে তাই সুনির্দিষ্ট প্রতিবিধান হিসেবে দেখা হয়েছিল, শ্রেণী-শাসন ও অর্থনৈতিক শোষণের অবসান ঘটিয়ে তা যথার্থ স্বাধীনতা সম্ভব করবে।[৫৮] এই উপলব্ধির পরিচয় সমকালীন সমস্ত বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী দলিলেই ছড়িয়ে ছিল এবং এই উপলব্ধি স্বভাবতই সেই সব স্লোগানেও ব্যাপ্ত ছিল, যে সব স্লোগানে স্বাধীনতাকে মানুষের প্রতি মানুষের শোষণের অবসানের সঙ্গে সমার্থক করে দেখা হত। যেমন, এইচ. এস. আর. এ ইস্তাহারে বলা হয়েছিল: "প্রলেতারিয়েতের আশা-আকাঙ্ক্ষা আজ তাই সমাজতন্ত্রকে ঘিরে দানা বাঁধছে এবং সমাজতন্ত্রই কেবল পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা সম্ভব করতে পারে এবং সমস্ত সামাজিক বৈষম্য ও বিশেষ সুবিধা দূর করতে পারে।"

সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীরা যে মুহূর্তে ভারতীয় সমাজ সহ সমস্ত সমাজের শ্রেণী-ভিত্তিক চরিত্র উপলব্ধি করলেন তখনই তাঁরা দেশী শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধেও জোট বাঁধলেন। যে রকম কঠোর ভাষায় তাঁরা বিদেশী পুঁজির প্রভুত্বের নিন্দা করলেন ঠিক সে রকম কঠোর ভাষাতেই তাঁরা ভারতীয় পুঁজিপতি ও ভূস্বামীদের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন এবং ঘোষণা করলেন যে পূর্বোক্তটির অবসানের মতই শেষোক্তটির অবসানও বিপ্লবের পক্ষে একই রকম আবশ্যিক। 'এইচ. এস. আর. এ.' ইস্তাহারে'র বক্তব্য অনুযায়ী:

> ভারতীয় প্রলেতারিয়েতের অবস্থা আজ অত্যন্ত সংকটজনক। তার সামনে রয়েছে দুটি বিপদ। এক দিকে তাকে সহ্য করতে হচ্ছে বিদেশী পুঁজিবাদের প্রচণ্ড আক্রমণ এবং অন্যদিকে ভারতীয় পুঁজির বিশ্বাসঘাতী আঘাত:

শেষোক্তটির মধ্যে পূর্বোক্তটির সঙ্গে যোগ দেওয়ার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

কারাগার থেকে পাঠানো এক বার্তায় ভগৎ সিং লিখেছিলেন ঃ "শুধু বিদেশী নাগপাশ থেকেই নয়, কৃষক শ্রেণীকে ভূস্বামী ও পুঁজিপতিদের জোয়াল থেকেও নিজেদের মুক্ত করতে হবে।"[৫৯] তাঁর ৩ মার্চ, ১৯৩১-এর বার্তা ছিল আরো সুস্পষ্ট ঃ "মুষ্টিমেয় শোষকরা তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাধারণ মানুষের শ্রম যতদিন শোষণ করে যাবে ভারতবর্ষের সংগ্রাম ততদিন চলবে। এসব শোষক বিশুদ্ধ ব্রিটিশ পুঁজিপতি অথবা মৈত্রীবদ্ধ ব্রিটিশ ও ভারতীয় পুঁজি-পতি অথবা এমনকি খাঁটি ভারতীয় পুঁজিপতি কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর"।[৬০]

লক্ষ্য করা যেতে পারে যে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীরা ভারতীয় সমাজের বিশদ শ্রেণী বিশ্লেষণ করেন নি। গ্রামীণ সমাজের কোন বাস্তব বিশ্লেষণ, ভারতীয় পুঁজিবাদের কাঠামো বা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তার জটিল সম্পর্কের ব্যাপারে কোন আলোচনা ছিল না। ভূস্বামী, জমিদার ও মহাজন এবং শিল্প-পুঁজিপতির মধ্যে কোন সুস্পষ্ট ভেদ-রেখা টানতেও তাঁরা ব্যর্থ হয়েছিলেন। পুঁজিবাদকে অর্থনৈতিক শোষণের প্রতীক এবং চুম্বক হিসেবে তাঁরা সম্ভবত দেখেছিলেন। তথাপি তাঁরা যে শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমাজ বিশ্লেষণ পদ্ধতি ভালভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাঁদের যে সমাজতন্ত্রের প্রতি আস্থা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা এবং শ্রমজীবী শ্রেণীর নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার মানসিকতা ছিল সেটা লক্ষণীয়। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যক বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী তাঁদের আন্দোলন প্রান্তসীমায় পৌঁছনোর পরই যে মার্ক্সবাদ ও কমিউনিজমের দিকে ঝুঁকেছিলেন সেটা আকস্মিক ছিল না।[৬১]

৮

বিপ্লবের পক্ষে কারা লড়াই করবে বা কারা বিপ্লব ঘটাবে অথবা অন্য-ভাবে বলতে গেলে, তাঁদের আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি কি হবে—বাস্তব জ্ঞান-সম্পন্ন বিপ্লবী হিসেবে এইচ. এস. আর. এ নেতৃবৃন্দ এই প্রশ্নেরও মোকাবিলা করেছিলেন। এইচ. এস. আর. এ. নেতারা বিপ্লবের সামাজিক ভিত্তির প্রশ্নে কর্মসূচি বা তত্ত্বগত ভাবে পরিষ্কার জবাব দিয়েছেন। সাধারণ মানুষ, শ্রমিক ও কৃষক, যুব সম্প্রদায় ও র‍্যাডিক্যাল বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর ওপর তাঁদের আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে 'বোমার-দর্শন' এই প্রশ্নে দ্ব্যর্থহীন। "যুব সম্প্রদায়, শ্রমিক ও কৃষক, বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের" উদ্দেশে তাতে এক আবেদন জানানো হয়েছিল। নওজওয়ান ভারত সভার ইস্তাহারেও (১৯২৮) এই বিষয়ে পরিষ্কার বলা হল ঃ "দেশকে প্রস্তুত করার ভবিষ্যৎ কর্মসূচি শুরু

হবে 'জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য বিপ্লব' এই বাণী দিয়ে।"[63] সভার অন্যতম বড় লক্ষ্য ছিল, তার বিধিনিয়ম অনুযায়ী শ্রমিক ও কৃষকদের সংগঠিত করা।[63] গ্রামাঞ্চলে কাজের গুরুত্বের ওপর জোর দেওয়ার জন্য সভা গ্রামে শাখা খোলার সিদ্ধান্তও নিয়েছিল।[64] ১৯৩০ এর জানুয়ারিতে কানপুরে এইচ. এস. আর. এ কেন্দ্রীয় পরিষদের সভায়, অন্যান্যদের মধ্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগবতী চরণ ভোহ্‌রা, যশপাল ও কৈলাসপতি। সেই সভায় ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে কাজ আরো জোরদার করার এবং এই উদ্দেশ্যে সভাপতি হিসেবে শেঠ দামোদরস্বরূপ ও সম্পাদক হিসেবে ভগবতী চরণের নেতৃত্বে দলীয় সংগঠনের একটি আলাদা বিভাগ তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।[65] অনুরূপভাবে ১৯৩১ সালে ভগৎ সিং ঘোষণা করেছিলেন, "আমাদের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত কৃষক ও শ্রমিকদের সংগঠিত করা"।[66]

আরেকটি দৃষ্টিকোণ থেকেও সংগ্রামে সাধারণ মানুষের ভূমিকার ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। এইচ. এস. আর. এ নেতৃবৃন্দ নিশ্চিত ছিলেন যে পুঁজিপতি ও উচ্চশ্রেণীয় মধ্যে বিদেশী শক্তির সঙ্গে যোগ দেওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে এবং তারা মাঝপথে স্বাধীনতা সংগ্রাম ত্যাগ করতে পারে।[67] স্বাধীনতা সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের ওপরই কেবল নির্ভর করা যেতে পারে এবং তাদেরই শুধু সে শক্তি আছে। ভগৎ সিং-এর ভাষায়ঃ "সংগঠিত শ্রমিক, কিষাণ ও সাধারণ মানুষের ওপর ভরসা করেই শুধু জাতি সফল যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে।"[68] কৃষক ও শ্রমিকের মধ্যে বৈপ্লবিক কাজকর্মের ওপর জোর দেওয়া এবং তাদের বৈপ্লবিক সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দেওয়াটা বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে নূতন ঘটনা ছিল না, যদিও এরা যে বিপ্লবের সামাজিক ভিত্তি তার ওপর জোর দেওয়ার বিষয়টি নূতন। এর আগে ১৯২৪ সালে এইচ. আর. এ এই সিদ্ধান্তও নিয়েছিল যে "শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কলকারখানা, রেল ও খনি অঞ্চলে শ্রমিকদের সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রণ করতে সমিতির পক্ষে উপযুক্ত ব্যক্তিদের অবশ্যই নিযুক্ত করতে হবে।[69]

অবশ্যই এসব ছিল তত্ত্ব বা কর্মসূচির স্তরে সীমাবদ্ধ। সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করার এমনকি তাদের মধ্যে প্রাথমিক রাজনৈতিক কাজ করার চেষ্টাও বাস্তবে খুব সামান্যই হয়েছিল। নওজওয়ান ভারত সভা ১৯২৮ সালে দু একটা কৃষক বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিল এবং কৃষকরা যাতে নিজেদের সংগঠিত করতে পারে সেজন্য তাদের কিছু পরামর্শ দিয়েছিল।[70] সভার একমাত্র গ্রামীণ শাখা ছিল আম্বালার মোরিন্দাতে এবং দুটি তহসিল শাখা ছিল জারানওয়ালা ও তালাগঞ্জে, কিন্তু এগুলো সবই ছিল নিষ্ক্রিয়।[71] সভার কাজকর্ম কার্যতঃ শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং তাও সেখানকার মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই।[72] অনুরূপভাবে অজয় ঘোষ ও অন্য কয়েকজন,

সম্ভবত কমিউনিস্ট কর্মীদের প্রভাবে, কানপুরে শ্রমিকদের সঙ্গে কাজ করেছিলেন।[73] এইচ. এস. আর. এ কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য, কৈলাসপতি, দিল্লি ষড়যন্ত্র মামলায় রাজসাক্ষী হয়েছিলেন। তিনি তাঁর সাক্ষ্যে বলেছিলেন যে ১৯৩০ এর জানুয়ারিতে পরিষদ শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্রদের মধ্যে কাজকর্ম আরো জোরদার করার সিদ্ধান্ত নিলেও কৃষকদের মধ্যে কাজ করার দায়িত্ব কাউকেই দেওয়া হয়নি।[74]

বাস্তবে এইচ. এস. আর. এ. সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন রাজনৈতিক কাজই করতে পারেনি। তাদের সঙ্গে প্রায় কোন যোগসূত্র বা সম্পর্কই এই সংগঠনের ছিল না। তাদের শ্রেণী শক্তিকে সংগঠিত করা এবং শ্রেণী সংগ্রামে তাদের নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ত বাদই দেওয়া হল। যেসব শ্রেণীকে এই সংগঠনের কর্মসূচিতে বিপ্লবী আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল তাদের কাছ থেকে এরা কার্যত বিচ্ছিন্ন ছিল। এটা ছিল এইচ. এস. আর. এর অন্যতম প্রধান দুর্বলতা।

বাস্তবিক ব্যাপার হল এই যে এইচ. এস. আর. এর আসল আবেদন ছিল র‍্যাডিক্যাল জাতীয়তাবাদী তরুণদের কাছে। তত্ত্বগতভাবে তরুণ সম্প্রদায়ের এক দৈবত ভূমিকা ছিল। তাদের একদিকে শ্রমিক ও কৃষকের কাছে বৈপ্লবিক সমাজতান্ত্রিক বার্তাবাহকের কাজ করার কথা ছিল,[75] অপরদিকে কথা ছিল বিপ্লবের প্রত্যক্ষ যোদ্ধা হওয়ার। বাস্তবে এইচ. এস. আর. এ নেতৃবর্গ রাজনৈতিক কাজের জন্য সম্পূর্ণ নির্ভর করেছিলেন তরুণদের ওপর : তরুণরা হবে বিপ্লবের অগ্রদূত। কৃষকরা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করবে, এমনকি নেতৃত্বও দেবে এটা তাঁরা ভাবগত দিক থেকে মেনে নিলেও বাস্তবে কিন্তু তখনও তা ঘটতে পারেনি, কারণ শ্রমিক ও কৃষককে তখনও পর্যন্ত "নিষ্ক্রিয়", "নীরব" ও "মত প্রকাশে অক্ষম" বলে মনে করা হত।[76] সুতরাং তরুণদের হতে হবে বিপ্লবের প্রকৃত নির্মাতা, জনগণের হয়ে তাদের কাজ করতে হবে এবং কর্ম ও ত্যাগের মাধ্যমে জনগণকে জাগাতে হবে।[77]

বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের রাজনৈতিক আবেদন সবচেয়ে আবেগময় হয়ে উঠত তাঁদের বাস্তব ও প্রত্যক্ষ শ্রোতাদের কাছে। 'বোমার-দর্শনের' মতানুসারে, "যুব সম্প্রদায়ের অস্থিরতা, যে মানসিক বন্ধন ও ধর্মীয় কুসংস্কার তাদের বেঁধে রেখেছে তা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার প্রবল আগ্রহ, এ সবের মধ্যে বিপ্লবীরা ইতিমধ্যেই বিপ্লবের আবির্ভাব দেখতে পাচ্ছে"। ১৯২৯ সালে এইচ. এস. আর. এ. ইস্তাহার তরুণদের কাছে তাদের ঐতিহাসিক কর্তব্য সুচারু ভাষায় বর্ণনা করে এক আবেদন রেখেছিল। আবেগে, কাব্যময়তায়, ও তরুণদের আদর্শ সম্পর্কে ভাবগভীরতায় এই আবেদন চীনের ৪ মে আন্দোলনের প্রবর্তকদের আবেদনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কি ধরনের আবেগ বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীরা জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন এবং কি বিপুল আবেগ তাঁদের বিরাট

ত্যাগে অনুপ্রাণিত করেছিল, উক্ত আবেদনের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতাংশটি থেকে তা বোঝা যায় ঃ

> ভারতের ভবিষ্যৎ তরুণদের হাতে। তারাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাদের দুঃখ স্বীকার করার তৎপরতা, তাদের অসমসাহসিকতা এবং তাদের উজ্জ্বল আত্মত্যাগ প্রমাণ করে যে ভারতের ভবিষ্যৎ তাদের হাতে সম্পূর্ণ নিরাপদ।···তরুণদল—ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সৈনিকগণ, সারিবদ্ধ হও। শিথিলভাবে দাঁড়িয়ো না, তোমাদের পা যেন না কাঁপে।···তোমাদের কর্তব্য মহান, বেরিয়ে পড় দেশের প্রতিটি আনাচে-কানাচে, ভবিষ্যৎ বিপ্লবের ভিত্তিভূমি প্রস্তুত কর, তা অনিবার্য।···নিষ্ক্রিয় হয়ে পড় না। জাগো।···তোমাদের তরুণ বন্ধুদের মনের উর্বর জমিতে বপন কর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও ঘৃণার বীজ। এবং এই বীজ মঞ্জরিত হবে, জেগে উঠবে বলিষ্ঠ বৃক্ষের অরণ্য, কারণ তোমরা তোমাদের উষ্ণ রক্তধারা সেই বীজে সিঞ্চন করবে।[৭৪]

বাস্তবেও বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদীদের সমস্ত প্রকাশ্য কাজকর্মের, "মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রচার" সহ তাদের সমস্ত প্রচারের লক্ষ্য ছিল তরুণরাই। নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তরুণরাই ছিল আন্দোলনের প্রকৃত সামাজিক ভিত্তি। এইচ. এস. আর. এ-র প্রায় সব সদস্যকেই সমাজের এই অংশ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল।[৭৫]

তরুণ সম্প্রদায়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার একটা কারণ হল যে বর্তমান প্রজন্মের বিপ্লবীদের কাজ বিপ্লব করা নয়, বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হওয়া এই ধারণা। ভগৎ সিং নিজেকে বিপ্লবের অগ্রদূত বলে মনে করতেন। সমাজতন্ত্র ও বিপ্লবের ধারণা জনপ্রিয়তা লাভ করলেই বিপ্লব শুরু হবে। জনগণ তখন বিপ্লব করবে। একমাত্র তরুণদেরই আছে বুদ্ধি, আছে আবেগ, সংসারের চিন্তা থেকে তারা মুক্ত, পূর্বোক্ত কাজ করার মত আত্মত্যাগ ও বীরত্বের প্রেরণা তাদেরই আছে। এই কারণেই বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্বে প্রাধান্য ছিল তরুণদেরই।

অধিকন্তু আরেকটি কারণেও বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীরা তরুণদের ওপর নির্ভর করেছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রচার হল "কাজের মাধ্যমে প্রচার", অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদী ও অন্যান্য বীরত্বব্যঞ্জক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে প্রচার। তাঁদের কাজকর্ম বিপ্লব গড়ে তোলা নয়, কিন্তু বিপ্লবের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য এইরকম কাজকর্ম তখনই প্রয়োজন ছিল। এইভাবে তাঁরা এক দ্বন্দ্বমূলক বিরোধের সম্মুখীন হয়েছিলেন। বিপ্লব করবে জনগণ এবং বিপ্লবের আগেও বৈপ্লবিক কাজকর্ম করার জন্য লোক দরকার। অন্যভাবে বলতে গেলে, জনগণের বৈপ্লবিক প্রবণতা জাগিয়ে তোলার জন্য বৈপ্লবিক সচেতনতাসম্পন্ন এবং আত্মোৎসর্গের ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন। বলতে কি, উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তরুণরাই শুধু যথেষ্ট ছিল।[৭৬]

কিন্তু সূচনায় বৈপ্লবিক চেতনা ছিল বিশুদ্ধ জাতীয়তাবাদী। এই তরুণদের তাই জাতীয়তাবাদী ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রধানত ব্যবহার করা যেতে পারত। এইচ. এস. আর. এ. নেতৃবৃন্দ এই আরেকটি দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তত্ত্বগতভাবে, পুরোপুরি সমাজতন্ত্রের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হলেও কার্যত তাঁরা জাতীয়তাবাদকে অতিক্রম করে যেতে পারেননি।

৯

বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীরা কখনো রাজনৈতিকভাবে "কাজ শুরু" করতে পারলেন না। তাঁরা প্রথম, প্রারম্ভিক ধাপ বলে যা মনে করতেন তাই তাঁরা ডিঙোতে পারেন নি। স্পষ্ট আদর্শ বর্জিত ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বহীন বীর-চরিত্র হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করলেও, তাঁরা কিন্তু তাঁদের দলের পক্ষে জনগণের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়েছিলেন। যে নিরবচ্ছিন্ন ও চূড়ান্ত দারিদ্র্য তাঁদের সব সময় গ্রাস করে রাখত তাতেই এর পর্যাপ্ত সাক্ষ্য মেলে। সরকারেরের বিরুদ্ধে একটি গণ-বৈপ্লবিক লড়াইও সংগঠিত করতে এমনকি ছোট কোন সশস্ত্র দলের লড়াই সংগঠিত করতেও তাঁরা সফল হননি। ফলে, বলতে গেলে, তাঁদের সামান্য কিছু সফল ব্যক্তিগত রাজনৈতিক বা সন্ত্রাসবাদী লড়াই নিরালম্ব হয়েই ছিল এবং তাঁদের নিজেদের কর্মসূচির দিক দিয়ে তা কম-বেশি ব্যর্থই হয়ে ছিল। মোটের উপর, তাঁরা নিজেরা এইসব লড়াইকে দেখেছিলেন বৈপ্লবিক পথে জনগণকে চালিত করার এবং গণ-বিদ্রোহ ও সশস্ত্র সংগ্রামের পক্ষে ব্যাপকতর সমর্থন ও সেই সংগ্রামের সৈনিক সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে। বস্তুত, জনগণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের পথ ও পদ্ধতি পর্যন্ত তাঁরা খুঁজে বার করতে পারেননি। পরিণামে, সরকার তার শক্তি প্রয়োগ করে তাঁদের সাধারণ স্তরের কর্মীসংখ্যা বহুলাংশে হ্রাস করেছিল এবং সেই শূন্যস্থান তাঁরা পূরণ করতে পারেননি। ১৯৩০ সালে সারা বছরে একটিও নাটকীয় "লড়াই" সংগঠিত করা যায়নি। চন্দ্রশেখর আজাদের সতর্কভাবে তৈরি করা সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল। অভ্যন্তরীণ কলহের ফলে বীর যোদ্ধাদের দলে ভাঙ্গন শুরু হল। হিন্দি সংবাদ জগতে তুমুল বিতর্কে এই কলহের অনুরণন আজো শোনা যায়। দল ভেঙে দিতে হল এবং অবিলম্বে তা ছোট ছোট দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু গোষ্ঠীতে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। এমনকি সিংহবিক্রম চন্দ্রশেখর আজাদ, যিনি ভাগ্যের হাতে বারংবার আঘাত সহ্য করেছিলেন, বীরের সহিষ্ণুতায় তিনিও হতাশ হতে শুরু করলেন, যদিও তিনি শেষ পর্ব পর্যন্ত "লড়াইয়ের" পরিকল্পনা করে গিয়েছিলেন। ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ভারতের বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে কার্যত যবনিকাপাত হল।

এইচ. এস. আর. এ. তার অন্যান্য রাজনৈতিক লক্ষ্যের ক্ষেত্রেও ব্যর্থ হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে এর সূচনা হয়েছিল জাতীয় আন্দোলনের প্রভাবশালী গান্ধীবাদী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ফলে ও তার বিরোধী শক্তি হিসাবে। এইচ. এস. আর. এ. তার স্বল্প আয়ুষ্কালে এই নেতৃত্ব ও তার চিন্তাধারার প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করেছিল। "কাজের মাধ্যমে প্রচারের" কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য ছিল জনগণ ও তরুণ সম্প্রদায়কে গান্ধীবাদের পথ থেকে সরিয়ে আনা। গান্ধীর অ-বৈপ্লবিক আপসপন্থী নেতৃত্বের বিরোধিতা করেই তাঁরা নিজেদের বিপ্লবী বলে দাবি করেছিলেন। তবু, ১৯২৯, ১৯৩০ এবং ১৯৩১ সালে তাঁদের বিপুল জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও তাঁরা গান্ধীর কোন বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে তুলতে পারেননি। জাতীয় আন্দোলনে বৈপ্লবিক সমাজতান্ত্রিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জন করতে অথবা আন্দোলনকে বিপ্লবে রূপান্তরিত করতে তাঁরা নিঃসন্দেহে ব্যর্থ হয়েছিলেন। মোটের ওপর গান্ধীবাদী কার্যক্রমের মধ্যেই জাতীয় আন্দোলন আটকে রইল।

সমাজতন্ত্রের ধারণাকে জনপ্রিয় করা এবং জাতীয়তাবাদী তরুণদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চেতনা ছড়িয়ে দেওয়া এইচ. এস. আর. এ.র অন্যতম লক্ষ্য ছিল। এইচ. এস. আর. এ. খুব সফল হয়েছিল বলে মনে হয় না। তাঁদের অনুরাগীদের একটা বিরাট অংশ সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রতি তাঁদের আস্থার গুরুত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে গিয়েছিল। অবশ্য অংশত এর কারণ হল তাঁদের কোন রচনাই সরকার প্রচার করতে দেয়নি। লাহোরের নওজওয়ান ভারত সভা কর্তৃক গোপনে বিলি করা 'বোমার-দর্শন' (যদিও ১৯৩০ এর ২৬ জানুয়ারিতে মাত্র একবারই), এবং 'ট্রিবিউন' ও অন্যান্য কাগজে মাঝে মাঝে প্রকাশিত তাঁদের বার্তা ছাড়া আর কোন সূত্রও ছিল না। একমাত্র পাঞ্জাবেই এইচ. এস. আর. এ. এবং নওজওয়ান ভারত সভা সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা কিছুটা পেঁছে দিতে পেরেছিল। তাঁদের চিন্তাধারা এবং সেই চিন্তাধারার পিছনে তাঁদের ত্যাগের মাহাত্ম্য পরবর্তী বছরগুলিতে বৈপ্লবিক সমাজতান্ত্রিক চেতনা প্রসারের ক্ষেত্রে হয়তো শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারতো যদি কমিউনিস্ট ও সমাজতান্ত্রিক দলগুলি সেগুলিকে সেভাবে কাজে লাগাতো। কিন্তু অজ্ঞাত কোন কারণে এইসব দল তা করতে পারেনি।

বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য ছিল দেশে বৈপ্লবিক চেতনার প্রসার ঘটানো। ফাঁসির ঠিক আগে ভগৎ সিং শিব ভার্মাকে বলেছিলেন, "বিপ্লবী দলে যোগ দেওয়ার সময় ভেবেছিলাম দেশের প্রতিটি কোণে কোণে 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক' ধ্বনি যদি পেঁছে দিতে পারি তাহলে আমার জীবন পুরোপুরি সার্থক হবে।...আমার মনে হয় কারো জীবন এর চাইতে মূল্যবান হতে পারে না।"[৪১] এবং নিঃসন্দেহে ভগৎ সিং এই লক্ষ্যে পেঁছতে পেরেছিলেন। কিন্তু সর্বজনীনভাবে এই ধ্বনি গৃহীত হলেও এবং বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের আত্মত্যাগ ও সংগ্রাম দেশের মধ্যে বিপুল শ্রদ্ধা জাগিয়ে তুললেও

তা জাতীয়তাবাদী চেতনাকে বিপ্লবের দিকে চালিত করতে পেরেছিল একথা বলা যায় না। নিঃসন্দেহে, কৃষক ও শ্রমিক সংগঠন ও আন্দোলন এবং দেশের বামপন্থী আন্দোলন এই স্লোগানকে তাদের সংগ্রাম-ধ্বনি করে নিয়েছিল। কিন্তু সাধারণভাবে যা বোঝা যায় তা হল এই স্লোগান অবিলম্বে স্বাধীনতা লাভের নিছক জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে দাঁড়াল।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনা জাগিয়ে তোলার কাজে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীরা বিরাট সফলতা অর্জন করেছিলেন। জাতীয়তাবাদী উদ্দেশ্যের কথা বাদ দিলেও তাঁরা দেশকে জাগাতে এবং দেশের মানুষের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করতে সফল হয়েছিলেন। এই সাফল্য খুব কম নয়। কিন্তু তাঁদের সাফল্যের ফল কুড়িয়েছিল সনাতন কংগ্রেস নেতৃত্ব, যাদের তাঁরা বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলে নিন্দা করেছিলেন এবং যাদের জায়গা তাঁরা অধিকার করবেন বলে আশা করেছিলেন, যদিও এই ঘটনা প্রকৃতপক্ষে এবং সক্রিয়ভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম পরিচালনা করেছিল। অন্যভাবে বলা যায়, তাঁদের মহান ও প্রকৃত সাফল্য অর্জিত হয়েছিল এমন একটি ক্ষেত্রে এবং তা এমন পরিণতি লাভ করেছিল যা ছিল তাঁদের বাঞ্ছিত লক্ষ্য থেকে একেবারেই আলাদা। এর ফলে সৃষ্টি হল এক কৌতূহলোদ্দীপক ঐতিহাসিক কূটাভাস। বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের প্রায় নব্বই শতাংশই যেক্ষেত্রে পরবর্তী সময়ে মার্ক্সবাদ বা কমিউনিজমের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন, সেক্ষেত্রে তাঁদের নিজেদের তরুণ বয়সের অবদান ও স্লোগান হয়ে গেল গান্ধীপন্থী নেতৃত্বের সঙ্গে আবদ্ধ 'বাম' কংগ্রেসীদের উত্তরাধিকার-লব্ধ বস্তু।

মূলগতভাবে, তাঁদের চিন্তাধারা ও কাজের মধ্যে পরপর কতকগুলি বিরোধের উদাহরণ তুলে তাঁদের ব্যর্থতাকে প্রকাশ করা যেতে পারে। তত্ত্বের দিক দিয়ে তাঁরা যেখানে ছিলেন সমাজতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধ, কার্যত সেখানে তাঁরা জাতীয়তাবাদকে অতিক্রম করতে পারেন নি। তত্ত্বে তাঁরা গণ-সংগ্রাম ও সশস্ত্র সংগ্রাম কামনা করলেও বাস্তবে তাঁরা সন্ত্রাসবাদী বা ব্যক্তিগত সংগ্রামের ওপরে উঠতে পারেননি। তত্ত্বগতভাবে তাঁরা আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন জনগণের ওপর, কৃষক ও শ্রমিকের ওপর, কিন্তু বাস্তবে তাঁরা শুধু আবেদন করতে পেরেছিলেন শহুরে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও পাতি বুর্জোয়া তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে। তাত্ত্বিক দিক দিয়ে তাঁরা চেয়েছিলেন একটা গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করতে ও তার নেতৃত্ব দিতে, কিন্তু কাজে তাঁরা থেকে গিয়েছিলেন এক দল নির্ভীক তরুণ মাত্র। তত্ত্বগতভাবে তাঁদের ছোট সংগঠনটির কাজ করার কথা ছিল একটা "কেন্দ্র" হিসেবে, অর্থাৎ একটি ছোট ইউনিট যাকে ঘিরে জড় হবে দেশের উদীয়মান বিপ্লবী শক্তিগুলি, কিন্তু কাজে তাঁরা দেখলেন মূল গোষ্ঠীর ঐক্য বজায় রাখাই কঠিন এবং অবশেষে তা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল।

তাঁদের ব্যর্থতার অন্য দুটি দিকও ভেবে দেখতে হবে। শুধু তত্ত্বের সঙ্গে কর্মকে যুক্ত করতেই তাঁরা ব্যর্থ হননি, তত্ত্বগত ও কর্ম-

সূচির স্তরে জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রকে যুক্ত করতেও তাঁরা পারেন নি। তাঁদের কর্মসূচিতে আশা করা হয়েছিল যে তাঁরা জাতীয়তাবাদী বিপ্লব ছাড়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবও সম্পন্ন করে ফেলবেন। ঐতিহাসিক পরিস্থিতি স্পষ্টতই এ রকম সংযোগসাধনের অনুকূল ছিল না বলে, কার্যত এর অর্থ দাঁড়াল সমাজতান্ত্রিক চেতনা এবং জাতীয়তাবাদী চেতনাকে একেবারে পরস্পর সম্পর্ক বিহীন বিষয় বলে বিবেচনা করা। পূর্বোক্তটি হয় পরোক্তটির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল নয়ত পরোক্তটির সঙ্গে তার যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। এই দ্বন্দ্বের আরেকটি রূপও দেখা গেল। এইচ. এস. আর. এ. নেতৃত্ব যখন সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা উপলব্ধি করা ছাড়াও তা মেনে নেওয়ার দিকেও দ্রুত অগ্রসর হচ্ছেন, সাধারণ কর্মীরা তখন তত্ত্বের প্রতি সম্পূর্ণ নিস্পৃহ ছিল এবং তাদের কাজকর্ম ইত্যাদি প্রায় পুরোপুরি বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী চেতনার স্তরে আবদ্ধ ছিল।[৪৯]

যখন জনগণের বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে, তখন মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর র‍্যাডিক্যাল তরুণ সম্প্রদায়ের ওপর নির্ভরতা সম্ভবত সব রাজনৈতিক পরিস্থিতি, কর্মসূচি ও দলেরই পক্ষে ঐতিহাসিক উভয়সংকট হয়ে দাঁড়াল। বৈপ্লবিক পরিস্থিতি যেখানে বর্তমান, যেখানে যত ছোট আকারেই হোক না কেন, বিপ্লব শুরু না করলে রাজনৈতিক অচলাবস্থা থেকে উত্তরণের আর কোন পথ নেই বলে মনে হয়, প্রচার ও সংগঠনের সময় ও সুযোগ-সুবিধা (বৈধ অবস্থা) যেখানে নেই, এবং যেখানে রাজনৈতিক অনগ্রসরতা বা সরকারি দমননীতি অথবা দীর্ঘকাল অ-বৈপ্লবিক রাজনৈতিক প্রভাবাধীন থাকার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিপ্লবী চেতনা নেই, বিপ্লবী কর্মীও এখনও নেই সেখানেই এই উভয় সঙ্কট দেখা দেয়। এইচ. এস. আর. এ. নেতৃত্ব পরিস্থিতিকে দ্রুত বদলানোর এবং তাঁদের ক্রিয়াকলাপকে গণ-সংগঠন ও গণ-বিদ্রোহ বা সশস্ত্র লড়াইয়ের সঙ্গে মেলানোর চেষ্টা না করে ভুল করেছিলেন। সরকারি আমলাদের বিরুদ্ধে লড়াই না করে, সরকারের বিরুদ্ধে, যত ছোটই হোক, কোন সংগঠিত সশস্ত্র লড়াই গড়ে তুলতে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাত্ত্বিক পর্যায়ে বিপ্লবী সন্ত্রাস-বাদীদের বিপ্লব অভিমুখী অগ্রগতি অপেক্ষাকৃত নির্ভুল হওয়া সত্ত্বেও এবং প্রথম থেকেই গণ-বিদ্রোহ, সাম্রাজ্যবাদের উৎখাত ও সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সশস্ত্র সংগ্রাম দ্রুত শুরু করার পরিকল্পনা সত্ত্বেও এটা ঘটেছিল। কিন্তু তাঁরা তাঁদের ভাবনাকে কাজে পরিণত করার সময় বিশেষ পাননি। মাত্র দুই কি তিন বছরের মধ্যে প্রায় সবাই গ্রেপ্তার বা নিহত হয়েছিলেন এবং এই সময়ের মধ্যেও এক অত্যন্ত দৃঢ়ভিত্তিক ও দক্ষ প্রশাসন তাঁদের অবিরাম তাড়া করে বেড়িয়েছিল। তাঁদের সবচেয়ে বড় একটা ভুল ছিল সম্ভবত এই যে, অ-বৈপ্লবিক পন্থায় হলেও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব যখন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার যথেষ্ট ক্ষমতা রাখত, সেই সময় তাঁরা ভেবেছিলেন মুষ্টিমেয় কিছু তরুণদের সাহায্যেই বিপ্লবের সূত্রপাত করা যেতে পারে।

বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের আরেকটি ভ্রান্তি ছিল এই যে নির্ভীক তরুণদের কাজের বা মৃত্যুবরণের মাধ্যমে প্রচারের ফলে এক বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে বলে তাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন। এটা রাজনৈতিক শক্তিগুলির এবং এমনকি বিপ্লবেরও স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভবে অন্ধ বিশ্বাস। একমাত্র এই বিশ্বাসের বলেই তাঁরা তাঁদের বিশিষ্টতম নেতাকে "মৃত্যুবরণের মাধ্যমে প্রচারে" অংশ নেওয়ার জন্য ঠেলে দিতে পারতেন। কিন্তু তাঁদের এই অপরিমেয় আত্মত্যাগের ফলে মুক্ত ও জাগ্রত ভাবাবেগের সুযোগ নিতে পারত দেশের যেসব রাজনৈতিক শক্তি—দল, গোষ্ঠী, ব্যক্তি—তারা কোথায় ছিল? বস্তুত, কেন তাঁরা মৃত্যুবরণ করছেন রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই কথাটি ব্যাখ্যা করার মতও কোন ব্যবস্থা ছিল না। পক্ষান্তরে, তাঁরা বোধহয় বিশ্বাস করতেন যে তাঁদের আত্মত্যাগ, তাঁদের মৃত্যুকে-তুচ্ছ-করা বিবৃতি, মানুষের অনুভূতিতে নাড়া দেবে, তাদের শিক্ষিত করে তুলবে এবং নিজেদের সংগঠিত করতে সাহায্য করবে। ফলে তাঁদের বৈপ্লবিক চিন্তা ধারা জনসাধারণের কাছে বিশেষ পৌঁছায়নি। জনসাধারণের কাছে তাঁদের ভাবমূর্তি ছিল নিছক কিছু বীরের, দেশের জন্য যাঁরা মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন। তাঁরা শুধুই একটা জাতীয়তাবাদী চেতনা সৃষ্টি করেছিলেন। যে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের পুঁজিবাদী চরিত্র উন্মুক্ত করে দিয়ে তাঁরা সে জায়গায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, নিজস্ব ছাঁচের জাতীয়তাবাদকে জনপ্রিয় করার জন্য তারাই তাঁদের এই খ্যাতি ও ত্যাগকে কাজে লাগিয়েছিল।

অস্বীকার করা যায় না যে কাজের মাধ্যমে প্রচার রাজনৈতিক শিক্ষার এক শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারত। কিন্তু: অহিংস বা সহিংস হোক, কোন একটা সংগঠিত আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবেই কেবল তা হতে পারত। এইচ. এস. আর. এ-র তীক্ষ্ণধী নেতৃত্ব এই প্রাথমিক রাজনৈতিক বিষয়টি সম্পর্কে কিছুটা যে অবহিত ছিলেন না তা নয়। এই কারণেই ভগৎ সিং, ভগবতী চরণ, রাম কৃষণ, ধন্বন্তরি ও এহ্‌সান ইলাহি কোন না কোন পর্বে নওজওয়ান ভারত সভার কাজে তাঁদের কর্মশক্তির একটা বড় অংশ ব্যয় করেছিলেন। একমাত্র যে শহরে ভগৎ সিং ও তাঁর সহকর্মীদের মহান আত্মত্যাগ বামপন্থীদের মধ্যে একটা রাজনৈতিক আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল সেটা হল লাহোর এবং এর প্রধান কারণ হল সভা সেখানে জেলের ভেতরে তাদের সংগ্রামের ভিত্তিতে প্রসার লাভ করেছিল। অনুরূপভাবে, ১৯৩০ সালে আজাদ এবং যশপাল খুবই চেষ্টা করেছিলেন এমন একটা রাজনৈতিক সংগঠন তৈরি করতে যা জনসাধারণের কাছে তাঁদের কথা পৌঁছে দিতে পারবে। কিন্তু এসব প্রয়াস ছিল নিতান্তই দুর্বল এবং প্রায়শঃই নিষ্ফল এবং কোন অবস্থাতেই তা কাজের মাধ্যমে বিপ্লব প্রচারের সঙ্গে মানানসই ছিল না।

এক দিক দিয়ে একটা গভীর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক বিয়োগান্ত নাটক সেই সময় অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। এইচ. এস. আর. এ নেতৃত্বের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা

প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সামনের সঠিক পথটি দেখতে পেয়েছিলেন।[৪৩] কিন্তু তাঁরা ছিলেন তাঁদের সন্ত্রাসবাদী অতীতের খুবই কাছাকাছি। বস্তুত, সেই অতীত তাঁদের বর্তমানের একটা অংশ হয়ে উঠেছিল কারণ এইসব তরুণ যেন কয়েক মাসে কয়েক দশক সময় অতিক্রম করেছিল। তাঁরা যখন বিচ্ছিন্ন হতে চাইলেন, যেমন অ্যাসেম্বলি বোমার মামলার ক্ষেত্রে, তাঁরা পুরোন পন্থার আবরণের ভেতরে থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন। বীরত্বের প্রতি আনুরক্তিই তাঁদের সন্ত্রাসবাদ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হতে দেয়নি। শেষ পর্যায়ে, ১৯৩০ এর উত্তরার্ধে ও ১৯৩১ এ, তাঁরা প্রধানত লড়াই করছিলেন তাঁদের দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত সহকর্মীদের নির্ভীক ত্যাগের মহিমা আগের মতই উজ্জ্বল রাখার জন্য। রাজনৈতিক বাস্তবতা যে কঠোর আঘাত তাঁদের দিয়েছিল তার সামনে আসন্ন বিপ্লবের স্বপ্ন অপসৃত হয়ে গিয়েছিলো। অবশেষে ভগৎ সিংকে দেখা গেল, যে সব তরুণ বাইরে ছিলেন রাজনীতি সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি তাঁদের কাছে কিভাবে পৌঁছে দেওয়া যায় সেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে, মৃত্যুদণ্ড লাভ করেও তিনি তাঁর রাজনীতি পুনর্বিবেচনা করেছেন এমন কোন লক্ষণ নেই। তাঁর ভেতরের সমাজতন্ত্রী মানুষটি শেষ পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদী মানুষটিকে পরাস্ত করেছিল। যে বীরসুলভ ত্যাগের উপলব্ধি তিনি সন্ত্রাসবাদ থেকে গ্রহণ করেছিলেন তা বর্জন না করে তিনি মরিয়া হয়ে এই পরিবর্তনের কথা জানাতে চেষ্টা করলেন।[৪৪] ভগৎ সিং, সুখদেব, এবং রাজগুরুর প্রাণ বাঁচানোর জন্য বাইরে চন্দ্রশেখর আজাদ প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন, অবৈপ্লবিক নেতাদের হস্তক্ষেপের জন্য বস্তুত সনির্বন্ধ মিনতি জানাতে লাগলেন, আর অবিচলিত চিত্তে অপেক্ষা করতে লাগলেন এক শহিদের মৃত্যুর জন্য। ততদিনে তিনি উপলব্ধি করেছেন তাঁদের জীবনের মূল্য কি। এই বিনিময়ের জন্য তিনি সাময়িকভাবে বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ স্থগিত রাখতেও রাজি ছিলেন। একই সঙ্গে তিনি চেষ্টা করলেন অবশিষ্ট অল্প কিছু মেধাসম্পন্ন সদস্যের মধ্যে দুজন, যশপাল ও সুরেন্দ্র পাণ্ডেকে গণ-সংগঠন ও বিপ্লব করার কৌশল শেখার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে পাঠাতে। কারণ অন্যদের মত তিনিও উপলব্ধি করেছিলেন যে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের পথ ব্যর্থ হয়েছে এবং একমাত্র ব্যাপক গণ-আন্দোলনই পারে বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করতে।[৪৫] এই উপলব্ধি তখন অবশ্য বেশ কিছুদিন ধরেই তাঁদের সচেতনতার অঙ্গ হয়ে উঠছিল।

১০

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীরা সমাজ, রাষ্ট্র, জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও বিপ্লব সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক উপলব্ধির প্রাথমিক

তত্ত্বে পেঁছিতে পেরেছিলেন। বৈপ্লবিক তত্ত্বকে বাস্তবে রূপান্তরিত করা হলেই কেবল গভীরতর উপলব্ধি সম্ভব হতে পারত। পক্ষান্তরে, বিপ্লবী রাজনৈতিক সক্রিয়তা ও সংগঠনের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া এবং বিপ্লবী দলের ভূমিকা তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁরা অবশ্য তাঁদের বিপ্লবী চেতনাকে বরাবর অক্ষুন্ন রেখেছিলেন।

টীকা

1. 1929 সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে প্রচারিত। হিন্দুস্তান সোস্যালিস্ট রিপাবলিক অ্যাসোসিয়েশনের ইস্তাহার (এর পর ইস্তাহার বলে উল্লেখ করা হয়েছে)। উৎস : হিস্ট্রি অব দ্য ফ্রীডম মুভমেন্ট, পর্যায় III, বি 38/3.

২. হিন্দীতে লেখা শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যালের বন্দী জীবন (দিল্লী, 1963) পৃঃ 237 অনুবর্তী ; হিন্দী লেখা বীরেন্দ্র সন্ধুর, যুগদ্রষ্টা ভগৎ সিং, (দিল্লী 1968), পৃঃ 138 ; হিন্দী লেখা যশপালের সিংহবালকান (লক্ষ্ণৌ, 1951), প্রথম খণ্ড, পৃঃ 138 ; অজয় ঘোষ, প্রবন্ধ ও বক্তৃতা সংকলন, (মস্কো, 1962), পৃঃ 15.

3. যশপাল, টীকা 2, পৃঃ, 138.

4. যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইন সার্চ অব ফ্রীডম (কলকাতা, 1967), সান্ন্যাল টীকা 2, পৃঃ 314 অনুবর্তী।

5. যশপাল, টীকা 2, পৃঃ 96.

6. জে. এন. সান্ন্যাল, সর্দার ভগৎ সিং (লাহোর 1931), পৃঃ 26 ; এইচ. আর. ভোরার সাক্ষ্য, ট্রিবিউন, 30 নভেম্বর 1929. এই সঙ্গে দ্রষ্টব্য, অজয় ঘোষ, টীকা 2, পৃঃ 15.

7. 27 মে 1929 তারিখে সি. আই. ডি দপ্তরের রায় বাহাদুর ভগবান দাস-এর দেওয়া এন. বি. সভা সম্বন্ধে মন্তব্য। হোম (পলিটিক্যাল) প্রসিডিংস, এফ 130 এবং কে. কে. ডব্লু. 1930, পৃঃ 40-41.

8. দ্রষ্টব্য, ট্রিবিউন, 26 জানুআরি 1930.

9. অজয় ঘোষ, টীকা 2, পৃঃ 25,

10. জে. সি. চ্যাটার্জি, টীকা 4, পৃঃ 247 ও 391.

11. বি. কে. সিনহার সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

12. যশপাল, টীকা 2, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ 49 ও 59.

13. জে এন সান্ন্যাল, টীকা 6, পৃঃ 26.

14. সোহন সিং জোশ ও পি. সি. জোশীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

15. জে. সি চ্যাটার্জি, টীকা 4, পৃঃ 20, 208-09 ; জে. এন. সান্ন্যাল, টীকা 6, পৃঃ 12.

16. তরুণ বিপ্লবীরা সব সময় জোর দিতেন পুরোনো যুগের বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁদের ধারাবাহিকতার উপর। উদাহরণ স্বরূপ দ্রষ্টব্য, 1923 সালের 23 এপ্রিলের ইয়ং ইন্ডিয়াতে সুখদেবের চিঠি, পৃঃ 82. অনুরূপভাবে ভগৎ সিং তাঁর পূর্ববর্তী কর্তার সিং সরাভার দৃষ্টান্ত তুলে ধরতেন। শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যালের 'বন্দী জীবনে'র প্রথম খণ্ড কার্যত ছিল তাদের মতাদর্শ ও প্রচার

কাবে'র ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক বিশেষ। একইভাবে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীরা শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপক বাণী পাঠিয়েছিলেন ; ট্রিবিউন, এপ্রিল 1930.

17. যশপালের মতে, অধ্যাপক জয়চন্দ্র বিদ্যালংকার এবং জে. এন. সান্যালকে ইচ্ছে করেই দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল, কারণ তাঁরা ছিলেন পুরোনো চিন্তাধারার প্রতিনিধি ; এই সভার অংশগ্রহণকারীরা তাদের আন্দোলনের একটা নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ করতে এবং তাদের সংগঠনের একটা নতুন পথ খুঁজে নিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। দ্রষ্টব্য, যশপাল, টীকা 4, পৃঃ 145.

18. এইচ. আর. এ.-র নেতারা 1925 সালের গোড়ার দিকেই আন্দোলনের ক্ষেত্রে মতবাদের ভূমিকার গুরুত্ব স্বীকার করেছিলেন। একজন জেলা সংগঠকের যে গুণ থাকা দরকার বলে উল্লেখ করা হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল : "আজকের দিনে নিজের মাতৃভূমির বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি অনুধাবন করার ক্ষমতা তাঁর থাকতে হবে।" জে. সি. চ্যাটার্জি'র গ্রন্থে উল্লিখিত 'এইচ. আর. এ.-র গঠনতন্ত্র', টীকা 4, পৃঃ 341.

19 যশপাল, টীকা 2, পৃঃ 148-49। অজয় ঘোষ বলেছিলেন, আজাদ নতুন মতবাদ নিয়ে মাথা ঘামাতেন না—কিন্তু একথা ভুল। আজাদ যে সময় নেতা হিসাবে পরিপক্ক হয়ে উঠছিলেন সেই গুরুত্বপূর্ণ বছরগুলিতে অজয় ঘোষ কারান্তরালে ছিলেন বলেই প্রধানত তিনি এই ভুলটা করেছিলেন। আসল কথাটা হল এই যে, তাত্ত্বিক হিসাবে অন্য কয়েকজন কমরেডের শ্রেষ্ঠত্ব আজাদ স্বীকার করতেন এবং এই ব্যাপারে তাঁর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন।

20. যশপাল, টীকা 2, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ 66-67.

21. দ্য ফিলসফি অব দ্য বম্ব্।

22. 1929-এর 6 জুন ভগৎ সিং এবং দত্তর বিবৃতি।

23. মডার্ণ রিভিউ, ট্রিবিউন, 24 ডিসেম্বর 1929-এ প্রকাশিত ভগৎ সিং ও দত্তর চিঠি।

24. ভগৎ সিং ও দত্তর চিঠি, টীকা 23

25. ভগৎ সিং প্রভৃতি টীকা 22.

26. ভগৎ সিং ও দত্তর চিঠি, টীকা 23.

27. ভগৎ সিং, এন. কে. নিগমের হিন্দীতে রচিত 'বলিদান' (দিল্লী), পৃঃ 41.

28. দ্য ফিলসফি অব দ্য বম্ব্, টীকা 21.

29. জে. সি. চ্যাটার্জি, টীকা 4, পৃঃ 338.

30. গোপাল ঠাকুর, ভগৎ সিং : দ্য ম্যান অ্যান্ড হিজ্ আইডিয়াস-এ উদ্ধৃত (নিউ দিল্লী, 1952), পৃঃ 9.

31. ট্রিবিউন, 10 এপ্রিল 1929.

32. জে. এন. সান্যাল, টীকা 6, পৃঃ 28-29.

33. এইচ. আর. এ. কাউন্সিল-এর সভার বিবরণ, 1924.

34. জে. সি. চ্যাটার্জি, টীকা 4, পৃঃ 242.

35 যশপাল, টীকা 2, পৃঃ 96 ; অজয় ঘোষ, টীকা 2, পৃঃ 36. সেই 1924 সালে লালা লজপৎ রাই প্রকাশ্যে ভগৎ সিং-কে একজন রুশ এজেন্ট বলে বর্ণনা করেছিলেন এবং অভিযোগ করেছিলেন যে, ভগৎ সিং চান "আমাকে একজন লেনিন বানাতে।" ভি. সন্ধু, টীকা 2, পৃঃ 316.

36. ভগৎ সিং সমেত, তাঁদের অনেকেই সম্ভবত কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, কারণ তাঁরা সে সময় কানপুরে উপস্থিত ছিলেন।

37. জে. এন. সান্যাল, টীকা 6, পৃঃ 15.

38. ঐ, পৃঃ 103.

39. যশপাল, টীকা 2, পৃঃ 234-35, 237, 262, 285 এবং 306.

40. ঐ, পৃঃ 237 এবং 306.

41. যশপাল, টীকা 2, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ 11.

42. ভি. সন্ধু, টীকা 2, পৃঃ 196.

43. জে. এন. সান্ন্যাল, টীকা 6, পৃঃ 106.

44. ঐ, পৃঃ 32-33 ; যশপাল টীকা 2, প্রথম খণ্ড, পৃঃ 170

45. ভগবান দাস মাহুর, বানারসী দাস চতুর্বেদী সম্পাদিত, হিন্দীতে লেখা যশ কী ধারওয়ার (দিল্লী, 1968) গ্রন্থের দ্বিতীয় সং, পৃঃ 27--28-এ।

46. যশপাল, টীকা 2, পৃঃ 145 ; মাহুর, টীকা 45, পৃঃ 26.

47. ভগৎ সিং-এর শেষ বাণী ; দ্রষ্টব্য, পরিশিষ্ট 5, বিশ্বনাথ বৈশম্পায়ন-এর হিন্দীতে লেখা অমর শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ। দ্বিতীয়-তৃতীয় খণ্ড, (বারাণসী, 1967), পৃঃ 306.

48. ভি. সন্ধু উদ্ধৃত, টীকা 2, পৃঃ 241. এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, ভগৎ সিং নিজেকে মহান স্বাধীনতা যোদ্ধা হিসেবে ততটা দেখেন নি, যতটা দেখেছিলেন প্রধানত সমাজ-তন্ত্রের মতবাদের প্রচারক হিসেবে।

49. এইচ. আর. এ. প্রকাশিত, দ্য রেভোলিউসনারি, 1925.

50. দ্য ফিলসফি অব দ্য বম্ব্।

51. ভগৎ সিং ইত্যাদি, টীকা 22.

52. নওজওয়ান ভারত সভার নিয়ম কানুন ও বিধি বিধান, পাঞ্জাব, 1 মে 1928, 1929 মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা, উর্দু সাক্ষ্য প্রমাণের (exhibits) ইংরেজী অনুবাদ, এক্সিবিট নং পি 205 (টি) ; নওজওয়ান ভারত সভার কার্যকলাপ সম্বন্ধে রিপোর্ট, হোম (পলিটিক্যাল) প্রসিডিংস, এফ 130 এবং কে ডবলিউ (1930; পৃঃ 40 এবং পৃঃ 10 কে ডবলিউ ; দ্য ফিলসফি অব দ্য বম্ব্।

53. আরো দ্রষ্টব্য, ভগৎ সিং ইত্যাদি, টীকা 22

54. ট্রিবিউন, 14 জুন 1929.

55. 1929 30 সালে মামলা চলাকালীন ট্রিবিউনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য। যেমন, ট্রিবিউন, 6 অক্টোবর 1929 দেখুন।

56. দ্রষ্টব্য, ভগৎ সিং ইত্যাদি টীকা 22 ; দ্য ফিলসফি অব দ্য বম্ব্ ; এবং বৈশম্পায়নের গ্রন্থে ভগৎ সিং-এর শেষ বাণী, টীকা 47.

57. ভগৎ সিং এবং দত্ত তাঁদের 6 জুনের বিবৃতিতে আরো উল্লেখ করেছিলেন "শোষকদের অর্থনৈতিক সংগঠনের" কথা, "সে শোষকদের মধ্যে সরকারই হল দেশের মধ্যে সব চেয়ে বড় শোষক।"

58. দ্য ফিলসফি অব দ্য বম্ব্।

59. গোপাল ঠাকুর উদ্ধৃত, টীকা 30, পৃঃ 39.

60. দ্রষ্টব্য, বৈশম্পায়ন, টীকা 47, দ্বিতীয়-তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ 304, আরো দ্রষ্টব্য, দ্য ফিলসফি অব দ্য বম্ব্।

61. দ্রষ্টব্য, মাহুর, টীকা 45, পৃঃ 10 ; যশপাল, টীকা 2, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ 263-64.

62. গোপাল ঠাকুর উদ্ধৃত, টীকা 30, পৃঃ 39.

63. নওজোয়ান ভারত সভার নিয়ম কানুন ইত্যাদি, টীকা 52, পৃঃ 35 ; আরো দ্রষ্টব্য, জে. এন. সান্ন্যাল, টীকা 6, পৃঃ 25.

64. হোম (পলিটিক্যাল) প্রসিডিংস, এফ 130 এবং কে ডবলিউ (1930), পৃঃ 10.

65. দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার বিবরণ, কৈলাসপতির সাক্ষ্য, প্রথম খণ্ড, পৃঃ 229 ; যশপাল, টীকা 2, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ 153-154.

66. গোপাল ঠাকুর উদ্ধৃত, টীকা 30, পৃঃ 39.

67. ইস্তাহার, ভগৎ সিং, গোপাল ঠাকুর উদ্ধৃত, টীকা 30, পৃঃ 39.

68. গোপাল ঠাকুর উদ্ধৃত, টীকা 30, পৃঃ 39.

69. জে. সি. চ্যাটার্জীর গ্রন্থে উদ্ধৃত এইচ. আর. এ-র গঠনতন্ত্র, টীকা 4, পৃঃ 342. এটা রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে শ্রমিকদের কার্যকারিতা সম্বন্ধে শচীন সান্যালের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল বলেই মনে হয়। দ্রষ্টব্য, এস. সান্যাল, টীকা 2, পৃঃ 237.

70. হোম (পলিটিক্যাল) প্রসিডিংস, এফ. 130 এবং কে. ডবলিউ. (1930) পৃঃ 38 অনুবর্তী। এটা সভার [নওজোয়ান ভারত সভা] কীর্তি কিষাণ অংশের কাজ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

71. ঐ, কে. ডবলিউ., পৃঃ 13.

72. ঐ, পৃঃ 36 অনুবর্তী।

73. লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ললিত কুমার মুখার্জীর সাক্ষ্য, ট্রিবিউন, 7 ডিসেম্বর 1929.

74. কৈলাসপতির সাক্ষ্য, টীকা 65, পৃঃ 299.

75. লাহোরে ছাত্র সম্মেলনে ভগৎ সিং এবং দত্তর বাণী, ট্রিবিউন, 22 অক্টোবর 1929; কৈলাসপতির সাক্ষ্য, টীকা 65, পৃঃ 299.

76. এইচ. এস. আর. এ.-র পুস্তিকা, শান্তিপূর্ণ এবং বৈধ, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা (II) -এ প্রদর্শিত সাক্ষ্যের অনুলিপি, স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস, পর্যায় II, অঞ্চল III, 6/3, একজিবিট পি. এন.। আরো দ্রষ্টব্য ভগৎ সিং, টীকা 22।

77. শান্তিপূর্ণ ও বৈধ; ভগৎ সিং প্রভৃতি, টীকা 22; ভগৎ সিং-এর উক্তি, ভি. সন্ধুর গ্রন্থে উদ্ধৃত, টীকা 2, পৃঃ 323; যশপাল, টীকা 4, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ 12.

78. আরো দ্রষ্টব্য, যুবকদের সম্বন্ধে ভগৎ সিং-এর প্রশস্তি, ভি. সন্ধুর গ্রন্থে উদ্ধৃত, টীকা 2. পৃঃ 323.

79. যশপাল, টীকা 2, পৃঃ 139; দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ 232; কে. এন. নিগম, টীকা 27, পৃঃ 11,

80. যশপাল, টীকা 2, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ 262.

81. ভি. সন্ধু উদ্ধৃত, টীকা 2, পৃঃ 238.

82 দ্রষ্টব্য, মাহুর, টীকা 45, পৃঃ 27-28; যশপাল, টীকা 2, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ 262; দ্বিতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ইন্দর পাল এবং মদন গোপালের সাক্ষ্য; এবং বৈশম্পায়ন, টীকা 47.

83. 1931 সালের ফেব্রুআরি মাসে ভগৎ সিং লিখেছিলেন, 1929 সালে গ্রেপ্তার হবার আগেই তিনি সন্ত্রাসবাদ পরিত্যাগ করেছিলেন; বর্তমান লেখক ভগৎ সিং-এর এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত।

84. ঐ।

85. মাহুর, টীকা 45, পৃঃ 117; নিগম, টীকা 27, পৃঃ 104, অজয় ঘোষ, টীকা 2, পৃঃ 31. বিপ্লবী আন্দোলনগুলির ইতিহাসে নিজেদের ব্যর্থতার স্বীকৃতি এবং বিকল্প পথ বেছে নেবার সংকল্প—বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক সততার বিরল দৃষ্টান্ত।

ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা

ভারতীয় অর্থনীতি, সমাজ ও রাজনীতির ঔপনিবেশিকরণ বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এর একটি হল ভারতীয়দের একটি জাতিতে সংহত করার দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সূত্রপাত। আর একটি হল, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ভারতীয় জনসাধারণের স্বার্থের মূলস্বন্দ্ব ঘনীভূত হওয়ার ফলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের উদ্ভব।

জাতি-গঠন প্রক্রিয়াকে ভিত্তি করে জাতীয় আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। অন্যদিকে, এই আন্দোলনই আবার শক্তিশালী উপাদান হিসাবে ঐ প্রক্রিয়াকে সাহায্য করেছে। জাতীয় আন্দোলনের প্রসার অংশত নির্ভর করেছে, জনসাধারণের জাতিত্ববোধ এবং জাতির মৌল স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে মুক্তির সংগ্রামের আবশ্যকতা সম্পর্কে সচেতনতার মাত্রার উপর। জাতি-চেতনা বা এক জাতিত্ববোধ অবশ্য বাস্তব পরিস্থিতির ফলেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে দেখা দেয়নি; আত্ম-আবিষ্কারের কঠোর, কণ্টকর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাকে আসতে হয়েছিল। এই স্তরে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

প্রকৃতিগতভাবে জাতিগঠন প্রক্রিয়া খুবই বৈশিষ্ট্যমূলক ছিল ও এখনও আছে। এর উপর, নূতন সামাজিক শ্রেণী ও স্তরের গঠনে এবং জনসাধারণের ওপর সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবের বিভিন্নতার ফলে সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে বিচিত্র সম্পর্কের উদ্ভব হয়েছিল। পরিণামে বিভিন্ন ধর্ম, জাতিও ভাষাগত সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং এমনকি বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী ও স্তরের মানুষের মধ্যেও স্থান ও কাল দুই দিক দিয়েই জাতীয় ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনায় অত্যন্ত অসম বিকাশ ঘটেছিল। জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বের সামনে তাই একটা প্রধান কর্তব্য হল ভারতের মানুষের মধ্যে সার্বিক চেতনা সঞ্চার করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সাধারণ স্বার্থে তাদের ঐক্যবদ্ধ করা।

প্রায় সমসময়েই সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব এক্ষেত্রে একটা বড়ো প্রতিবন্ধক হয়ে দেখা দিয়েছিল। ১৮৮০ র দশক থেকেই জাতীয় আন্দোলনের মূল ধারা থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করে রাখার চেষ্টা চলছিল। অন্যদিকে, জাতীয় আন্দোলন বিভিন্ন ধর্মের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার সংকল্প নিয়ে কাজ শুরু করেছিল, এবং সেজন্য তাকে বিভেদকামী সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হয়েছে। এই লড়াইয়ে জাতীয় আন্দোলন-অনুসৃত মূলনীতির প্রয়োগের ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছিল।

২

জাতীয় আন্দোলন-অনুসৃত নীতির মূল সূত্রকে 'উপর থেকে ঐক্য স্থাপনেরপ্রচেষ্টা' হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে। প্রথমে জোর দেওয়া হয়েছিল মুসলমান সমাজে নেতা হিসেবে স্বীকৃত মধ্য ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মুসলমান নেতাদের টেনে আনার উপর। কারণ এই নেতাদের টেনে আনতে পারলে তাঁরাই মুসলমান জনসাধারণ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে জাতীয় আন্দোলনের পক্ষে নিয়ে আসবেন এবং হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্ভব করে রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য সাম্রাজ্যবাদের ওপর চাপ সৃষ্টিতে সাহায্য করতে পারবেন।

এই নীতির মূল বৈশিষ্ট্যই ছিল মধ্য ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য 'নিরাপত্তা' এবং 'রক্ষাকবচের' ব্যবস্থা করার মানসিকতা। তত্ত্বগতভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য নিরাপত্তার প্রশ্ন উঠেছিল কিন্তু বাস্তবে, নেতাদের মধ্যে আলাপ আলোচনায় সংখ্যালঘুদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক বা সামাজিক অধিকারের বিষয়ের উল্লেখ খুব কমই হয়েছে। বরং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানদের জন্য চাকরির প্রতিশ্রুতি এবং মধ্য ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার ভাগ-এর প্রশ্ন নিয়েই বেশির ভাগ সময় আলোচনা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মুসলমান-প্রধান প্রদেশগুলিতে অধিকাংশ আসন মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণের দাবি করা হয়েছিল, কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের দাবি করা হয়নি, যদিও প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার পেলে এইসব প্রদেশে অধিক সংখ্যক মুসলমান বিধায়কের নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল নিশ্চিত। মুসলমান কৃষক ও শ্রমিকের অর্থনৈতিক অধিকার সংরক্ষণের প্রশ্ন কোন পর্যায়েই ওঠেনি, কারণ এমনকি সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরাও বুঝেছিল যে এসব অধিকার হিন্দু কৃষক ও শ্রমিকের অধিকার থেকে আলাদা নয়।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উপর থেকে ঐক্যসাধনের শুরু হয়েছিল। ১৮৮৮ সালে এলাহাবাদের চতুর্থ অধিবেশনে কংগ্রেস একটি প্রস্তাব পাশ করেছিল যাতে বলা হ'ল "এমন কোন বিষয় 'বিষয় নির্বাচনী' কমিটি কর্তৃক আলোচনার জন্য গৃহীত হবে না অথবা কংগ্রেসের কোন অধিবেশনে সভাপতি আলোচনার অনুমতি দেবেন না, যা উত্থাপন করলে হিন্দু বা মুসলমান প্রতিনিধিরা দলবদ্ধ ভাবে, সম্পূর্ণ বা প্রায় একমত হয়ে, আপত্তি জানাতে পারেন।" ১৮৮৯ সালে পুনা-তে পরবর্তী অধিবেশনে কংগ্রেস বিধান পরিষদগুলির সংস্কারের দাবির খসড়া রচনা করেছিল যার মধ্যে দাবি ছিল ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে আসন সংরক্ষণের। প্রথম দিকের নরমপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য রাজনৈতিক ও আদর্শগতভাবে জনসাধারণকে বিকাশমান ঐক্য,

সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াইয়ে সাধারণ স্বার্থ এবং লড়াইয়ে ঐক্যের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন করার যুগপৎ, বিজ্ঞানসম্মত প্রয়াসের মধ্যে নিহিত ছিল।

লোকমান্য তিলকও হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন হওয়া থেকেই অনুরূপ নীতি অনুসরণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন লক্ষ্ণৌ চুক্তির প্রধান রূপকার। এই চুক্তির লক্ষ্য ছিল, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতাদের ঐক্যবদ্ধ করে চাপ দিয়ে সাংবিধানিক সংস্কারে ঔপনিবেশিক শাসকদের সম্মতি আদায় করা। এই চুক্তি এবং তার ফলে পরবর্তী যৌথ রাজনৈতিক উদ্যোগকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণ-সংগ্রামের প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে দেখা হয়নি। কারণ মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ কিংবা 'নরমপন্থী' কংগ্রেসীরা কেউই এমন কোন সংগ্রামে অংশ নেবেন, বা এমনকি কামনা করবেন, এ প্রত্যাশা ছিল না।

খিলাফৎ নেতাদের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর ঐক্য ছিল জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের সফলতম প্রয়াস। এই ঐক্য গণ উপাদান বর্জিত ছিল না। মুসলমান জনগণ ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীকে গণ অসহযোগ আন্দোলনে সামিল করার লক্ষ্যই ছিল এর মূল প্রেরণা, এবং সে দিক থেকে বেশ কিছুটা সফলতাও এসেছিল। এই দিক থেকে পরবর্তী সময়ের হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রয়াসের প্রাথমিক সূত্র এবং পরিণতি থেকে এই প্রচেষ্টা ছিল গুণগতভাবে পৃথক।

একই সঙ্গে গান্ধীপন্থী কৌশলের মৌল বৈশিষ্ট্যও ছিল মধ্য ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মুসলমান নেতাদের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসা। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে ধর্মীয় অনুমোদন লাভের জন্য মুসলমান উলেমাদের (সনাতনী পণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ) রাজনীতিতে আনা উপযোগী ও প্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল। সর্বোপরি, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সাধনের জন্য এমন একটি বিষয় অর্থাৎ খিলাফৎকে বেছে নেওয়া হয়েছিল সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা বা তার উপর সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক ছিল না। খিলাফৎ জন-গণের আন্দোলন না হয়েও জনপ্রিয় আন্দোলন হয়েছিল কারণ এই আন্দোলনের একটি ধর্মীয় দিক ছিল।

উপরন্তু, শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সঙ্গে চুক্তির ফলে এবং একটি ধর্মীয় প্রশ্নে মুসলমান জনসাধারণ ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল বলে তাদের তৎকালিক সচেতনতা পুরোপুরি বজায় ছিল। তারা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল ধর্মনিষ্ঠার জন্য, গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের সংরক্ষণ ও উন্নতিবিধানের জন্য নয়। এর চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই চুক্তির শর্তাবলী এমন ছিল যে এর ফলে গান্ধী ও জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে আধুনিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মানসিকতা বা সামাজিক শক্তিগুলি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির এই সুযোগকে কাজে লাগাতে পারেন নি। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক ও

সামাজিক স্বার্থের বিরোধের দিকটিও এই আন্দোলন তাদের সামনে তুলে ধরেনি, অথচ নরমপন্থী ও চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীরা আগে এ রকম করেছিলেন, মহাত্মা গান্ধী তাঁর অসহযোগ আন্দোলনেও এ রকম করেছিলেন। ফলে খিলাফৎ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী মুসলমান জনসাধারণ আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চিন্তাধারা অথবা ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদ ও গণতন্ত্রের মত রাজনৈতিক সংগঠনের আধুনিক নীতিগুলির সাথে পরিচিত ছিল না। তার বদলে রাজনীতিতে ও রাজনৈতিক সমস্যায় ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির অনুপ্রবেশ বৈধতা ও স্থায়িত্ব পেল। খিলাফৎ আন্দোলন যখন প্রত্যাহার করে নেওয়া হল, জাতীয়তাবাদী মনোভাব আর বিশেষ অবশিষ্ট ছিল না। মওলানা আবুল কালাম আজাদের মত মুষ্টিমেয় কয়েকজন বলিষ্ঠ ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদীই মাত্র বেরিয়ে এসেছিলেন।

খিলাফৎ প্রশ্ন ছাড়াও, কংগ্রেস মুসলমান নেতাদের দলে টানার জন্য অন্য কিছু ব্যবস্থা নিয়েছিল। ১৯২০ সালে নাগপুর অধিবেশনে গৃহীত কংগ্রেসের সংবিধানে ১৮৮৮ সালের প্রস্তাবটি (আগে উদ্ধৃত) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১৯২১ সালে আর একটু এগিয়ে গিয়ে সর্বভারতীয় কমিটি পর্যন্ত কংগ্রেস সংগঠনের সর্বস্তরে লক্ষ্ণৌ চুক্তির আদর্শানুযায়ী মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণের নীতি সুপারিশ করেছিল; পরবর্তী কালে শিখদের জন্যও এই নীতি সম্প্রসারিত করার জন্য পঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

১৯২২ সালে সাম্প্রদায়িকতাবাদ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হ'ল। এই সময় "হিন্দু-মুসলমান অনৈক্যের সমস্যা সমাধানে জন্য কর্মসূচি" রচনার উদ্দেশ্যে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করার প্রতিবিধান দিয়েছিল কংগ্রেস; প্রথমে কংগ্রেস সভাপতি ভি. জে. প্যাটেল ও হাকিম আজমল খান এই দুজন নেতাকে নিয়ে এবং পরে এই দুজন এবং মদন মোহন মালব্য ও হাকিম আজমল খান কর্তৃক মনোনীত এক জন মুসলমান নেতা—এই চারজনকে নিয়ে। ১৯২৩ সালে এ আই সি সির গয়া অধিবেশনে ডঃ আনসারিকে অনুরোধ করা হ'ল জাতীয় চুক্তির একটি খসড়া তৈরি করে "বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধি ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের…মতামত যাচাই করার উদ্দেশ্য তাঁদের মধ্যে বিলি করার জন্য।" এই ভাবে জনসাধারণকে যুক্ত না করে এবং তাদের শিক্ষিত করে তোলার দিকে নজর না দিয়ে নেতাদের মধ্যে চুক্তি করে একটা কর্মসূচির মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের কথা ভাবা হয়েছিল। জনসাধারণকে এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করার বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে অনুপযুক্ত বলে মনে করা হয়েছিল।

একইভাবে ১৯২৩ সালে চিত্তরঞ্জন দাশের প্রচেষ্টারও লক্ষ্য ছিল শীর্ষ পর্যায়ে চুক্তি দ্বারা "মুসলমানদের স্বার্থ" অর্থাৎ উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানদের

স্বার্থের 'রক্ষাকবচের' ব্যবস্থা করা। একইভাবে মতিলাল নেহরুও মাহমুদাবাদের রাজার মত নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন।

বস্তুত, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যসাধনের জন্য কংগ্রেসের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াসই ছিল হিন্দু, মুসলমান ও শিখ সাম্প্রদায়িকতাবাদের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও কংগ্রেসের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ধর্ম-নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলির নেতা ও সক্রিয় সংগঠক হওয়ার বদলে কংগ্রেস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক নেতাদের মধ্যে মধ্যস্থের ভূমিকা নিয়েছে।

একই নীতিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গারও মোকাবিলা করা হয়েছিল। দাঙ্গার হোতাদের বিরুদ্ধে বা যে দৃষ্টিভঙ্গি তাদের বেড়ে উঠতে সাহায্য করছিল তার বিরুদ্ধে গণ রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত লড়াই সংগঠিত করার কোন চেষ্টাই প্রায় করা হয়নি। এমনকি অসহযোগ আন্দোলনের সীমিত গণ সমাবেশের কৌশলও ব্যবহার করা হয়নি। তার বদলে, যেসব তাৎক্ষণিক সাম্প্রদায়িক বিরোধকে নির্দিষ্ট অঞ্চলে দাঙ্গা বাধানোর কাজে ব্যবহার করা যেত সেগুলির মীমাংসাতেই রাজনৈতিক প্রয়াস প্রায় পুরোপুরি নিবদ্ধ ছিল। এমনকি তাও করা হয়েছে উদারনীতিক কায়দায় কোন আঞ্চলিক বা জাতীয় চুক্তিতে সই করার জন্য 'হিন্দু' ও 'মুসলমান' নেতাদের একত্র করে। সাম্প্রদায়িক সমস্যার ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে কেন্দ্র করে ১৯২৪ সালে গান্ধীর গুরুত্বপূর্ণ অনশন বিভিন্ন 'সম্প্রদায়ের' নেতাদের মধ্যে শীর্ষস্তরে একটা ভাসা ভাসা চুক্তির বেশি কিছুই করতে পারেনি।

এই পন্থার হাস্যকর দিক, এর নিষ্ফলতা এবং নীতিহীনতা স্পষ্ট হয়ে উঠল যখন শীর্ষস্তরে ঐক্যসাধনের চেষ্টায় মুসলিম লীগের অধিবেশনে 'হিন্দু' নেতাদের ও হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে 'মুসলমান' নেতাদের উপস্থিতিকে উৎসাহিত করা হল। কার্যত এর ফলে তাঁরা বাধ্য হলেন শান্তশিষ্টভাবে সাম্প্রদায়িক বক্তৃতা এমনকি বিরোধী সম্প্রদায়ের গালিগালাজও শুনতে। পরিণামে, এর ফলে চিরকালের জন্য তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল।

৩

সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে উপর থেকে ঐক্য সাধনের নীতির কয়েকটি সহজাত ত্রুটি ছিল। এর ফলে উপরতলায় সাম্প্রদায়িক বা জাতীয় নেতাদের হিন্দু বা মুসলমান বা শিখদের মুখপাত্র হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছিল বলে, তাঁদের সমগ্র রাজনীতি ও চিন্তাধারাকে হিন্দু বা মুসলমান বা শিখদের স্বার্থ ও আচরণের প্রতিফলন হিসেবে মেনে নেওয়া হ'ল। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়

হোক এতে ভারতে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের অস্তিত্বেরধারণাকে স্বীকৃতিদিয়েপরোক্ষে সমর্থন করা হয়েছিল। ধরে নেওয়া হ'ল যে, হিন্দু, মুসলমান ও শিখ সম্প্রদায়ের বাস্তবিকভাবে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে এবং ধর্ম ছাড়াও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থের ভিন্নতা তাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। অতএব, মুসলমান ও হিন্দু হিসেবে দুই সম্প্রদায়ের 'সাধারণ লক্ষ্য' আলাদা, এবং 'তারা স্বতন্ত্র সমাজ গঠন করেছে।' জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের মধ্যে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ছিল এই যে, জাতীয়তাবাদীরা চাইতো এই দুই সম্প্রদায়, সম্প্রদায় হিসেবেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হোক আর সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা চাইত একে অপরকে এড়িয়ে চলতে এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করতে।[1] উভয় পক্ষই সাম্প্রদায়িকতার যুক্তি মেনে নিয়েছিল। জাতীয়তাবাদীরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যসাধনে সচেষ্ট ছিল, অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা তাদের যুক্তিকে আরো সম্প্রসারিত করেছে। জিন্না প্রথম জীবনে দুটোই করতে পারতেন।[2] এইভাবে, রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থাৎ ভারতের রাজনীতিতে জনসাধারণের বিভিন্ন অংশকে একত্রিত করার পরিবর্তে স্বতন্ত্রভাবে গঠিত ভিন্ন সম্প্রদায়ের ও তাদের নেতাদের ঐক্যবদ্ধ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করার ফলে—ভারতের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দেওয়া হল।

এর কিছু পরোক্ষ ফলও দেখা গিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা কখনো স্রেফ হিন্দু স্বার্থের কথা বলে, কখনো আবার জাতীয় ঐক্যের কথা বলে অবাধে জাতীয় কংগ্রেসে ঢুকতে এবং জাতীয় কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পেরেছে। এবং অতি ধর্ম নিরপেক্ষ কংগ্রেসীও চোখের পলকে রূপান্তরিত হতে পেরেছেন পুরোদস্তুর সাম্প্রদায়িকতাবাদীতে।

উপর-থেকে-ঐক্যের এই নীতির মধ্যেই নিহিত ছিল হিন্দু-মুসলমান ঐক্য আলোচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নেতাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মানসিকতাকে উৎসাহিত করার সহায়ক আরেকটি ব্যবস্থা। এইসব নেতাদের অনেকেরই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার পুরোটাই হয়েছিল হয় মুসলমান অথবা হিন্দু নেতা হিসেবে।[3] এই কারণেই অন্যান্যরা তাঁদের নেতা হিসেবে মান্য করেছে এবং তাঁরাও অন্য ক্ষমতাশালী নেতাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পেরেছেন। ফলে তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের পক্ষেও জাতীয়তাবাদী মুসলমান বা জাতীয়তাবাদী হিন্দু থেকে বিশুদ্ধ জাতীয়তাবাদীতে উত্তীর্ণ হওয়া মুশকিল ছিল। বিশুদ্ধ জাতীয়তাবাদী হলে তাঁদের রাজনৈতিক গুরুত্ব সহসা কমে যেত।

সাম্প্রদায়িক নেতাদের সঙ্গে অবিরত আলাপ-আলোচনার ফলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুসলমানরাও দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা উত্তরোত্তর বাধ্য হচ্ছিলেন জাতীয়তাবাদী মুসলমান হিসেবে ভাবনাচিন্তা ও কাজকর্ম করতে। আবুল কালাম আজাদ ও আসফ আলির মত জাতীয়তাবাদী ক্রমশ দুর্লভ হয়ে উঠেছিল।

উপর থেকে ঐক্যের নীতির সমর্থনে রাজনৈতিক বা ঐতিহাসিক যে যুক্তি দেওয়া যেতে পারত, তা হল সাম্প্রদায়িক সমস্যা সহ রাজনৈতিক বিষয়গুলিকে স্পষ্ট করে তোলার অভিযানের প্রাথমিক স্তরে অ-রাজনৈতিক জনমানসের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই নীতি সহায়ক। তাছাড়া, সাম্প্রদায়িক নেতাদের মধ্যে সৌহার্দ্যের সামগ্রিক পরিবেশকে তখনই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ও ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে একটা জোরালো আক্রমণ চালানোর জন্য ব্যবহার করা যেত। কিন্তু সেরকম কিছুই করা হয়নি। উপর তলায় ঐক্যকে জাতীয় সংহতির প্রশ্নে চূড়ান্ত রাজনৈতিক সিদ্ধি হিসেবে এবং সমস্ত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের লক্ষ্য হিসেবে দেখা হয়েছে। মালব্য ও জিন্নার মধ্যে কিংবা লালা লাজপত রাই, ডঃ আনসারি ও সর্দার মহতাব সিং এর মধ্যে চুক্তিকে অথবা সমস্ত সাম্প্রদায়িক নেতা ও দলকে নিয়ে সর্বদলীয় সম্মেলনকে সর্বোচ্চ কর্মসূচি বলে মনে করা হয়েছে।

৪

সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানে সনাতন জাতীয় নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম মৌলিক দুর্বলতার কারণ নিহিত ছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের প্রকৃতির মধ্যেই। এই সংগ্রাম না ছিল নিরবচ্ছিন্ন, না সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে নিরলস আপস-বিরোধী। তাছাড়া, নিরবচ্ছিন্ন রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে সাধারণ মানুষকে কখনো যুক্ত করাও হয়নি। বস্তুত, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসের এবং সংগ্রামরত জনগণকে পেছন থেকে টেনে ধরার প্রবণতাই ছিল সাম্প্রদায়িকতার বারবার প্রকাশ ও বিস্তারের একটা বড়ো কারণ। যাই হোক, ভারতের জনগণের মৌলিক সাধারণ স্বার্থের অভিন্নতা এবং কার্যত, জাতীয় সংহতি বহুলাংশে গড়ে উঠেছিল উপনিবেশবাদ-বিরোধী সংগ্রাম এবং আর্থনীতিক ও সামাজিক উন্নতির প্রয়োজন থেকে, এবং সাধারণ শ্রেণী স্বার্থ থেকে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সার্বজনীন লড়াই এবং শ্রেণী স্বার্থের লড়াইয়ের মাধ্যমে তাদের সামগ্রিক স্বার্থের চেতনাকে বিকশিত ও প্রবল করে তোলা যেত। এই চেতনা ধর্মীয়, জাতিগত ও ভাষাগত বিভেদ মুছে ফেলতে পারত। এদিক থেকে সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের তুলনায় জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলির একটা বিশেষ সুবিধা ছিল। কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্বেই হোক অথবা তার ভেতরের বা বাইরের বাম গোষ্ঠী বা দলের প্রতিনিধিত্বেই হোক, জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলি বাস্তবে ছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, এবং সেই কারণেই তারা সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আবেগ, আন্দোলন ও মানুষকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করতে পারত। পক্ষান্তরে, 'সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এবং সংগ্রামে অনীহার মধ্যেই নিহিত ছিল

সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির দুর্বলতা—বিশেষ করে ১৯৩৭ সালের ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের দিকে পূর্ণ সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার পর। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন গণ-সংগ্রামের মাধ্যমেই সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির মুখোশ খুলে দেওয়া অথবা মূল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রবাহে তাদের টেনে আনা সম্ভব ছিল। এবং এর ফলে তাদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব এবং জনগণের ওপর প্রভাব ক্রমশ নির্মূল হ'ত।

সমকালীন ইতিহাসের দিকে তাকালে এ বিষয়ে কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য পাওয়া যাবে। দেখা যাবে যখনই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে জোয়ার এসেছে সাম্প্রদায়িকতাবাদ পিছু হটেছে এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে ভাঁটা পড়লেই সাম্প্রদায়িকতাবাদ ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় একদিকে হোম রুল লীগের উত্থান ও অন্য দিকে গদরপন্থীদের সশস্ত্র সংগ্রামের ফলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম যখন উত্তাল হয়ে উঠেছিল, সাম্রাজ্যবাদ সমর্থক সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি তখন অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে পড়েছে। ১৯১৮ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত বছরগুলি তাই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম ও হিন্দু-মুসলমান ঐক্য উভয়ের পক্ষেই ছিল সুখের সময়। মুসলিম লীগ ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির প্রভাব তখন নগণ্য। বস্তুত, এদের কারোরই গণ-ভিত্তি ছিল না, এমন কি নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলির মধ্যেও নয়। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম প্রত্যাহার করে নেওয়ার পরে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। আন্দোলন হঠাৎ থেমে যাওয়ার ফলে যে হতাশা ও অসন্তোষ দেখা দিল তার ফলেই সাম্প্রদায়িক তিক্ততা বেড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। নিজেদের ভাগ্য ফেরাতে সরকার ও বিত্তবান শ্রেণী জায়মান ও অসম্বদ্ধ গণআন্দোলনের উপর সাম্প্রদায়িক রং চড়াতে সমর্থ হল। এর উপর ১৯২২ সালের পরে সংসদীয় রাজনীতি অনুসৃত হওয়ার ফলে সাধারণ কংগ্রেস কর্মীদের ভেতর থেকে এবং তার বাইরে থেকেও সৃষ্টি হল বিপুল সংখ্যক 'হিন্দু' ও 'মুসলমান' নেতা। কিন্তু এসব সত্ত্বেও অসহযোগ আন্দোলনের রেশ সাম্প্রদায়িকতাবাদকে মুষ্টিমেয় নেতাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে পেরেছিল। এদের সংকীর্ণ সামাজিক ভিত্তি সীমিত ছিল সমাজের মধ্য ও উচ্চ স্তরের মধ্যে। ফলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক প্রাচীরকে ভেঙে ফেলতে পারার সম্ভাবনা ১৯২০র দশক ধরেই ছিল।

১৯২৬ সালের পর বামপন্থী রাজনীতির অভ্যুদয়, ট্রেড ইউনিয়ন ও যুব আন্দোলনের প্রসার, এবং সাইমন কমিশন-বিরোধী প্রতিবাদ আন্দোলন আর একবার সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা প্রশমিত করে জনগণের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার করতে পেরেছিল। সারা দেশে দ্বিতীয় আইন অমান্য আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল। ১৯২০ সাল থেকে ১৯২২ সালের আন্দোলনে যা ঘটেনি এবার তাই ঘটল। জনসাধারণ আন্দোলনে অংশ নিল ভারতীয় হিসেবেই, আলাদা আলাদা অভাব-

অভিযোগ নিয়ে হিন্দু বা মুসলমান হিসেবে নয়।[৪] সাম্প্রদায়িক দলগুলি এবং তাদের নেতারা আড়ালে যেতে বাধ্য হল। বস্তুত এদের অনেকেই আন্দোলনে যোগ দিল অথবা সমর্থন জানাল। অনেকে কার্যত রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করল। ১৯৩১-৩২ সাল পর্যন্ত মুসলমান সম্প্রদায় সক্রিয় ভাবেই এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, এই প্রথম জাতীয় আন্দোলন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও কাশ্মীর এর মত দুটি মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। অনুরূপভাবে, মেওয়াতিরা (মুসলমান) আলোয়ারের মহারাজার বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছিল। উপরন্তু, হিন্দু ও মুসলমান যুব সম্প্রদায়, শ্রমজীবী মানুষ এবং অনেক জায়গায় কৃষক ক্রমাগত বেশী পরিমাণে রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রত্যাশায় কমিউনিস্ট পার্টি, ভগৎ সিং-এর নওজওয়ান ভারত সভা, এবং নেহরু ও সুভাষ বোসের মুখাপেক্ষী হচ্ছিল।

১৯৩১ সালে আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত এবং ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আপস আলোচনা সাম্প্রদায়িক নেতাদের আবার মঞ্চে আবির্ভূত হওয়ার সুযোগ করে দিল। এবং তখনই ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করল যে সাম্প্রদায়িকতাবাদ হল প্রধান রাজনৈতিক সমস্যা এবং সংবিধান সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আগে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে বাছাই করা সাম্প্রদায়িক নেতাদের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হ'ল। দুর্ভাগ্য বশত, আপসমুখী কংগ্রেসী নেতৃত্ব রাজনৈতিক অগ্রগতি লাভের প্রত্যাশায় অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই ফাঁদে পা দিল।

অল্পদিনের মধ্যেই আইন অমান্য আন্দোলন আবার শুরু হল। ১৯৩৩-৩৪ সালে সে আন্দোলনের ব্যর্থতা ও প্রত্যাহারের আগে অবশ্য সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা আর মাথা তোলার সুযোগ পায়নি। এমনকি সেক্ষেত্রেও মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভার মত সবচেয়ে প্রকাশ্য সাম্প্রদায়িক সংগঠনও ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত দুর্বল হয়েই থেকেছে। লীগের ভেতরে নির্লজ্জভাবে সাম্প্রদায়িক, সামন্ততান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক শক্তিগুলি ১৯৩২ সাল পর্যন্ত সংখ্যালঘু ছিল; বিরাট সংখ্যক মুসলিম লীগ নেতা ছিলেন কংগ্রেসের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন। এমনকি ১৯৩৪-৩৭ সালে কংগ্রেস যখন সরকারি সংস্কারের ও ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনকে দুর্বার করে তোলার প্রতিশ্রুতি নিয়ে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন-পরিষদগুলিতে নির্বাচনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে তখনও সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি দুর্বল হয়েই ছিল এবং বেড়ে উঠতে পারেনি। পাছে তারা সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায় সেইজন্য এই সময় তারা কংগ্রেস-এর বিরোধিতা করতে ভয় পেয়েছে। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে বা হিন্দু-মুসলমানে কোন তিক্ততা ঘটেনি। এই নির্বাচনে আসন দখলে ভোটের সংখ্যায় বা প্রভাব বিস্তারে কোনো ক্ষেত্রেই লীগ বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। এমনকি মুসলমান-প্রধান প্রদেশগুলিতেও লীগ খুব বেশী

সমর্থন পায়নি। প্রাদেশিক বিধানসভাগুলিতে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত মোট ৪৮২ টি আসনের মধ্যে লীগ পেয়েছিল মাত্র ১০৮ টি। মোট ৭৩,১৯,৪৪৫ জন মুসলমান ভোটদাতার মধ্যে মাত্র ৩,২১,৭২২ জন লীগ প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দিয়েছিল। অর্থাৎ তারা নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানদের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়েছিল। অন্যভাবে বলা যায়, সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ তখনও ভারতের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেনি।

১৯৩৭ সালের পরে যখন একদিকে কংগ্রেস ১৯৩৫ সালের নূতন ভারত সরকার আইন বলে সরকারে অংশগ্রহণ করে পরিণত হল এক সংসদীয় দলে, আর সুদূর ভবিষ্যতে ছাড়া সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণসংগ্রামের আশা ত্যাগ করে বিধান সভার ভেতরেও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, শ্রমিক-দরদী, কৃষক-দরদী এবং সাধারণভাবে জনু-দরদী রাজনীতির পরিবর্তে বুর্জোয়া-ভূস্বামী রাজনীতি অনুসরণ করতে শুরু করল, এবং অন্যদিকে ক্রমবর্ধনশীল বামপন্থী শক্তিও কংগ্রেসীদের কৌশলের বিকল্প তাত্ত্বিক নয়, বাস্তব কর্মকৌশল গ্রহণে ব্যর্থ হল, একমাত্র তখনই সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি স্ব-ভূমিকায় ফিরে আসতে এবং এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে পেরেছিল।

অবশ্য মুসলিম লীগ এবং উত্তর ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রকৃত অগ্রগতি ঘটেছিল ১৯৪২ সালের পরেই। তখন ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে দমন করা হয়েছে, লক্ষ্য করা যেতে পারে, এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে লীগের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও আন্দোলনের সময় কোন রকম সাম্প্রদায়িক অশান্তি ছিল না, কংগ্রেস নেতৃত্ব কারাগারে নিষ্ক্রিয় হয়ে আছেন, আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ-বিরোধী যুদ্ধকে কিভাবে সমর্থন করা যাবে সে সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হওয়ার ফলে কমিউনিস্টরা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা ও গণ-আন্দোলনের নেতৃত্বের স্থান নিতে ব্যর্থ হয়েছে, এবং ভারতবর্ষের উচ্চ, মধ্য ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীগুলি যুদ্ধের সময় চাকরি, ঠিকাদারী ও প্রচুর মুনাফা লাভের সুযোগ নেওয়ার জন্য সব রকম রাজনীতি ত্যাগ করেছে।

৫

সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আরেকটি মৌলিক দুর্বলতা ছিল, সাধারণ ভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এবং বিশেষ ভাবে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সুদৃঢ় নীতিগত লড়াই সংগঠিত করতে এই আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে। নানা দিক দিয়ে এই ব্যর্থতা এসেছে।

ভারতে মুসলমানরা ছিল ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। সাম্রাজ্যবাদী লেখক প্রশাসক, রাষ্ট্রনায়করা এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সক্রিয়

সাম্প্রদায়িক নেতারা মুসলমান জনসাধারণ, মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীকে এই বিষয়ে সর্বদা সচেতন করে রেখেছে। মুসলমানেরা এমন এক পরিস্থিতিতে বাস করত যেখানে হিন্দুদের এক ক্ষুদ্র কিন্তু সরব সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী নিয়মিতভাবে দেশকে হিন্দুভাবাপন্ন করার কথা বলত এবং এই লক্ষ্য ও অন্যান্য অনুরূপ লক্ষ্যের সঙ্গে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের লক্ষ্যকে এক করে দেখত। ফলে তারা শুধু দমন-পীড়নের ভয়েই নয়, ক্রমশ দুঃখ-দুর্দশায় তলিয়ে যাওয়ার আশাংকায়ও ভীত হয়ে পড়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে, একমাত্র ধর্মীয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক মানসিকতার বিরুদ্ধে সক্রিয় লড়াইয়ের ভিত্তিতেই ধর্ম-নিরপেক্ষ ও সংঘবদ্ধ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব ছিল। অন্য দিকে, এই মানসিকতার প্রতি যে কোনো রকম দুর্বলতা প্রদর্শনের অনিবার্য ফল ছিল সংখ্যালঘুদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি, তা যতই অবাস্তব হোক। এর ফলে মুসলমান সাম্প্রদায়িক নেতারা স্বীয় সম্প্রদায়ের জনগণ ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্যে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পেয়েছে।

জাতীয় আন্দোলনের কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রধান অংশটি নিঃসন্দেহে ধর্ম-নিরপেক্ষ ও ধর্মীয় সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত ছিলেন। এঁরা হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের পক্ষে নিয়মিত প্রচার, এবং এমনকি আন্দোলনও সংগঠিত করেছেন। তাছাড়া অনেক সংকটপূর্ণ মুহূর্তে হিন্দু সম্প্রদায়বাদীদের সন্তুষ্ট রাখার প্রস্তাব বর্জন করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, কোন পর্যায়েই তাঁরা হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত আক্রমণ চালান নি।

এর জন্য গোড়াতেই স্বীকার করতে হ'ত যে সংখ্যাগুরুর ও সংখ্যালঘুর সাম্প্রদায়িকতা এক নয়, বিষয় বস্তুতে মিল থাকলেও তাদের রূপ আলাদা হতে বাধ্য। সংখ্যালঘু চরিত্রের জন্যই সংখ্যালঘুর সাম্প্রদায়িকতাবাদীকে প্রকাশ্যভাবে গোষ্ঠীগত, সংকীর্ণ, অগণতান্ত্রিক ও বিভেদমূলক পথ নিতে হয় এবং 'সংখ্যালঘুর রক্ষাকবচ' ইত্যাদি কথাবার্তা বলতে হয়। অন্যদিকে সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা জানে যে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের গণতান্ত্রিক নীতি তাদের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রভুত্ব কায়েম করার এবং মধ্য ও উচ্চশ্রেণীর জন্য চাকুরী ও অন্যান্য অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা এনে দিতে পারে। সংখ্যা-গুরু শ্রেণীগুলি তুলনামূলকভাবে প্রাগ্রসর হলে এই সম্ভাবনা আরো বেশি। তারা তাই নিরাপদে জাতীয়তাবাদীর ছদ্মবেশে গণতন্ত্র, সুযোগের সমতা, মেধার প্রতিযোগিতা ইত্যাদি বড়-বড় নীতির কথা বলতে পারে। মুসলমান সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদীকে যেখানে একজন খাঁটি জাতীয়তাবাদীর ভাব দেখিয়েও, বাধ্য হয়েই 'মুসলমানদের অধিকার' রক্ষা করতে চাইতে হ'ত, সেখানে হিন্দু সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদীর খোলাখুলিভাবে সাম্প্রদায়িক মনোভাব দেখানর প্রয়োজন ছিল না, কারণ সে ধরেই নিত যে সংখ্যাধিক্যের নীতিই অনিবার্যভাবে 'হিন্দুদের অধিকার' রক্ষা করবে।[৪]

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পক্ষে সেই কারণে জাতীয় অথবা সম্প্রদায়গত দাবির প্রতি আনুগত্য অনুযায়ী জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীর মধ্যে সরল ভেদ-রেখা অগ্রাহ্য করা আবশ্যক ছিল। জাতীয়তাবাদকে যারা গ্রহণ করেছিল তাদের সবাই যে ধর্ম-নিরপেক্ষ ছিল তাও নয়; তাদের অনেকেই মনে মনে কম-বেশি সাম্প্রদায়িক আনুগত্য পোষণ করত এবং কখনো কখনো অকপট সাম্প্রদায়িক মুসলমানের মতই সাম্প্রদায়িক আনুগত্যে আপ্লুত হয়ে যেত। অন্যভাবে বলা যায়, একজন হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীকে আপাতদৃষ্টিতে মুসলমান বিভেদপন্থীর মত মনে হ'ত না, কারণ সে আরো বেশি করে জাতীয় সংহতি ও পারস্পরিক বিশ্বাসের কথা বলতে পারত,[৮] যদিও বাস্তবে সে একইরকম বিদ্বেষপরায়ণ সাম্প্রদায়িকতাবাদী ছিল। সেইজন্য জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বকে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের চিন্তাধারা, মনস্তত্ত্ব ও রাজনৈতিক পন্থার গভীরে অনুসন্ধান করতে হত। হিন্দু মহাসভাকে মুসলিম লীগের হিন্দু প্রতিরূপ ধরে নিয়ে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে দুর্বল করে রাখতে পারার জন্য শ্লাঘা বোধ না করে নিজেরই সাধারণ কর্মীদের মধ্যে লক্ষ্য করতে হ'ত, এখানেই নানা বর্ণ ও শ্রেণীর বহুসংখ্যক হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীর সন্ধান মিলত। জাতীয়তাবাদের মুখোশধারী এই সব হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই না করে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব ছিল না। স্বাভাবিক কারণেই, ওরা ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন।

তা না করে কংগ্রেস নেতৃত্ব প্রকাশ্যে সাম্প্রদায়িকদের অথবা যাদের মতাদর্শ ও রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব বেশ ভালভাবেই ছিল এমন ব্যক্তিদের কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার, এমন কি কংগ্রেসের মধ্যে আঞ্চলিক থেকে সর্বভারতীয় সব স্তরেই নেতৃত্বের আসন দখলের সুযোগ দিয়েছিলেন। উপরতলার কংগ্রেসী নেতারা এদের জাতীয়তাবাদীর সুনাম অর্জন করতে কিংবা সেই সুনাম বজায় রাখতে কোন বাধা দেননি। এদেরকে সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী আখ্যা দেওয়া যায়। এই সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদীরা মাঝে মাঝেই কংগ্রেস ত্যাগ করত, এমন কি রাজনৈতিক বিরোধিতাও করত। কিন্তু সহজেই আবার তারা নেতৃত্বের পদ পেত। আত্ম-সমালোচনার বা তাদের সাম্প্রতিক মতামতের অথবা এমনকি অনেক সময়ে তাদের বর্তমান সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারার ভুল স্বীকারের প্রয়োজন হ'ত না।

পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য হিন্দু মহাসভা আর কংগ্রেসের মধ্যে স্বচ্ছন্দে বিহার করতেন। ১৯৩১ সাল পর্যন্ত তিনি দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার প্রতিনিধিত্ব করেছেন, তথাপি ১৯৩২ সালে কংগ্রেসে ফিরে এসে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি মনোনীত হয়েছেন। ১৯৩৪ সালের মে মাসে এ. আই. সি. সি. কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্যে তাঁকে ও ডঃ আনসারিকে একটি কংগ্রেস স্বরাজবাদী সংসদীয় বোর্ড গঠনের জন্য অনুরোধও করেছিল। পঞ্জাবের গোপীচাঁদ ভার্গব প্রাদেশিক বিধান সভায় একদিন হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করলে পরদিনই আবার ভোল

পালটে হয়ে যেতেন কংগ্রেসী ও গান্ধীবাদী নেতা। পঞ্জাব ও বাংলা, এই দুই প্রদেশের বহু কংগ্রেসী নেতারই একই সঙ্গে চাকুরির ব্যাপারে 'হিন্দু স্বার্থ' সমর্থন করতে এবং সাংবিধানিক বিষয় নিয়ে কিংবা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ব্যাপারে আলোচনা করতে কোন অসুবিধেই হয়নি। ১৯২২ সালের পরে অনেক জাতীয়তাবাদীই প্রকাশ্যে সাম্প্রদায়িকতাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন এবং নিজের নিজের সাম্প্রদায়িক সংগঠনে যোগ দিয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও তাঁদের অচিরেই দেখা গেল আইন সভাগুলিতে স্বরাজবাদীদের আসন অলংকৃত করতে। ১৯২৬ সালে মতিলাল নেহরু কংগ্রেসের গৌহাটি অধিবেশনে তাঁর সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী সমালোচকদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন ঃ

> স্বরাজবাদীদের সত্যিকারের পরাজয় ঘটেছে।··কিন্তু সেটা তারা স্বরাজবাদী বলে নয়, তারা জাতীয়তাবাদী বলে। ···এটা ছিল জাতীয়তাবাদী শক্তি এবং ধনদৌলত, পাইকারি দুর্নীতি, সন্ত্রাসবাদ ও মিথ্যাচারে বলীয়ান হীন সাম্প্রদায়িক শক্তির মধ্যে লড়াই। কি হিন্দু কি মুসলমান, কংগ্রেস বিরোধীদের জিগির ছিল, 'ধর্ম বিপন্ন'। আমার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযোগ করা হয়েছে যে আমি গোমাংসভোজী এবং গোহত্যাকারী, মসজিদের সামনে গান-বাজনা বন্ধের সমর্থক, এবং এলাহাবাদে রামলীলা শোভাযাত্রার গতিরোধের জন্য দায়ী একমাত্র ব্যক্তি। ···ডাক-বাংলো এবং ইন্সপেকশন বাংলোতে থাকা এবং ইউরোপীয় কায়দায় তৈরি খাবার খাওয়া ইত্যাদির কথা বলা হয় মিথ্যা প্রচার জোরদার করার জন্য।

তথাপি খুব অল্প দিনের মধ্যেই তিনি আর তাঁর সাম্প্রদায়িক সমালোচকরা স্বাধীনতা সংগ্রামে একই তালে পা ফেলে হাঁটছিলেন!

এটাও লক্ষণীয় যে, 'শুদ্ধি' ও 'সংগঠন' আন্দোলন নেতৃস্থানীয় কংগ্রেসী এবং অন্যান্য জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। অন্যান্য কংগ্রেসীরা তবলিঘ ও তনজীম আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। কংগ্রেস নেতৃত্ব এর কোনটিরই নিন্দা করেন নি। বহু বিতর্কের পর তাঁরা কেবলমাত্র এদের ক্রিয়াকলাপে বলপ্রয়োগের বিরোধিতা করেছিলেন একইভাবে, অনেক জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র পুরো সময়ের জাতীয়তাবাদী হিসেবে এবং আংশিক সময়ের সাম্প্রদায়িক প্রকাশ মাধ্যম হিসেবে কাজ করত। উদাহরণস্বরূপ, লাহোরের **ট্রিবিউন** পত্রিকার জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র হিসেবে ব্যাপক সুনাম ছিল, কিন্তু পত্রিকাটি সরকারি চাকরি, আইন সভার আসন ইত্যাদিতে অবিরত হিন্দুদের জন্য বৃহত্তর অংশ দাবি করত এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতি বিষয়ে প্রকাশ্যেই 'হিন্দু-সমর্থক' অর্থৎ হিন্দু সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকাশ করত। এলাহবাদের **লীডার** এবং কলকাতার **অমৃতবাজার পত্রিকা**-র ক্ষেত্রেও একথা সত্য। এমন কি **হিন্দুস্তান টাইমস্**ও মহাত্মা গান্ধী ও জি ডি বিড়লার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সত্ত্বেও হিন্দু মহাসভাকে বর্জন করতে চায়নি।

এই সব পত্র-পত্রিকার বা ব্যক্তির দ্বৈত ভূমিকাকে আলাদা করে দেখা কিংবা এদের জীবনে নিয়ত স্থান পরিবর্তনশীল জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িক অধ্যায়কে চিহ্নিত করা মুসলমানদের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হল তিক্ততা। জাতীয়তাবাদীদের কাপট্য সম্পর্কে স্থিরবিশ্বাসও ব্যাপক হয়ে উঠল।

অনেক কংগ্রেসী নেতা আবার একই সঙ্গে ভূমিকা নিয়েছেন জাতীয়তাবাদী নেতার এবং তাঁর নিজ ধর্মের প্রচারকের, অন্ততপক্ষে সংস্কারকের। তত্ত্বগত ভাবে একজন ব্যক্তির যুগপৎ খাঁটি ভারতীয় এবং একজন খাঁটি হিন্দু অথবা খাঁটি মুসলমান হওয়ায় কোন অন্যায় নেই। কিন্তু বাস্তবে একথা একমাত্র ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। একটি বহু-ধর্মের দেশে যখন সরকারী মদতপুষ্ট হয়ে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি সক্রিয়, এরকম প্রকাশ্য দ্বৈত ভূমিকা ব্যক্তিগত জীবনের বাইরে অসম্ভব এবং সেই কারণে অবাঞ্ছিত। এই ধরনের ঘটনায় জনগণ অনিবার্যভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল; সাম্প্রদায়িক নেতারা সহজেই সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন।

এটাও লক্ষণীয়, মদন মোহন মালব্য, এন. সি. কেলকার, আনে, বা ১৯২২-পরবর্তী লাজপত রাইয়ের মত সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদীদেরই নয় সাম্প্রদায়িক ভাবনা-চিন্তা সাধারণ কংগ্রেস কর্মীদেরও গ্রাস করেছিল। প্রথম সারির কংগ্রেস নেতাদের অনেকেই কমবেশী সাম্প্রদায়িক মানসিকতায় ভুগছিলেন। এর সর্বনাশা ফল লক্ষ্য করা গেল যখন ১৯৩৭ সালে প্রদেশগুলোতে কে. এম. মুন্সির মত তাঁদের কেউ কেউ মন্ত্রী হলেন। ১৯৪৭ সালে সর্দার প্যাটেলের রাজনৈতিক আচরণেও কোন আকস্মিক ও সাময়িক ভ্রষ্টতা ছিল না। এর মূল ইতিহাসের গভীরে প্রোথিত ছিল এবং তা শুধু তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ইতিহাসেই নয়।

জাতীয়তাবাদী কর্মীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভাবধারার অনুপ্রবেশের এক বিশেষ দৃষ্টান্ত হল ভারতের ইতিহাস আলোচনায় সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপক প্রাদুর্ভাব, বিশেষ করে এর সূক্ষ্মতর রূপে। বিদেশী শাসনে ভারত দুর্দশা ভোগ করেছে হাজার বছর ধরে এবং 'মুসলমান শাসনে' ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির দ্রুত অধঃপতন ঘটেছিল, এমন কথা বহু কংগ্রেস নেতাই প্রকাশ্যে বলেছেন এবং লিখেছেন। প্রাচীন ভারতীয় সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে স্তুতির দৃষ্টিভঙ্গীকে কার্যত জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার মৌলিক উপাদান বলে মনে করা হত। প্রায় সব কংগ্রেসী নেতাই শিবাজী, 'রাণা প্রতাপ, ও গুরু গোবিন্দ সিং প্রভৃতিকে 'বিদেশী শাসনের' হাত থেকে স্বাধীনতার জন্য লড়াই' করেছিলেন বলে জাতীয় বীর হিসেবে মহিমান্বিত করার কাজে যোগ দিয়েছিলেন। শেঠ গোবিন্দ দাসের মত নেতা ও লেখকরা যে কোন ছোট রাজপুত বা বুন্দেলা জমিদার যারাই কোন না কোনো মুসলমান ফৌজদার, সুবেদার, বা সর্দারের সঙ্গে লড়াই করেছিল সবাইকে বীর বানিয়েছেন। একইভাবে, বহু কংগ্রেস নেতা হিন্দির পক্ষ নিয়েছিলেন ইংরেজীর বিরুদ্ধে

ততটা নয়, তার চেয়ে বেশি উর্দুর বিরোধিতা করার জন্য। এঁরা হিন্দির পক্ষে প্রচার করেছেন গণতন্ত্র-ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির কারণে নয়, খোলাখুলিভাবে সাম্প্রদায়িক কারণে। উর্দুকে চিহ্নিত করা হয়েছিল বিদেশী ভাষা ও মুসলমানদের ভাষা হিসেবে এবং হিন্দির প্রশংসা করা হত হিন্দুদের ভাষা বলে।

কংগ্রেস ও জাতীয় নেতৃত্ব মুসলমানদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে হিন্দুদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধানিষেধ, স্বতন্ত্রতা বোধ ও অনৌদার্যের বিরুদ্ধে কোন প্রচার-আন্দোলন সংগঠিত করতেও ব্যর্থ হয়েছিল। এ কথা সত্য যে এটা সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভবের কারণ নয়, কারণ কয়েক শ বছর ধরে মুসলমানরা এগুলিকে মেনে এসেছে এবং কখনই বিভেদমূলক বলে মনে করেনি। এসব নিয়ে কোন পক্ষেই জাতিগত উৎকর্ষ বা শ্রেষ্ঠত্বের চিন্তবিকার ছিল না। এগুলিকে নিছক ধর্মীয় ব্যাপার বলেই মনে করা হত। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, এগুলির রূপ ছিল পুরোপুরি সামাজিক। ফল হল এই যে, সাম্প্রদায়িকতা যখনই ডাল-পালা বিস্তার করতে শুরু করল, তার কারণ ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এই সব বিধিনিষেধকে মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক কারণে ব্যবহার করতে লাগল মুসলমান নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে হিন্দু-বিরোধী বিদ্বেষ ছড়াতে এবংসাম্প্রদায়িক ঘৃণার আগুনে ইন্ধন জোগানার কাজে। এই পর্যায়ে প্রয়োজন ছিল এইসব সামাজিক বিধিনিষেধের, বিশেষত এগুলির বিভেদমূলক দিকগুলির বিরুদ্ধে এগুলিকে কাটিয়ে ওঠার লড়াই। এই বিষয়ে ব্যর্থতা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে হরিজন ও নারীর প্রতি অনুরূপ বিধিনিষেধ ও বৈষম্যের ক্ষেত্রে লড়াই ঘোষণা করা হয়েছিল। একথা বলা যেতে পারে যে অন্তত আংশিকভাবে এই ব্যর্থতার কারণ ছিল জাতীয়তাবাদী কর্মীদের মধ্যে সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারার ব্যাপক প্রভাব।[১]

সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার প্রতি এই দুর্বল নীতি শীর্ষস্তরে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানে জাতীয় নেতৃত্বের প্রয়াসের পথে একটি বড় বাধা হয়ে উঠেছিল। সম্ভবত বহু বাস্তব কারণ ছিল যা হয়ত শেষ পর্যন্ত সমগ্র প্রয়াসটিকেই ব্যর্থ করে দিয়েছিল। সাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দ ও দলগুলির প্রতি ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের সক্রিয় সমর্থন ছিল এইরকম একটি কারণ। আরেকটি কারণ হল সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি এবং কায়েমী সামাজিক ও আর্থনীতিক স্বার্থ গোষ্ঠীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের চেষ্টার সাফল্যের যেটুকু সম্ভাবনা ছিল এমনকি মুসলমান সাম্প্রদায়িক নেতাদের স্বরূপ উদ্ঘাটনের সুযোগটুকুও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কারণ কংগ্রেস নেতৃত্ব দলের ভেতরের এবং বাইরের হিন্দু-সাম্প্রদায়িকাতবাদীদের চাপের বিরুদ্ধে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। আসলে 'সাম্প্রদায়িক রক্ষাকবচ' নিয়ে আলোচনা করার সব যুক্তির মূলে নিহিত ছিল এই তথ্যের স্বীকৃতিতে যে, একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, তা যেভাবেই গঠিত হোক না কেন, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের দ্বারা উৎপীড়ন ও দমনের ভয়ে কিছুটা

ভীত হতে বাধ্য, সে ভয় যতই অযৌক্তিক বা বাস্তব-ভিত্তিহীন হোক। ফলে, শীর্ষস্তরে আলাপ আলোচনার দ্বারা ঐক্যের প্রচেষ্টার কার্যকরতা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় উদার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে পারার ওপর নির্ভর করেছে। এতে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার আলোয় যুক্তিহীন ভয় দূর হতে পারত। এই ঔদার্য ছাড়া নেতৃবৃন্দের উচিত ছিল 'সাম্প্রদায়িক রক্ষাকবচ' নিয়ে আলাপ-আলোচনার চেষ্টা পর্যন্ত না করা। সেক্ষেত্রে উচিত হত ভিন্ন পন্থা নেওয়া। খেলতে নেমে ঐ খেলার নিয়ম না মানা আত্মঘাতী হয়েছিল। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের চাপে কংগ্রেস নেতৃত্ব ঠিক এই কাজটিই করেছিলেন।

হিন্দু মুসলমান এবং কংগ্রেস-লীগ আলাপ-আলোচনার পুরো ইতিহাস এই সমালোচনা সমর্থন করে। যেমন, জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব একথা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে পৃথক নির্বাচক মণ্ডলী ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভোটার-ভিত্তিক রাজনীতির সমূহ ক্ষতিসাধন করছিল, এবং ভারতীয় রাজনীতির সুস্থ ক্রমবিকাশের জন্যই এর বদলে যৌথ নির্বাচক মণ্ডলীর ব্যবস্থার প্রবর্তন আবশ্যক ছিল। ১৯২০-র ও ১৯৩০ এর দশকের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এর জন্য কখনই খুব বড় রাজনৈতিক ত্যাগ করা হয় নি। কিন্তু বেশ কয়েকবার মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা অন্যান্য সুযোগ সুবিধার প্রতিদানে যৌথ নির্বাচক মণ্ডলী মেনে নিলেও, কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ সমস্যাটি সমাধান করতে পারলেন না, কারণ তাঁরা হিন্দু সাম্প্রদায়িক মতামতকে অগ্রাহ্য করতে চাননি। এই রকম সুযোগ অন্তত তিনটি নষ্ট হয়েছিল—১৯২৭ সালে নেহরু কমিটির রিপোর্ট নিয়ে আলোচনার সময়, ১৯৩১ সালে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে, এবং ১৯৩২ সালে সর্বদলীয় সংহতি বৈঠকে। বস্তুত, ১৯৩২এ ব্রিটিশ সরকার যৌথ নির্বাচক মণ্ডলীর প্রশ্নে চুক্তির সম্ভাবনায় এত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল যে তাঁরা সাম্প্রদায়িক পুরস্কার ঘোষণা করলেন। পৃথক নির্বাচক মণ্ডলী বজায় রেখে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সমস্ত দাবিই মূলত মেনে নেওয়া হয়েছিল। এর পর একমাত্র যে রক্ষাকবচটি মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা আর চাইতে পারত তা হল একটি পৃথক রাষ্ট্র। তারা এবার সেই পথেই এগুতে শুরু করল। এর জন্য প্রথম দাবি হল, দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকার। জাতীয় নেতৃত্ব এবং হিন্দু সাম্প্রদায়িকগণ আরেকটি চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরলেন: মুসলমান সাম্প্রদায়িকদের যেসব দাবী তারা প্রথমে মেনে নিতে চাইছিলেন না সেগুলিও এখন ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশের মাধ্যমে এলে ইচ্ছায় হ'ক অনিচ্ছায় হ'ক আন্দোলন ছাড়াই মানা হ'ল। তাঁরা এইভাবে মুসলমান সাম্প্রদায়িকদের সাম্রাজ্যবাদের কোলে আশ্রয় নিয়ে তার ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠার সুযোগ দিলেন।

হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ এবং নিজেদের দলের ভেতরের হিন্দু সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষেত্রে জাতীয় নেতৃত্বের ব্যর্থতার আরেকটি পরিণামের কথা বলা যেতে পারে। তা হ'ল মুসলমান ও শিখ সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রতিও একই রকম 'উদারনীতি' দেখাতে নেতৃত্ব বাধ্য হয়েছিল।

তাছাড়া, মুসলমান অনুগামীদের মধ্যে বলিষ্ঠ, ধর্ম-নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ জাগানোর পরিবর্তে নেতৃত্ব জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের ওপর নির্ভর করতে, এমনকি কার্যত তাদের উন্নতিবিধান করতেও বাধ্য হয়েছিল। এই জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা বিশেষ ধরনের জাতীয়তাবাদের আশ্রয়ে কার্যত এক কায়েমী স্বার্থে পরিণত হচ্ছিল। তাঁরা নিঃসন্দেহে জাতীয়তাবাদী ছিলেন, কিন্তু তাঁদের রাজনৈতিক গুরুত্ব তাঁদের মুসলমান এবং মুসলমান 'প্রতিনিধি' হওয়ার ওপরেই নির্ভর করেছে। এই পরিস্থিতিতে আবুল কালাম আজাদের মত বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদীরা অচিরেই বেমানান হয়ে পড়লেন। দেশে সাম্প্রদায়িকতাবাদকে স্থায়ী আসন দেওয়া হল। কংগ্রেস নেতৃত্ব হিন্দু বা মুসলমান কোন সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদীর বিরুদ্ধেই এমনকি বন্ধুত্বমূলক লড়াইও চালানর সাহস পেলেন না। হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের যেমন হিন্দু মহাসভায় অবাধে কাজ করতে দেওয়া হয়েছিল সেই রকম জাতীয়তাবাদী মুসলমানদেরও মুসলিম লীগে অবাধে কাজ করতে দিয়ে ধর্ম-নিরপেক্ষ নীতি পালন করা হল।

আদর্শগত দুর্বলতা ছাড়াও, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে কংগ্রেস নেতৃত্বের ব্যর্থতা তার সংসদীয় নীতি এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী-নির্ভর সামাজিক ভিত্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিল। বিশেষ করে ১৯৩০এর দশকে, ঔপনিবেশিক অর্থনীতি, মধ্য ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভারতীয়দের পক্ষে অতি সামান্য আর্থিক সুযোগ ও ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। ফলে যৎসামান্য সুযোগ ও সংস্থানের জন্য তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় নামতে বাধ্য হয়েছিল। এমনকি যাঁরা সাম্রাজ্যবাদী শাসন উৎপাটিত করার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আস্থাশীল ছিলেন আশু বেঁচে থাকার সমস্যার সমাধানের জন্য সুযোগ-সুবিধা তাঁদেরও খুঁজতে হয়েছে। অনুপ্রেরণা পাওয়ার মত শক্তিশালী কোন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের অস্তিত্ব না-থাকায় মধ্যবিত্ত শ্রেণী দেখতে পেল যে ক্ষয়িষ্ণু জাতীয় সম্পদে (কেকে) ভাগ বসানোর ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক ও গোষ্ঠীগত স্বার্থানুসরণ কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে। পরিণামে, শুধু মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীই নয়, হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেও সাম্প্রদায়িক ঝোঁক দেখা দিল।

কংগ্রেস নেতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের সময় সাধারণ মানুষ ও তাদের উদ্দীপনার ওপর নির্ভর করলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে অনেকটা পরিমাণে উপেক্ষা করতে পারত। কিন্তু নির্বাচনের সময়, সার্বিক ভোটাধিকার না থাকায় তাদের নির্ভর করতে হ'ল সাম্প্রদায়িক মানসিকতা সম্পন্ন নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ওপর, এবং যাঁরা একই সঙ্গে জাতীয়তাবাদী ও 'হিন্দু স্বার্থের' অভিভাবক হিসাবে খ্যাত এবং বিপুলভাবে সম্মানিত ছিলেন, বিশেষ করে সেই শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক নেতাদের উপর। পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর ফলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর প্রার্থীর কাছেই এই নির্ভরতা দ্বিগুণ অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদীদের বিরোধিতা করার

জন্য স্বরাজ্যবাদীদের চরম মূল্য দিতে হ'ল ১৯২৬ সালের নির্বাচনে। পঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে তাদের শোচনীয় পরাজয় হয়েছিল। শুধু তাই নয়, সারা দেশেই তাদের পায়ের নিচের মাটি সরে গিয়েছিল।

এই কারণে রীতিমত জবরদস্ত জাতীয়তাবাদীরাও যে মদনমোহন মালব্যর মত নেতাদের বিরুদ্ধে সম্মুখ সংঘাতে যেতে ভয় পেতেন কিংবা গোপনে সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করলেও হিন্দু মুসলমান সংহতি বৈঠক ও সংবিধান বিষয়ে আলোচনায় হিন্দু সাম্প্রদায়িক মতামতকে উপেক্ষা করতে পারতেন না এটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার এবং যৌথ নির্বাচক মণ্ডলীই: নির্বাচন প্রার্থীদের এই বাধা থেকে মুক্ত করতে পারত। কয়েক দশক ধরে অর্জিত এই অভ্যাস আজও রয়ে গেছে। নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীগুলি, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার কারণে, আজও সাম্প্রদায়িক ও অন্যান্য বিভেদমূলক আবেদন ও চিন্তাধারার প্রতি আসক্ত। ব্যতিক্রম শুধু বাংলার মত অল্প কয়েকটি জায়গা, কারণ বামপন্থীরা সেখানে শক্তিশালী।

৬

জওহরলাল নেহরুই ছিলেন একমাত্র কংগ্রেসী নেতা যিনি উপরতলায় চুক্তির মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের তিলকবাদী-গান্ধিবাদী মধ্যপন্থী নীতিটির মৌলিক দুর্বলতা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। এই বিষয়ে ১৯৩৪ সালে থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে লেখা তাঁর রচনাবলীতে চিন্তার সজীবতা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্যার ক্ষেত্রে যাঁরা প্রথম মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিলেন নেহরু তাদের অন্যতম। তিনি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে জাতীয় সংহতির অর্থ হল জনগণের মধ্যে সংহতি, নেতাদের মধ্যে কৃত্রিমভাবে স্থির করা সুবিধাজনক মিলন নয়।

১৯৩৬-৩৭ সালে তিনি কংগ্রেসের মধ্যে তাঁর সদ্য অর্জিত অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠাকে মুসলিম লীগ নেতাদের সঙ্গে জোড়াতালি ঐক্যে পৌঁছনর চেষ্টাকে বাধা দিতে কাজে লাগিয়েছিলেন। তিনি যে বিকল্প রাজনৈতিক পথ উপস্থাপিত করলেন তাতে জঙ্গী পথে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, সাংবিধানিক ফাঁদে পা দিতে অস্বীকৃতি, গণ-ভিত্তিক রাজনীতি,—এবং মুসলমান কৃষক ও শ্রমিকের শ্রেণীগত দাবির ভিত্তিতে তাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কাজকর্মের মাধ্যমে তাদের সরাসরি স্বমতে আনার প্রয়াস গুরুত্ব পেল। এইভাবে তিনি যে শুধু মধ্য ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক নেতাদের এড়িয়ে গেলেন তাই নয়, সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদের প্রতি তাদের পক্ষপাতের ব্যাপারটিও প্রকাশ্যে তুলে ধরলেন। এটা

বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই কারণে যে ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ এবং সাম্প্রদায়িক নেতারা দেশের প্রায় সমস্ত শ্রেণীগত ও সামাজিক বিরোধের উপর সাম্প্রদায়িক রং চড়িয়েছিল। নেহরু তাঁর রাজনৈতিক পন্থা রূপায়ণের জন্য ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইন বয়কটের প্রস্তাব আনলেন। এই আইন বলে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠন করতে অস্বীকার করা, শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনগুলিকে সরাসরি কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত করা, কংগ্রেস-সমাজতন্ত্রী এবং কমিউনিস্টদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা, এবং মুসলমানদের সঙ্গে জন সংযোগ তাঁর কর্মসূচিতে স্থান পেল।

কিন্তু এই কর্মসূচি কোনদিন রূপায়িত হয়নি। কারণ চালু হবার আগেই তা বাতিল হয়ে গিয়েছিল। যেটুকু তিনি বাঁচাতে পেরেছিলেন তা শুধু তাঁর নেতৃত্ব। তাঁর কংগ্রেস সভাপতি থাকাকালীনই কংগ্রেস প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠন করেছিল। কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনগুলিকে সরাসরি কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার বিষয়টি দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসীরা বাতিল করলেন। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি কৃষক ও শ্রমিক স্বার্থমুখী নীতি অনুসরণ করতে ব্যর্থ হ'ল। অন্যদিকে অনেক প্রদেশে, যেমন পঞ্জাব ও বাংলায়, আঞ্চলিক কংগ্রেস নেতৃত্ব জমিদার ও মহাজন স্বার্থ রক্ষার মনোভাব গ্রহণ করেছিল। মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে জনসংযোগের কর্মসূচি কখনোই গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা হয়নি, কারণ মৌলিক ভূমিবিষয়ক কর্মসূচি এবং শহর ও নগরের জন্য শ্রমিক ও কারিগর-স্বার্থে নীতি গ্রহণ করা ছাড়া তা করা সম্ভব ছিল না।

সর্বোচ্চ কংগ্রেস নেতৃত্বের বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির জন্য এসবই ছিল অবশ্যম্ভাবী। অন্যদিকে, সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানে নেহরু পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়ার কারণ এর অকার্যকরতা। নেহরুর আপসহীন মনোভাব সেই সময় শীর্ষস্তরে আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতার পথ রুদ্ধ করেছিল। শেষে ১৯৪৭ সালে যখন আপসের রাস্তা নেওয়া হ'ল, তার পরিণাম হ'ল বিপর্যয়-কর, ১৯৩৭-৩৯ সালে তা হয়ত কম ক্ষতিকারক হত। নেহরু এবং বামপন্থীরা কংগ্রেসের ভেতরে ও বাইরে হয় এত দুর্বল ছিলেন যে সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে কেন্দ্র করে কোন কর্মসূচী কার্যকরী করার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না, নতুবা সে চেষ্টা করতে গিয়ে তাঁরা রাজনৈতিকভাবে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়তে চাননি। যেমন, নিজেদের মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি বলে মুসলিম লীগ যে দাবি করেছিল নেহরু সঠিকভাবেই তার বিরোধিতা করেছিলেন, কিন্তু এই দাবি যাতে বাস্তব হয়ে না উঠতে পারে তার জন্য তিনি কোন সক্রিয় রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ব্যবস্থা নিতে পারেননি। তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন যে, কংগ্রেসের উচিত মুসলমান জনগণের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করা, কিন্তু এই প্রত্যক্ষ সংযোগ তিনি স্থাপন করতে পারেননি। মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে নূতন সমর্থন তৈরি করতে না-পারায় কংগ্রেস শীর্ষস্তরে নমনীয়তা হারিয়েছিল। এটা ঘটেছিল এমন একটা সময়ে যখন মুসলিম লীগ এবং ঔপনিবেশিক কর্তারা ১৯৩৭

সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের জয়লাভে, নেহরুর র‍্যাডিকাল রাজনীতির বজ্রনির্ঘোষে, এবং বামপন্থীদের দ্রুত শক্তিবৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হয়ে উচ্চ পর্যায়ে উত্তর প্রদেশের জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের, পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্টদের এবং বাংলার কৃষক প্রজা সমিতিকে লীগের অন্তর্ভুক্ত করছিলেন এবং নিম্ন স্তরে লীগের একটা আপসহীন, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভাবমূর্তি সৃষ্টি করতে সচেস্ট হয়ে উঠেছিলেন। ফল হল এই যে, নেহরু উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মুসলমান সাম্প্রদায়িক বাঘের দাঁত না তুলেই তাকে আহত করলেন এর মূল্য এক দশকের মধ্যেই দিতে হল। আসলে, রাজনৈতিক কর্মসূচী বাস্তব রাজনৈতিক কাজকর্মের দ্বারা সমর্থিত না হলে অবাস্তর হয়ে যায়, এমনকি বিপর্যয়করও হতে পারে।

৭

ভারতীয় রাজনীতির বাস্তব সত্যটাই এই যে, র‍্যাডিক্যাল পথেই হোক আর রক্ষণশীল পথেই হোক সমকালীন জাতীয়তাবাদী রাজনীতির কাঠামোর মধ্যে সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোন সমাধান ছিল না। একমাত্র শক্তিশালী বামপন্থী ও গণভিত্তিক রাজনীতিই এর সমাধান করতে পারত। কিন্তু তেমন কোন রাজনীতির অস্তিত্ব ছিল না, এবং সহজ পথে এই সমস্যার মোকাবিলা করা ছিল অসম্ভব।

সব ঐতিহাসিক সমস্যাকেই সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়ে ফেলা যায় না। অতীত ও বর্তমানের পারস্পরিক সম্পর্ককে উপেক্ষা করে তাৎক্ষণিক সমাধান খোঁজার অর্থ অসার কল্পনাকে প্রশ্রয় দেওয়া। বছরের পর বছর, এমনকি দশকের পর দশক ধরে সমাধানের শর্ত ও শক্তিগুলিকে প্রস্তুত করতে হয়। তাছাড়া, এক একটা জাতি ও সমাজ কখনো কখনো এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় যখন তাদের সমস্যাগুলিকে টুকরো-টুকরো ভাবে সমাধান করা যায় না, তা সদাশয় ব্যক্তিরা যত আগ্রহীই হোন না কেন।

ভারতে ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ও শাসনব্যবস্থা ১৯৩০ এর দশকে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল যখন তার সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা দাবি করছিল যুগপৎ আমূল পরিবর্তন—এক যথার্থ বিপ্লব। নেহরু সেই সত্যের আভাস পেয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত, তিনি ও বামপন্থীরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

আজও আমাদের অবস্থা একই রয়েছে। সাম্প্রদায়িক, আঞ্চলিক, ভাষাগত ও জাতিগত দাঙ্গা-হাঙ্গামার ঘটনা একথাই প্রমাণ করে। ঔপনিবেশিক শাসনের রাজনীতি এবং অনগ্রসরতাকে মোকাবিলা করতে না-পারার মূল্য দিতে হয়েছিল ১৯৪৭ সালে দেশকে দুটুকরো করে। অনগ্রসর স্তরে পুঁজিবাদের ব্যর্থতার

পর্বে ভারতীয় জাতির সংহতি একমাত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমেই রক্ষা করা যেতে পারে। গভীরতর অর্থে একথা বলা যায় যে, ১৯৪৭ সালের দেশ-বিভাগের কারণ ছিল কৃষক ও শ্রমিকদের সংগঠন এবং এক শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে ভারতের জনগণের ব্যর্থতা। ইতিহাসের যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে!

টীকা

1. এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব ব্যাপক। এমনকি আজও বেশীর ভাগ ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের মধ্যে হিন্দু, শিখ অথবা মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক অস্তিত্ব, চিন্তাভাবনা ও অনুভূতি নিয়ে আলোচনায় প্রবণতা দেখা যায়। বস্তুত, 'সম্প্রদায়', এই পরিভাষাটির ব্যবহারই অবৈজ্ঞানিক, এবং এর মধ্য দিয়ে অচেতনভাবে হলেও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিকে আংশিক স্বীকৃতি দেওয়ার মনোভাব বেরিয়ে পড়ে।

2. এজন্যই জিন্না 1924 সালে দাবি করতে পেরেছেন যে তাঁর লক্ষ্য "মুসলমান সম্প্রদায়কে সংগঠিত করা—হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঝগড়া করার জন্য নয়, বরং জন্মভূমির স্বার্থে তাদের সঙ্গে ঐক্য ও সহযোগিতা গড়ে তোলার জন্য।" তিনি নিশ্চিত ছিলেন, মুসলমান সম্প্রদায় "একবার সংগঠিত হলেই হিন্দু মহাসভার সঙ্গে হাত মিলিয়ে জগতের সামনে ঘোষণা করবে, হিন্দু মুসলমান ভাই-ভাই।"

3. "মডার্ন ইসলাম ইন ইণ্ডিয়া" গ্রন্থে ডাব্লিউ. সি. স্মিথ দেখিয়েছেন: "এই আন্দোলন ছিল স্বাধীনতার জন্য একটি দেশবাসীর বিপুল প্রচেষ্টার উদাহরণ। এতে দেখা গেল, সংগ্রামের সময় জনসাধারণ ধর্মগত অনৈক্য সত্ত্বেও রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মসূচীতে ঐক্যবদ্ধ হতে সমর্থ। তারা সানন্দে এক সঙ্গে কাজ করেছে, লড়াই করেছে, এবং কষ্ট ভোগ করেছে।"

4. ভারতের রাজনৈতিক বিকাশে একটি বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য অতীতে দেখা গেছে এবং আজও দেখা যায়। তা হ'ল: হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের মধ্যে নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে অসন্তুষ্টির মানসিকতা। ফলে তারা সর্বদাই হিন্দুদের মধ্যে সংখ্যালঘু-সুলভ একটা ভয়ের মানসিকতা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছেন, হিন্দু হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারলে মুসলমানদের পদানত হতে হবে, এই রকম আতঙ্ক ছড়িয়ে। ঐ আতঙ্ককে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্যই আফগানিস্তান, ইরান এবং আরব থেকে ভারতীয় মুসলমানদের সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা করা হয়।

5. 1920 এবং 1930 এর দশকের কোন কোন রাজনৈতিক নেতা এই বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে ধরতে পেরেছিলেন। যেমন, চৌধুরী খালিকুজ্জমান। ইনি ঐ সময়ের একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান। 1934 সালে তিনি ডঃ আনসারি-কে লিখেছিলেন: "যদি মালব্যজী ও আনে নিজেদের জাতীয়তাবাদী বলে দাবি করতে পারেন, তাহলে আমি মনে করি, ব্যক্তিগত সুবিধের জন্য কিংবা সরকারী অনুগ্রহকে আড়াল দেওয়ার জন্য করছে না, কিন্তু সাম্প্রদায়িক অধিকার রক্ষায় সততার সঙ্গে সংগ্রাম করছে এমন যে কোন মুসলমানই জাতীয়তাবাদী।"

6. গান্ধীর নীতি, সর্বোচ্চ সার্থকতার স্তরে, লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করাতে পেরেছিল। অন্যদিকে, নেহরুর নীতি, রূপায়ণ করতে পারার ক্ষমতার অভাবে, কোনরকম সাফল্যই লাভ করতে পারেনি। গান্ধীর নেতৃত্বে নিরত প্রচণ্ড প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে নেতৃস্তরে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করতে। নেহরু একটি ঐতিহ্যের সূত্রপাত করেছিলেন, যে ঐতিহ্য 1947 সালের পরও অনুসৃত হয়েছে; এর মূল কথা হ'ল, আমরা যদি সাম্প্রদায়িকতাকে উপেক্ষা করি, মাঝে-মাঝে গালাগালি দেই বা ব্যঙ্গ করি, তা হলে ভূতটাকে যে কোন ভাবেই হ'ক ঘাড় থেকে নামানো যাবে।

লর্ড ডাফরিন ও ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের চরিত্র

ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে, ১৮৮৮ সালের ৬ নভেম্বরের বিখ্যাত স্মারকলিপিতে এবং ঐ বছরই ৩০ নভেম্বর সেন্ট এণ্ড্রুজ দিবস-এর বক্তৃতায়, লর্ড ডাফরিন বারবার ভারতের উদীয়মান জাতীয় নেতৃত্বকে "সংখ্যাল্প জনসাধারণের প্রতিনিধি" এবং "একটি অতি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু গোষ্ঠী" বলে অভিহিত করেছেন।[1] শুধু তাই নয়, তাঁর মতে এই নেতারা জনগণের স্বার্থের প্রতি উদাসীন, এমনকি বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্নও ছিলেন।[2] প্রথম বক্তব্যের সমর্থনে প্রমাণ হাজির করতে ডাফরিনকে কিঞ্চিৎ সমাজতত্ত্বের সাহায্য নিতে হয়েছিল। ডাফরিন আমাদের জানালেন, ভারতীয় সমাজ বিভিন্ন শ্রেণীতে, বস্তুত পরস্পর বিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য শ্রেণী বলতে তিনি জমিদার, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, ব্রিটিশ পুঁজিপতি, আমলা কিংবা নানা সামাজিক বর্ণ বা জাতি ইত্যাদি প্রচলিত অর্থে শ্রেণীর কথা বলেন নি ; ভারতীয় ও বিদেশী, এই শ্রেণীভেদের কথা তো নয়ই। তিনি দেখতে পেলেন ভারতীয় সমাজ বিভক্ত হয়েছিল শিক্ষিত "বাবু সম্প্রদায়" ও অশিক্ষিত জনসাধারণ, এই দুই শ্রেণীতে।[3]

তিনি যাঁদের বাবুশ্রেণী বা বাবুবিক্ষোভকারী আখ্যা দিয়েছিলেন সেই জাতীয়তাবাদী নেতাদের মনোভাব যে জনসাধারণের স্বার্থের প্রতিবন্ধী ছিল, এই দ্বিতীয় বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ ডাফরিন সাম্প্রতিক বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, আয়কর প্রবর্তন ও লবণ কর বৃদ্ধির[4] প্রস্তাবের প্রসঙ্গে জাতীয় কংগ্রেস ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় জাতীয়তাবাদী সংগঠন, সর্বোচ্চ আইন পরিষদের ভারতীয় সদস্য ও "বাবু বিক্ষোভকারীদের" ভূমিকার উল্লেখ করেছেন। প্রথমটির বিষয়ে প্রধান যে যুক্তি তিনি উপস্থিত করেছেন তা হল, "গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় সভা-সঙ্ঘগুলি" "আমাদের সাম্প্রতিক ভূমিসংক্রান্ত আইনের···তীব্র বিরোধিতা করেছে।"[5] আয়কর ও লবণ কর প্রসঙ্গে, তাঁর বক্তব্য ঃ

"কর-রাজস্বের বেশীর ভাগই আসে জনসাধারণের কাছ থেকে। মাত্র চার লক্ষ ব্যক্তি আয়কর দেয়। কাজেই, ভারতের জনসাধারণের কর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার থাকলে, তারা লবণের দাম এক পয়সা বাড়ানোর পরিবর্তে আয়কর দশগুণ বাড়ানোর প্রস্তাব সমর্থন করত। অথচ সর্বোচ্চ পরিষদের ভারতীয় সদস্যদের সবাই লবণ কর বৃদ্ধি সমর্থন করেছেন এবং আয়কর সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেছেন···"[6] অধিকন্তু, "কংগ্রেস (আয়করের) বোঝা কমানোর জন্য একটি প্রস্তাবও পাস করেছে।"[7]

১৯৬৪ সালে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের রাঁচী অধিবেশনে পঠিত এবং "এন্‌কোয়ারী" পত্রিকার ১০ম সংখ্যা ১৯৬৫-তে প্রকাশিত—এন. এস. ২য় খণ্ড, ১নং।

ডাফরিনের দৃঢ় অভিমত ছিল যে, আইন পরিষদগুলিতে ভারতীয়দের আরো বেশি প্রতিনিধিত্বের জন্য জাতীয়তাবাদীদের দাবি মেনে নেওয়া হলে তা সরকারের পক্ষে জনহিতকর আইন পাস করার ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়াত, কারণ শিক্ষিত ভারতীয়রা এই ধরনের প্রচেষ্টার বিরোধিতা করত।[৮] তাঁর মতে বাস্তব অবস্থাটাই ছিল এই যে, সরকার "সর্বদা বিপুল সংখ্যক জনসাধারণের স্বার্থে কাজ করলেও" শিক্ষিত 'শ্রেণীগুলি' স্বাভাবিক প্রকৃতিবশত "আমাদের অধিকাংশ প্রজার স্বার্থের বিনিময়ে নিজেদের স্বার্থ" সিদ্ধি করতে সচেষ্ট।[৯] "উদাহরণস্বরূপ", ডাফরিন নর্থব্রুককে লিখলেন, "আইন পরিষদে আরো বেশি দেশীয় সদস্য থাকলে আমাদের সাম্প্রতিক সমস্ত ভূমি আইন অনুমোদন করাতে অনেক বেশি অসুবিধা হত এবং আমাদের অনেক বেশি বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হত।"[10]

পরবর্তী সময়ের সরকারি আমলা ও লেখকরা বারবার ডাফরিনের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করেছেন। আরো বেশী বিস্ময়কর হল, সাম্প্রতিক কালে এইসব মতামতকে নির্বিচারে মেনে নেওরার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।[11] আমি দুভাবে ডাফরিনের বক্তব্যের যাথার্থ্য বিচার করার চেষ্টা করব। প্রথমত, সমকালীন জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও দৃষ্টিভঙ্গির এবং দ্বিতীয়ত, ডাফরিনের নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতির আলোয়। আমার **দ্য রাইজ অ্যান্ড গ্রোথ অভ ইকনমিক ন্যাশনালিজম ইন ইনডিয়া** নামক গবেষণা গ্রন্থে আমি প্রথমটির বিশদ আলোচনা করেছি। দ্বিতীয়টি এখনও অনালোচিত, বর্তমান প্রয়াসকে সেই দিকে বিনীত সূচনা বলা যেতে পারে।

ডাফরিন ভূমি আইন প্রসঙ্গে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের মনোভাবের যে সমালোচনা করেছিলেন তার কোন বাস্তব ভিত্তি বলতে গেলে নেই। ভূস্বামী-প্রজা সমস্যার প্রতি জাতীয়তাবাদীদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয় নয়, তবুও একথা বলা প্রয়োজন যে জাতীয় নেতৃত্বের অগ্রবর্তী অংশ করের বোঝা, উচ্ছেদ ও প্রজাদের ওপর জমিদারদের ব্যাপক অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদই করেছিলেন।[12]

ডাফরিন ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের উল্লেখ করেছেন। এই আইনের প্রথম পরিকল্পনা ১৮৭৯ সালে; ১৮৮৩ সালে প্রস্তাবিত আইনের খসড়া উপস্থাপিত হয়েছিল। জমিদাররা এই বিলের প্রচন্ড সমালোচনা করে। ১৮৮৫ সালে বিলটি পাস হওয়ার আগে একটি সিলেক্ট কমিটি এটিকে আমূল সংশোধন করেছিল। ঐ সংশোধনের ফলে মূল বিলে প্রজার স্বার্থ রক্ষার

জন্য যেসব গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ছিল, সেগুলির কী পরিণতি হয়েছিল তা দেখা যাক।

(১) বিলে একই গ্রাম বা এস্টেটে জমি অধিকার করে আছে এমন সব রায়তকে জমি ভোগদখলের অধিকার দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু আইনে তা সীমাবদ্ধ করে শুধুমাত্র একই গ্রামে দখলীকৃত জমির ক্ষেত্রে এই অধিকার দেওয়া হল। (২) বিলে ভোগদখলের অধিকার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য এবং অবাধে হস্তান্তরযোগ্য করা হয়েছিল; আইনে হস্তান্তরের অধিকার নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটি স্থানীয় প্রথার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। (৩) খাজনা বৃদ্ধি সম্পর্কে বিলে বলা হয়েছিল যে ভোগদখলকারী রায়তের খাজনা কখনোই মোট উৎপন্ন আয়ের এক-পঞ্চমাংশের বেশি হবে না এবং একবার খাজনা বাড়িয়ে দ্বিগুণ বাড়ান যাবে না অথবা দশ বছর অন্তর ছাড়া বাড়ান যাবে না, আর যে রায়ত ভোগদখল করে না তার খাজনা মোট উৎপন্নের পাঁচ-ষোড়শাংশের বেশি হবে না। আইনে খাজনা বৃদ্ধির ওপর এসব বিধিনিষেধ তুলে দেওয়া হল। (৪) বিলে বলা হয়েছিল যে রায়ত ভোগদখল করে না তাকে উচ্ছেদ করা হলে সে ক্ষতিপূরণ পাবে, আইনে এই শর্তটি বাদ দেওয়া হ'ল।[18] এইভাবে ১৮৮৫ সালের চূড়ান্ত আইনটি মূল বিলের এক হীনবল সংস্করণ হয়ে দাঁড়াল। তাছাড়া, ভোগদখলকারী রায়তের অধীনস্থ প্রজাকে এই আইন নিরাপত্তা দিতে পারেনি।

এখন দেখা যাক, এইসব ব্যবস্থার প্রতি জাতীয়তাবাদীদের এবং ডাফরিনের মনোভাব কি ছিল। ডাফরিন যাই বলুন না কেন, বাংলা ও বাংলার বাইরের অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী ১৮৮০ থেকে ১৮৮৪ সালের মধ্যে সরকার যেসব প্রস্তাব এনেছেন সেগুলির প্রজাস্বার্থানুকূল অংশের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। উল্লিখিত গ্রন্থে বিশদভাবে আমি এটি দেখিয়েছি।[14] এখানে আমি বিষয়টি সংক্ষেপে উপস্থিত করব, ভারতসভা, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এবং বাংলার অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র প্রজার স্বার্থ রক্ষায় সক্রিয় ছিলেন। এ-বিষয়ে সরকার যথেষ্ট অগ্রসর না হওয়ায় তাঁরা সরকারের সমালোচনা করেছেন, প্রজার অধিকার শক্তিশালী করার দাবি জানিয়েছেন, এবং প্রজাদের রক্ষা করার সরকারি প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে জমিদারদের বিক্ষোভের নিন্দা করেছেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, তাঁদের অনেকেই উপলব্ধি করেছিলেন যে ভূস্বামীদের খাজনা বাড়ানোর অধিকারকে যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ করা হয়নি, এবং খাজনা বাড়ানোর সর্বোচ্চ সীমাও মাত্রাধিক উঁচুতে বাঁধা হয়েছিল।

এঁদের অনেকে আবার খাজনার বিষয়ে জমিদার ও রায়তের মধ্যে স্থায়ী বন্দোবস্তের দাবিও জানিয়েছিলেন। অনেক জাতীয়তাবাদী নেতা ভোগদখলকারী রায়তের উপ-প্রজাদের জন্য নিরাপত্তা বিধানের এবং মধ্য-স্বত্বের বিস্তার রোধের দাবি জানিয়েছিলেন। এঁরা যেসব ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছিলেন তার একটি হ'ল, ভোগদখলের অধিকার থাকা উচিত প্রকৃত কৃষকের, তথাকথিত ব স্বাধিকারীর নয়।

সিলেক্ট কমিটি এবং ভারত সরকারের হস্তক্ষেপে ১৮৮৩ সালের বিলটির প্রজাস্বার্থানুকূল ব্যবস্থাগুলি ক্রমাগত বাতিল হয়ে যাওয়ায়, বাংলার অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী নেতা এই পরিবর্তনের জন্য তীব্রভাবে সরকারের নিন্দা করেছিলেন।

বাংলার জাতীয়তাবাদীদের অগ্রবর্তী গোষ্ঠী এই সময় রায়তদের পক্ষে এক গণ প্রচার আন্দোলনও সংগঠিত করেছিল। ভারত সভা ও সংগঠন অন্যান্য ১৮৮০, ১৮৮১ ও ১৮৮৫ সালে রায়তদের নিয়ে অনেকগুলি জনসভা সংগঠিত করেছিলো। কোন কোন সভায় দশ থেকে কুড়ি হাজার রায়ত যোগদান করেছিলেন। এইসব সভায় ভাষণ দিয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, আনন্দ মোহন বোস, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি প্রমুখ নেতারা।

অন্যান্য প্রদেশের বহু বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা এবং সংবাদপত্রও ১৮৮৩ সালের বিলের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্রের নাম **মারহাট্টা**, **ইনডিয়ান স্পেকটেটর**, **নেটিভ ওপিনিয়ন**, **ট্রিবিউন** ও **কেশরী**। বিচারপতি রানাডে অবশ্য বিলটিকে সমর্থন করেননি, জমিদারদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের জন্য নয়, কারণ তিনি মনে করেছিলেন এই বিল বাংলার ভূমি সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। সবলতর জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দুর্বলতর প্রজাকে আইনগত নিরাপত্তা দেওয়ার প্রয়োজন তিনি সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, এবং সেজন্য এবিষয়ে সরকারের আইন প্রণয়নের অধিকারকে সমর্থন করেছিলেন।

জাতীয়তাবাদী কর্মীদের মধ্যে ১৮৮৩ সালের বিলের পক্ষে এই ব্যাপক সমর্থনের বিপরীতে মাত্র অল্প কিছু গুরুত্বহীন জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র জমিদারদের স্বার্থ সমর্থন করেছিল। এবং একটি মাত্র বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র, **অমৃত বাজার পত্রিকা**, মধ্যস্বত্বভোগী প্রজাদের দাবি সমর্থন করেছিল।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের প্রতি জাতীয়তাবাদীদের মনোভাব মোটেই ডাফরিনের বক্তব্য সমর্থন করেনা, বরং সিদ্ধান্তের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

অন্যদিকে ১৮৮৩ সালের বিলটির প্রতি ডাফরিনের মনোভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা সহসা আবিষ্কার করি জাতীয়তাবাদী পন্থা সম্পর্কে তিনি পরবর্তী সময়ে যা বলেছিলেন তা সম্ভবত তাঁর নিজের সম্পর্কেই সত্য। ডাফরিনই বাংলার জমিদারের স্বার্থ রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, এবং তাঁর ভারতে আসার আগেই রচিত বিলটির প্রজার স্বার্থানুকূলে অংশগুলির সক্রিয় বিরোধিতা করেছিলেন। প্রথম থেকেই বিলটি ও তার রচয়িতাদের সম্পর্কে তাঁর মধ্যে তীব্র বিরোধিতার মনোভাব দেখা গেছে। সেক্রেটারি অভ স্টেটকে লেখা ২৩ ডিসেম্বর, ১৮৮৪, তারিখের চিঠিতে ১৮৮৩ সালের বিলটিকে "অহেতুক উগ্র এবং পক্ষপাতদুষ্ট" বলে নিন্দা করেছিলেন, এবং আইরিশ ভূস্বামীসুলভ

ভঙ্গিতে পুরো দোষটা চাপিয়েছিলেন "দুই আইরিশের ওপর"। ডাফরিন-এর ভাষায় "জনৈক মিঃ ম্যাকডনেল এবং মিঃ ওকিনিলি একজন বাংলা সরকারের সচিব, অন্যজন বিচারপতি অবাধে লেফটেন্যাণ্ট-গভর্নরকে নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয়। দুজনেই খুব চতুর লোক, এবং আমাদের সুপরিচিত তীব্র ভূস্বামীবিরোধী মানসিকতায় এঁরা উদ্দীপ্ত হয়েছেন"। "আমার নিজের কাউনসিল," তিনি লিখেছিলেন "অনেক বেশি নরমপন্থী মানসিকতা সম্পন্ন এবং কোন অবস্থাতেই রিভার্স থম্পসনের উপদেষ্টাদের মত বিরক্তিকর উৎসাহে চালিত হয় না।"[15] বস্তুত, ডাফরিনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, "বাংলার জন্য অবিলম্বে আইন প্রণয়ন করার" প্রয়োজন নেই। ১৮৮৪-র ২৩ ডিসেম্বর তারিখের চিঠিতে সেক্রেটারি অভ স্টেটকে তিনি লিখেছিলেন, "বাংলার পূর্বাঞ্চলে প্রজারা নিজেদের ব্যাপার নিজেরাই সামলাতে পারে বলে মনে হয়। এমনকি জমিদার-বিরোধী অতি উগ্র তার্কিকরাও স্বীকার করে যে বাংলায় প্রজারা সাধারণভাবে মোটেই মাত্রাধিক খাজনার ভারে পীড়িত নয়।"[16] এক সপ্তাহ পরে তিনি জানিয়েছিলেন যে, তিনি এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখতে আগ্রহী।[17] কিন্তু তা অসুবিধাজনক হওয়ায় তিনি বিলের যেসব শর্ত "আমার কাছে জমির মালিকদের পক্ষে অযৌক্তিকভাবে কঠোর বলে মনে হয়েছিল" সেগুলো পরিবর্তন করার জন্য বাংলা সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করলেন।[18]

ডাফরিন ১৮৮৫ সালের বিলে প্রজার স্বার্থানুকূল প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ শর্তের বিরোধিতা করেছিলেন এবং বারংবার অনুরোধ করেছিলেন সেগুলি সংশোধনের জন্য। এইভাবে (১) তিনি একই এস্টেটে যাদের জমি আছে এইরকম স্থায়ী রায়তদের ভোগস্বত্ব দেওয়ার বিরোধিতা করেছিলেন, এই যুক্তিতে যে এই ব্যবস্থা "আইনের ভোগস্বত্ব সংক্রান্ত ধারাগুলির পরিধি অযৌক্তিকভাবে প্রসারিত করবে"।[19] (২) তিনি ভোগস্বত্বকে হস্তান্তর যোগ্য করার বিরোধিতা করেছিলেন।[20] (৩) খাজনা বৃদ্ধির ব্যাপারে খাজনার সর্বোচ্চ সীমা হিসাবে মোট উৎপন্ন আয়ের এক-পঞ্চমাংশকে যারা খুব বেশি বলে মনে করত ডাফরিন প্রথমে তাদের সমালোচনা করেছিলেন।[21] পরে তিনি সীমাকে "সম্পূর্ণ অর্থহীন" বলে বর্জনীয় মনে করেছেন।[22] ১৫ বছরের মধ্যে টাকায় দু-আনার বেশী খাজনা বাড়ানো যাবেনা—এই মর্মে বাংলা সরকার খাজনা-বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের নতুন প্রস্তাব করলে ডাফরিন লিখেছিলেনঃ "আমি খাজনা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের নীতিটিকে ভালো মনে করিনি এবং আর্থিক অথবা শর্তাদি থেকে এটা জমিদারদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত বলে আমার মনে হয়নি; তৎসত্ত্বেও আমি ওদের সিদ্ধান্ত মেনে নেব।"[23] (৪) ভোগস্বত্বহীন রায়তদের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারে ডাফরিন সেক্রেটারি অব ১৮৮৫ সালের ৬ জানুয়ারি জানিয়েছিলনঃ "আপনার সুপারিশ আমরা উচ্ছেদের দরুন ক্ষতিপূরণের ব্যাপারটি বিলের অন্তর্ভুক্ত

করিনি।"[২৪] (৫) ভোগস্বত্ব অধিকার অর্জনে বাধাদানকারী প্রচলিত সব চুক্তি বাতিল করার প্রস্তাবের জন্যও তিনি বিলটির সমালোচনা করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, ভোগস্বত্বাধিকারী রায়তরা "নানাভাবে ভূস্বামীস্বার্থ-বিরোধী হওয়ায়, যে জমিদাররা তাঁদের লীজ দলিলে এসব ধারা যোগ করেছিলেন আমার মনে হয় তাঁরা অত্যন্ত যুক্তি সঙ্গত সাবধানতা অবলম্বন করে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন।"[২৫]...এসব ছাড়াও, ডাফরিনের ভাষ্যে, বিলটিতে আরো অনেক কিছু ছিল যা "ভূস্বামীদের পক্ষে অহেতুকভাবে কঠোর বলে মনে হয়"। ভাইসরয় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, "ভারত সরকার প্রস্তাবিত আইনটি সম্পর্কে সরকারিভাবে ব্যবস্থা নিতে এগিয়ে এলেই এই কঠোরতা হ্রাস করতে কোন অসুবিধে হবে না।"[২৬]

লক্ষণীয় যে ডাফরিন প্রজার স্বার্থে বিলে একটি পরিবর্তনের জন্যও কোন সময়েই চাপ দেননি। অথচ বিলটি মোটেই আদর্শস্থানীয় ছিল না। বস্তুত ডাফরিন নিজেই সেক্রেটারি অব স্টেটকে ১৭ মার্চ, ১৮৮৫ তারিখে জানিয়েছিলেন যে "দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে বিলে যেসব পরিবর্তন করা হয়েছে...তার প্রায় সবটাই জমিদারদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে।"[২৭] ডাফরিন এসব পরিবর্তনের জন্য কৃতিত্ব দাবি করতে ভোলেননি ; ১৮৮৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি রাণী ভিক্টোরিয়াকে তিনি জানিয়েছিলেন :

> শেষ পর্যন্ত বিলটা পড়েছিল বাংলা সরকারের হাতে, অন্য ভাবে বলতে গেলে, এক দুর্বল লেফটন্যান্ট গভর্নরের হাতে, যিনি তিন-চারজন উগ্র আইরিশ দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছেন। পরিণামে বিলটা এক অত্যন্ত অসন্তোষজনক চেহারা নিয়েছিল, এই মূল অবস্থায় পাস হলে জমিদারদের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হত। এখানে আসার পর লর্ড ডাফরিন খসড়ার সবচেয়ে আপত্তিজনক অংশগুলি বাদ দেওয়ার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। এখন এটিকে যথেষ্ট পরিমাণে পরিমিত ব্যবস্থা বলে মনে করা যেতে পারে।[২৮]

১৮৮৫ সালের ২৩ মার্চ সহকর্মী বঙ্গের গভর্নর জেমস ফার্গুসনকে তিনি আরো খোলাখুলিভাবে লিখেছিলেন :

"অনেকে (জমিদাররা) আমাকে বলেছেন যে বর্তমান বিলটা নিয়ে তাঁদের চিন্তা নেই, চিন্তা হল বাংলা সরকার এরপর কি করতে পারে তাই নিয়ে। কিন্তু যতদিন রিভার্স থম্পসন বাংলা সরকারের প্রতিনিধি আছেন আমি সরকারের ওপর খুব কড়া নজর রাখতে চাই...জমিদারদের ভাগ্য ভাল আমি বিলের দায়িত্ব নিয়েছিলাম, কারণ তা না হলে তাদের কঠিন সমস্যায় পড়তে হত।"[২৯]

ভারতের জাতীয় নেতৃত্ব কৃষক বিরোধী এবং জমিদার-সমর্থক, ডাফরিনের এই অভিযোগের আরেকটি কৌতূহলোদ্দীপক দিককে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। এই অভিযোগ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডাফরিন একথাও বলেন যে ব্রিটিশ সরকার জমিদার ও অভিজাত শ্রেণীর মিত্র এবং জমিদার ও অভিজাত

শ্রেণীও ব্রিটিশ সরকারের মিত্র, কাজেই সরকারের উচিত নিজেকে ওদের সঙ্গে একাত্ম করে দেখা। বাবুশ্রেণী এদেরকে বিতাড়ন করতে সচেষ্ট হয়েছিল। 'বাবু-শ্রেণী' জমিদার ও অভিজাত শ্রেণী জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধী[৪০] ছিল বলে হঠাৎই আমাদের মনে হয় আমরা যেন এ্যালিস-এর আজবনগরীর সমাজ জগতে ভেসে বেড়াচ্ছি।

২

আয়কর ও লবণ কর সম্পর্কে জাতীয়তাবাদীদের মনোভাবকেও ডাফরিন বিকৃতভাবে উপস্থিত করেছিলেন। জাতীয়তাবাদীরা সাধারণভাবে আয়কর বসানোর বিরোধিতা করেননি, বরং তাঁদের অধিকাংশই সক্রিয় সমর্থন জানিয়েছিলেন।[৪১] বস্তুত, ১৮৮৬ সালে আয়কর বসানোর আগেই বহু জাতীয়তাবাদী নেতা ইউরোপীয় ও ভারতীয় উভয় শ্রেণীর বেতনভোগী সরকারি কর্মচারী এবং ব্যক্তিদের, বিভিন্ন পেশায় অর্থাৎ "শিক্ষিত বাবুশ্রেণীর" সবাইকে প্রচলিত লাইসেন্স ট্যাক্সের আওতায় আনার জন্য দাবি জানিয়েছিলেন।[৪২] একইভাবে তাঁরা লাইসেন্স ট্যাক্সকে বেতন ও পেশাগত আয়ের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করার জন্য ১৮৮০ সালে জন স্ট্র্যাচির প্রয়াসকে সমর্থন করেছিলেন।[৪৩] সমকালীন দুটি প্রথম শ্রেণীর জাতীয়তাবাদী পত্রিকা **অমৃত বাজার পত্রিকা** এবং **হিন্দু** আয়কর প্রবর্তনের দাবি সক্রিয়ভাবে জানিয়েছিল।[৩৪] ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনেই "বর্তমানে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরকারি ও বেসরকারি সামাজিক শ্রেণীকে লাইসেন্স ট্যাক্সের" আওতায় আনার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানিয়ে এক প্রস্তাব পাস করা হয়েছিল।[৩৫] এই প্রস্তাবের উত্থাপক ও সমর্থকরা আর এক ধাপ এগিয়ে আয়কর আরোপ করার দাবিও জানিয়েছিলেন।[৩৬] শেষ পর্যন্ত ১৮৮৬ সালে আয়কর প্রবর্তিত হলে জাতীয়তাবাদী মত প্রকাশের অধিকাংশ শক্তিশালী মাধ্যমই একে সমর্থন করেছে।[৩৭] কিছু নেতা অবশ্য এর বিরোধিতা করেছিলেন, কিন্তু তাদের অনেকেরই বিরোধিতার কারণ করের প্রকৃতি নয়, কারণ, (ক) তাঁরা যে কোনরকম কর বৃদ্ধিরই বিরোধী ছিলেন, কেননা তাঁরা মনে করতেন এভাবে সংগৃহীত অর্থ সামরিক অভিযান ও প্রশাসনিক ব্যয়বাহুল্যে অপচিত হবে, এবং (খ) তাঁরা মনে করতেন যে সম্প্রতি তুলে নেওয়া তুলা-শুল্ক রাজস্ব সংগ্রহের অপেক্ষাকৃত ভাল পথ। কিন্তু আয়করের এসব সমালোচকরাও বেতনভুক ও বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত সম্প্রদায়কে এর আওতায় আনার ব্যাপারটি সমর্থন করেছিলেন।[৩৮] ১৮৮৬ সালের পর আয়কর অনেক বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কোন গুরুত্বসম্পন্ন জাতীয়তাবাদী নেতাই এই কর প্রত্যাহার করার কথা বলেন নি বা এর পেছনে যে অর্থনৈতিক যুক্তি

তারও সমালোচনা করেন নি। ১৮৮৭ সালে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে এটি নাটকীয়ভাবে প্রকাশ পেল। জনৈক প্রতিনিধি ভি. আর. চক্রবর্তী আয়েঙ্গার আয়কর বিলোপের দাবি জানানোর জন্য ৬নং সিদ্ধান্ত সংশোধনের প্রস্তাব করেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিধিরা চিৎকার করে বাধা দিলেন: "না, না, প্রত্যাহার করুন," "একমাত্র এই করই ধনীদের ছুঁতে পারে" "আমরা কর থেকে অব্যাহতি চাই না," "আমরা মানব না," "বসে পড়ুন" "চুপ করুন" ইত্যাদি। ফলে চক্রবর্তী আয়েঙ্গার তাঁর সংশোধন প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হলেন।[৪৩]

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং অন্যান্য জাতীয়তাবাদী মুখপাত্ররা ১৮৮৬ সালের আয়কর আইনের অব্যাহতির নিম্ন সীমার বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছিলেন; ডাফরিন এটিকেই কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছিলেন। জাতীয়তাবাদী নেতারা নিম্ন সীমা বার্ষিক ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০০ টাকা করতে চেয়েছিলেন। এই দাবির পেছনে যুক্তি ছিল এই যে, অল্প আয়ের ওপর করের বোঝা চাপার পরিণামে সরকারি কর্মচারীদের হাতে গরীব লোকেরাও নাকাল হচ্ছিল। এই দাবির সুস্পষ্ট অর্থ ধনী অথবা মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলির" প্রতি পক্ষপাত নয়।[৪০] এর অর্থ, জাতীয়তাবাদী বা পাতি বুর্জোয়া শ্রেণী অর্থাৎ ছোট দোকানদার, কারিগর ও করণিক শ্রেণীর কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষায় আগ্রহী ছিলেন।

আর লবণ করের ব্যাপারে, অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী নেতাই এই করের বিরোধী ছিলেন। ১৮৮২ সাল পর্যন্ত তাঁরা এই কর হ্রাসের জন্য দাবি জানিয়ে এসেছেন। ১৮৮২ থেকে ১৮৮৬ সালের অন্তর্বর্তী সময়ে তাঁরা এই কর আরো হ্রাসের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন এবং কর বৃদ্ধির যে-কোন প্রয়াসের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। অবশেষে ১৮৮৮ সালে যখন এই কর বাড়ান হলো, প্রথম শ্রেণীর জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়ে উঠেছিল। তাদের সঙ্গে অবিলম্বে প্রতিবাদে যোগ দিয়েছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস।

বস্তুত, আয়কর ও লবণ করের ব্যাপারে বিপুল সংখ্যক জাতীয়তাবাদীর মনোভাব ছিল ভারতীয় জনসাধারণের তথাকথিত অভিভাবক ব্রিটিশ সরকারি কর্মচারী ও ব্যবসায়ী, এবং জনসাধারণের তথাকথিত জাতীয় নেতা ভারতীয় জমিদার, অভিজাত শ্রেণী এবং সাধারণভাবে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মনোভাবের ঠিক বিপরীত। আগেই বলা হয়েছে, ব্রিটিশ আর্থিক ও প্রশাসনিক নীতি এবং যেসব চাপের ফলে তার বিবর্তন হয়েছিল, তা নিয়ে প্রায় কোনো বিচার-বিশ্লেষণই হয়নি। এব্যাপারে কয়েকটি চিত্তাকর্ষক বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে।

১৮৭৯-৮০ সালে জন স্ট্র্যাচি বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ও বেতনভুক ব্যক্তিদের লাইসেন্স ট্যাক্সের আওতায় আনার প্রস্তাব করেছিলেন। আগেই বলা হয়েছে,

প্রস্তাবটি অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী সমালোচকের সোৎসাহ সমর্থন লাভ করেছিল। কিন্তু ভারতে বসবাসকারী ইংরেজদের বিরোধিতার ফলে রাজস্ব দফতরের সদস্য স্বয়ং এটি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।[41]

আর্থিক অবস্থার চাপে ভারত সরকার ১৮৮৫ সালে আয়কর প্রবর্তনের কথা ভাবতে বাধ্য হলে ডাফরিন সেক্রেটারি অফ স্টেট র‍্যানডলফ চার্চিলকে জানিয়েছিলেন যে $3\frac{1}{8}$ শতাংশ কর-হারকে তিনি মাত্রাধিক বলে মনে করেন।[42] এক সপ্তাহ আগেই তিনি সেক্রেটারি অব স্টেটকে জানিয়েছিলেন যে ভারতের ইউরোপীয়দের ওপর আয়কর আরোপ করা হলে "তা হবে ঐসব শ্রেণীগুলির কাছ থেকে অন্যায়ভাবে আদায় করা দাবি।"[43] সেক্রেটারি অব স্টেট এই মত পুরোপুরি সমর্থন করেছিলেন: "যাদের দেশে জোরাল সমর্থন আদায় করার ক্ষমতা আছে তাদের উপর $3\frac{1}{8}$ শতাংশ আয় কর চাপালে তারা নির্ঘাৎ চেঁচামেচি শুরু করে দেবে।"[44] ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮৫ তারিখে নর্থব্রুককে লেখা চিঠিতে ডাফরিন "মুখোমুখি লড়াইয়ের পর" কাউন্সিলের সহকর্মীদের "আরো অনেক বেশি সহনীয় কর-হার মেনে নিতে রাজি" করানোর কৃতিত্ব দাবি করেছিলেন।[45] **ডাফরিন বাংলার জমিদারদের খুশি করার উদ্দেশ্যে তাদের আয়করের আওতায় আনারও বিরোধিতা করেছিলেন।**[46] খুব কম সংখ্যক জাতীয়তাবাদী এই অব্যাহতির সমালোচনা করেছিলেন।[47] ১৮৮৬ সালের জানুয়ারি মাসে আয়কর বিলটি উপস্থাপিত হওয়ার পর ডাফরিন সানন্দে নর্থব্রুককে জানালেন যে একমাত্র সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের কাছ থেকে ছাড়া কোন বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়নি।[48]

খুবই মজার ব্যাপার, ভারতের জাতীয়তাবাদীদের আয়কর বিরোধিতার তথ্যটি ডাফরিন নিজেই আবিষ্কার করেছিলেন বেশ কিছুটা পরে। ১৮৮৬ সালে আয়কর আরোপের সময় আইনটির প্রতি ভারতীয়দের সমর্থনের কথা তিনি অকপটে স্বীকার করেছিলেন। ১০ জানুয়ারী, ১৮৮৬, তারিখে লেখা এক চিঠিতে তিনি নর্থব্রুককে জানিয়েছিলেন যে ভারতীয় সংবাদপত্র আয়কর বিল সমর্থন করেছে।[49] নর্থব্রুককে লেখা ১০ অক্টোবর, ১৮৮৬, তারিখের আরেকটি চিঠিতে তিনি বলেছিলেন: "অবশ্য আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে আয়কর আরোপের ব্যাপারে দেশীয় সদস্যদের ভূমিকা খুব ভাল ছিল।[50] এ ছাড়াও, বিধান পরিষদে আয়কর বিলের উপর ভাষণ দিতে গিয়ে ডাফরিন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের ৬নং সিদ্ধান্তের উল্লেখ করে-ছিলেন বিলটির প্রতি ভারতীয় জনমতের পুরোবর্তী অংশের সমর্থনের নজির হিসেবে।[51]

আমরা আগেই দেখেছি যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা অথবা শিক্ষিত ভারতীয়রা লবণ কর সমর্থন করেছিলেন ডাফরিনের এই অভিযোগ বাস্তবে ভিত্তিহীন। সে কথা বাদ দিলেও, কোনো শাসক যদি নিজের আরোপিত কর সমর্থন করার জন্য একটি গোষ্ঠীকে জনবিরোধী আখ্যা দেন তাহলে তা বৈধ

কিনা, এ প্রশ্ন সঙ্গত কারণেই করা যেতে পারে। বাস্তবে, "কর বৃদ্ধি করতে পারে এই রকম সব ধরনের ব্যয়ের" বিরুদ্ধে শিক্ষিত ভারতীয়দের আপত্তি জানানোর প্রবণতাকেই ডাফরিণ বিধান পরিষদগুলিতে তাঁদের প্রতিনিধি হওয়ার অযোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরেছিলেন।[৫৩] এর অর্থ শিক্ষিত ভারতীয়দের সামনে বাছাইয়ের বাস্তবিক কোনো সুযোগ ছিল না। লবণ কর সমর্থন করলে তাঁরা হতেন জন-বিরোধী আর বিরোধিতা করলে বলা হ'ত তারা দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং "সরকার পরিচালনার যোগ্যতা" তাঁদের নেই।

লবণ করের বিষয়ে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রথম থেকেই ব্রিটিশ-ভারতীয় আর্থিক প্রশাসন লবণ করকে ভারতীয় রাজস্ব ব্যবস্থায় এক বিশাল অর্থ ভাণ্ডার বলে মনে করেছে।[৫৪] ডিউক অব আরসাইল ১৮৬৯ সালের ২১ জানুয়ারি তারিখের এক বার্তায় সরকারি নীতির মূল সূত্র সংক্ষেপে বিবৃত করেছিলেন। তারই কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত করা হল: "করনীতির সাধারণ সূত্র অনুসারে করারোপের সম্পূর্ণ উপযুক্ত বস্তু লবণ। যে-কোন দেশেই প্রত্যক্ষ করের আওতায় জনসাধারণকে আনা অসম্ভব। রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে আদৌ কোন সাহায্য করতে হলে, তাদের তা করতে হবে সর্বজনীন ভোগ্যপণ্যের ওপর আরোপিত কর দিয়ে। এইসব কর ঠিকমত আরোপ করতে পারলে জনসাধারণকে কম সচেতন করে এবং শুধু তাই নয় অন্য যে-কোন উপায়ের তুলনায় তাদের সত্যিকারের কষ্ট কম দিয়ে বিরাট পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহ করা সম্ভব। ভারতে কর ধার্য করার পক্ষে এরকম অনুকুল তুলনীয় কোন পণ্যদ্রব্য নেই।...সুতরাং আমার মত হল ভারতের লবণ করকে সরকারি রাজস্বের এক বৈধ ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে গণ্য করে যেতে হবে।...পরোক্ষ করের অন্যতম বিরাট সুবিধা হল তা দামের অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে এমন ভাবে মিশে থাকে যে ভোক্তা তার অগোচরেই কর দেয়।"[৫৪]

একই কথা আরও জোর দিয়ে বলেছিলেন লিটন তাঁর ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৮, তারিখের বাজেট বক্তৃতায়। ধনীর উপর প্রত্যক্ষ কর আরোপের অসুবিধা এবং ধনী ও দরিদ্র উভয়ের কাছ থেকে লবণ কর আদায়ের সুবিধা বিষয়ে উইলিয়াম ম্যুর-এর তুলনামূলক আলোচনাকে অনুমোদন করে, লিটন তার থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন—"একটির দ্বারা আমরা দেশজুড়ে প্রতিটি শ্রেণীকে বিক্ষুব্ধ করে তুলি; অন্যটিতে কোন শ্রেণীরই সুখ শান্তিকে ব্যাহত না করে অনায়াসে আমরা আমাদের প্রয়োজনানুসারে সংগ্রহ করতে পারি।"[৫৫] এমনকি ই. বেয়ারিংও ১৮৮২ সালে লবণকর মণপ্রতি ৮ আনা কমানর সময় এই করকে এক আর্থিক ভাণ্ডার হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন।[৫৬] ডাফরিন নিজেও ১৮৮৮ সালের ২৭ জানুয়ারি সেক্রেটারি অব স্টেটকে বলেছিলেন যে লবণ কর বৃদ্ধিতে জনসাধারণের "বিশেষ কোন কষ্ট" হবে না, "কারণ আমরা দেড় কোটি টাকা পেলেও সেই টাকা আসবে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছ থেকে যার ফলে কেউই অসুবিধা অনুভব করবে না।"[৫৭] লবণ কর বৃদ্ধির ব্যাপারে কাউন্সিলের

ভারতীয় ও অন্যান্য "স্বাধীন" সদস্যের সর্বসম্মত সমর্থন আদায় করতে পারার জন্য ডাফরিন নিজেকে তারিফ করতেও ভোলেননি। ১৮৮৮ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি তিনি সেক্রেটারি অব স্টেটকে লিখেছিলেন: "আমি আত্মপ্রশংসা করব এই কারণে যে, যে কোন ভাইসরয়ের পক্ষে আয়কর ধার্য করা এবং দু' বছর পরেই আবার প্রায় কোন হৈ চৈ ছাড়াই দেশের রাজস্ব আদায় প্রায় সাড়ে দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বাড়িয়ে তোলা সম্ভব হোত না।"[৫৪]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ডাফরিনের সরকার লবণ কর না-বাড়িয়ে আয়কর বাড়াতে পারতেন। বস্তুত, ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের অনেকে এটাই চেয়েছিলেন।[৫৯] তাঁদের কেউ কেউ এ ব্যাপারে বলিষ্ঠ ভাবে নিজেদের মত প্রকাশ করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, ১৮৮৮ সালের ২২ জানুয়ারি **মাহ্‌রাট্টা** পত্রিকায় লেখা হয়েছিল: আয়কর ছিল, তা বাড়ান যেতে পারত। কিন্তু, না, সরকার তা করবেন না, কারণ তাহলে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজ তার বিরুদ্ধে চিৎকার শুরু করে দিত। গরীব হিন্দু প্রতিবাদ করে না, সুতরাং তার ওপর যত খুশি কর চাপান যেতে পারে।" ১৮৮৮ সালের ২৪ জানুয়ারি **কেশরী** পত্রিকা লিখেছিল: "আয়কর বাড়ান হলে তার বোঝার অধিকাংশই পড়ত উচ্চপদস্থ ইউরোপীয় অফিসার ও ব্যবসায়ীদের ওপর, এবং মুদ্রা বিনিময় হার ইতোমধ্যেই বেশি হওয়ার ফলে তাদের পক্ষে তা সর্বনাশা হয়ে উঠত এবং তারা বিদ্রোহ করত।...লর্ড ডাফরিনের মত একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি কি এরকম বিরোধ জাগিয়ে তুলে তাঁর সুনাম কলঙ্কিত করার ঝুঁকি নিতে পারতেন?"[৬০] কর-বাছাই নিয়ে ভারতে ও লণ্ডনে সরকারি ব্যক্তিরা আলোচনা ও বিতর্ক করেননি এমন নয়। ডাফরিনকে দেখতে পাই আয়করের বদলে লবণ কর বাড়ানর প্রস্তাব সমর্থন করার জন্য ইনডিয়া কাউন্সিলের সদস্য এ লায়ালকে তিনি ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।[৬১]

৩

জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য আর যে তথ্য ডাফরিন পেশ করেছিলেন, সেটি 'বেঙ্গল রেণ্ট বিল' এবং লবণ করের ব্যাপারে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউনসিলের ভারতীয় সদস্যদের ভোট দান সংক্রান্ত আচরণ নিয়ে।[৬২] স্পষ্টতই এতেও একটা চাতুরির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। শ্রোতা বা পাঠকের মনোযোগ চালিত করা হয়েছে 'দেশী সদস্য' এই শব্দের দিকে যাতে 'মনোনীত' শব্দটি নজরে না আসে। কিন্তু এখানেই রয়েছে আসল সত্য। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাস করার সময় কৃষ্ণদাস পাল, প্যারী মোহন মুখার্জী, দ্বারভাঙ্গার মহারাজা এবং সৈয়দ আমির আলি সবাই ছিলেন ভারত সরকারের মনোনীত ব্যক্তি। বস্তুত, প্রথম তিনজনকে সুচিন্তিত ভাবেই মনোনীত করা হয়েছিল জমিদারদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য।

প্যারী মোহন মুখার্জী ও দিনশা পেটিত, 'দায়িত্বশীল শ্রেণীর' প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সরকারিভাবে মনোনীত হয়েছিলেন ; এঁরা লবণ কর বৃদ্ধির জন্য সরকার প্রস্তাবিত আইনের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। বস্তুত, এই সময় ডাফরিন আগ বাড়িয়ে প্যারী মোহন মুখার্জীকে প্রশংসা করেছিলেন। সেক্রেটারি অব স্টেটকে তিনি ৩০ জানুয়ারি, ১৮৮৮, তারিখে লিখেছিলেন, "আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে এদেশে সাধারণ মানুষের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নেতা প্যারী মোহন মুখার্জী দৃঢ়তার সঙ্গে লবণ কর বৃদ্ধির পক্ষ অবলম্বন করেছেন। এর একটা ফল ভাল হবে এবং সম্ভবত এর দ্বারা সংবাদপত্রগুলি প্রভাবিত হবে।"[৬৪] অন্য দিকে, লবণ কর বৃদ্ধি সমর্থন করার জন্য জাতীয়তাবাদীদের অনেকে প্যারী মোহন মুখার্জী ও দিনশা পেটিতকে নিন্দা করেছিলেন। আইন পরিষদগুলি ত্রুটিপূর্ণ এবং সেজন্য জনপ্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করে সেগুলির সংস্কার সাধন আবশ্যক, জাতীয়তাবাদীদের এই বক্তব্য যে সত্য তার আর একটি প্রমাণ হিসাবে এঁদের আচরণকে তুলে ধরেছিলেন।[৬৫]

৪

জন-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিই যদি প্রকৃত কারণ না হয়ে থাকে, তবে জাতীয়তা বাদীদের দাবিয়ে রাখার সরকারি নীতি, তাঁদের প্রতি বৈরী মনোভাব গ্রহণের এবং আইন পরিষদগুলিতে আরো বেশি জন-প্রতিনিধিত্বের দাবির অস্বীকৃতির সরকারি মনোভাবের, অন্তত ডাফরিনের মনোভাবের আর কী কারণ হতে পারে? উদীয়মান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি ডাফরিনের মনোভাবের কার্যকারণ-সম্বন্ধ বিচার করার সুযোগ এখানে নেই। শুধু সাময়িকভাবে কিছু ইঙ্গিত দেওয়া যেতে পারে।

প্রথমত, ডাফরিন পরিষ্কার বুঝেছিলেন যে জাতীয়তাবাদের প্রসার ভারতে শাসক শক্তির মৌলিক সাম্রাজ্যিক স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর। সেজন্য, সেক্রেটারি অব স্টেটকে লেখা ২৬ এপ্রিল, ১৮৮৬, তারিখের চিঠিতে তিনি আশংকা প্রকাশ করেছিলেন যে আইন পরিষদগুলিতে আরো বেশি ভারতীয় প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা "সহায়ক হওয়ার বদলে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে" পারে। তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন, "সাম্রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ে তারা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের বিরোধিতা করবে।[৬৬] ১৮৮৬ সালের ১৬ অক্টোবার নর্থব্রুককে লেখা এক চিঠিতে একইভাবে জানিয়েছেন,"...কিন্তু, আমরা যদি নেটিভদের বর্তমান মতামত ধরি, তাহলে দেখব বার্মা অধিকার, সেনাবাহিনী বাড়ান, রেলপথ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে দুর্গ নির্মাণ, আমীরকে সাহায্য এবং বস্তুত সমস্ত রকম ব্যয় যা কর

বৃদ্ধি করবে অথচ প্রত্যক্ষ ও আশু প্রাপ্তির সম্ভাবনা সৃষ্টি করেনা, এমন সব কিছুরই তারা বিরোধী।"[66] সভ্যতার সংবর্ধিত ব্রতর সঙ্গে ডাফরিন বিদেশী পুঁজির তত্ত্বাবধানের বিষয়টিকেও যুক্ত করেছিলেন। ভারতে বিপুল সংখ্যক ব্রিটিশ বিনিয়োগকারীর স্বার্থ যাতে বিপন্ন না হয় সেই কারণে অবিমিশ্র ব্রিটিশ শাসন অব্যাহত রাখতে হবে। ৬ নভেম্বর, ১৮৮৮, তারিখে ডাফরিনের স্মারকলিপি থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়া হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না :

> এইসব দায়ের সঙ্গে মাতৃভূমির বিরাট বাণিজ্যিক স্বার্থের প্রতি নজর রাখার দায়িত্ব অবশ্যই যুক্ত করতে হবে। বাইশ কোটি পাউন্ড স্টার্লিং-এরও বেশি দায়বদ্ধ পুঁজি ভারতের পক্ষে অত্যন্ত লাভজনকভাবে ঋণ দেওয়া হয়েছে ও রাষ্ট্রকে অথবা ভারতীয় রেলপথ ও অনুরূপ উদ্যোগে বিনিয়োগ করা হয়েছে ; **কারণ, ভারত প্রাথমিকভাবে ভারতীয় জনসাধারণের স্বার্থে শাসিত হওয়া উচিত একথা আমরা যতই মুক্তকণ্ঠে বলি না কেন,** সরকারি জামিনের ওপর নির্ভর করে **যারা ভারতের সম্পদের উন্নতিতে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছে,** অথবা সাম্রাজ্যের ভারতীয় কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে ভারতের অর্থ তহবিলে যারা পুঁজি বিনিয়োগ করেছে **তাদের প্রতি সরকারের দায়িত্ব উপেক্ষা করা অপরাধ হবে।** বিপুল পরিমাণ ঐ বেসরকারী পুঁজির ক্ষেত্রে একই কথা প্রায় একই ভাবে প্রযোজ্য যা ব্রিটিশ উদ্যোক্তারা **ইংরেজ শাসন ও ইংরেজের ন্যায়বোধ ভারতে প্রভুত্ব করে যাবে ধরে নিয়ে** যন্ত্রশিল্পে, চা-চাষে এবং নীল, পাট ও অনুরূপ শিল্পে বিনিয়োগ করছে।[67]

উপরন্তু, ডাফরিন বিশ্বাস করতেন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্বৈরাচারী চরিত্র জাতীয় কংগ্রেস এবং 'শিক্ষিত শ্রেণীগুলিকে' সাংবিধানিক সুযোগ-সুবিধা দিতে বাধা দিয়েছিল। "এখন যদিও আমার প্রবণতাগুলি সব মূলত উদারনৈতিক," সেক্রেটারি অব স্টেটকে ১৮৮৮ সালে লেখা এক চিঠিতে তিনি এই মন্তব্য করেছিলেন, "তাহলেও এটা খুবই সুস্পষ্ট যে সাংবিধানিক নীতির ভিত্তিতে ভারত সরকারকে পরিচালনা করা যাবে না। বর্তমানে যেমন আছে এবং আগামী বহু বছর তেমনি একে সদাশয় স্বৈরতন্ত্র হতে হবে।" "রাজনৈতিক প্রশ্নে মগ্ন" জাতীয় কংগ্রেসের মত সংগঠনগুলি ভারতীয় ব্রিটিশ প্রশাসনের আনুকূল্য পেতে পারে না, কারণ "তাদের অস্তিত্ব আমাদের মত এইরকম স্বৈরতন্ত্রী প্রশাসনের সঙ্গে সবসময় সঙ্গতিহীন হতে বাধ্য।"[68]আরো আগেও ডাফরিন বলেছিলেন যে জাতীয়তাবাদী নেতারা প্রকাশ্যে এবং কর্মসূচিতে যাই বলুন না কেন তাঁরা আসলে রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য ব্রিটেনের প্রতিদ্বন্দ্বী।[69]

ডাফরিনের মতে জাতীয়তাবাদীদের কাছ থেকে ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃত ভয় দেখা দিয়েছিল তাদের গণবিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করার প্রবণতা এবং ক্ষমতার জন্য। বাহ্যত, "বাবুশ্রেণী" ঠিকমত জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করছে না এই যুক্তিতে যদিও তিনি পরিষদগুলি সম্প্রসারণে বাধা দিয়েছিলেন

এবং 'বাবুরা' অকার্যকর সংখ্যালঘু বলে অবজ্ঞা প্রকাশ করেছিলেন, আসলে যা তাঁকে সত্যিই আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছিল তা হল এরা যে কোন মুহূর্তে জনসাধারণকে সংগঠিত করতে ও নেতৃত্ব দিতে পারে এই ভয়। ২১মার্চ, ১৮৮৬ তিনি সেক্রেটারি অব স্টেটকে জানিয়েছিলেন যে জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে একটি নূতন ঘটনা ঘটছে, "যথা, বাংলার বিভিন্ন জেলায় রায়তদের নিয়ে জনসভা সংগঠন।" তিনি সতর্ক করে বলেছিলেন যে এই ঘটনা অশুভঃ "আমি নিজেকেই প্রশ্ন না করে পারছি না ভারত সরকারের মত একটা স্বৈরতন্ত্রী সরকার কতদিন......ইংল্যান্ড থেকে, অথবা বলা যায় আয়ারল্যান্ড থেকে, অবিকল আমদানি করা আধুনিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চাপ সহ্য করতে পারবে।"[৭০] অধিকন্তু, "দিনের পর দিন শত শত তীক্ষ্নবুদ্ধিসম্পন্ন বাবু তীব্র ও কার্যকর ভৎর্সনায় ইংরেজ নিপীড়নকারীদের বিরুদ্ধে তাদের ঘৃণা ও ক্রোধ বর্ষণ করছে।" সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাবুরা বোধহয় জনস্বার্থ বিরোধী বলে ক্ষতিকর ছিল তা নয়, তারা ক্ষতিকর ছিল কারণ, "ইংরেজ নিপীড়নকারীদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করেছিল" ফলে, "একটা সময় আসবেই যখন ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে তাদের ক্রমবর্ধমান ও অবাধ অভিযোগ আমাদের শাসনের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক বৈরিতার মনোভাব সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হবে না।[৭১] ১৮৮৬ সালের ২৬ এপ্রিল সেক্রেটারি অব স্টেটকে লেখা আরেকটি চিঠিতে ডাফরিন একই কথা বলেছিলেন। তিনি অভিযোগ করেছিলেন, সংগঠিত গণ-আন্দোলন "আরো সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট রূপ" নিচ্ছে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও অন্যান্যরা "আইরিশ বিপ্লবপন্থীদের কৌশল ও সংগঠন নকল করার......অন্ধ বাসনায়" মগ্ন। তাঁরা রায়তদের নিয়ে "বিশাল বিশাল সভা" সংগঠিত করার চেষ্টা করছিলেন। এই রকম একটি সভায় দশ হাজার লোক জমায়েত হয়েছিল, "তারা সারা দিন ধরে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে মিঃ ব্যানার্জী ও তাঁর বন্ধুদের বক্তৃতা শুনেছিল।" ডাফরিন সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, আরও গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা ছিল। বাঙ্গালী 'বাবু' তার নিজের অঞ্চলে ততটা বিপজ্জনক নন, কিন্তু তিনি মধ্য ও উত্তর ভারতে ক্রিয়াকলাপ প্রসারিত করতে শুরু করেছেন। এই সময় ডাফরিন বারংবার উচ্চারিত সতর্কবাণী আবারও প্রকাশ করেন, "ভারতবর্ষ এমন দেশ নয় যেখানে ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পন্থা প্রয়োগ করলে ক্ষতিকর পরিণামের হাত থেকে অব্যাহতি মিলবে।" স্বরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষকে তিনি পরামর্শ দেন "খোলা মনে সম্ভবনা বা অনুমোদনযোগ্য সবকিছু দিয়ে বিরোধ মেটাতে।" একই সঙ্গে তিনি তাদের পরামর্শ দেন "জনসভা এবং উত্তেজক বক্তৃতা নিষিদ্ধ করতে।"

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি সরকারি মনোভাবের ওপর উজ্জ্বল আলোকপাত করেছে ভাইসরয়কে লেখা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যার লেফটন্যান্ট গভর্ণর এ. কলভিনের ১০ জুন, ১৮৮৮, তারিখের একটি চিঠি, যেটি ভাইসরয় তাঁর ২৯ জুন, ১৮৮৮, তারিখের চিঠির সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন

সেক্রেটারি অব স্টেটকে।[৭৪] কলভিন লিখেছিলেন কংগ্রেস নেতারা জনসমক্ষে ভাষণে তাঁদের লক্ষ্য সম্পর্কে যা বলেন এবং জনসাধারণ এইসব লক্ষ্যকে যেভাবে বোঝে, এই দুয়ের মধ্যে একটা স্পষ্ট পার্থক্য করা দরকার। যদি অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে জনসাধারণ কংগ্রেসের আন্দোলনকে "ভারতের ইংরেজ কর্তৃপক্ষের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন বলে" মনে করে, কংগ্রেস প্রচারকরা "স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে নিপীড়নকারী ও সহানুভূতিহীন হিসেবে তুলে ধরে তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা" ছড়ায়, এবং এই অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ছড়ানর ফলে "জনসাধারণ ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠছে," তাহলে কংগ্রেসের বিরোধিতা করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। কলভিন এই কথাটা ভাল করে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, যেমন পরবর্তীকালে বলা হয়েছে, কংগ্রেসকে 'তিন দিনের বিস্ময়' অভিধা দিয়ে উপেক্ষা করা ঠিক হবে না। "আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন · কংগ্রেসের সাময়িক অধিবেশনগুলি নিয়ে আমি চিন্তিত নই।" কংগ্রেসের প্রকাশ্যে ঘোষিত দাবিগুলিও দুশ্চিন্তার কারণ নয়। বিপজ্জনক হ'ল, যারা জনসাধারণের সমর্থন আদায়ের জন্য তাদের দুঃখ, তাদের অবিচারের কথা নিত্য বোঝানোর কাজে নিয়োজিত রয়েছে এবং তাদের কার্যকলাপ এই উদ্দেশ্যে সমস্ত অন্যায়ের কারণ, উৎস ও যন্ত্র হিসেবে আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষকে জনসাধারণের ঘৃণার বস্তু করে তুলছে। তাই কলভিনের অভিমত কংগ্রেসের বার্ষিক সভায় তিনি বাধা দেবেন না, কিন্তু অসন্তোষ ছড়ান "প্রচার-পুস্তিকা বা গ্রন্থ প্রভৃতি জনসাধারণের মধ্যে আর প্রচার করতে দেবেন না।"

সেক্রেটারি অব স্টেটকে লেখা ভাইসরয়-এর ঐ চিঠির সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা সরকারের আরেকটি আদেশনামা ছিল যাতে নির্বাচিত কিছু অফিসারকে উক্ত প্রদেশের কংগ্রেস আন্দোলন সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দিতে বলা হয়েছিল। এর মধ্যে দুটি প্রশ্ন ছিল এই রকম: (ক) কংগ্রেস আন্দোলনকে কি সক্রিয়ভাবে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ সৃষ্টির কেন্দ্র হিসেবে, না মূলত কেতাবি বিতর্কের জায়গা হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে? (খ) শহর বা গ্রামের প্রধানত উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মনোযোগই কি এর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, না এই সংগঠন শহুরে বা কৃষিজীবী মধ্য ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মনেও তা স্থান করে নিচ্ছে?

সব শেষে, জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে যাঁরা অত্যন্ত নরমপন্থী, অর্থাৎ যাঁরা তাঁদের দাবিকে সংকীর্ণ সাংবিধানিক ও সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে শক্ত করে ধরে রেখেছিলেন, ডাফরিন তাঁদের মেনে নিতে রাজি ছিলেন, বিশেষ করে এই কারণে যে তাঁরা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের দুর্বল হয়ে পড়া অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বুনিয়াদকে শক্ত করতে সাহায্য করতে পারতেন।[৭৫] কিন্তু এইসব নরমপন্থীরা রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে টিকে থাকতে পারবে কি না সে বিষয়ে তিনি সন্দিহান ছিলেন—এরা 'চরমপন্থী' আক্রমণের সামনে সোজা হয়ে

দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না এবং ফলে স্রেফ জাতীয়তাবাদীদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির অস্ত্র হিসেবে লেগে যেতে পারে।[75] বস্তুত, ১৮৮৮ সালের ৩০ নভেম্বর ডাফরিনের সেণ্ট অ্যানড্রুজ দিবসে ভাষণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চরমপন্থী চাপের সামনে নরমপন্থীরা যাতে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে, তার জন্য তাদের সাহায্য করা। ১৮৮৮ সালের ৩ ডিসেম্বর সেক্রেটারি অব স্টেটকে লেখা চিঠিতে ডাফরিন ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন যে একদিকে বাঙালি চরমপন্থীদের "জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা" এবং অন্যদিকে জমিদার, তালুকদার ও 'দায়িত্বশীল' ব্যক্তিদের মাঝখানে ছিল "বেশ কিছু দ্বিধাগ্রস্ত মতামতসম্পন্ন মানুষের" একটি তৃতীয় গোষ্ঠী। "কংগ্রেসের যেসব দাবি ও আচরণ অসংযত ও নিন্দনীয় সেগুলিকে" তীব্রভাবে নিন্দা করে তিনি এই তৃতীয় শক্তিকে প্রভাবিত করতে পারবেন বলে আশা করেছিলেন।[76]

৫

সুতরাং উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, প্রথম দিকের জাতীয়তাবাদীদের রাজনৈতিক কার্যাবলী ও দৃষ্টিভঙ্গি অথবা ডাফরিনের নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতির পটভূমিতে বিচার করলে দেখা যাবে গোড়ার দিকের ভারতীয় জাতীয় নেতৃত্বের চরিত্র সম্পর্কে ডাফরিন যে মন্তব্য করেছিলেন তা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। সম্ভবত এ বিষয়ে তাঁর পক্ষপাতপূর্ণ মতামত বহুলাংশে গড়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনের জরুরী প্রয়োজন থেকে, কারণ তখন বহুঘোষিত সাম্রাজ্যবাদী সদাশয় স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ও তার তথাকথিত বদান্য চরিত্রের বিরুদ্ধে প্রতিকূলতা ক্রমাগত বেড়ে উঠছিল। তা না হলে ডাফরিনের হাতের কাছেই যথেষ্ট সরকারি তথ্য ছিল, তিনি ঐ মন্তব্য না করে সত্য নিরূপণ করতে পারতেন।

1. নর্থব্রুককে লেখা ডাফরিনের চিঠিপত্র, 16 অক্টোবর 1886,—'ডাফরিন পেপারস' (এরপর থেকে শুধু ডি. পি. বলে উল্লেখ করা হয়েছে); ডাফরিনের স্মারকলিপি, হোম (পাবলিক) ডেসপ্যাচ টু সেক্রেটারি অব স্টেটস, নং 67, 6 নভেম্বর 1888 (এরপর থেকে '6 নভেম্বর 1888-র ডাফরিন স্মারকলিপি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে); ডাফরিনের 'বক্তৃতাবলী' 1884-88।

2. 6 নভেম্বর 1888-র ডাফরিন স্মারকলিপি।

3. সেক্রেটারি অব স্টেট-কে লেখা ডাফরিনের চিঠি, 20 মার্চ 1887। সেক্রেটারি অব স্টেট, লর্ড নর্থ, ডাফরিনকে লেখা 1886 সালের 8 সেপ্টেম্বরের চিঠিতে বিষয়টিকে আরও অমার্জিত ভাবে প্রকাশ করেছেন: "ভারতবর্ষে স্পষ্টভাবে বিভক্ত দুটি শ্রেণী—প্রথমটি, সাধারণ মানুষ; আর দ্বিতীয়টি, 'শিক্ষিত নেটিভ-রা'।" ডি. পি.।

4. 6 নভেম্বর 1888-এর ডাফরিন স্মারকলিপি।

5. তদেব।

6. তদেব।

7. তদেব।

8. সেক্রেটারি অব স্টেটকে লেখা ডাফরিনের চিঠি, 26 এপ্রিল, 1886, (ডি. পি.) এবং নর্থব্রুককে লেখা চিঠি, 16 নভেম্বর 1886, (ডি. পি)। এই প্রসঙ্গে সেক্রেটারি অব স্টেটকে লেখা 8 সেপ্টেম্বর 1886-র এবং সেক্রেটারি অব স্টেটের লেখা 14 এপ্রিল 1887-র (ডি পি.) চিঠি দুটিও দ্রষ্টব্য।

9 6 নভেম্বর 1888-এর ডাফরিন স্মারকলিপি।

10 16 অক্টোবর 1886 (ডি. পি.)। সেক্রেটারি অব স্টেটকে লেখা ডাফরিনের 26 এপ্রিল 1886-র চিঠিও দ্রষ্টব্য (ডি. পি)।

11. বি. বি. মিশ্র—'দ্য ইণ্ডিয়ান মিড্‌ল্ ক্লাসেস, লণ্ডন', 1961, পৃঃ 346-350 দ্রষ্টব্য।

12 বর্তমান লেখকের "দ্য রাইজ এণ্ড্ গ্রোথ অব ইকনমিক ন্যাশনালিজ্‌ম ইন ইণ্ডিয়া", নয়া দিল্লী 1965, দ্রষ্টব্য।

13. সি. ই. বাকল্যান্ড—বেঙ্গল আণ্ডার দ্য লেফটেনান্ট গভর্নর্স, কলকাতা 1901, 2 খণ্ড; পৃঃ 811-12।

14. এই প্রসঙ্গে 'দ্য ইণ্ডিয়ান ইকনমিক এণ্ড সোশ্যাল হিস্ট্রি রিভিউ'—এর 2 খণ্ড 4 সংখ্যায় প্রকাশিত বর্তমান লেখকের প্রবন্ধ "টু নোটস অন দ্য এগ্রেরিয়ান পলিসি অব ইণ্ডিয়ান ন্যাশানালিস্টস্, 1880-1905" দ্রষ্টব্য।

15. ডি. পি। আইরিশ "দুর্বৃত্তের" ব্যাপারটা ডাফরিন-এর চিঠিপত্রে ঘুরে-ফিরে এসেছে। 1885 সালের 30 নভেম্বর তারিখে সেক্রেটারি অব স্টেটকে লেখা একটি চিঠিতে প্রজাদের প্রতি সহানুভূতিশীল আমলাদের উল্লেখ করে তাদের "বিচার-বিবেচনাহীন আইরিশ ভদ্রলোক" আখ্যা দিয়েছিলেন। তদেব। এই প্রসঙ্গে 1885 সালের 23 মার্চ ফার্গুসনকে (ডি. পি) এবং ঐ বছরেই 16 ফেব্রুয়ারি রানী ভিক্টোরিয়াকে লেখা চিঠি (ডি. পি.) দ্রষ্টব্য।

16. ডি. পি.।

17. 1884-র 30 ডিসেম্বর সেক্রেটারি অব স্টেটকে লেখা চিঠি (ডি. পি.)।

18. তদেব।

19. 1884 সালের 23 ডিসেম্বর সেক্রেটারি অব স্টেটকে লেখা ডাফরিনের চিঠি (ডি. পি.); এই প্রসঙ্গে 1885 সালের 6 জানুয়ারির চিঠিও দ্রষ্টব্য (ডি. পি.)।

20. সেক্রেটারি অব স্টেটকে লেখা 1884 সালের 23 ডিসেম্বরের (ডি. পি.) এবং ঐ বছরেই 6 জানুয়ারির চিঠি (ডি. পি.)। উল্লেখ করা দরকার, সরকার আগে এই ব্যবস্থাকেই গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি বলে দাবি করেছিল।

21. সেক্রেটারি অব স্টেটকে লেখা ডাফরিনের 6 জানুয়ারি 1885-র চিঠি (ডি. পি.)।

22. এস. সি. বেইলীকে লেখা ডাফরিনের চিঠি, 29 জানুয়ারি 1885 (ডি. পি.)।

23. তদেব। এর আগে 1885 সালে 27 এ জানুয়ারীতে বেইলী ডাফরিনকে জানিয়েছিলেন: "আমাদের আইন-এর প্রস্তাব বৃদ্ধির সুযোগ সংকীর্ণ করেছে, কিন্তু ঐগুলি কার্যকর করার আরো বেশি সুবিধা করে দিয়েছে।"

24. ডি. পি.।

25. সেক্রেটারি অব স্টেটকে ডাফরিনের লেখা, 23শে ডিসেম্বর 1884 (ডি. পি.)।

26. তদেব।

27. ডি. পি.। এই চিঠিতে ডাফরিন বিল-এ জমিদারদের পক্ষে পরিবর্তনসমূহের একটা লম্বা ফিরিস্তি দিয়েছেন। তাঁর পক্ষ থেকে, সেক্রেটারি অব স্টেট তাঁর 1885 সালের 24 জুন তারিখের লেজিসলেটিভ ডেসপ্যাচ-এ এগুলিকে অনুমোদন করেছিলেন।

28. ডি. পি.।

29. (এখানে জোর দেওয়া হয়েছে) ডি. পি.।

30. উদাহরণস্বরূপ, 1885 সালের 30 জুলাই নর্থব্রুককে লেখা (ডি. পি.), 7 আগস্ট 1885 সালে সেক্রেটারি অব স্টেটকে লেখা (ডি. পি.), 1 ফেব্রুয়ারি 1887 সালে সেক্রেটারি অব স্টেটকে লেখা (ডি. পি.), 17 সেপ্টেম্বর 1888 সালে সেক্রেটারি অব স্টেটকে লেখা (ডি. পি.) ও 3 ডিসেম্বর 1888 সালে সেক্রেটারি অব স্টেটকে লেখা (ডি. পি.) ডাফরিনের চিঠি এবং 6 নভেম্বর 1888-র ডাফরিন স্মারকলিপি দ্রষ্টব্য। "আমি যেসব সম্মানিত শ্রেণীকে মহামান্য মহারাণীর সরকারের কর্মসূচির সঙ্গে একাত্ম করতে চাই, তাদের আস্থা ও শুভেচ্ছা হারানোর বিপদ সম্পর্কে সেক্রেটারি অব স্টেটও ভাইসরয়কে সাবধান করেছিলেন —11 অক্টোবর, 1888 (ডি. পি.)।

31. আমার "দ্য রাইজ এন্ড গ্রোথ অব ইকনমিক ন্যাশনালিজম ইন ইন্ডিয়া" দ্রষ্টব্য।

32, তদেব।

33. তদেব।

34. 'অমৃত বাজার পত্রিকা', 10 জানুয়ারি 1878, 2 জানুয়ারি 1880, 5 মার্চ 1880, 29 ডিসেম্বর 1881; 'হিন্দু'—19 ডিসেম্বর 1884। এছাড়া 'বেঙ্গলী', 17 জানুয়ারি 1880, 'ইন্দু প্রকাশ' 3 মার্চ 1884; 'স্বদেশমিত্রন', 11 ডিসেম্বর, 1884 এবং আরো বহু জাতীয়তাবাদী পত্রিকা;

35. 6নং সিদ্ধান্ত।

36. রিপোর্ট অব দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, 1885, পৃঃ 66-72।

37. "দ্য রাইজ এন্ড গ্রোথ অব ইকনমিক ন্যাশনালিজম" দ্রষ্টব্য।

38. তদেব।

39. রিপোর্ট অব দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস 1887, পৃঃ 135।

40. খুঁটিনাটির জন্য 'দ্য রাইজ এন্ড গ্রোথ অব ইকনমিক ন্যাশনালিজম' দ্রষ্টব্য। এই বিষয়ে জাতীয়তাবাদীদের দাবি যে সঙ্গত ছিল পরবর্তীকালে কর্তৃপক্ষও তা স্বীকার করেছে। যেমন, 'ফাইন্যান্স মেম্বর' স্যার এডওয়ার্ড ল 1903 সালে মন্তব্য করেছিলেন—'আয়কর ছাড়-এর পরিমাণ বৃদ্ধির প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হ'ল, এক হাজার টাকার নীচে আয়ের উপর কর বসলে তা দিতে হয় প্রধানত ছোট ছোট ব্যবসায়ী, সরকারি ও বেসরকারি অফিসকর্মী এবং অবসর ভাতাভোগীদের। দেয় করের পরিমাণ বেশি না হলেও, এরা ওটিকে সাংঘাতিক আঘাত বলে মনে করে। ...তাছাড়া, এরকম আশঙ্কা করার কারণ আছে যে' কর নির্ধারকদের আচরণের ফলে স্বল্প আয় বিশিষ্ট শ্রেণীগুলিকে সম্ভবত বেশি কষ্ট পেতে হয়; অনেক সময়েই এরা অন্যায় রকম বেশি হারে কর চাপিয়ে দেন..." অর্থসংক্রান্ত বিবৃতি, কলকাতা 1903-4,489 অনুচ্ছেদ।

41. পি, ব্যানার্জি: এ হিস্ট্রী অব ইন্ডিয়ান ট্যাক্সেশন, কলকাতা 1930, পৃঃ 70, এবং 'অমৃত বাজার পত্রিকা', 5 মার্চ 1880।

42. 14 অগাস্ট 1885 তারিখে লেখা চিঠি (ডি. পি.)।

43. 7 আগস্ট 1885 তারিখের চিঠি (ডি. পি.)।

44. 8 সেপ্টেম্বর 1885 তারিখে ডাফরিনকে লেখা চিঠি, (ডি. পি.)।

45 ডি. পি। অন্যদিকে, 'হিন্দু' পত্রিকা 1886 সালের 7, 9 এবং 12 জানুয়ারি আয়কর হারে প্রগতিশীলতা না-থাকায় সমালোচনা করেছিল। 'হিন্দু' ক্রমবর্ধমান কর হারের দাবি জানিয়েছিল। এই পত্রিকা জোর দিয়ে বলেছিল, উচ্চ আয় সম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে শতকরা 2½ ভাগ কর হার অত্যন্ত কম ('ভয়েস অব ইন্ডিয়া', জানুয়ারি 1886)। এছাড়া 9ই জানুয়ারীর 'বঙ্গবাসী' (রিপোর্ট, নেটিভ প্রেস বেঙ্গল, 17 জানুয়ারী, 1886) দ্রষ্টব্য।

46. সেক্রেটারি অব স্টেটকে লেখা ডাফরিন-এর চিঠি, 22 ডিসেম্বর, 1885 (ডি, পি)।

47. 7, 9 ও 12 জানুয়ারি 1886-র 'হিন্দু' ('ভয়েস অব ইন্ডিয়া', জানুয়ারি 1886); 'ইন্ডিয়ান নেশন', 25 ফেব্রুয়ারি 1886 ('ভয়েস অব ইন্ডিয়া', ফেব্রুয়ারি 1886) 'গুজরাত মিত্র' (10 জানুয়ারী, 1886 (রিপোর্ট, নেটিভ প্রেস, বোম্বে, 16 জানুয়ারী 1886); জি. ভি. যোশী, 'রাইটিংস এন্ড স্পিচেস', পুনা 1912, পৃঃ 141-42, 161, 165, 190 এবং 'বেঙ্গলী', 17 জানুয়ারি 1880 দ্রষ্টব্য।

48. 3 ফেব্রুয়ারি 1886-র চিঠি (ডি পি.) এই প্রসঙ্গে ভাইসরয়-এর একান্ত সচিব ডি. ম্যাকেঞ্জি ওয়ালেস-কে লেখা ভারত সরকারের স্থায়ী আন্ডার সেক্রেটারি জে. এ. গডলির 9 অক্টোবর 1885 তারিখের চিঠিও দ্রষ্টব্য।

49. ডি. পি.।

50, তদেব।

51. অ্যাবসট্রাক্ট অব দ্য প্রসিডিংস অব দ্য কাউন্সিল অব দ্য গভর্নর-জেনারেল অব ইন্ডিয়া, 1886, পঞ্চবিংশতি খণ্ড, পৃঃ 27।

52. নর্থব্রুককে লেখা 16 অক্টোবর 1886-র চিঠি (ডি. পি.)।

53. পি. ব্যানার্জি, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ 276-97।

54. জন স্ট্রাচি ও রিচার্ড স্ট্রাচি-র "দ্য ফিনান্সেস এন্ড পাবলিক ওয়ার্কস অব ইন্ডিয়া ফ্রম 1869 টু 1881" উদ্ধৃত লন্ডন 1882, পৃঃ 222-23।

55. লেডি বি. ব্যালফুরের "দ্য হিস্ট্রী অব লর্ড লিটন'স ইন্ডিয়ান এ্যাডমিনিস্ট্রেশন, 1876-80"-তে উদ্ধৃত লিটনের বক্তব্য: লন্ডন, 1899, পৃঃ 892-898।

56. 1882-83 সালের অর্থসংক্রান্ত বিবৃতি, 192 অনুচ্ছেদ।

57. ডি. পি.। তুলনামূলক বিচারের জন্য, এপ্রিল 1888 সালে" পুনার সর্বজনিক সভার পত্রিকা"-য় প্রকাশিত জি. ভি. যোশীর অসাধারণ প্রবন্ধ "দ্য বার্মা ডেফিসিট এন্ড দ্য এনহান্সমেন্ট অব দ্য সল্ট ডিউটিজ"-এ জাতীয়তাবাদীদের বক্তব্যের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য। "রাইটিংস এন্ড স্পিচেস", পৃঃ 137-90।

58. ডি. পি.।

59. 'মারাঠা', 22 জানুয়ারি 1888; 'হিন্দু', 25 জানুয়ারি 1882, 'অমৃত বাজার পত্রিকা', 26 জানুয়ারি 1888; 'সঞ্জীবনী', 28 জানুয়ারি এবং 4 ফেব্রুয়ারি (রিপোর্ট, নেটিভ প্রেস বেঙ্গল, 4 এবং 11 ফেব্রুয়ারি 1888); 'ট্রিবিউন', 11 ফেব্রুয়ারি ('ভয়েস অব ইন্ডিয়া', মার্চ 1888); 'স্বদেশমিত্রম', 28 জানুয়ারি ও 25 ফেব্রুয়ারি (রিপোর্ট, নেটিভ প্রেস মাদ্রাজ, 31 জানুয়ারি ও 29 ফেব্রুয়ারি); 1888-র 28 জানুয়ারি শেষ হওয়া সপ্তাহের বোম্বাই-এর প্রায় সব পত্রিকা (রিপোর্ট, নেটিভ প্রেস বোম্বে, 28 জানুয়ারী 1888); এবং যোশী, উল্লিখিত, পৃঃ 161-66, 190।

60. রিপোর্ট, নেটিভ প্রেস বোম্বে, 28 জানুয়ারি 1888।

61. 27 ফেব্রুয়ারি 1888-র চিঠি (ডি. পি.)। 12 জানুয়ারি 1888তে সেক্রেটারি অব সেটট-কে লেখা ডাফরিনের বক্তব্য তুলনীয়: "আগে একজন ভাইসরয় তাঁর প্রাপ্য বেতন থেকে বেশ কিছুটা সঞ্চয় করতে পারতেন...আমি যে সময় কলকাতায় নিয়োজিত আছি তখন রুপোর দাম পড়ে যাওয়ায় এবং আয়কর দিতে হচ্ছে বলে আমার আয়ের থেকে ব্যয় প্রতি মাসে 250 থেকে

300 পাঃ বেশি হচ্ছে। এটা খুবই কষ্টকর এবং গুরুতর ব্যাপার। প্রকৃত পক্ষে, আমি আমার পূর্ববর্তী ভাইসরয় লর্ড রিপণের থেকে বছরে 2000 পাউন্ডের উপর কম পাচ্ছি।" (ডি. পি.)।

62. উপরের উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য।

63. ডি. পি.। প্রকাশ্যে তিনি আরো বেশি প্রশংসা করেছেন। আইন পরিষদে বলেছিলেন : "সাম্প্রতিক লবণ কর বৃদ্ধি তাঁর অনুমোদন পেয়েছে, একথা মাননীয় সহকর্মী রাজা প্যারীমোহন মুখার্জীর কাছ থেকে জানতে পেরে আমি যে আনন্দ অনুভব করেছি তা প্রকাশ না-করে পারছিনা। উনি ভারতের দেশীয় শিক্ষিত ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব করেন, কাজেই ওঁর মতামত অত্যন্ত মূল্যবান। গভর্নর-জেনারেলের আইন পরিষদের কার্যবিবরণীর সংক্ষিপ্ত-সার, 1886, খণ্ড-27, পৃঃ 26।

64. এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য "দ্য রাইজ এন্ড গ্রোথ অব ইকনমিক ন্যাশনালিজম ইন ইন্ডিয়া" দ্রষ্টব্য। জি. ভি. যোশী 'পুণার সর্বজনিক সভার' পত্রিকা'-য় লিখেছিলেন : বিতর্কটি আইন পরিষদ-এর পক্ষে কলঙ্কজনক হয়েছিল, কারণ জাতির পবিত্র স্বার্থ'-রক্ষায় নিয়োজিত এই পরিষদ নিজের স্বাধীনতার প্রতি সম্মান দেখাতে পারেননি এবং সরকারের শাসনবিভাগের বিরুদ্ধে কথা বলতে শঙ্কিত বোধ করেছেন। এটা আরো বেশি কলঙ্কজনক হয়েছিল দেশীয় সদস্যদের পক্ষে, যাঁদের নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত ছিল; আর সবচেয়ে বেশি কলঙ্কজনক হয়েছে সেই ব্যবস্থার পক্ষে যে ব্যবস্থা একটি দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রশাসন যন্ত্রকে একটি কঠিন বাস্তব সমস্যাকে এই ধরণের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার সুযোগ দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এই বিতর্ক জাতীয় কংগ্রেসের বোম্বাই, কলকাতা ও মাদ্রাজ অধিবেশনে গৃহীত আইন পরিষদ-এর নির্বাচনভিত্তিক পুনর্গঠনের দাবির সমর্থনে আমাদের মনে আরো একটি যুক্তি জাগিয়েছে।" উপরে উল্লিখিত, পৃঃ 144।

65. ডি. পি.।

66. তদেব।

67. জোর দেওয়া হয়েছে।

68. 17 আগস্ট 1888-র চিঠি (ডি. পি.)।

69. "একথা মনে রাখা দরকার যে, সাধারণ বুদ্ধি এবং পৃথিবী ও অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা ধারণার ফলে নেতারা তাঁদের পক্ষে কতটা পাওয়া সম্ভব বুঝে তাঁদের লক্ষ্য ও কর্মসূচীকে সীমাবদ্ধ করতে পারলেও, তাঁদের সমর্থকদের অধিকাংশেরই আদর্শ হ'ল এমন এক ব্যবস্থা যাতে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী বিদেশী শত্রুর আক্রমণ ও আভ্যন্তর ক্ষেত্রে স্বৈরাচার থেকে তাদের মুক্ত রাখবে এবং তারা সম্ভবত ভাইসরয় আর অন্য দুচারজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছাড়া বাকী শ্বেতকায়দের হস্তক্ষেপ মুক্ত হয়ে গণতান্ত্রিক কার্যক্রমের স্বাধীন পরিচালনার সুযোগ পাবে।" 1886 সালের 26 এপ্রিল সেক্রেটারি অব স্টেট-কে লেখা চিঠি। (ডি. পি.)।

70. ভারতীয় সংবাদপত্র সম্পর্কে তাঁর অভিযোগ একই রকম :"...বেশিরভাগই অত্যন্ত চতুর এবং বিবেকবর্জিত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত সম্পূর্ণ স্বাধীন ও অনিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র আমাদের বর্তমান শাসনব্যবস্থা বা তার কোনো পরিশীলিত রূপের সঙ্গে কতটা সঙ্গতিসূচক হওয়া সম্ভব!" বিষয়টির মূল জটিলতা এখানে।

71. ডি. পি.।

72. (জোর দেওয়া হয়েছে) তদেব।

73. (জোর দেওয়া হয়েছে) তদেব।

74. "মহামান্য মহারাণীর ভারতীয় প্রজাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিবিধ সমস্যার সমাধানে ভারতীয় সহযোগীদের অভিজ্ঞতা এবং পরামর্শের উপর আরো বেশী পরিমাণে নির্ভর করতে পারলে, ব্যক্তিগত ভাবে আমি তাকে সাহায্য ও বোঝা-লাঘব মনে করতে পারতাম। যেসব দেশীয় ব্যক্তিদের আমি জানি, ত র মধ্যে এমন বেশ কয়েকজন আছেন যাঁরা বিচক্ষণ ও দক্ষ এবং যাঁদের আনুগত্যসম্পন্ন সহযোগিতার উপর নিঃসন্দেহে নির্ভর করা যায়। এ'রা সরকারকে সাহায্য করলে যে সব আইনকে বর্তমানে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার সাহায্যে প্রবর্তিত বলে মনে হচ্ছে তার অনেকগুলিকেই জনপ্রিয় করে তোলা যায়। তার উপর ও'রা যদি কোন দেশীয় দলের সমর্থন পান তাহলে ভারত সরকার ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে একটি বিচ্ছিন্ন শিলার মত দাঁড়িয়ে থাকার অবস্থা থেকে অব্যাহতি পেতে পারে।" সেক্রেটারি অব স্টেটকে লেখা ডাফরিণের চিঠি, 26 শে এপ্রিল, 1886 (ডি. পি.) ।

75. "আমার আশঙ্কা এইসব ক্ষেত্রে সচরাচর যেমন হয়ে থাকে, নরমপন্থীরা তাঁদের আগের প্রভাবের বেশীর ভাগই হারিয়েছেন, এবং অল্পদিনের মধ্যেই এ'রা স্বদেশবাসীর অসংযত, উগ্র অংশের দ্বারা পরাজিত ও দমিত হবেন। যদি আমার এই আশঙ্কা সত্য হয়, তাহলে আরো বেশী দেশীয় ব্যক্তিকে আইন পরিষদের সদস্য করলে সুবিধের পরিবর্তে তা দায় হয়ে দাঁড়াবে।" "অশিক্ষিত ও প্রতিনিধিহীন" সাধারণ মানুষের পক্ষে উপকারী আইন রচনায় ভারতীয় সদস্যদের কাছ থেকে বাধা পাওয়ার সম্ভাব্য বিপদের উল্লেখ করার পর ডাফরিন মন্তব্য করেছেন: "তাছাড়া, ও'রা সত্যি সত্যি সরকারকে সাহায্য করতে চান কিনা, কিংবা ঐ নরমপন্থী সদস্যরা যাকে ভীষণ ভয় পান সেই সংবাদপত্রের সমালোচনার সম্মুখীন হওয়ার মত সাহস পাবেন কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।" (ডি. পি.), এছাড়া নর্থব্রুককে লেখা ডাফরিন-এর 16ই অক্টোবর, 1886 তারিখের চিঠিও দ্রষ্টব্য (ডি. পি.) ।

76. ডি. পি. ।

লেনিন ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন

ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও অস্টেলিয়ার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর লেনিনের চিন্তাধারার ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। তবে আফ্রো-এশীয় ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দুনিয়াতেই এই প্রভাবের ফল অক্টোবর বিপ্লবের সময় থেকেই সবচেয়ে বেশী বৈপ্লবিক পরিণতির পথে চালিতে হয়েছিল। ঔপনিবেশিক দুনিয়ার জনসাধারণ প্রধানত লেনিনবাদের মধ্য দিয়েই মার্ক্সবাদী চিন্তাধারা গ্রহণ ও আত্মীকরণ করেছিল। নিঃসন্দেহে, মার্ক্স ও এঙ্গেলসের রচনাবলীতে জাতীয় ও ঔপনিবেশিক সমস্যার সমাধানে মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কিছু মৌল উপাদান ছিল,[1] এবং অন্যান্য বিপ্লবী যথা, মাও সে-তুং, হো চি মিন, কিম ইল-সুং, ফিদেল কাস্ত্রো এবং চে গুয়েভারা তাকে আরো সমৃদ্ধ করেছেন। কিন্তু এই বিষয়ে মার্ক্স ও এঙ্গেলসের চিন্তা ছিল কিছুটা অবিন্যস্ত এবং তা গড়ে উঠেছিল বিশ্ব পুঁজিবাদের আদি যুগে। লেনিনের রচনার মাধ্যমেই বিপ্লবের তত্ত্বের রূপরেখা উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলির জনসাধারণের কাছে পৌঁছেছিল।

যদিও ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন উনিশ শতকের শেষের দশকগুলিতে শুরু হয়েছিল, বস্তুত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়েই এইসব দেশের অধিকাংশতে শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রসারের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। উপনিবেশগুলির জনসাধারণ তখন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সফল সংগ্রাম শুরু করার জন্য নতুন মতবাদ ও ধ্যান-ধারণা খুঁজছিল। লেনিন মার্ক্সবাদী চিন্তাধারাকে প্রয়োগ করলেন পুঁজিবাদের নূতন একচেটিয়া পর্যায়ের অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের এবং উপনিবেশগুলির জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের বিশেষ পরিস্থিতির বিশ্লেষণে। এর ফলে কোন কোন সামাজিক শক্তি সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করতে তাদের সাহায্য করতে পারে ঔপনিবেশিক দেশগুলির জনসাধারণ তা বুঝতে পারল। ব্যাপকতর বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিজেদের সংগ্রামকে যুক্ত করতে এই বিশ্লেষণ তাদের সাহায্য করল। লেনিন উপনিবেশের মানুষকে জোগালেন নিজেদের সংগ্রামের জন্য আত্মবিশ্বাস, এবং বাস্তব অবস্থাকে অনুধাবন করে পরিবর্তিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ কাঠামো। রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তিনি তাঁর তত্ত্বে দিলেন শত্রুকে চেনার ও বোঝার এবং সমাজ জীবনে রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্রীয় ভূমিকা উপলব্ধি

১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নয়া দিল্লির ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স আয়োজিত লেনিন শতবার্ষিকী স্মারক আলোচনা-চক্রে পঠিত এবং 'ইন্ডিয়া কোয়ার্টারলি'র ২৭ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি—মার্চ, ১৯৭১, তে প্রকাশিত।

করার ক্ষমতা। বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির ধারণায় তিনি তাদের সরবরাহ করলেন বিপ্লব সফল করার হাতিয়ার।

২

অন্যান্য মার্ক্সবাদীদের মত লেনিন জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের তত্ত্বের প্রতি এতটা মনোযোগ দিয়েছিলেন তার কারণ সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কে মার্ক্সবাদী তত্ত্বে সামাজিক জ্ঞানকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। মার্ক্সবাদ মনে করে, প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান যেমন আমাদের সাহায্য করে তাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তন করতে, তেমনই সমাজকেও বিশ্লেষণ করা, বোঝা এবং বদলান সম্ভব। তালগোল পাকিয়ে কতকগুলি আকস্মিক ঘটনা সামাজিক ক্রমবিকাশের রূপ নেয় নি, এবং তা নেয়ও না। প্রকৃতির জগতে নিয়মের মতই সমাজের পরিবর্তনের বা বিকাশের নিয়ম বা প্রবণতা আছে। এইসব নিয়মকে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে অনুধাবন করতে পারলে, সমাজ পরিবর্তনের ধারাকে সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।[৩] মার্ক্স এঙ্গেলস সারা জীবন সমাজ-পরিবর্তনের বিশেষ করে ধনতান্ত্রিক যুগে পরিবর্তনের সূত্র অনুসন্ধানে ব্যস্ত থেকেছেন। লেনিন ওঁদের আবিষ্কৃত সূত্রকে ভিত্তি করে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের যুগে অনগ্রসর পুঁজিবাদী দেশে বিপ্লবের প্রক্রিয়া এবং পরবর্তীকালে বিশ্ব বিপ্লবের প্রক্রিয়া জানবার জন্য সংগ্রামে করেছেন। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে তিনি ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে সমাজ বিকাশের নিয়ম সম্পর্কে একটি অন্তর্দৃষ্টি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন।

এই পর্যায়ে আমরা লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গির একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি মনোনিবেশ করতে পারি। এটি তাঁর ঔপনিবেশিক বিপ্লবের তত্ত্বে স্পষ্ট রূপ পেয়েছে এবং একই সঙ্গে সমসাময়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে এসে এই তত্ত্বে পৌঁছতে সাহায্য করেছে। এই বৈশিষ্ট্য হ'ল, মার্ক্সীয় পদ্ধতির এই মৌলিক বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ—প্রতিটি ঘটনা বা পরিস্থিতিকে বস্তুনিষ্ঠ ভাবে এবং বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। তিনি বারবার বলেছেন, মার্ক্সবাদীদের কাছে নির্দিষ্ট ফর্মুলা বা ঐতিহাসিকতা-বিচ্ছিন্ন কোনো 'সাধারণ সূত্র' নেই।[৪] ঐতিহাসিক বিশিষ্টতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, একটি দেশের বৈশিষ্ট্য এবং ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্পর্কে জ্ঞান। ১৯১৪ সালে তিনি লিখেছিলেন, "মার্ক্সীয় তত্ত্ব দাবি করে, প্রতিটি সামাজিক প্রশ্নকে সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক সীমার মধ্যে বিশ্লেষণ করতে হবে; এবং কোন একটি নির্দিষ্ট দেশের প্রসঙ্গে (যেমন, কোন বিশেষ দেশের জাতীয় কর্মসূচি) যেসব

বৈশিষ্ট্য সেই দেশকে একই ঐতিহাসিক যুগের অন্তর্গত অন্যান্য দেশ থেকে স্বতন্ত্র করেছে সেগুলির প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিতে হবে।"[4]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বস্তুবাদী ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় লেনিন এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করেছিলেন, ঠিক যেভাবে আগে বহু বছর ধরে আসন্ন রুশ বিপ্লবের চরিত্র ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন। জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নে, ১৯১৪ সালে রোজা লুক্সেমবুর্গের সঙ্গে বিতর্কে তিনি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছিলেন "জাতীয় আন্দোলনগুলির ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে"[5] সমাধান খুঁজে বের করার উপর, পূর্বনির্ধারিত ধারণার ভিত্তিতে নয়। আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর তিনি এই বিষয়টির ওপর আরো বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন। উপনিবেশের মানুষদের তিনি বারবার এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে তারা যেন অন্য দেশের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে। রাশিয়ার এবং অন্যান্য জাতির সাধারণ সংগ্রাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করে যেতে হবে, এবং এইভাবেই তাদের দেশে বিপ্লবের নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান করতে হবে।[6] ১৯২০ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের জাতীয় ও ঔপনিবেশিক সমস্যা সংক্রান্ত থিসিসের প্রাথমিক খসড়ায় লেনিন বলেছিলেন যে কমিউনিস্ট পার্টির "জাতীয় সমস্যা সংক্রান্ত কর্ম-সূচীকে ভিত্তি করতে হবে বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতির, মূলত অর্থনৈতিক অবস্থার, যথাযথ মূল্যায়ন, এবং কতকগুলি অসার ও অবাস্তব নীতি নয়।"[7] ঐ কংগ্রেসে উপস্থাপিত জাতীয় ও ঔপনিবেশিক সমস্যা সংক্রান্ত কমিশনে কার্যাবলীর প্রতিবেদনে লেনিন আরো স্পষ্ট করে বলেছেন: সাম্রাজ্যবাদের যুগে প্রোলেতারিয়েত ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পক্ষে বিশেষভাবে জরুরী কাজ হল, বাস্তব আর্থনীতিক তথ্য প্রতিষ্ঠা করা, এবং তার জন্য সমস্ত ঔপনিবেশিক ও জাতীয় প্রশ্নের সমাধানে বাস্তবের ওপর ভিত্তি করে এগোতে হবে, অবাস্তব স্বতঃসিদ্ধের ওপর ভিত্তি করে নয়।"[8] মানবেতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি অক্টোবর বিপ্লবের এবং সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বিপ্লবের সফল প্রতিরোধের নেতা লেনিন ককেশাস অঞ্চলের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির মানুষকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, এই সাফল্যের পেছনে যে কর্ম কৌশল ছিল তাঁরা যেন তার দ্বারা অভিভূত হয়ে না পড়েন, এই একটি ঘটনা লেনিনের দৃষ্টি-ভঙ্গির এই দিকটির প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। ১৯২১ সালের ১৪ এপ্রিল লেখা এক চিঠিতে লেনিন এইসব প্রজাতন্ত্রের কমিউনিস্টদের বলেছিলেন যে তাঁদের কর্তব্যের সফল সম্পাদনের জন্য "সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ" হল, "আর. এস. এফ. এস. আর-এর অবস্থা ও পরিস্থিতি থেকে স্বতন্ত্র করে তাঁদের প্রজাতন্ত্রগুলির নির্দিষ্ট পরিস্থিতির অনন্যতা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে; আমাদের কর্ম কৌশল শুধু অনুকরণ না করে ভিন্ন বাস্তব পরিস্থিতির উপযোগী করে তাকে সুচিন্তিতভাবে বদলে নেওয়ার প্রয়োজন উপলব্ধি করতে হবে।" প্রচণ্ড

অসুবিধা এবং অত্যন্ত প্রতিকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মধ্যে রাশিয়ার জনগণকে "বিশ্ব পুঁজিবাদে প্রথম ফাটল সৃষ্টি করতে" হয়েছিল। কিন্তু ককেশাসের কমিউনিস্টরা এখন সুযোগ পেয়েছে "আরো সতর্কতার সঙ্গে, আরো সুসম্বদ্ধভাবে নূতন জীবন গড়ে তোলার"। তা করতে গিয়ে তাদের রুশ কৌশল অনুকরণ পরিহার করতেই হবে, এবং তাঁদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণ, যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা এগুলির জন্ম দিয়েছে এবং তাদের ফলাফল "বিশ্লেষণ করতে হবে"। পরিশেষে তিনি তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন "১৯১৭-২১ সালের অভিজ্ঞতাকে আক্ষরিক অর্থে নয়, তার মর্মার্থকে, নির্যাসকে, শিক্ষাকে কাজে লাগাতে"।[৩]

লেনিনবাদের এই দিকটি বাস্তব ও ঐতিহাসিক ঘটনার ওপর এই গুরুত্ব আরোপ ঔপনিবেশিক বিপ্লব সম্পর্কে লেনিনের তত্ত্ব উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়। এটি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অবিরাম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজের মতামতের নিরন্তর বিবর্তন এবং বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্ব বিপ্লবে ঔপনিবেশিক বিপ্লবের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধির নিরন্তর পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করে। অধিকন্তু, এর দ্বারা বোঝা যায় কেন ঔপনিবেশিক সমস্যা সম্পর্কে তাঁর মতামত অস্পষ্ট ও অত্যন্ত সাধারণ, বস্তুত কাঠামর পর্যায়ে ছিল এবং কখনোই সম্পূর্ণ তত্ত্বের আকার নেয়নি। ঔপনিবেশিক বিপ্লবের তাত্ত্বিক হিসেবে লেনিনের কিছু সুবিধা ছিল। আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক দিয়ে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট ধারণা, বিশ্ব বিপ্লবের চিত্রকে পুরোভাগে রাখার ক্ষমতা, এক আধা-ইউরোপীয়, আধা-এশীয় দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক উভয় প্রকার বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার ও তাকে সফল করার অভিজ্ঞতা, এবং বিশাল জার সাম্রাজ্যের নিপীড়িত জাতিগুলির সমস্যা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা—এসবই তাঁকে সাহায্য করেছিল ঔপনিবেশিক জাতিসমূহের সমস্যাগুলিকে বুঝতে যা সমকালীন আর কোন ইউরোপীয়ের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে তিনি এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে, ঔপনিবেশিক বিপ্লবের ঘটনাস্থল থেকে তিনি অনেক দূরে থেকেছেন এবং তাদের সমস্যাগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করার সময়ও তাঁর ছিল না। সেইজন্য তিনি ঔপনিবেশিক জাতিসমূহের জন্য 'আইন রচনা' বা 'হুকুম জারি' করতে অথবা তাদের অনুসরণযোগ্য বিপ্লবের পরিকল্পনা রচনা করতে চাননি। একথা বলা যায় যে, লেনিন ঔপনিবেশিক জাতিগুলির সামনে বিপ্লবের দরজা খুলে দিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি একথাও শিখিয়েছিলেন যে তাঁর মতামতের বাস্তব প্রয়োগ বিপ্লবে প্রকৃত নিযুক্ত ব্যক্তিদের কাজ। প্রতিটি দেশের মানুষকে তাদের নিজেদের পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে থেকেই বিপ্লব করতে হবে। এই নির্দেশের বিচক্ষণতা সমর্থিত হয়েছে চীন, ভিয়েতনাম ও কিউবার বিপ্লবের অভিজ্ঞতায়। এইসব নির্দেশ মানা বা না-মানার ব্যাপারটা বিভিন্ন

দেশে লেনিনবাদ যে ভিন্ন ভিন্ন পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে তা অনেকদূর বোধগম্য করে।

বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণের প্রতি লেনিনের মনোযোগ এবং সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ ও সামান্যীকরণের আবশ্যকতা সম্পর্কে তাঁর সুদৃঢ় অভিমত গুরুত্ব পেয়েছিল কমিউনিস্ট ইনটারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসের সময়, যখন লেনিন প্রথম এশিয়ার বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। তাঁদের কাছে লেনিন ছিলেন বিনীত। মার্ক্সবাদ সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞানের অগভীরতা লক্ষ্য করেও তিনি তাঁদের এবং তাঁদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন, কারণ তাঁরা এসেছিলেন ঔপনিবেশিক দেশ থেকে এবং নিজেদের দেশ সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আধার।[10] এজন্যই তিনি তাঁর নিজের খসড়ায় কিছু কিছু পরিবর্তন করতে সহজেই রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ এম. এন. রায় ও তাঁর মতামতকে কংগ্রেসে জায়গা দেওয়ার জন্য লেনিন পেছনে সরে গিয়েছিলেন, যদিও এই ক্ষেত্রে তাঁর বিনয় একটি ভুলের ধারক হয়েছিল। তিনি প্রকাশ্যে ঐ মতামতের সমালোচনা করেননি এবং কয়েকটিকে রায় কর্তৃক উত্থাপিত এবং কংগ্রেসে গৃহীত অনুপূরক থিসিস হিসেবে রেখে দেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন।[11]

৩

ঔপনিবেশিক সমস্যা নিয়ে লেনিনের ভাবনা-চিন্তা ছিল বহুমুখী ও দীর্ঘ সময় ধরে বাস্তব ঘটনাবলী ও মতাদর্শগত বিতর্কের মধ্য দিয়ে তা গড়ে উঠেছিল। প্রথম থেকেই লেনিন প্রাচ্যের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সমস্যাবলীর প্রতি ঐকান্তিক মনোযোগ দিয়ে সমকালীন সমাজতন্ত্রীদের থেকে তাঁর পার্থক্য স্পষ্ট করেছিলেন। এই বিষয়ে তাঁর ভাবনা-চিন্তার বিবর্তনে অবশ্যই ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা সাহায্য করেছিল। ঔপনিবেশিক দেশগুলির সমস্যা সম্পর্কে লেনিনের মতামত সবচেয়ে ভালভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২০ সালে কমিউনিস্ট ইনটারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে উপস্থাপিত জাতীয় ও ঔপনিবেশিক সমস্যাবলী সংক্রান্ত থিসিসের প্রাথমিক খসড়ায়।[12]

জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে লেনিনের মতামতকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়। এর মধ্যে কয়েকটি অতি পরিচিত, কাজেই সন্দেহাতীত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলেও, সেগুলিকে নিয়ে এখানে বিস্তৃত আলোচনা না করলেও চলে। বস্তুত, লেনিনবাদের সাফল্যের একটা মাপকাঠি হল বর্তমানে, অন্তত কথায় হলেও তা ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে; লোকে ভুলে গেছে যে একসময় তার অনেক কিছুই বিতর্কের ধুলোতে আচ্ছন্ন ছিল। এরকম

বিতর্কিত কয়েকটি বিষয়ঃ উপনিবেশবাদ; তার শ্রেণীগত ভিত্তি এবং উপনিবেশগুলিতে তার প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকাকে বাস্তব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে উদ্ঘাটন করে লেনিনের বিশ্লেষণ;[13] উপনিবেশের মানুষদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি এবং তাদের স্বাধীনতা ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবির প্রতি স্বীকৃতি ও সমর্থন, উপনিবেশগুলির জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রতি তাঁর সক্রিয় সমর্থন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের নিপীড়িত জাতিগুলির সমস্যার গণতান্ত্রিক সমাধানে তাঁর ভূমিকা। এটা সুবিদিত যে, লেনিন মনে করতেন যে নিজেকে একজন সমাজতন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করার আগে জাতীয় ও ঔপনিবেশিক সমস্যার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির মত মৌলিক পরীক্ষায় তাকে উত্তীর্ণ হতে হবে। একটি উৎপীড়ক জাতির কোন সোস্যাল ডেমোক্রাট যদি এইরকম প্রচার (অর্থাৎ, নিপীড়িত জাতিগুলির স্বাধীনতার পক্ষে—বি. চ.) চালাতে ব্যর্থ হয় তবে তাকে নীতি বিবর্জিত সাম্রাজ্যবাদী হিসেবে দেখার অধিকার আমাদের আছে, এবং সেটি আমাদের কর্তব্যও।"[14]

রোজা লুক্সেমবুর্গের মত লেনিনের সমসাময়িক কয়েকজন সমাজতন্ত্রী, যাঁরা কথায় সমাজবাদী কিন্তু কাজে সাম্রাজ্যবাদী অর্থাৎ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী নন, উপনিবেশের অত্যাচারিত মানুষের প্রতি সহানুভূতিতে এবং তাদের মুক্তির দাবিতে নীতিগতভাবে তাঁরা লেনিনের সঙ্গে একমত হয়েছিলেন। কিন্তু যেসব জাতীয় মুক্তি আন্দোলন তখন চলছিল সেগুলিকে তাঁরা হয় উপেক্ষা করেছিলেন নতুবা সেগুলির প্রতি উদাসীন মনোভাব অবলম্বন করেছিলেন। এই উদাসীন মনোভাবের একটা বড় কারণ হল তাঁরা ঔপনিবেশিক জনসাধারণকে রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় এবং ঐতিহাসিকভাবে নিজেদের মুক্তি আন্দোলনে অথবা আসন্ন বিশ্ব বিপ্লবে সক্রিয় ভূমিকা নিতে অপারগ বলে মনে করতেন। তাছাড়া তাঁদের কাছে ঔপনিবেশিক মুক্তি আন্দোলনের ঐতিহাসিক দিক দিয়ে কোন গুরুত্ব ছিল না। কারণ, তাঁরা মনে করতেন প্রধানত প্রাগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলেই উপনিবেশগুলির মুক্তি সম্ভব।[15]

লেনিন এব্যাপারে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তিনি ঔপনিবেশিক জনগণের সংগ্রামের প্রতি উদাসীন মনোভাবের বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে এই মনোভাব "প্রতিক্রিয়াশীল"। তিনি মনে করতেন ঔপনিবেশিক জনগণ নিজেদের স্বাধীনতা অর্জন করতে (যদিও সেক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শ্রমজীবী মানুষের পক্ষ থেকে সমর্থন জানাতে হবে), নিজেদের দেশে বিপ্লব করতে এবং বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ও স্বাধীন ভূমিকা পালন করতে পুরোপুরি সক্ষম। প্রথম ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রীদের অন্যতম লেনিন এ বিষয়টিকে লক্ষ্য করেছিলেন যে ঔপনিবেশিক দেশের জনগণ ইতিমধ্যেই, বিশ শতকের সূচনা থেকেই বিপ্লবের পথে নেমেছে। বস্তুত, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে তিনিই সাম্রাজ্যবাদ ও বিশ্ব বিপ্লবের নব-যুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও স্বাতন্ত্র্য সূচক বৈশিষ্ট্য বলে মনে করতেন।

কিছু কিছু পন্ডিতের মতে ঔপনিবেশিক জনগণের আন্দোলনের বৈপ্লবিক সম্ভাবনার এই স্বীকৃতি ছিল প্রধানত 'কৌশলগত'। বলা হয়ে থাকে যে ১৯২০ সালের পরে প্রাচ্যে যখন বিপ্লবের আশা ব্যর্থ হল, তখন টিকে থাকার জন্যই সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রয়োজন হয়েছিল প্রাচ্যের আন্তর্জাতিক মিত্রদের। প্রাচ্যের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে লেনিনের মতামত সম্বলিত প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির কালানুক্রমিক তালিকা তৈরি করলেই দেখা যায় এই ধারণা কতটা ভুল। কার্যত তাইপিং বিপ্লব, ১৮৫৭-র বিদ্রোহ, আইরিশ বিপ্লবী আন্দোলন, এবং অন্যান্য নিপীড়িত জাতির অনুরূপ আন্দোলন সম্পর্কে রচনায় মার্ক্স ও এঙ্গেলস যে ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রথম থেকেই লেনিন তা অনুসরণ করেছেন।[16] ঔপনিবেশিক দেশের জনগণের সক্রিয় ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে বহু বছর ধরে তিনি যে অসংখ্য মন্তব্য করেছিলেন সেগুলি এখানে পুনরুদ্ধৃত বা পুনরালোচনা করার দরকার নেই। তাঁর মতামত স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য তাঁর কয়েকটি রচনা থেকে উদ্ধৃতিই যথেষ্ট।

১৯০৮ সালে 'বিশ্ব রাজনীতিতে দাহ্য পদার্থ" শীর্ষক প্রবন্ধে লেনিন এশিয়ার জাতিসমূহকে "গভীর ঘুম" থেকে জেগে ওঠার এবং "পুঁজি ও পুঁজিবাদী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে" উঠে দাঁড়ানর জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে এরা যে "নিপীড়নের" মধ্য দিয়ে আসছে তা থেকেই তারা শিখবে "কিভাবে গৃহযুদ্ধ পরিচালনা করতে হয় এবং কিভাবে বিপ্লব জয়যুক্ত করতে হয়।" "ইউরোপের শ্রেণী সচেতন শ্রমিক ইতিমধ্যেই এশিয়াতে সাথী পেয়ে গেছে, প্রতিদিন প্রতি ঘণ্টায় এদের সংখ্যা বেড়ে চলবে।"[17] ১৯১২ সালে "চীনে গণতন্ত্র ও নারদিজম" সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লেনিন চীনা জনগণের "বিপুল আত্মিক ও বৈপ্লবিক উদ্দীপনা" এবং "কোটি কোটি মানুষের বৈপ্লবিক আন্দোলনের গভীরতা" লক্ষ্য করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন চীনের জনগণ "শুধু বহুযুগব্যাপী দাসত্বের জন্য বিলাপ করতে এবং স্বাধীনতা ও সাম্যের স্বপ্ন দেখতেই সক্ষম নয়, দীর্ঘকালের অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেও সমর্থ"।[18] ১৯১৩ সালে "এশিয়ার জাগরণ" নামক প্রবন্ধে তিনি তুরস্ক, পারস্য, চীন ও ডাচ ইস্ট ইন্ডিজে (ইন্দোনেশিয়া) জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রসারের উল্লেখ করেছিলেন।[19] ১৯১৬ সালে রোজা লুক্সেমবুর্গের উল্লিখিত 'জুনিয়াস' পুস্তিকার জবাব দিতে গিয়ে লেনিন জোর দিয়ে বলেছিলেন: "সাম্রাজ্যবাদের যুগে উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলিতে জাতীয় যুদ্ধ শুধু সম্ভাব্য নয়, অবশ্যম্ভাবী।...এইসব দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ইতিমধ্যেই অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, অথবা শক্তিশালী ও পরিণত হয়ে উঠছে।"[20] প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও সোভিয়েত বিপ্লবের পর প্রাচ্যের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জঙ্গী সংগ্রামের নূতন স্তরে পৌঁছেছিল, এবং লেনিন দৃঢ়তার সঙ্গে তাকে স্বাগত জানিয়েছেন। প্রাক্তদার দশম

বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ৫ই মে, ১৯২২, তারিখের এক বার্তায় তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে ভারত, চীন ও এশিয়ার বাকি অঞ্চলের জনগণ "অপ্রতিহত ভাবে ক্রমবর্ধমান গতিতে…তাদের ১৯০৫ সালের দিকে এগিয়ে চলেছে"।[২১] লেনিনের স্বচ্ছ দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় ১৯২৩ সালের ২রা মার্চে লেখা তাঁর শেষ রচনায়। তিনি ভবিষ্যবাণী করেছিলেন ঃ

> বিশ্বের জনসংখ্যার অধিকাংশই রাশিয়া, ভারত, চীন ইত্যাদিতে বাস করে। এই ঘটনাই চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, সংগ্রামের পরিণতি নির্ধারিত করবে। আর এই সব দেশের মানুষ গত কয়েক বছরে অস্বাভাবিক দ্রুততায় মুক্তি সংগ্রামে যোগ দিয়েছে। ফলে বিশ্ব সংগ্রামের শেষ পরিণতি সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ আর নেই। এই অর্থে, সমাজতন্ত্রের পূর্ণ বিজয় সম্পূর্ণ ও চূড়ান্তভাবে সুনিশ্চিত।[২২]

স্বদেশের ইতিহাসে এবং বিশ্ব বিপ্লবে ঔপনিবেশিক দেশের জনগণ যে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারত এবং নিয়েছিল সে সম্পর্কে লেনিনের উপলব্ধি বিশ্ব বিপ্লব পরিচালনার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ তার কৌশল, শক্তি বিন্যাস প্রভৃতিতে, এবং ইউরোপের জনগণকে নিজেদের দেশে বিপ্লবের স্রোতে ভাটার সময় সমাজ বিপ্লবে অতি প্রয়োজনীয় আস্থা জোগানর ক্ষেত্রেই শুধু গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা নয়, ঔপনিবেশিক দুনিয়ায় তা এক সক্রিয়, প্রেরণাদায়ক ভূমিকাও পালন করেছে। ঔপনিবেশিক জনগণের মধ্যে লেনিনবাদের জনপ্রিয়তার এটি একটি কারণ হিসাবে বলা যায়।

৪

ঔপনিবেশিক বিপ্লবের সক্রিয় ঐতিহাসিক ভূমিকা মেনে নিলেই প্রশ্ন আসে সেই বিপ্লব কি ধরণের হবে, অথবা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য কি, অথবা, অন্যভাবে বলতে গেলে, ঐতিহাসিক দিক দিয়ে তাদের প্রগতিশীল চরিত্র কিসে নিহিত? প্রথমত, লেনিন ঔপনিবেশিক সমস্যা এবং ইউ-রোপের বিভিন্ন দেশে পরাধীন জাতিগুলির সমস্যাকে অভিন্ন করে দেখেছিলেন। 'উভয়েরই তত্ত্বগত ভিত্তি বিশেষ করে অভিন্ন ছিল' কারণ উভয়েই ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়ায় একই পর্যায়ভুক্ত ছিল। এই উভয় সংগ্রামই ছিল গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে, অর্থাৎ তাদের লক্ষ্য ছিল বুর্জোয়া অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা। দুটি আন্দোলনেরই আর্থনীতিক ভিত্তি নিহিত ছিল এই ঘটনায় যে ইউরোপের কোন অত্যাচারিত জাতির ক্ষেত্রে অথবা কোন উপনিবেশ বা আধা-উপনিবেশে পুঁজিবাদী শ্রেণীর উদ্ভব হলে সেই

শ্রেণীর স্বার্থেই একটি জাতীয় রাষ্ট্র গঠন প্রয়োজন হলে তা শক্তিশালী জাতীয় আন্দোলনের মাধ্যমেই কেবল রূপ নিতে পারে।[২৩]

লেনিনের মতে এশিয়াতে বুর্জোয়া জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলির ইতিবাচক ভূমিকা সম্ভব হয়েছিল কয়েকটি কারণে। একটি কারণ হল, ১৯১২ সালে লেনিন লিখেছিলেন, এশিয়ায় বুর্জোয়া শ্রেণী তখনও নবীন, উদীয়মান এবং প্রাণশক্তি সম্পন্ন। এই শ্রেণী নিজের স্বার্থে এবং সেই কারণে গণতান্ত্রিক দাবি আদায়ের জন্য জঙ্গী সংগ্রাম করতে সমর্থ ছিল।[২৪] দ্বিতীয়ত, এইসব বিপ্লবের ঐতিহাসিক লক্ষ্য ছিল আমূল ভূমি সংস্কারের সূচনা যার অর্থ "সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সর্বতোভাবে নির্মূল" করা।[২৫] তৃতীয়ত, তারা লক্ষ লক্ষ মানুষকে রাজনৈতিক সক্রিয়তায় ও সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে তুলছিল।[২৬] বিশেষ করে কৃষকদের মধ্যে তারা যে সাহস ও উদ্যম সঞ্চার করেছিল তা ছিল এই আন্দোলনের প্রধান সামাজিক অবলম্বন।[২৭] তাছাড়া, জনগণের প্রধান শত্রু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এরা লড়াই করেছিল।[২৮] ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিবাচক দিকগুলিকে তুলে ধরার অর্থ অবশ্য তার শ্রেণী চরিত্রকে উপেক্ষা করা নয়। ১৯১৩ সালে লেনিন লক্ষ্য করেছিলেন, "এশিয়ার বিপ্লবগুলির মধ্যে দেখা যাচ্ছে উদারনৈতিক আন্দোলনের মতই মেরুদণ্ডহীনতা ও নীচতা (যেমন ইউরোপে দেখা গেছে—বি. চ.)...এবং প্রলেতারিয়েত ও বিভিন্ন বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে এখানেও একই রকম পার্থক্য স্পষ্ট। তিনি আরো বলেছিলেন যে "ইউরোপ ও এশিয়া উভয় ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার পর যদি কেউ আজ শ্রেণীহীন রাজনীতি এবং শ্রেণীহীন সমাজতন্ত্রের কথা বলেন তবে তাকে অস্ট্রেলিয়ার ক্যাঙ্গারুর সঙ্গে খাঁচায় পুরে লোককে দেখান দরকার।"[২৯] একইভাবে প্রাথমিক তত্ত্বে লেনিন জোর দিয়ে বলেছিলেন যে জাতীয় সমস্যা সংক্রান্ত নীতিকে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, "নিপীড়িত শ্রমজীবী ও শোষিত শ্রেণীর স্বার্থ এবং সামগ্রিকভাবে জাতীয় স্বার্থ অর্থাৎ শাসক শ্রেণীর স্বার্থের সাধারণ ধারণার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নিরূপণের ওপর" স্থাপিত করতে হবে।[৩০] একটু পরে এ বিষয়ে আমাদের আরো আলোচনা করতে হবে।

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রগতিশীল ভূমিকা সম্পর্কে ধারণাটি লেনিনের বিপ্লবের পর্যায়ক্রমিক বিকাশের তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত। এর অর্থ, একটি অনগ্রসর পুঁজিবাদী বা ঔপনিবেশিক দেশে বিপ্লবের প্রক্রিয়া সুস্পষ্টভাবে দুটি পর্যায়ে ভাগ করতে হবে—বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বা উপনিবেশবাদ বিরোধী, সামন্তবাদ-বিরোধী বিপ্লবের পর্যায় এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়।

মার্কসবাদ অনুযায়ী, ইতিহাসের ধারায় মানবসমাজ একাধিক সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক যুগ বা স্তরের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যায়। এই প্রতিটি স্তর নির্দিষ্ট হয় উৎপাদন ব্যবস্থার প্রকৃতির দ্বারা। প্রতিটি স্তর অপর স্তর থেকে স্বতন্ত্র, যেমন ইউরোপে সামন্তবাদের যুগ, পুঁজিবাদের যুগ, এবং সমাজবাদের যুগ,

এর প্রত্যেকটিই আলাদা আলাদাভাবে বিভিন্ন দশক ও এমনকি শতকের দ্বারা চিহ্নিত। চিন্তায় এবং বাস্তবে অসুবিধে দেখা দেয় তখনই যখন মধ্য-উনিশ-শতকের জার্মানি এবং বিশ শতকের গোড়ায় রাশিয়ার মত একটি অনগ্রসর পুঁজিবাদী দেশে সামন্ততন্ত্র-বিরোধী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হয়েছে দেরিতে এবং ঐতিহাসিক ঘটনাসূচিতে এমন একটা সময়ে যখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিশ্ব রঙ্গমঞ্চের কেন্দ্রস্থল অধিকার করেছে। ঔপনিবেশিক দেশে বিপ্লবের ক্ষেত্রে এটা আরো অনেক বেশি প্রযোজ্য, কারণ এখানে শুধু এই দুটি বিষয়ই বিদ্যমান নয়, বিদ্যমান একটি নূতন বিষয়, তা হ'ল এখানে উভয় বিপ্লবের প্রধান শত্রু এক—আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ। একই ঐতিহাসিক পর্যায়ে দুটি ভিন্ন ঐতিহাসিক স্তরে সক্রিয় হওয়ায় অর্থাৎ সমাজ-বিপ্লবের সংগ্রাম বর্জন না করে জাতীয় সংগ্রাম সংগঠিত করার এই প্রয়োজন বহু জটিল তাত্ত্বিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে, বিশ শতকে মার্ক্সবাদীরা যেগুলির সম্মুখীন হতে বাধ্য হয়েছে। এইসব সমস্যার তাত্ত্বিক আলোচনায় লেনিনের মৌলিক অবদান রয়েছে। এর অন্যতম হ'ল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে উঠতে পারেনি এমন সব দেশে বিপ্লবের ক্রমবিকাশের দুটি পর্যায় সংক্রান্ত সফল তত্ত্ব।

লেনিন এই ধারণাটি প্রথম উপস্থিত করেছিলেন ১৯০৫ এর বিপ্লবের সময়ে লেখা তাঁর **গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সামাজিক গণতন্ত্রের দুটি কৌশল** নামক রচনায়। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতের ভূমিকা ব্যাখ্যা করা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিপ্লবের স্তর সম্পর্কে এই তত্ত্বের অর্থ হল, বিপ্লবের দুটি স্তর—গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ। বিপ্লবের এই দুই ভিন্ন স্তরের প্রত্যেকটির সীমানা সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বিষয় বস্তুর দ্বারা চিহ্নিত; এর প্রত্যেকটিতে সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক রূপান্তর প্রতিফলিত হয়। প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হল এই পর্যায়ে কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক কর্তব্য, ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে যার অর্থ "বৈদেশিক নিষ্পেষণের অবসান"[৩১] সম্পন্ন হয়। বিপ্লবের রাজনৈতিক নেতৃত্ব শ্রমিক-কৃষকের করায়ত্ত হলেও বিপ্লবের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পর্যায়ের এই বৈশিষ্ট্যটি থেকে যায়। এই পর্যায়কে এড়িয়ে যাওয়া যায় না, কারণ এটা হল ঐতিহাসিক বাস্তবতার অঙ্গ।[৩২] বাস্তব ঐতিহাসিক পরিস্থিতির জন্যই তা অপরিহার্য ও অবশ্যম্ভাবী, বিপ্লবীদের বিষয়ীগত ইচ্ছার অভাবের জন্য নয়। অন্যভাবে বলা যায়, অত্যন্ত বিপ্লবী নেতৃত্বকেও বিষয়ীগত দিক দিয়ে প্রথমে এই ঐতিহাসিক কর্তব্যটি সম্পাদন করতে হয়।[৩৩] ১৯১২ সালে সান-ইয়াৎ সেন-এর আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে লেনিন তাঁর "ডিমক্র্যাসি এণ্ড নারদিজম" প্রবন্ধে এশিয়ার একটি দেশ নিয়ে এধরনের পরিস্থিতির দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছিলেন। লেনিন দেখিয়েছিলেন যে

বিপুল সংখ্যক প্রগতিশীল চীনা মানসিকভাবে সমাজতন্ত্রী হয়ে উঠেছিল কারণ তারা তাদের মুক্তির ধারণা ধার করেছে ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে। সেখানে সমাজতন্ত্রী হওয়াটাই ছিল "সমসাময়িক দস্তুর"। একই সময়ে চীনের বাস্তব পরিস্থিতি ছিল "প্রায় ৫০ কোটি মানুষের অনগ্রসর, কৃষি-নির্ভর, আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশের দৈনন্দিন জীবনে অব্যাহত ছিল অত্যাচারের ও শোষণের একটি নির্দিষ্ট, ঐতিহাসিকভাবে স্বতন্ত্র রূপ, সেটি সামন্ততন্ত্র"। ফলে "চেতনার স্তরে সমাজতান্ত্রিক ধারণা থেকে জন্ম নিয়েছে···শুধু সামন্ততান্ত্রিক শোষণ অবসানের একটি কর্মসূচি"। অন্যভাবে বলা যায় যে নারদিজম (Narodism) ও বিষয়ীগত সমাজতন্ত্র সত্ত্বেও সান ইয়াৎ-সেন "এক বিশুদ্ধ ও সর্বোচ্চ পুঁজিবাদী, কৃষি সম্পর্ক কর্মসূচির"[৩৪] সমর্থক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই বাস্তব ও ঐতিহাসিক কর্তব্য হওয়ার ফলে চীনদেশে প্রলেতারিয়েতের উদ্ভব ঘটলে তাকেও রাজনৈতিক ও কৃষিসংক্রান্ত কর্মসূচির এই বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক অংশটিকে সতর্কতার সঙ্গে সুনির্দিষ্ট করে রক্ষা করতে এবং বিবর্ধিত করতে হবে।[৩৫] অন্য ভাবে বলা যায় যে লেনিনের মতে রাজনৈতিক কাজকর্মে বৈপ্লবিক মান নির্ণয়ের অর্থ বিমূর্ত ভাবে প্রাগ্রসর রাজনৈতিক কর্মসূচী বা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ে সমাজ-তান্ত্রিক কর্মসূচী গ্রহণ করা নয়। বরং বিপ্লবী হওয়ার অর্থ হ'ল বিপ্লবের ঐতিহাসিক স্তরের কর্মসূচীর, বর্তমান ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচীর, সার্থক বৈপ্লবিক রূপায়ণ, তার ফলে অগণিত নিষ্পেষিত মানুষের রাজনৈতিক কর্মশক্তি মুক্ত ও সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে।[৩৬]

লেনিনের কোন কোন সমালোচক মনে করতেন বৈপ্লবিক আন্দোলনের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী পর্যায়ের ওপর তিনি গুরুত্ব দেওয়ার ফলে সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম দুর্বল হবে, কারণ এর ফলে শ্রমিকদের বুর্জোয়া নেতৃত্বের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হবে। এঁরা জোর দিয়ে বলেছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদ একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা হওয়ায় বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে তা ধ্বংস করতে পারলে তবেই নিপীড়িত জাতিগুলোর মুক্তি ঘটতে পারে।[৩৭] লেনিনের জবাব ছিল যে সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের স্বার্থেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পর্যায়কে স্বতন্ত্র করে সম্পূর্ণ করতে হবে। কারণ "গণতন্ত্রের জন্য একটি সামগ্রিক, সুনির্দিষ্ট, বৈপ্লবিক সংগ্রাম"[৩৮] ছাড়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভব নয়। একমাত্র এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই জনগণকে সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে শামিল করা সম্ভব।[৩৯] আগেই বলা হয়েছে, জনগণের বিপুল কর্মশক্তিকে মুক্ত করার কাজে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামগুলি যে দারুণ বৈপ্লবিক ভূমিকা নিতে পারে লেনিন সে বিষয়ে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন। পক্ষান্তরে, তিনি বিশ্বাস করতেন, "সামন্ততন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র ও বিদেশী অত্যাচারের অবসান হওয়ার আগে সমাজতন্ত্রের প্রলেতারীয় সংগ্রাম গড়ে ওঠার প্রশ্ন ওঠে না।"[৪০]

বিপ্লবের এই পর্যায়ের তত্ত্বের একটি সমান গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল অব্যাহত

বিপ্লবের ধারণা। বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায়ের একটি অপরটিকে ঐতিহাসিক ক্রমানুযায়ী অনুসরণ করে, সুস্পষ্ট ও অনতিক্রম্য কাজের জন্য এদের পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে, এবং একটিকে অপরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায় না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে এদের মধ্যে বিস্তর সময়ের ব্যবধান থাকতেই হবে। ১৯২১ সালে লেনিন লিখেছিলেন: "বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে আমরা এমন ভাবে **সম্পূর্ণতা দান** করেছি যা আগে কেউ করেনি। এখন আমরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে সচেতনভাবে, দৃঢ়তার সঙ্গে এবং অবিচলিত ভাবে **এগিয়ে চলেছি** একথা মনে রেখে যে সমাজতান্ত্রিক ও বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে কোন দুরতিক্রম্য বাধা নেই।"[41] এর আগে ১৯১৬ সালে তিনি মন্তব্য করেছিলেন: "সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় এবং এটি নির্দিষ্ট একটি রণক্ষেত্রে একটি মাত্র লড়াই নয়, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তীব্র শ্রেণীদ্বন্দ্বের একটি সম্পূর্ণ যুগ, সমস্ত ক্ষেত্রে অর্থাৎ অর্থনীতি ও রাজনীতির সমস্ত প্রশ্নকে কেন্দ্র করে এক দীর্ঘ ধারাবাহিক লড়াই। এই লড়াই-এর অবসান হতে পারে একমাত্র বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের উচ্ছেদেই।"[42] কাজেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে রাজনৈতিক শক্তিগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের বিশেষ অবস্থায় জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটতে পারে।[43] এভাবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বা জাতীয় বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে এক প্রাথমিক পদক্ষেপ অথবা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অপরিহার্য প্রস্তাবনা হিসেবে দেখা যেতে পারে।[44] অন্যভাবে দেখলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা এবং তার পিছিয়ে আসার পথ বন্ধ করা। ১৯২১ সালে লেনিন বিষয়টিকে এইভাবে উপস্থিত করেছিলেন "প্রথমটি পরিণতি পায় দ্বিতীয়টিতে। দ্বিতীয়টি প্রথমটির সমস্যা সমাধান করে তার কার্যাবলী পুনর্বিন্যস্ত করে ও সম্পাদন করে।[45] এমনকি আরো আগে, ১৯০৫ সালে, লেনিন রুশ বিপ্লবীদের সামনে এই দ্বৈত পর্যায়ক্রমিক কিন্তু অব্যাহত বিপ্লবের কর্মসূচি রেখেছিলেন: "সমগ্র জাতি, এবং বিশেষত কৃষক সম্প্রদায়কে পুরোভাগে থাকতে হবে—পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য, নিয়ত গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য, প্রজাতন্ত্রের জন্য! সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ ও শোষিত মানুষকে নেতৃত্ব দিতে হবে—সমাজতন্ত্রের জন্য।"[46]

লেনিনের মতে বিপ্লবের দুটি পর্যায়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান তাত্ত্বিকভাবে নির্ধারিত হতে পারে না। তা নির্ভর করে বিপ্লবী শ্রেণী ও দলের বাস্তব কর্মসূচীর উপর[47] এবং বিপ্লবের প্রথম, গণতান্ত্রিক পর্যায়ে সমাজবাদী বিপ্লবীরা কিভাবে সক্রিয় তার উপর।[48] এক্ষেত্রে মূল প্রশ্ন হল: গণতান্ত্রিক দাবির সংগ্রামে জনগণকে কতটা ব্যাপকভাবে জাগিয়ে তোলা হয়েছে? কৃষক সম্প্রদায়কে কতটা পরিমাণে নাড়া দেওয়া গেছে? বিপ্লবী আন্দোলনে প্রলেতারীয় নেতৃত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে না হয়নি?[49]

পর্যায়ক্রমিক অব্যাহত বিপ্লব সম্পর্কে লেনিনের উপলব্ধি মেনশেভিকদের সঙ্গে তাঁর মত পার্থক্য সুস্পষ্ট করেছিল। মেনশেভিকদের বক্তব্য ছিল বুর্জোয়া নেতৃত্বেই গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে হবে, এবং ধনতন্ত্রকে উৎখাত করার কাজ শুরু করতে গেলে তা প্রতিষ্ঠিত ও পরিণত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। লেনিন অনগ্রসর দেশগুলির বিপ্লবীদের সামনে যে কর্মসূচী উপস্থিত করেছিলেন তার একটি বিষয় ছিল বিপ্লবের দুই পর্যায়ের মধ্যে উত্তরণ কালকে সংক্ষিপ্ত করে, প্রথম পর্যায়কে দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নীত হতে সাহায্য করা। ১৯১৭ সালে এই কর্মসূচী সাফল্যের সঙ্গে অনুসৃত হয়েছিল। উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রসঙ্গে তিনি ১৯২২ সালে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের এই আন্দোলন, যার প্রাথমিক মূল লক্ষ্য জাতীয় মুক্তি "আসন্ন বিশ্ব বিপ্লবের চূড়ান্ত সংগ্রাম বিশ্বের পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই-এ পরিণত হবে এবং সম্ভবত আমরা যতটা আশা করছি তার চেয়ে অনেক বেশি বৈপ্লবিক ভূমিকা নেবে।"[50] লেনিনের এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ব ইউরোপ, চীন, উত্তর কোরিয়া, ভিয়েতনাম ও কিউবাতে সার্থক হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিপ্লব অব্যাহত থেকেছে এবং প্রথম পর্যায় থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। সর্বত্রই এই সাফল্য সম্ভব হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ণ এবং বিপ্লবের প্রথম স্তরে সংগঠিত জনসাধারণের সর্বাত্মক বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ ও জন-সংগঠনের ফলে। এইভাবে বিপ্লবের পর্যায়ক্রমিক বিবর্তন সম্পর্কে লেনিনের তত্ত্ব সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে অনগ্রসর শিকার দেশগুলিতে আমাদের যুগের সবচেয়ে ব্যাপক বিপ্লব ঘটাতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এই সব দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রাগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলির অনেক আগে। উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলিতে বিপ্লবের দুটি পর্যায়ের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত থাকায় ফলে এইসব দেশের বিপ্লবীরা মূল দ্বন্দ্বটি ধরতে পেরেছিলেন। সেটি ছিল ঔপনিবেশিক দেশের জনসাধারণের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্ব। ফলে তাঁরা তাদের প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ সংহত করতে পেরেছেন এবং এর মধ্য দিয়ে কৃষক ও শ্রমিকের ব্যাপক ঐক্য গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। আমাদের যুগে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নিরবচ্ছিন্নতা প্রলেতারিয়েত ও কৃষক সম্প্রদায়কে গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে, বিপ্লবের প্রথম পর্যায় সম্পূর্ণ হওয়ার পরে বুর্জোয়া গোষ্ঠীকে ক্ষমতা দখল করতে দেওয়ার মেনশেভিক ভ্রান্তি এড়াতে, এবং বিপ্লবের গণতান্ত্রিক পর্যায়ের কাজ 'নির্ভীক ও ব্যাপকভাবে' দ্রুত সম্পন্ন করে সমাজতন্ত্রের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

৫

লেনিনকে যে সব মৌলিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তার একটি ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতি কমিউনিস্টদের (এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের) মনোভাব সম্পর্কে। এর সঙ্গে জড়িত ছিল এই ধরণের আন্দোলনে বুর্জোয়া শ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের ভূমিকা নিরূপণের প্রাথমিক প্রশ্ন।

প্রথম থেকেই লেনিন "পুঁজিবাদের বিকাশের দুই স্তরের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তার" প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। প্রথম স্তরটি হল উত্থান-পর্ব, যখন সামন্ততন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তাকে "সমস্ত শ্রেণীর জনসাধারণকে রাজনীতিতে" টেনে এনে, বিশেষ করে জনসাধারণের বৃহত্তম অংশ কৃষক সম্প্রদায়কে নিয়ে গণভিত্তিক জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার পথে নিয়ে যায়। দ্বিতীয়টি হল তার পতন-পর্ব—"পুঁজিবাদের ধ্বংসের প্রাক্‌মুহূর্তে"—যখন সে প্রলেতারিয়েতের মুখোমুখি হয়। এই পর্বের মুখ্য বৈশিষ্ট্য "বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক গণ আন্দোলনের অনুপস্থিতি"।[51]

স্পষ্টতই উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলি সাধারণভাবে ছিল পুঁজিবাদের প্রথম, ঐতিহাসিকভাবে প্রগতিশীল পর্যায়ে। ফলে এসব দেশে পুঁজিবাদের মধ্যে এক দিকে, ছিল বর্ধিষ্ণু শ্রেণীসুলভ সক্রিয়তা, অন্য দিকে, সাম্রাজ্যবাদের নিপীড়ন। উপরন্তু, যে ব্যবস্থায় পুঁজিবাদ সর্বাধিক সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে, সেই জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াসকে কেন্দ্র করে এসব দেশের পুঁজিবাদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের সংঘর্ষ দেখা দিয়েছিল অনিবার্যভাবে।[52] বহু দেশে বুর্জোয়া শ্রেণীকে লড়াই করতে হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের বন্ধু আঞ্চলিক সামন্ততান্ত্রিক ও মধ্যযুগীয় শক্তিগুলির বাধার বিরুদ্ধে।[53] এই লড়াই ঔপনিবেশিক বুর্জোয়া শ্রেণীকে জনগণের কাছাকাছি আসতে সাহায্য করেছিল।

একই সঙ্গে লেনিন কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক বুর্জোয়া গোষ্ঠীর দ্বিধাগ্রস্ততা এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপস করার প্রবণতা লক্ষ্য করেছিলেন। এদের কোন কোন অংশ এমনকি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গেও যোগ দিয়েছে এবং শ্রমিকদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে জাতীয়তাবাদী স্লোগান ব্যবহার করেছে।[54] লেনিন তাই এদের একপেশে ভাবে বা 'সাধারণ ভাবে' প্রগতিশীল অথবা প্রতিক্রিয়াশীল ধরে না নিয়ে এদের দোদুল্যমান ভূমিকার (ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় সম্ভাবনা সহ) ওপর জোর দিয়েছিলেন।[55] এদের শুধু প্রগতিশীল বললে তা হ'ত বুর্জোয়া শ্রেণীর ভূমিকাকে মহিমান্বিত করে দেখা, যার ফলে শ্রমিক শ্রেণীকে তাদের অনুসরণ করতে প্রণোদিত করা হ'ত। আর শুধু প্রতিক্রিয়াশীল বললে উপনিবেশগুলিতে বুর্জোয়া শ্রেণীর ভূমিকা পুরোপুরি অস্বীকার করা হয়। এর ফলে জাতীয় আন্দোলনে হঠকারিতার

প্রবণতা দেখা দিতে পারে, এবং পরিণামে, কৃষক সম্প্রদায় ও শহুরে পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী থেকে কমিউনিস্ট আন্দোলন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হল কৃষক সম্প্রদায়ের ভূমিকাকে উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলিতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে উপলব্ধি। লেনিন কৃষক সম্প্রদায়কে এই বিপ্লবের প্রধান শক্তি হিসেবেই শুধু নয়, এই শ্রেণীকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান সামাজিক ভিত্তি অথবা এমনকি বিপ্লবী বুর্জোয়ার এক ধরনের প্রতিনিধি হিসাবে দেখেছিলেন।[৫৬] উপনিবেশগুলিতে কমিউনিস্ট কর্মসূচীর ক্ষেত্রে কৃষকদের মধ্যে কাজকর্মের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।[৫৭] উপরন্তু, "আন্তর্জাতিক বিপ্লবের আসন্ন পর্যায়গুলিতে কৃষক সম্প্রদায়ের জন্য[৫৮] বড় বৈপ্লবিক ভূমিকা" নির্ধারিত ছিল। প্রাথমিক তত্ত্বে লেনিন "কৃষক আন্দোলনকে বিশেষ সাহায্য দেওয়ার" প্রয়োজনের ওপর জোর দিয়েছিলেন এবং কমিউনিস্টদের পরামর্শ দিয়েছিলেন "কৃষক আন্দোলনকে বৈপ্লবিক চরিত্র দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে"।[৫৯] এমনকি লেনিন ভেবেছিলেন যে উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলিতে কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের সোভিয়েত গঠনের উপযুক্ত সময় এসে গিয়েছিল।[৬০] এইসব দেশে কমিউনিস্ট পার্টি যাতে (সদস্য গ্রহণ, বিশেষ কর্মসূচী ইত্যাদির ক্ষেত্রে) কৃষক-শ্রেণীর উপরও যথোচিত গুরুত্ব দেয় তার জন্য লেনিন সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন এই দেশগুলিতেঃ "এটা একটা জটিল সমস্যা। এর জন্য প্রয়োজন ভাবনা-চিন্তা এবং বাস্তবসম্মত উত্তর খোঁজা।"[৬১]

উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলিতে বিপ্লবের তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে লেনিনের এটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কৃষক শ্রেণীর বৈপ্লবিক ভূমিকা পালনের সম্ভাবনা অবশ্য মার্ক্স ও এঙ্গেলসও লক্ষ্য করেছিলেন।[৬২] অনুরূপভাবে অন্যরাও বিশেষত মাও সে-তুং, জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে কৃষক বিদ্রোহের যোগসূত্র রচনা করে, ঔপনিবেশিক পরিবেশে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে কৃষক সংগ্রাম হিসেবে অথবা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে মূলত কৃষি বিপ্লব হিসেবে দেখে এই বিষয়ে লেনিনের থেকে আরো এগিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র রচনার কাজটি প্রথম করেছিলেন লেনিন এবং মৌলিক পদক্ষেপ তাঁরই নেওয়া। লেনিন গড়ে দিয়েছিলেন ভিত্তি।[৬৩] এর বেশি তাঁর পক্ষে করা সম্ভব ছিলনা, কেননা তিনি ভবিষ্যদ্বক্তা বা অন্য দেশের বিপ্লবের ব্লু-প্রিন্ট রচয়িতা ছিলেন না। তিনি এক বিপ্লবী চিন্তানায়ক এবং নেতা, যিনি মার্ক্সবাদ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান এবং রুশ ও বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ঔপনিবেশিক দুনিয়ার প্রকাশমান সত্যকে উপলব্ধি ও বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাঁর সমাজ বিষয়ক-চিন্তাকে আরো গভীরতা দান তাঁদের পক্ষেই সম্ভব ছিল যাঁরা প্রকৃতই ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে বিপ্লবের কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

দীর্ঘকাল ধরে লেনিন বিশ্বাস করে এসেছেন যে উপনিবেশ ও আধা-উপ-নিবেশগুলিতে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রগতিশীল ভূমিকা থাকায় এবং যেহেতু এইসব দেশের বিপ্লব তখনও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পর্যায়ের কমিউনিস্টদের তাই উচিত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন করা ও তাতে অংশগ্রহণ করা, এবং সাময়িক ভাবে হলেও এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী সমস্ত বুর্জোয়া শক্তির সঙ্গে হাত মেলান।[64] অর্থাৎ, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে দেখতে হবে যারা সাম্রাজ্যবাদ-বিরুধে লড়াই-এ আগ্রহী তাদের সবার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুক্ত মোর্চা হিসেবে।

এই সমস্যার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়েছিল ১৯২০ সালে কমিউনিস্ট ইনটারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে, যখন **প্রাথমিক তত্ত্বে** উপস্থাপিত লেনিনের মত সেখানে গৃহীত হয়েছিল। শ্রমিক ও কৃষককে বুর্জোয়া-নেতৃত্বাধীন আন্দোলন থেকে স্বতন্ত্র মুক্তি আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, এম. এন. রায় ও সেরাতির এই বিকল্প মতটি ঐ কংগ্রেস কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছিল।

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সমর্থনের ব্যাপারে লেনিনের সাধারণ সূত্রটি ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছিল, এমনকি এম. এন. রায়ও শেষ পর্যন্ত অন্তত আনুষ্ঠানিক ভাবে তা মেনে নিয়েছিলেন। তথাপি অনতিবিলম্বে একটা বড় রকমের বিতর্ক শুরু হয়েছিল যা পরবর্তী অনেক বছর ধরে উপনিবেশ-গুলিতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের কাছে একটি প্রধান সমস্যা হয়ে থেকেছে। বিতর্কের বিষয় ছিল, তৎকালীন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীগত উপাদান, তার কর্মসূচি, এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের ব্যাপারে তার র‍্যাডি-ক্যাল মনোভাবের নানা মাত্রার ফলে ঐক্য গঠনের বাস্তব-কৌশলের সমস্যা। অন্যভাবে বললে প্রশ্নটা ছিল: কোন্ ধরণের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের প্রতি সক্রিয় সমর্থন জানান যাবে এবং **মৈত্রীর হাত বাড়ান যাবে**।

এই বিতর্কের মূলে ছিল লেনিনের "জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্ন সংক্রান্ত তত্ত্বের প্রাথমিক খসড়ার" ভাষাগত একটি পরিবর্তন। এই বিষয় সংক্রান্ত কমিশনের আলোচনার মাধ্যমে তত্ত্বটি চূড়ান্ত রূপ লাভ করলে দেখা গেল লেনিন যেখানেই প্রথমে "বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক" আন্দোলনের প্রতি সমর্থনের কথা বলেছিলেন সেখানেই শেষ পর্যন্ত শব্দগুলি বদলে করা হয়েছিল "জাতীয় বিপ্লবী" আন্দোলনের পক্ষ সমর্থন।[66]

কেন এই পরিবর্তন করা হয়েছিল? এক্ষেত্রে 'বিপ্লবী' শব্দটির তাৎপর্য কী?

কমিশনের রিপোর্ট পেশ করতে গিয়ে লেনিন ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন যে এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক চরিত্র অথবা তাকে সমর্থন করা বা সহযোগিতা করার নীতি সম্পর্কে তাঁর পুরো ধারণাটিকে বাতিল করে দেওয়া নয়।[67] লেনিন কমিশনের সামনে তাঁর ভাষণে রায়ের মতের বিরোধিতা করে বলেছিলেন: "রাশিয়াতে উদারপন্থীদের মুক্তি

আন্দোলন যখন জারতন্ত্রের বিরোধিতা করেছে, তখন আমরা তা সমর্থন করেছি ভারতীয় কমিউনিস্টদেরও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে মিশে না গিয়ে অবশ্যই তা সমর্থন করতে হবে।"[৬৪]

কোন্ ধরনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে কমিউনিস্টরা হাত মেলাবে তা নির্দিষ্ট করে দেওয়ার জন্য পরিবর্তনটি করা হয়েছিল। লেনিন এইসব আন্দোলনের সংস্কারবাদী ও সাম্রাজ্যবাদ-পন্থী অংশ ও বিপ্লবী অংশের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করতে চেয়েছিলেন।[৬৯] ঔপনিবেশিক জাতিগুলি সমেত নিপীড়িত জাতিগুলির বুর্জোয়া গোষ্ঠীর দোদুল্যমান চরিত্র সম্পর্কে নিজের ধারণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি চেয়েছিলেন এই দোদুল্যমানতা এবং এমনকি সম্ভাব্য বিশ্বাসঘাতকতারও অশুভ পরিণাম থেকে প্রলেতারিয়েতকে রক্ষা করতে। সেই কারণে তিনি কমিউনিস্টদের পরামর্শ দিয়েছিলেন শুধু সেইসব আন্দোলনকে সমর্থন করতে যেগুলি "যথার্থই বৈপ্লবিক"। অন্যদিকে তিনি কমিউনিস্টদের "সংস্কারপন্থী বুর্জোয়াগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে বলেন"।[৭০]

প্রাথমিক তত্ত্বের উক্ত পরিবর্তন লেনিন কেন করেছিলেন তার আরেকটি যে গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা অনুমান করতে পারি, তা হল ঔপনিবেশিক বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রগতিশীল ভূমিকা সম্পর্কে যান্ত্রিক ব্যাখ্যার বিরোধিতা করা। ঔপনিবেশিক বুর্জোয়া শ্রেণী বিষয়গত ভাবে ও সহজাত কারণে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী-হলেও, তার মানে এই নয় যে সেই শ্রেণী বা তার সমস্ত অংশ সব সময়ে এবং একইভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত। কমিউনিস্টরা শুধু তাদের সঙ্গেই মিত্রতা স্থাপন করবে যারা প্রকৃতই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এবং সেই কারণেই বিপ্লবী। বিশেষ করে বিপ্লবের পরিস্থিতিতে কোন সমস্যাকে বিচার করার সময় অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বতন্ত্র করে তার রাজনৈতিক বিষয়ের উপর লেনিন যে গুরুত্ব আরোপ করতেন বুর্জোয়ার সাধারণ অবস্থান ও বাস্তব কার্যকর অবস্থানের মধ্যে এই পার্থক্য নির্ণয় হল তারই অঙ্গ।

"যথার্থই বৈপ্লবিক" বলতে লেনিন কি বোঝাতে চেয়েছিলেন আমাদের আরো সুনির্দিষ্ট ভাবে সেটা বুঝতে হবে। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে, এই প্রবন্ধের প্রথম পরিচ্ছেদে যে কথা বলা হয়েছে, লেনিন কখনোই নীতিগত অবস্থান থেকে পৃথক কোন রাজনৈতিক অবস্থানকে সাধারণ ভাবে বা তত্ত্বগতভাবে সংজ্ঞায়িত করেননি, সব সময়েই তিনি সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বস্তুগত বিশ্লেষণের দ্বারা। প্রথমেই আলাদাভাবে একথা বলে নেওয়া দরকার যে এমনকি ১৯২০ সালের আগেই তিনি বৈপ্লবিক ও সংস্কারবাদী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য করেছিলেন।[৭১] চীনের উদারপন্থী বুর্জোয়া

শ্রেণী যে বিশ্বাসঘাতকতা ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করতে চলেছিল বলে ১৯১৩ সালে লেনিন তাঁর তীব্র নিন্দা করেছিলেন, এর মধ্যেও এই পার্থক্যের ইঙ্গিত ছিল।[73]

"যথার্থই বৈপ্লবিক" কথাটি ব্যবহারের অর্থ সম্ভবত এই নয় যে ঔপনিবেশিক সংগ্রাম সরাসরি সমাজতন্ত্রের দিকে নিয়ে যাবে অথবা তা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক চরিত্র হারাবে।[74] অথবা এও নয় যে, সাম্রাজ্যবাদ উৎখাত হওয়ার পরে জনগণের প্রতি বা সামাজিক প্রশ্নে বুর্জোয়া শ্রেণী কী মনোভাব অবলম্বন করতে পারে তার দ্বারা নির্ধারিত হবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী পর্যায়ে তার বৈপ্লবিক বা প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র। লেনিন একথাও বলতে চাননি যে সমর্থনযোগ্য বিপ্লবী জাতীয়তাবাদীর অর্থ বুর্জোয়া শ্রেণী নয়, কৃষক শ্রেণী ; কেননা বৈপ্লবিক, সংস্কারবাদী ও সাম্রাজ্যবাদপন্থী এই শব্দগুলি অর্থবহ হতে পারে একমাত্র পূর্বোক্তটির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলেই। ঔপনিবেশিক পরিবেশে কৃষক শ্রেণী বৈপ্লবিক শ্রেণী (এমন এক শ্রেণী যার ওপর ভিত্তি করে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠতে পারে), কাজেই তাকে সমর্থন করার প্রশ্ন ওঠে না ; কৃষকেরা জাতীয় বিপ্লবের একটি মূল শক্তি, তার সঙ্গে প্রলেতারিয়েতকে যোগ দিতেই হবে।

এম. এন. রায় ও সেরাতির (ইটালি) বক্তব্যের সঙ্গে তুলনা করে দেখলে লেনিনের চিন্তার এই দিকটি সবচেয়ে স্পষ্ট করে বোঝা যায়। এই দুজনের সঙ্গে লেনিনের পার্থক্য শুধু ভাষাগত বা ব্যাখ্যার প্রশ্নে নয়। এঁরা দুজনেই বিপ্লবের পর্যায়ক্রমিক ক্রমবিকাশের তত্ত্বটিকে সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। জাতীয় ও ঔপনিবেশিক সমস্যা সংক্রান্ত কমিশনে নিজের বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি উপস্থিত করতে গিয়ে রায় জোর দিয়ে বলেছিলেন যে ভারতীয় জনগণ "কোন জাতীয়তা বোধের দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়নি। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধানে তারা আগ্রহী"। ফলে তাদের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী শ্লোগানে কোনোরকম উৎসাহ নেই ; 'কৃষককে জমি দাও'—একমাত্র এই দাবীই তাদের আকৃষ্ট করতে পারে"। অধিকন্তু, "বিপুলসংখ্যক জনসাধারণের দিক থেকে ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের কোনো সম্পর্ক নেই"। তিনি অনুরোধ করেছিলেন তত্ত্বের ১১নং অনুচ্ছেদ বাদ দেওয়ার জন্য, এতে কমিউনিস্টদের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন করতে বলা হয়েছিল। রায়-এর বক্তব্য ছিলঃ "ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট ইনটারন্যাশনালের কর্তব্য হবে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তুলতে সাহায্য করা। বিপুল সংখ্যক জনসাধারণকে তাদের নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থের জন্য লড়াই করার উদ্দেশ্যে সংগঠিত করার কাজে পুরোপুরি নেমে পড়াই হবে কমিউনিস্ট পার্টির কাজ।[74]

লক্ষণীয় যে ভারতে কারা "বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী" সে সম্পর্কে রায়ের ধারণা স্পষ্ট ছিল। এঁরা অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ।[75] সংস্কারপন্থী জাতীয়তাবাদী অথবা সাম্রাজ্যবাদপন্থী উদারপন্থী নেতাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী

জাতীয়তাবাদীদের সমর্থন করার পক্ষে রায় কোনো যুক্তি উপস্থিত করেননি। এবং "বিপ্লবী-জাতীয়তাবাদীদের" সমর্থন করার বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল স্পষ্ট। যদিও পরে লেনিন ও কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেস তাঁর এই বক্তব্য অগ্রাহ্য করার পর তিনি অনুপূরক তত্ত্বে সমর্থনের বিষয়টি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।[76]

কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে সেরাতির বক্তব্য ছিল রায়ের অনুরূপ, তবে উভয়ের সিদ্ধান্তে সূত্র ছিল ভিন্ন। সেরাতির ধারণা ছিল "সাধারণ ভাবে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক শ্রেণীর জাতীয় মুক্তি সংক্রান্ত কোন কাজই, এমনকি বিদ্রোহের পদ্ধতি অনুসৃত হলেও তা বৈপ্লবিক নয়"। তিনি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের প্রতি যে-কোন রকম সমর্থনের বা তাদের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপনের বিরোধিতা করেছিলেন, এমন কি যাদের ''বিপ্লবী বলা হয়ে থাকে"[77] ত দের সঙ্গে মৈত্রীরও। তাঁর বক্তব্যও কংগ্রেস বাতিল করে দিয়েছিল।

৬

চূড়ান্ত তত্ত্বে ''বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদী'' কথাটি ব্যবহার করে লেনিন কী-বোঝাতে চেয়েছিলেন, এবার আমরা সেই প্রশ্ন খোঁজার চেষ্টা করতে পারি।

লেনিনের অভিমত সামগ্রিকভাবে বিচার করে এবং তিনি যে কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতির ব্যাপারে 'রায়' না দিয়ে বরং বিপুল সংখ্যক ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশের ইতিহাসের একটি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক পর্যায় নিয়ে আলোচনা করেছেন এই কথাটা মনে রেখে বলা যেতে পারে যে ব্যাপকতম অর্থে বৈপ্লবিক শব্দটির অর্থ বিপ্লবের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক স্তরের, ঐতিহাসিক কর্মসূচীর আদ্যন্ত ও দায়িত্বশীল রূপায়ণের জন্য সংগ্রাম। আরো নির্দিষ্ট ভাবে, ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে 'বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী' এই শব্দগুলির দুটি প্রশস্ত কিন্তু স্পষ্ট অর্থ আছে।

প্রথম কষ্টিপাথরটি হল সাম্রাজ্যবাদের প্রতি মনোভাব। বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদী তারাই যারা সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করেছিল এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। তাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদই ছিল প্রধান শত্রু এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বিরোধই ছিল মুখ্য বিরোধ। সুতরাং কোন নেতৃত্বের বৈপ্লবিক গুণের মাত্রা নির্ণয় করতে হয় এই বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে।

কমিনটার্ন কংগ্রেসের প্লেনাম অধিবেশনে জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্ন সংক্রান্ত কমিশনের পক্ষ থেকে পেশ করা রিপোর্টে লেনিন বলেছিলেন, বুর্জোয়া শ্রেণীর যে অংশ সাম্রাজ্যবাদপন্থী, যারা জাতীয় আন্দোলনে সম্ভবত সাম্রাজ্যবাদের চর, এবং যারা হয়ত ''সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হয়ে সমস্ত বৈপ্লবিক আন্দোলন ও বিপ্লবী শ্রেণীর বিরোধিতায়

রত" তাদের সমর্থন করা যাবে না। আবারও জোর দিয়ে বলা দরকার এই পার্থক্য কোন তত্ত্ব বা সূত্রজাত ছিল না, কমিশনের কাছে পেশ করা 'অকাট্য' প্রমাণের ভিত্তিতে করা হয়েছিল।[৭৮] ঔপনিবেশিক বুর্জোয়া শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকাই ছিল বস্তুত তাকে সমর্থন করার নীতির পিছনে মূল যুক্তি।[৭৯] ঔপনিবেশিক বুর্জোয়া শ্রেণী এই ভূমিকা ত্যাগ করলে তখনই তা হয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল।[৮০]

জাতীয় আন্দোলনের বৈপ্লবিক চরিত্রের দ্বিতীয় পরীক্ষাটি হল এই আন্দোলনে জনসাধারণের ভূমিকা এবং তার সক্রিয়তার ব্যাপ্তি। আগেই বলা হয়েছে, পুঁজিবাদের প্রাথমিক বিকাশ পর্বে লেনিন যে অন্যতম ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করেছিলেন তা হল জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং গণআন্দোলনে তাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ। এই আন্দোলন জনগণকে কতটা সচেতন ও প্রস্তুত করেছে, রাজনীতিতে কতটা টেনে এনেছে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক সক্রিয়তার মাধ্যমে কতটা তাদের সুপ্ত কর্মশক্তিকে মুক্ত করতে পেরেছে, সেটাই হল বুর্জোয়া জাতীয় আন্দোলনের প্রগতিশীল ও বিপ্লবী চরিত্রের প্রধান মাপকাঠি। অন্যদিকে, যে আন্দোলনের কোন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, এমনকি প্রগতিশীল রাজনৈতিক সিদ্ধান্তও, যখন জনগণের অজ্ঞাতসারে শীর্ষস্তরে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নেওয়া হয় তখন সেই আন্দোলনকে বলা যায় সংস্কারবাদী। এইজন্যই লেনিন ১৯১৩ সালে সান ইয়াৎ সেন-এর ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "সান ইয়াৎ-সেনের বৈপ্লবিক বুর্জোয়া গণতন্ত্র রাজনৈতিক ও ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত কর্মসূচী সম্পাদন করার কাজে কৃষিজীবী জনগণের উদ্যোগ, দৃঢ়তা ও সাহস যথাসম্ভব বাড়িয়ে তোলার মাধ্যমে চীনকে পুনর্জাগরিত করার জন্য সঠিকভাবেই চেষ্টা করেছে।[৮১] ১৯১৪ সালে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ লেখা **জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার** থেকে জাতীয় মুক্তির জন্য আয়ারল্যান্ডের সংগ্রাম বিষয়ক একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি এই ব্যাপারটিকে যথেষ্ট স্পষ্ট করবে :

> তত্ত্বগতভাবে যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরোধী হলেও মার্ক্স এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সম্ভাব্যতা মেনে নিয়েছিলেন শুধু এই শর্তে যে, ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীর সমর্থনে আয়ারল্যান্ডের জনসাধারণের সংস্কারপন্থী নয়, বৈপ্লবিক সংগ্রামের মাধ্যমে সে দেশকে মুক্ত করার সম্ভাবনা থাকছে। এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই ভাবেই এই ঐতিহাসিক সমস্যার প্রলেতারিয়েত স্বার্থের সর্বাধিক অনুকূল এবং দ্রুত সামাজিক প্রগতির সহায়ক সমাধান সম্ভব ছিল।...কিন্তু আয়ারল্যান্ডের জনগণ এবং ইংরেজ প্রলেতারিয়েত উভয়েই নিজেদের দুর্বল প্রমাণ করেছে। মাত্র সম্প্রতি ইংরেজ উদারনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আইরিশ বুর্জোয়াগোষ্ঠীর ঘৃণ্য সমঝোতার মাধ্যমে আয়ারল্যান্ডের সমস্যার সমাধান করা হতে চলেছে...।[৮২]

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে কৃষকদের যে ব্যাপক ভূমিকা লেনিন নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে আমরা এর আগেই বিশদ আলোচনা করেছি।

জনগণের ভূমিকা প্রসঙ্গে লেনিন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বুর্জোয়া নেতৃত্বকে সমর্থন করার বিষয়ে আর একটি শর্ত যোগ করেছিলেন। তা হল : বুর্জোয়া নেতৃত্ব "কৃষক সম্প্রদায় ও বিপুল সংখ্যক শোষিত মানুষকে বৈপ্লবিক উদ্দীপনায় শিক্ষিত ও সংগঠিত করার" জন্য কমিউনিস্টদের প্রচেষ্টার বিরোধিতা অবশ্যই করবে না।[৪৩] এর অর্থ, কমিউনিস্টরা কৃষক শ্রেণীকে ও গণ আন্দোলনকে বুর্জোয়া নিয়ন্ত্রণে অথবা বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে রেখে ঔপনিবেশিক বুর্জোয়াকে তুষ্ট করতে রাজী নয়।[৪৪] তাছাড়া কমিউনিস্টদের সমস্ত পরিস্থিতিতেই নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এবং "প্রলেতারিয় আন্দোলনের স্বনির্ভরতা" বজায় রাখতে হবে, শ্রমিক ও কৃষকের স্বাধীন রাজনৈতিক কাজকর্ম ও সংগঠনকে কখনোই বুর্জোয়া ক্রিয়াকলাপ ও নেতৃত্বের আড়ালে হারিয়ে যেতে দেওয়া চলে না।[৪৫]

জনগণের ভূমিকা এবং কমিউনিস্টদের স্বাধীন সংগঠনের ওপর লেনিন যে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন তার একটি সুস্পষ্ট অর্থ আছে : বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সমর্থন করা যেতে পারে একমাত্র এই শর্তে যে তা প্রলেতারিয়েত ও কমিউনিস্টদের বিপ্লবের পরবর্তী ধাপের জন্য তৈরি হতে এবং তার পথ প্রস্তুত করতে সাহায্য করবে।

"জাতীয় বিপ্লবী" এই শব্দগুলির দ্বারা লেনিন কি বোঝাতে চেয়েছিলেন, প্রাচ্যের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলির ব্যাপারে বিগত বছরগুলিতে তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন তা অনুসরণ করে এই প্রশ্নের জবাব আরেকভাবে খোঁজা যেতে পারে। কেবলমাত্র উল্লিখিত দুটি মাপকাঠির ব্যবহার করার ফলেই যে এর অনেক গুলিকে তিনি বৈপ্লবিক আখ্যা দিয়েছেন সেটা এতে স্পষ্ট হবে।

১৯১১ সালে রচিত 'বিশ্ব রাজনীতিতে দাহ্য পদার্থ" নামক প্রবন্ধে লেনিন "ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী আন্দোলনকে" স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং বিশেষভাবে, "ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের" জনগণের এবং পারস্য ও তুরস্কের "বৈপ্লবিক" আন্দোলনের উল্লেখ করেছিলেন।[৪৬] ১৯১২ সালেই তিনি পুনরায় পারস্যে "এশিয়ার গণতন্ত্রীদের বৈপ্লবিক আন্দোলনের" উল্লেখ করেছিলেন এবং এশিয়ার মুক্তি এবং ইউরোপীয় বুর্জোয়া গোষ্ঠীর আধিপত্য খর্ব করার ক্ষেত্রে "চীনের জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের আন্তর্জাতিক তাৎপর্যের" প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।[৪৭] ১৯১৩ সালে 'ডিমক্র্যাসি অ্যান্ড নারদিজম ইন চায়না' নামক নিবন্ধটির পুরোটাই ছিল ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে চীনের বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিশ্লেষণ। আন্দোলনটিকেবিশেষ করে প্রশংসা করা হয়েছিল এই কারণে যে "জনগণের অবস্থা এবং গণসংগ্রামের প্রশ্ন তা সঠিকভাবেই তুলে ধরেছে"।[৪৮] একই বছরে 'এশিয়ার জাগরণ' নামক প্রবন্ধে তিনি সমগ্র এশিয়াতে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রসার এবং নতুন তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা—"ওলন্দাজ অধিকৃত পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে

বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রসারের" প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[৮৯] ১৯১৫ সালে 'সমাজতন্ত্র ও যুদ্ধ' নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে লেনিন বলেছিলেন যে চীন, পারস্য, ভারত ও অন্যান্য পরাধীন দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বিদেশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অগণিত মানুষকে জাগিয়ে তুলছে[৯০] (এইভাবে উপরে আলোচিত উভয় মাপকাঠির দাবি পূরণ হচ্ছে)।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর চীনে ও ভারতে জাতীয় আন্দোলনের বিস্তৃতি এবং এইসব আন্দোলন সম্পর্কে লেনিনের মূল্যায়ন শিক্ষাপ্রদ। অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে পৈশাচিক হত্যাকান্ডের পর গণচেতনাকে উদ্বুদ্ধ এবং জনসাধারণের কর্মশক্তিকে উদ্দীপিত করার কাজে অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপ্তি দেখে লেনিন অভিভূত হয়েছিলেন। মেহনতী কৃষকদের প্রথম সর্ব-রুশীয় কংগ্রেসে লেনিন তাঁর রিপোর্টে মন্তব্য করেছিলেন যে ভারতবর্ষে "রাজনৈতিক চেতনা এবং বৈপ্লবিক আন্দোলন প্রতিদিন বিকাশ লাভ করে চলেছে।"[৯১] ১৯২১ সালের জুন মাসে অসহযোগ আন্দোলন যখন তুঙ্গে লেনিন তখন লিখেছিলেন, এশিয়ার জনগণ "বিশ্ব রাজনীতি এবং সাম্রাজ্যবাদের বৈপ্লবিক বিনাশের ক্ষেত্রে এক সক্রিয় উপাদান হয়ে উঠেছে", এবং "ব্রিটিশ ভারত রয়েছে এইসব দেশের পুরোভাগে" কারণ ভারতবর্ষে "বিপ্লবের পূর্ণতাপ্রাপ্তি ত্বরান্বিত" হয়ে চলেছে।[৯২] এম. এন. রায় তাঁর স্মৃতিকথায় গান্ধী সম্পর্কে ১৯২০ সালে লেনিনের সঙ্গে তাঁর আলোচনার উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষায়ঃ "লেনিন বিশ্বাস করতেন যে গণ আন্দোলনের প্রেরণাদাতা ও নেতা হিসেবে গান্ধী ছিলেন একজন বিপ্লবী।"[৯৩] এই মন্তব্য সংক্ষেপে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্বের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে লেনিনের প্রধান মানদন্ডটিকে তুলে ধরে। গান্ধী সম্পর্কে এই ইতিবাচক মূল্যায়ন ততদিনই ছিল যতদিন গণ আন্দোলন টিকে ছিল। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারতে গণ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হলে গান্ধীবাদী নেতৃত্ব সম্পর্কে এই ইতিবাচক মূল্যায়নও প্রত্যাহৃত হয়। এই সময়ের ভারতবর্ষ সম্পর্কে লেনিনের কোন মন্তব্য পাওয়া না গেলেও, ১৯২২ এর নভেম্বরে অনুষ্ঠিত চতুর্থ কমিনটার্ন কংগ্রেসে গৃহীত প্রাচ্যের সমস্যা-সংক্রান্ত তত্ত্বকে লেনিনের অভিমত বোঝার ক্ষেত্রে আংশিক দিগ্দর্শক হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই তত্ত্বে "ভারতবর্ষে জাতীয় বৈপ্লবিক আন্দোলনের ঝড়ের মত অগ্রগতি..."[৯৪] উল্লেখ করে কৃষি-বিদ্রোহের ক্রমবর্ধমান সম্ভাবনার আতংকে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের "দোদুল্যমান মনোভাব ও দ্বিধাগ্রস্তার" দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। বুর্জোয়া নেতৃত্বের এই "ভীরুতা" (লক্ষণীয় যে, "বিশ্বাসঘাতকতা" বা "প্রতিক্রিয়াশীলতা" নয়—বি. চ.) "ভারতবর্ষে জনগণকে সংগঠিত ও সংহত করার পথে বাধা" সৃষ্টি করেছিল "যা প্রমাণিত হয়েছে অসহযোগ পদ্ধতির দেউলেপনায়"।[৯৫] অন্য ভাবে বলা যায় যে "জনগণকে সংগঠিত ও সংহত করার" যে ভূমিকা গান্ধীকে একদা বিপ্লবী

নেতা করে তুলেছিল, পরবর্তীকালে গান্ধীপন্থী নেতৃত্ব সেই ভূমিকা পালন না করায় রাজনৈতিকভাবে দেউলে হয়ে পড়েছিল।

চীনের সান ইয়াৎসেনের নেতৃত্বাধীন কুওমিনটাঙের প্রতি লেনিন ও কমিনটানের মনোভাব একইরকম গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় কুওমিনটাঙ যে শুধু লেনিনের প্রধান মাপকাঠি দুটির দাবি সম্পূর্ণভাবে পূরণ করেছিল তাই নয়, কমিউনিস্টদের সংগঠিত হতে এবং জনগণের মধ্যে কাজ করতেও সাহায্য করেছিল।[৭৬] সেই কারণে লেনিন ও কমিনটার্ন কমিউনিস্ট পার্টিকে পার্টি হিসেবে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখে সান ইয়াৎসেন ও কুওমিনটাঙের সঙ্গে যোগ দিতে এমনকি কুওমিনটাঙের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্যও উৎসাহ দিয়েছিলেন।[৭৭]

৭

উপসংহারে, প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে, এই প্রশ্নটি নিয়ে মার্ক্সবাদীদের মধ্যে পরবর্তী সময়ের বিতর্ক যে পথভ্রষ্ট হয়েছিল তার প্রধান কারণ আলোচিত **মাপকাঠি দুটির আলোকে** বাস্তবে অস্তিত্বশীল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভূমিকার বাস্তবানুগ বিশ্লেষণের ব্যাপারটি তাঁদের অনেকেই উপেক্ষা করেছিলেন। তার বদলে তাঁরা মনোযোগ দিয়েছিলেন ঔপনিবেশিক বুর্জোয়া গোষ্ঠী ও তার বিভিন্ন অংশের অবস্থান ও ভূমিকা সম্পর্কে এক অবাস্তব ও তাত্ত্বিক আলোচনায় এবং 'মার্ক্সবাদ' সম্পর্কে এইরকম একমাত্রিক, জীবন-বিচ্যুত, অগভীর জ্ঞান বা ব্যাখ্যার ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদী-আন্দোলনের কৌশল বার করার চেষ্টায়। অর্থনীতি ও রাজনীতি এবং প্রকৃত বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ না করে, কেতাবী ধ্যান-ধারণা আর যুক্তি যা প্রায়ই বাক্‌ বিস্তার বা কুতর্ক, তার মাধ্যমে আন্দোলন পরিচালনার প্রবণতার এটি একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য প্রশ্নে, এর ফলে স্বভাবতই ঔপনিবেশিক দেশগুলির বুর্জোয়া শ্রেণীর ভূমিকাকে বারবার 'অতি মূল্যায়ন' বা 'অবমূল্যায়ন' করা হয়েছে। এই ধরণের বিশ্লেষণ এবং নিয়ত মূল্যায়ন ও পুনর্মূল্যায়ন বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে আপস ও তার কাছে আত্মসমর্পণ কিংবা অতিমাত্রায় হঠকারিতা ও প্রকৃত জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে অবিশ্বাসী মনোভাবের পক্ষে সাফাই গাওয়ার কাজে ব্যবহার করা সম্ভব ছিল, এবং তা করা হয়েছে। অন্যদিকে লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গিতে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বুর্জোয়া শ্রেণীর সম্ভাব্য ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ঔপনিবেশিক বুর্জোয়া শ্রেণীর বিভিন্ন অংশের প্রকৃত রাজনৈতিক কাজের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের ওপর।[৭৮] অনুরূপভাবে, ঔপনিবেশিক বুর্জোয়ার

দ্বিধাগ্রস্ত দুমুখো চরিত্র সম্পর্কে লেনিনের বক্তব্যকে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রকৃত শ্রেণী-ভূমিকা ও শ্রেণী-আচরণ বিশ্লেষণ করার এবং তার ভিত্তিতে তাদের প্রতি বাস্তব রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার কাজে ব্যবহার করা হয়নি, ব্যবহার করা হয়েছে যে কোন নীতির পক্ষে সুবিধাবাদী সাফাই গাওয়ার জন্য।

ঔপনিবেশিক প্রশ্নে লেনিনের তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে পার্থক্য বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ভারতীয় ও চীন কমিউনিস্টদের তত্ত্বে ও প্রয়োগের পার্থক্যে। উদাহরণস্বরূপ, চীনা কমিউনিস্টরা তত্ত্বগতভাবে চিয়াং কাই শেককে বর্ণনা করেছিল সামন্তবাদ ও মুৎসুদ্দি পুঁজির প্রতিনিধি হিসেবে, যার সঙ্গে কমিউনিস্টরা জোট বাঁধতে পারে না। তথাপি, ১৯৩৬ সালের পরে জাতীয়তাবাদী মতামতের চাপে চিয়াং যখন জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে কিছুটা রাজি হলেন তখন কমিউনিস্টরা তাঁর সঙ্গে যুক্ত ফ্রন্টে যোগ দিতে দ্বিধা করেনি। এমনকি জাপ-বিরোধী মোর্চায় তারা কোনরকম নেতৃত্বও দাবি করেনি।[৭৬] স্পষ্টতই, তারা বিষয়টিকে বিচার করেছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা সম্পর্কে লেনিনের মাপকাঠি দিয়ে।

একই রকমভাবে, বহু ক্ষেত্রে বুর্জোয়া শ্রেণীর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলি দেখার ওপরে জোর দেওয়ার ফলে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় বুর্জোয়া শ্রেণীর ভূমিকার ওপর প্রয়োজনাতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল। এমনকি যখন বুর্জোয়া গোষ্ঠীর ভূমিকা নেতিবাচক বলে মনে করা হয়েছে তখনও। এর ফলে কার্যত জনগণের ভূমিকার ওপর মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ যে গুরুত্ব আরোপ করেছে তাকে উপেক্ষা করা হয়েছিল। বুর্জোয়া গোষ্ঠীর বৈপ্লবিক বা প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকার মূল্যায়ন করতে গিয়ে কমিউনিস্টরা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্রে শ্রমিক ও কৃষককে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করার ব্যাপারে নিজেদের বৈপ্লবিক ভূমিকাটিকেই অবহেলা করতে বসেছিল।

টীকা

1. মার্ক্স-এঙ্গেলস "অন কলোনিয়ালিজম"; (মস্কো), "অন ব্রিটেন" (মস্কো, 1953); ডোনা টর সম্পাদিত, "মার্ক্সিজম, ন্যাশনালিটি এন্ড ওয়ার" (2 খন্ড) লন্ডন 1941; হোরেস বি, ডেভিস, "ন্যাশনালিজম এন্ড সোস্যালিজম", ন্যু-ইয়র্ক 1967; ডি. বোয়েরস্নার, "দ্য বলশেভিকস এন্ড দ্য ন্যাশনাল কলোনিয়াল কোয়েশ্চন", জেনেভা 1957; এন. এন. আগরওয়ালা, "সোবিয়েত ন্যাশনালিটিজ পলিসি," আগ্রা 1969; এবং হেলেন এনকস্ ও সটুয়ার্ট শ্রাম, "মার্ক্সিজম এন্ড এশিয়া", লন্ডন 1965, দ্রষ্টব্য।

2. এবিষয়ে মার্ক্সবাদী বক্তব্যের একটি সাম্প্রতিক বিবরণ পাওয়া যাবে ফ্রান্সিস মায়েক-এর "ফিলজফি অব ওয়ার্ল্ড রেভোলিউশান" (ন্যু-ইয়র্ক 1969)-এ।

3. ভি, আই, লেনিন, "সম্পূর্ণ রচনাবলী" (এর পর থেকে সংক্ষেপে CW বলে উল্লিখিত), খণ্ড-22, মস্কো 1964, পৃঃ 149 পাদটীকা।

4. লেনিন, "প্রাচ্যের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন" (এরপর থেকে NLME বলে উল্লিখিত), ২য় মুদ্রণ, মস্কো 1969, পৃঃ 70-71।

5. তদেব, পৃঃ 65। রোজা লুক্সেমবুর্গ-এর বিরুদ্ধে লেনিনের অভিযোগ, তিনি রুশীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের জাতীয় কর্মসূচী নিয়ে আলোচনার সময় এই কাজটি করেন নি। লেনিন লিখেছিলেন: "আমরা একটি নির্দিষ্ট দেশ, রাশিয়ার, একটি নির্দিষ্ট সময়ের—বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের—মার্ক্সবাদীদের জাতীয় কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করছি। রোজা লুক্সেমবুর্গ কি এই বিশেষ দেশটি বিশেষ সময়ে কোন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল এবং জাতীয় প্রশ্নে ও জাতীয় আন্দোলনে এর সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি কী ছিল তা খতিয়ে দেখেছেন?" তদেব, পৃঃ 71।

6. তদেব, পৃঃ 235।

7. তদেব, পৃঃ 250।

8. তদেব, পৃঃ 264।

9. তদেব, পৃঃ 283-85।

10. উদাহরণস্বরূপ এম. এন. রায়-এর "মেময়র্স" বোম্বাই, 1964, পৃঃ 3'6-47, এবং 380 দ্রষ্টব্য। 1912 সালে সান-ইয়াৎ-সেন-এর ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে লেনিন যে মন্তব্য করেছিলেন তা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির এই দিকটিকে তুলে ধরে। সান-ইয়াৎ-সেন-এর মতবাদ-এর তীক্ষ্ম সমালোচনা করেও লেনিন তাঁকে এইভাবে অভিনন্দিত করেছেন "এইগুলি প্রকৃতই একটি মহান জাতির মহান আদর্শ…'। লেনিন' NLME, পৃঃ 42।

11. এম এন. রায় পৃঃ 380-81। সম্পূরক থিসিসটি কার্যত কমিনটার্ন-এর পরবর্তী কালের কার্যাবলীতে উপেক্ষিত হয়েছে। এর ফলে ক্ষতির সম্ভাবনা আংশিক নিরসিত হয়েছে।

12 লেনিন, NLME, পৃঃ 249। এই থিসিসটিকে এর পর থেকে প্রাথমিক বা 'প্রিলিমিনারি থিসিস' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কমিনটার্ন-এর সম্মেলনে গৃহীত সংশোধন-সহ থিসিসটির মূল পাঠ পাওয়া যাবে জেন দেগ্রাস্-এর 'দ্য কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল, 1919-1943" দলিল, খণ্ড 1, 1919-22, লণ্ডন 1956 বই-এ, পৃঃ 138।

13 বিশেষ করে, মার্ক্স-এঙ্গেলস প্রবর্তিত ঐতিহ্য পরিত্যাগ করেছে এমন এক দল সমসাময়িক সমাজতন্ত্রীর বক্তব্যের সঙ্গে তুলনীয়। এইসব সমাজতন্ত্রীদের ভূমিকা সম্পর্কে জানার জন্য বোয়েস্নার পৃঃ 29-32, এনকস এবং শাম, পৃঃ 15-16; এ. এম. ম্যাকব্রায়ার "ফেবিয়ান সোশ্যালিজম এণ্ড ইংলিশ পলিটিক্স" লণ্ডন, 1962, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, দ্রষ্টব্য।

14. CW খণ্ড-22, পৃঃ 346। এছাড়া NLME পৃঃ 92 দ্রষ্টব্য।

15. বোয়েস্নার, পৃঃ 29, 32, 42-43, 57 দ্রষ্টব্য। এই ধরনের চিন্তার একটা ভালো উদাহরণ রোজা লুক্সেমবুর্গ-এর বিখ্যাত "জুনিয়াস" প্যাম্ফলেট (1916) থেকে নীচের উদ্ধৃতি: "মানব সমাজকে মুক্ত করার জন্য সমাজ-বিপ্লবের আহ্বান আসতে পারে একমাত্র ইউরোপ থেকেই। সময় হলে ইউরোপের পুরনো ধনতান্ত্রিক দেশগুলো এ আহ্বান জানাবে। শুধু ইংরেজ, ফরাসী, বেলজিয়ান, জার্মান, রুশ ও ইতালীয় শ্রমিকরাই যৌথভাবে পারে পাঁচটি মহাদেশের শোষিত মানুষকে নেতৃত্ব দিয়ে পরিচালিত করতে। সময় হলে এরাই পারবে অনুন্নত জাতিগুলির উপর শত শত বছর ধরে নিষ্পেষণ এবং পৃথিবী জুড়ে ধ্বংসলীলা সাধনের জন্য পুঁজিবাদকে জবাবদিহি করাতে। সে প্রতিশোধ নেওয়ার সামর্থ্য শুধু এদেরই আছে।" এনকস ও শাম-এর বইয়ের 143 44 পৃঃ এই উদ্ধৃতি পাওয়া যাবে।

16. উদাহরণস্বরূপ, কাউটস্কিকে লেখা তাঁর 1882 সালের 12ই সেপ্টেম্বর তারিখের চিঠি। এঙ্গেলস ভারতবর্ষে এবং আলজিয়ার্স বা মিশর-এর মত দেশে বিপ্লবের সাফল্যের সম্ভাবনা

লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর ভাষায় "সম্ভবত ভারতবর্ষে বিপ্লব ঘটবে। বাস্তবিক পক্ষে এ সম্ভাবনা খুবই বিশ্বাসযোগ্য।" মার্ক্স-এঙ্গেলস 'নির্বাচিত পত্রাবলী 1846-1895' ন্যু-ইয়র্ক 1942, পৃঃ 399।

17. NLME, পৃঃ 12-13 এবং 19।

18. তদেব, পৃঃ 42, 44।

19. তদেব, পৃঃ 59।

20. CW, খণ্ড-22, পৃঃ 310।

21. NLME, পৃঃ 297।

22. তদেব, পৃঃ 315।

23. তদেব, পৃঃ 65-66, 69 ও 76।

24. তদেব, পৃঃ 43।

25. তদেব, পৃঃ 43-46, 90, 97, 234 ; CW, খণ্ড-22, পৃঃ 146।

26 NLME, পৃঃ 44, 53, 55, 59, 104, 234।

27. তদেব, পৃঃ 43,. 47, 51-52।

28. তদেব, পৃঃ 170।

29. তদেব, পৃঃ 55।

30. তদেব, পৃঃ 250।

31 CW, খণ্ড-23, পৃঃ 59। রাশিয়ার বিপ্লব প্রসঙ্গে লেনিন 1905 সালে লিখেছিলেন, 'বিপ্লবের বিকাশে কয়েকটি অন্তর্বর্তী ধাপ অতিক্রম না করে পুঁজিতন্ত্রের মূলোৎপাটন সম্ভব হবে না...গণতান্ত্রিক বিপ্লব এখনই বুর্জোয়া সামাজিক ও আর্থনীতিক সম্পর্কের সীমা লঙ্ঘন করবে না..." CW, খণ্ড-9, 1965, পৃঃ 56-57। 1921 সালে তিনি আবার মন্তব্য করেছেন, "এই বিপ্লবের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক সারমর্ম হ'ল, এর ফলে দেশ সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে (ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানে) মধ্যযুগীয়তা, ভূমিদাসত্ব প্রথা ও সামন্ততন্ত্র থেকে মুক্ত হবে।" CW, খণ্ড-33, পৃঃ 52।

32. যারা "ঘৃণ্য বুর্জোয়ার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার"-এর বিরোধিতা করেছিল, লেনিন পরে 1919 সালে, তাদের ভৎর্সনা করে লিখেছিলেন যে, "এই অধিকার বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সুসঙ্গতিপূর্ণ এবং এটি বর্জন করলে তার ফলাফল হবে পুরোদস্তুর উদ্ভট এবং বাস্তবে যা বিদ্যমান আমরা তাকে অস্বীকার করতে পারি না, সে নিজেই আমাদের বাধ্য করবে স্বীকৃতি দিতে।" NLME, পৃঃ 211-16।

33. "সোশাল ডিমক্রেসির দুই কৌশল" বইয়ে লেনিন লিখেছেন, "বিপ্লবের প্রশ্নে তার কোনো আপত্তি বা সংশয় নেই কিংবা পিছন ফিরে তাকায় না এমন বিপ্লবী শ্রেণীর অগ্রবর্তী অংশের প্রতিনিধি হিসাবে আমাদের যতটা সম্ভব সাহসের সঙ্গে ও ব্যাপকভাবে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচী নিয়ে জনসাধারণের সম্মুখীন হতে সাতিশয় উদ্যোগী হতে হবে। এই কর্তব্যকে অবজ্ঞা করলে তা হবে তাত্ত্বিক মার্ক্সবাদের হাস্যকর অনুকরণ..." CW, খণ্ড-9, পৃঃ 112।

34. তদেব, পৃঃ 44-45।

35. তদেব, পৃঃ 47।

36. CW, খণ্ড-22, পৃঃ 145 দ্রষ্টব্য।

37. বোয়েরসনার, পৃঃ 47, 50।

38. CW, খণ্ড-22, পৃঃ 144। অন্যদিকে, 1913 সালে তিনি লিখেছিলেন, "গণতান্ত্রিক পথেই বৌথীকরণ সম্ভব।" NLME, পৃঃ 62। আরও আগে, 1905 সালে মন্তব্য করেছেন: "আমাদের মার্ক্সবাদীদের এটা বুঝতে হবে যে বুর্জোয়া স্বাধীনতা ও

বুর্জোয়া প্রগতির পথ ছাড়া শ্রমিক-কৃষকের প্রকৃত মুক্তির অন্য আর কোনো পথ নেই, এবং থাকতেও পারে না…' CW, খণ্ড-9, পৃঃ 112।

39. NLME, পৃঃ 103-04 ; CW, খণ্ড-23, পৃঃ 371।

40. NLME, পৃঃ 97।

41. CW, খণ্ড-33, 1966, পৃঃ 51-52।

42. CW, খণ্ড-22, পৃঃ 144।

43. লেনিন 1917 সালের এপ্রিল মাসে "দূর থেকে লেখা চিঠিপত্র"-তে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত হওয়ার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে একটি বাস্তবানুগ বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছিলেন—CW, খণ্ড-23, পৃঃ 295।

44. তদেব, পৃঃ 317। তুলনীয় কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর এই উক্তি : "কমিউনিস্টরা প্রধানত জার্মানীর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করছে কারণ ঐ দেশে বুর্জোয়া বিপ্লব সমাসন্ন এবং সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ড ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্স অপেক্ষা বর্তমান জার্মানীতে ইউরোপীয় সভ্যতা প্রাগ্রসর হওয়ায় ও জার্মান প্রলেতারিয়েত তুলনামূলকভাবে উন্নত বলে এই বিপ্লব সফল হতে বাধ্য। জার্মানীর এই বুর্জোয়া বিপ্লব প্রলেতারিয়েত বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বাভাষ।" চতুর্থ অধ্যায়।

45 CW, খণ্ড-33, পৃঃ 54।

46. CW, খণ্ড-9, পৃঃ 114।

47. "সংগ্রাম, শুধু সংগ্রামই, নির্ধারিত করেছে কতটা পরিমাণে দ্বিতীয়টি প্রথমটিকে ছাপিয়ে যেতে পারে". —লেনিন 1921 সালে লিখেছিলেন। CW, খণ্ড-33, পৃঃ 54।

48. 1905 সালে তিনি লিখেছেন, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচীকে রূপায়িত করতে হবে "যতটা সম্ভব সাহস ও ব্যাপকতার সঙ্গে এবং চূড়ান্ত উদ্যোগ নিয়ে।" CW, খণ্ড-9, পৃঃ 112। খণ্ড-33, পৃঃ 53 ও দ্রষ্টব্য। 1916 সালে তিনি বিপ্লবের প্রথম স্তর থেকে দ্বিতীয় স্তরে নির্বাধ উত্তরণের একটি রূপরেখা নির্মাণ করেছিলেন। এই রূপরেখা অনুসারে, গণতান্ত্রিক দাবীগুলিকে "সুনির্দিষ্ট করে, সংস্কার-পন্থার মাধ্যমে নয়, বৈপ্লবিক পথে রূপায়িত করতে হবে। এর জন্য বুর্জোয়া আইনসর্বস্বতার বাধা অপসারণ করে তাকে ভেঙ্গে ফেলতে হবে, সংসদে বক্তৃতা ও বাকসর্বস্ব বিরোধিতার আবদ্ধ না থেকে জনসাধারণকে চূড়ান্ত সংগ্রামে সামিল করতে হবে এবং প্রতিটি মৌলিক গণতান্ত্রিক দাবীকে তীব্রতর ও প্রসারিত করে বুর্জোয়ার উপর প্রলেতারিয়েতের প্রত্যক্ষ আঘাত হানতে হবে। এই আঘাত চালাতে হবে যতদিন না সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া সম্পত্তিচ্যুত হচ্ছে।" CW, খণ্ড-22, পৃঃ 145।

49. CW, খণ্ড-9, পৃঃ 112-14 ; খণ্ড-23, পৃঃ 295 ; খণ্ড-23, পৃঃ 52 দ্রষ্টব্য।

50. NLME, পৃঃ 290।

51. তদেব, পৃঃ 70-71।

52. স্পষ্টতই এই বক্তব্য উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এর কোনটিই না হলে, বিরোধিতা হয়ে দাঁড়ায় দুইটি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে, যার একটি অপরটি থেকে বৃহত্তর এবং বেশী সাম্রাজ্যবাদী।

53. উপরিলিখিত মন্তব্য। তাছাড়া NLME, পৃঃ 62, 65, 69, 76, 92, 274, এবং CW, খণ্ড-22, পৃঃ 151-52 দ্রষ্টব্য।

54. NLME, পৃঃ 43, 47, 52, 266 ; CW, খণ্ড-22, পৃঃ 148।

55 এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে প্রণিধানযোগ্য : লেনিন সর্বদাই সূত্রটিকে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ব্যবহার করেছেন এবং কখনোই এটিকে সমস্ত ঔপনিবেশিক বুর্জোয়ার সাধারণ বৈশিষ্ট্যজাত প্রবণতা হিসাবে দেখেননি। উদাহরণস্বরূপ, 1913 সালে সান-ইয়াৎ সেনকে চীনদেশীয়

বুর্জোয়ার বিপ্লবী মানসিকতা সম্পন্ন অংশের প্রতিনিধি হিসাবে সংখ্যাত করলেও, তিনি ইউয়ান শি-কাই-এর উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন, ইনি সেই উদারনৈতিক বুর্জোয়া গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা, "যারা যে কোনো সময়ে বিশ্বাসঘাতকতা করতে সক্ষম।" NLME, পৃঃ 43। এছাড়া, তদেব, পৃঃ 47, 52। 'প্রিলিমিনারি থিসিসে'ও সূত্রটির সুনির্দিষ্ট রূপ লক্ষণীয়।

56. 1913 সালে লিখেছেনঃ "এশীয় বুর্জোয়াদের যে প্রধান প্রতিনিধি বা প্রধানতম সমর্থক ঐতিহাসিক প্রগতির জন্য সংগ্রাম করতে সমর্থ, তারা হ'ল কৃষক সমাজ।" তদেব, পৃঃ 43।

57. 1920 সালে লেনিন বলেছিলেন যে, কমিউনিস্ট পার্টিগুলি "কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক রচনা করতে এবং এই আন্দোলনকে সক্রিয় সমর্থন জানাতে না পারলে" ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশে কার্যকর হতে পারবে না। তদেব, পৃঃ 266।

58. তদেব, পৃঃ 290।

59. তদেব, পৃঃ 255। এছাড়াও, কমিনটার্ন-এর কার্যকরী সমিতি প্রচারিত 'বাকুতে, প্রাচ্যের জাতিসমূহের আসন্ন সম্মেলন প্রসঙ্গে আবেদন" দ্রষ্টব্য—দেগ্রাস, পৃঃ 106।

60. NLME, পৃঃ 255, 262, 267-68।

61. CW, খণ্ড-42, 1969, পৃঃ 202।

62. ক্লানৎস্ মারেক, পৃঃ 67-68 এবং এনকস্ ও শাম, পৃঃ 121-23 দ্রষ্টব্য।

63. বস্তুত ও'র জীবৎকালেই কৃষক সমাজ অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে শুরু করেছিল। কমিনটার্ন-এর চতুর্থ অধিবেশনের থিসিস (নভেম্বর 1922) দ্রষ্টব্য—দেগ্রাস, পৃঃ 386-87, 394-98।

64. CW, খণ্ড 22, পৃঃ 151-52 এবং NLME, পৃঃ 236, 251-52, 254-55।

65. রায় এবং সেরাতি-র মত-এর জন্য এনকস্ ও শাম, পৃঃ 150-51, 159-63, 165-67 দ্রষ্টব্য। কমিনটার্নের কংগ্রেসে গৃহীত "জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নে" থিসিসের জন্য, দেগ্রাস, পৃঃ 139-44 দ্রষ্টব্য।

66. পরিবর্তনগুলি লক্ষ্য করার জন্য প্রাথমিক খসড়ার সঙ্গে চূড়ান্ত থিসিসটি তুলনীয় (দেগ্রাস, পৃঃ 139-44)। এনকস ও শাম লেনিনের প্রাথমিক খসড়া এবং পরিবর্তনসহ চূড়ান্ত থিসিসটি দিয়েছেন —পৃঃ 152-56 দ্রষ্টব্য।

67. NLME, পৃঃ 266।

68. এনকস ও শাম, পৃঃ 151।

69. এই পার্থক্য তাত্ত্বিক আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি, কিন্তু কোন-কোন ঔপনিবেশিক দেশের বাস্তব ঐতিহাসিক অবস্থা, বাস্তব জীবনে প্রকাশিত হয়েছে। NLME, পৃঃ 266 দ্রষ্টব্য।

70. তদেব।

71. CW, খণ্ড-22, পৃঃ 151-52। পৃঃ 145-ও দ্রষ্টব্য।

72. NLME, পৃঃ 43, 51-52, 62।

73. তদেব, পৃঃ 266।

74. এনকস ও শাম, পৃঃ 150-51।

75. তদেব, পৃঃ 163।

76. তদেব, পৃঃ 162।

77. তদেব, পৃঃ 165-67।

78. NLME, পৃঃ 266।

72. এখানে এই প্রশ্নে রায়-এর ভ্রান্ত কিন্তু তাত্ত্বিক নীতিসঙ্গত অবস্থানের উল্লেখ করা যেতে পারে। রায় এই বক্তব্যের যুক্তিযুক্ততা মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি মনে করেছেন যে, ভারত-

বর্ষের মত তুলনামূলকভাবে অগ্রসর দেশে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দেশীয় পুঁজির বিরোধ ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল এবং দেশীয় পুঁজির সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ আপস-রফায় উপনীত হয়েছিল। এর কারণ এইসব দেশের বৈপ্লবিক গণ উত্থান উভয়কেই আতঙ্কিত করেছিল। তাছাড়া দেশগুলিতে বুর্জোয়া শিল্প বিকাশে সাম্রাজ্যবাদ উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। এনকস ও শাম, পৃঃ 190-92 দ্রষ্টব্য।

80. ঔপনিবেশিক দেশের গণ আন্দোলনের এই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চরিত্রের উপর লেনিন বারবার জোর দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ NLME, পৃঃ 234 দ্রঃ। লেনিন জীবিত থাকা কালে কমিনটার্নও বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছিল—দেগ্রাস, পৃঃ 385, 394-96 দ্রষ্টব্য।

81. NLME, পৃঃ 47। এছাড়া পৃঃ 22, 42, 44, 235 এবং CW, খণ্ড-23, পৃঃ 31 দ্রষ্টব্য।

82. CW, খণ্ড-20, পৃঃ 441 এবং খণ্ড 22, পৃঃ 145 দ্রঃ।

83. NLME, পৃঃ 266।

84. CW, খণ্ড 22, পৃঃ 145।

85 NLME, পৃঃ 255। এছাড়া পৃঃ 235 এবং এনকস ও শ্যাম পৃঃ 151 (কমিশনে লেনিনের বক্তৃতা) দ্রষ্টব্য।

86. NLME, পৃঃ 12-13 এবং পৃঃ 18 দ্রঃ। 1919 সালে লেনিন ভারতের ইতিহাসের এই সময় সম্পর্কে পুনেরায় আলোচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 1905 সালের পর ভারতে "বিপ্লবী আন্দোলনের" বিকাশ হয়েছিল। তদেব, পৃঃ 23।

87. তদেব, পৃঃ 39-40।

88. ঐ, পৃঃ 42।

89. ঐ, পৃঃ 59।

90 ঐ, পৃঃ 101।

91. ঐ, পৃঃ 244।

92. ঐ, পৃঃ 283।

93. রায়, পৃঃ 379।

94. দেগ্রাস, পৃঃ 383।

95. তদেব, পৃঃ 386-87।

95. চীনের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের (1922) থিসিস অনুসারে: "আমরা, কমিউনিস্টরা, যদি দক্ষিণ চীনের শ্রমিক সঙ্ঘগুলোর মধ্যে সফলভাবে কাজ করতে চাই···তাহলে ঐ অঞ্চলের জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে আমাদের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলতে হবে। ই. এইচ, কার-এর "দা বলশেভিক রেভোলিউশন, 1917-23," তৃতীয় খণ্ড, পেঙ্গুইন সংস্করণ, 1966, পৃঃ 527-এ উদ্ধৃত।

97. বেঞ্জামিন স্কোয়ারজ-এর "চাইনীজ কমিউনিজম এণ্ড দ্য রাইজ অব মাও", কেম্ব্রিজ, মাস, 1966, তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

98. এই ভাবেই মার্ক্স তাঁর "এইটিনথ্ ব্রুমেয়ার"-এ সমসাময়িক ইতিহাস বিশ্লেষণ করেছিলেন।

99. স্টুয়ার্ট শাম, "দ্য পলিটিকাল থট অব মাও-সে-তুং", ন্যু-ইয়র্ক, 1963 পৃঃ 38।

কৃষক সম্প্রদায় ও জাতীয় সংহতি : সমকালীন ভারতবর্ষ

ঔপনিবেশিক যুগে কৃষি শ্রেণী কাঠামো

ঔপনিবেশিকযুগে সমাজ ও অর্থনীতিতে অতি গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ঘটেছিল ; এই সময়ে বহু শতাব্দীর পুরোন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে দিয়ে তার জায়গায় স্থান নিয়েছিল নূতন সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠান। একই ভাবে কৃষি ক্ষেত্রেও নূতন ভূমি সম্পর্ক ও শ্রেণী-কাঠামো গড়ে উঠেছিল। একদিকে অনুপস্থিত জমিদার, মহাজন এবং অন্যদিকে 'উঠবন্দী' এমন প্রজা, ভাগচাষী, কৃষি শ্রমিক প্রভৃতি নতুন নতুন শ্রেণী দেখা দিল। যে নতুন কৃষি কাঠামো জন্ম নিল তা না ছিল সনাতন বা সামন্ততান্ত্রিক না ধনতান্ত্রিক। প্রজাস্বত্বের বৃদ্ধি হল। রাষ্ট্র ও প্রকৃত কৃষকের মাঝখানে এমন এক মধ্যস্বত্বভোগী প্রজা ও উচ্চ কাঠামোর শ্রেণী দেখা দিল ভারতের ইতিহাসে যা নজিরহীন। ১৯৩১ সালের ভেতরে গ্রামীণ জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ ভূমি-হীন কৃষকে পরিণত হয়েছিল ; বাকি দুই তৃতীয়াংশের বেশির ভাগই ছিল 'উঠবন্দী' প্রজা, ভাগচাষী এবং ক্ষুদ্র চাষী।[1] সমভোগী ও শ্রেণীহীন সমাজে নূতন করে শোষক শক্তির উদ্ভব ঘটেছিল তা নয় ; অর্থনৈতিক অসাম্য, জমিদার, মালিক প্রভৃতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিপীড়ন, সামাজিক মর্যাদার পার্থক্য, উচ্চবর্ণের আধিপত্য, এসব আগে থেকেই খুব ভালভাবে ছিল। শোষণ ও প্রভুত্বের রূপে পরিবর্তন দেখা দিল। পুরোন প্রতিষ্ঠান ও সম্পর্কগুলিকে সচেতনভাবে উৎখাত না করে তার ওপর নূতন প্রতিষ্ঠান ও সম্পর্ক চাপানর চেষ্টা হ'ল। পরিণামে, সেগুলি ভেঙ্গে গেল, এবং পুরোন কাঠামোর সীমার মধ্যে পারস্পরিক সাহায্যের ফলে ও প্রচলিত প্রথার জন্য নিম্ন বর্ণ ও শ্রেণীর মানুষ যে সব সামাজিক নিরাপত্তা ভোগ করত তার কিছু কিছু অদৃশ্য হল।

নূতন সম্পর্কগুলি গড়ে উঠেছিল নূতনের সঙ্গে পুরোনর পারস্পরিক ক্রিয়ায়। কিন্তু এই পরিবর্তন সমাজ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে না-হওয়ার ফলে গড়ে ওঠা নতুন সামাজিক ভিত্তি অর্থনৈতিক বিকাশ বা অর্থনৈতিক কল্যাণের পক্ষে সহায়ক হয়নি। আসলে নতুন কাঠামো বেশি ভাল ছিল না মন্দ ছিল, কিংবা পুরোন

আগস্ট, ১৯৭৬-এ মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার মানব বিজ্ঞান বিষয়ক ৩০তম আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে উপস্থাপিত।

সমাজ ভেঙ্গে যাচ্ছিল কিনা সেটা আলোচ্য নয়, মূল কথা হল যে নতুন ব্যবস্থা যা দেখা দিল তা পুরোন ব্যবস্থা থেকে বেশি না হলেও, একই রকম পশ্চাদমুখী এবং কৃষির উন্নতির ক্ষেত্রে একই ভাবে প্রতিবন্ধক হয়েছিল। নতুন উৎপাদন সম্পর্কের কাঠামো এবং উদ্বৃত্ত আদায় ও তা ব্যবহারের পদ্ধতিতে (ক) কৃষিতে নানা ভাবে নিযুক্ত শ্রেণী বা সামাজিক স্তর গুলিকে আধুনিক উন্নতি সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ বা উৎসাহ যোগায়নি, এবং (খ) অন্যদিকে কৃষি থেকে ও কৃষকের কাছ থেকে সম্পদ শুষে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে, এই পরিবর্তনগুলি ঘটেছিল নূতন ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্তন, ভূমি রাজস্বের দুর্বহ বোঝা, আইনগত ও রাজনৈতিক পরিবর্তন, দেশীয় শিল্পের ধ্বংস, কৃষি ও শিল্পের বহু কালের পুরোন সমন্বয় ভেঙ্গে যাওয়া, অধীনস্থ অবস্থায় বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে অন্তর্ভুক্তি, এবং সর্বোপরি ভারতীয় অর্থনীতি ও কৃষিতে শিল্প বিপ্লব ছাড়া এক বাণিজ্যিক বিপ্লবের ফলে। আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, ভারতীয় কৃষিতে কারিগরী ভিত্তি বা উৎপাদন পদ্ধতিতে পরিবর্তন না এনে কৃষির বাণিজ্যিকরণ করা হয়েছিল।

ভারতের অর্থনীতি ও কৃষিতে উপনিবেশবাদের অনুপ্রবেশের এক বড় পরিণাম হল কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে অচল অবস্থা সৃষ্টি, উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস, মাথা-পিছু খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস, এবং সাধারণভাবে কৃষকের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র।[৩] অবশ্য বর্তমানে আমাদের মনোযোগের প্রধান বিষয় কৃষকের দারিদ্র ও দুর্দশা নয়, আমাদের মনোযোগের বিষয় হল সাম্প্রতিক ঔপনিবেশিক ও তারপর উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বে কৃষি শ্রেণী কাঠামোর পরিবর্তন।

আমরা এই পরিবর্তনের একটি রূপরেখা উপস্থিত করেছি। এটা করতে গিয়ে আঞ্চলিক পার্থক্যগুলিকে অনেকটা পরিমাণে উপেক্ষা করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক যুগে বিচিত্র ও দীর্ঘস্থায়ী ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফলে ব্যাপক আঞ্চলিক পার্থক্য ঘটেছিল, কাজেই দেশ সম্পর্কে এ ধরনের সাধারণীকরণ অসুবিধাজনক। কিন্তু তবুও তা করা হয়েছে, কারণ ঔপনিবেশিক কৃষি ও শ্রেণী কাঠামোর সাধারণ চরিত্র সারা দেশে একই রকম হয়ে ছিল কিন্তু একই সঙ্গে, মাঝে মাঝেই যে সব পরিসংখ্যানগত ও অন্যান্য তথ্য দেওয়া হয়েছে তা বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের। কারণ সব অঞ্চল সম্পর্কে এই ধরণের তথ্য ও প্রমাণ অপ্রতুল অন্ততঃ, রেফারেন্সের জন্য সহজলভ্য নয়।

(ক) কৃষি শ্রেণী কাঠামোর সর্বোচ্চ স্তরে ছিল জমিদার ও ভূস্বামী, যারা অধিকাংশ জমির মালিকানা ভোগ করত এবং সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করত। ১৯২০র দশকের মধ্যে জমিদারী ও রায়তী উভয় অঞ্চলেই জমিদার-তন্ত্র প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা দিয়েছিল। উপরন্তু, মধ্যস্বত্ব প্রদানের মাধ্যমে মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। বিপুল সংখ্যক জমিদার ও ভূস্বামীর অনেকেই ছিলেন নতুন, তাদের কাজকর্মের ধরণ ও কর্মচারিরাও

ছিল নতুন। ভূমি রাজস্বের চড়া হার, আদায়ের কঠোরতা এবং নূতন আইন ও প্রশাসন ব্যবস্থার পরিণামে ভূস্বামী কৃষক ছাড়া পুরোন উচ্চবিত্ত শ্রেণীও ক্ষমতাচ্যুত হ'ল। ব্যবসায়ী. মহাজন, ফাটকাবাজ, সরকারি কর্মচারী, পেশাদার ব্যক্তি ও অন্যান্য শহুরে গোষ্ঠী নিজেরা ভূস্বামী হওয়ার জন্য কৃষকদের মালিকানাধীন জমি ও জমিদারি কিনে নিল। এইসব নতুন জমিদার ও ভূস্বামীদের অধিকাংশই দূরে থাকত এবং জমির সঙ্গে তাদের সংযোগ ছিল অল্পই। শুধু তাই নয়, পুরোন জমিদারদের মতই তাদেরও পুঁজিপতি ভূস্বামী হওয়ার কোন আগ্রহ ছিল না, এমনকি অনেক সময় তারা খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারেও উৎসাহ দেখায়নি। ফলে তারা মধ্যস্বত্ব প্রদানের রাস্তা নিল, তার ফলে বাড়ল কর্মচারী সংখ্যা এবং খাজনার দাবি এবং খাজনা ভোগীর সংখ্যাও বাড়ল। মধ্যস্বত্বভোগীরা প্রকৃত কৃষকের কাছ থেকে আরো বেশি করে আদায়ের জন্য সম্ভবপর সবরকম আইনী ও বেআইনী পদ্ধতির আশ্রয় নিতে লাগল। রায়ত এলাকাতেও জমি ক্রমশ জোতদার ও মহাজনের নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছিল। লক্ষণীয় যে, ভূস্বামী কৃষকের হাত থেকে জমি হস্তান্তরের অর্থ কৃষিকর্ম হস্তান্তর নয়, তার অর্থ প্রাক্তন মালিক, নতুন প্রজা ও রাষ্ট্রের মধ্যে মধ্যস্বত্ব ভোগীর অনুপ্রবেশ। ১৯৪৭ সালের আগে ব্রিটিশ ভারতে মোট কৃষিজমির প্রায় ৭০ শতাংশের মালিক ছিল জমিদার ও ভূস্বামীরা। রায়তী অঞ্চলে প্রায় ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ জমি ছিল জোতদারদের হাতে, বাকি জমির উপর ছিল বিপুল ঋণের বোঝা।[3]

জমিদার ও ভূস্বামীরা মহাজন শ্রেণী থেকে এসেছিল শুধু তাই নয়, তাদের অনেকেই উত্তরোত্তর মহাজনী কারবার শুরু করেছিল। ১৯১৩ সালে ইউ. পি ব্যাংকিং ইনকোয়্যারি কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে যে যুক্ত প্রদেশে জোতদাররাই ছিল গ্রামীণ ঋণের বৃহত্তম উৎস, মোট ঋণের প্রায় ৪০ শতাংশ তারা জুগিয়েছে।[4]

অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধাহীন অনড় ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে মালিক-ভূস্বামীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়ায়, জমিদার ও ভূস্বামী শ্রেণীর অভ্যন্তরেও এক ব্যবধান দেখা দিয়েছিল। ১১৪৫ সালে যুক্তপ্রদেশে মোট জমির ২৭ শতাংশের মালিক ছিল '০৪ শতাংশ বা ৮০৪ জন জমিদার, আর মোট জমির ৫৭'৭৭ শতাংশ ছিল ১·৪১ জনের হাতে।[5] আগ্রা প্রদেশে ৮৫'৫ শতাংশ মালিক বছরে ২৫ টাকারও কম রাজস্ব হিসেবে দিত, অন্যদিকে ১৩.২ শতাংশ বছরে দিত ২৫ টাকা থেকে ২৫০ টাকার মধ্যে।[6] ১৮৯৩ সালে বাংলায় ৮৫.৪ শতাংশ এস্টেট নিয়ন্ত্রণ করত ৯.৮ শতাংশ এলাকা; এস্টেট প্রতি গড় জমির পরিমাণ ছিল ৪১ একর, নীট খাজনা ২৯ টাকা, শেয়ারের সংখ্যা ৪, এবং শেয়ার প্রতি খাজনা-বাবদ নীট আয় ৭ টাকা। বাকী ১৩.৮ শতাংশ এস্টেট নিয়ন্ত্রণ করত ৩৯.৩ শতাংশ পরিমাণ জমি, এস্টেট পিছু গড় জমির পরিমাণ ছিল ১২২৮ একর, নীট খাজনা ১৭১১ টাকা, শেয়ারের সংখ্যা ৬, এবং শেয়ার-প্রতি খাজনা

বাবদ নীট আয় ২৮৫ টাকা।[7] ভূস্বামীদের মধ্যে এই চূড়ান্ত ভেদ পরবর্তী সময়ে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ওপর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে। অধিকাংশ খাজনাভোগীর আয় এবং এমনকি জীবনযাত্রা মানকে ধনী বা মাঝারি চাষীদের থেকে আলাদা করা যেত না। এই শ্রেণী দরিদ্র হয়ে পড়ছিল, এবং ক্রমশই আরো দরিদ্র হচ্ছিল। ফলে এরা প্রচণ্ড উপনিবেশবাদ বিরোধী হয়ে উঠতে লাগল। শিক্ষা ও সামাজিক মর্যাদার মধ্যে লালিত এবং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নেতৃত্বে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে এরা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পেরেছে। বিশেষত ১৯১৯ সালের পর নিয়ন্ত্রিত ভোটাধিকারে ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে এরাই গণ সমর্থন জুগিয়েছে। জাতীয় আন্দোলনকে 'জনগণ মুখী' করার কাজে এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। তথাপি, দারিদ্র সত্ত্বেও, এরা ছিল খাজনা ভোগী এবং এই ব্যাপারটি জাতীয় কংগ্রেসের সামাজিক কর্মসূচি ও তার জাতীয় সংহতির ধাঁচের ওপর অনিবার্যভাবে ছাপ ফেলেছিল।

একইভাবে বিকাশমান কৃষক আন্দোলনে, বিশেষত ১৯২০র দশকে, এই শ্রেণী সুনির্দিষ্ট ভূমিকা নিতে শুরু করেছিল। প্রত্যক্ষভাবে ছাড়াও, ধনী ও মাঝারি কৃষকের উপর ক্ষমতা ব্যবহার করে এরা কৃষক আন্দোলন ও তার কর্মসূচির ওপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা তাৎপর্যপূর্ণ।

ভারতের বাণিজ্যিক বুর্জোয়া শ্রেণী প্রথমে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরে এরা বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে ভারতীয় অর্থনীতির সংযোজক হিসেবে বিকাশ লাভ করে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উন্নতিতে সাহায্য করেছে। কৃষিগত কাঁচামাল ও খাদ্য দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাছাড়া ভারতীয় অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান সমন্বয় সাধনের ফলে এবং রাষ্ট্র, ভূস্বামী ও মহাজনের পাওনা শোধ করার উদ্দেশ্যে উৎপাদিত পণ্য বাধ্যতামূলকভাবে বিক্রি করার জন্য কৃষকের ওপর চাপের ফলে, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্রমোন্নতি হয়েছিল। এইগুলি বাণিজ্যিক বুর্জোয়া শ্রেণীকে বিকাশের প্রচুর সুযোগ করে দিয়েছে। গ্রামীণ বাজারের কাঠামো এবং কৃষকের বাধ্যতামূলকভাবে ফসল বিক্রি ও পরে ভোগ্য পণ্য কেনার প্রয়োজন, বণিক শ্রেণীকে কৃষি-উদ্বৃত্তের এক প্রধান ভোক্তায় পরিণত করেছিল। কৃষির বাণিজ্যিকরণের ফলে প্রায়শই ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে দাদন নিয়ে চাষ করতে হত এবং উৎপন্ন ফসল একচেটিয়া মাধ্যমে বাজারে বিক্রি হত; এর ফলে ব্যবসায়ী শ্রেণী আরো শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এদের বেশীর ভাগই একধারে মহাজন ও ব্যবসায়ী। এরাই দূরবাসী ভূস্বামী হিসেবে উত্তরোত্তর জমির ওপর নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করাও শুরু করেছিল।

অর্থনীতিতে উপনিবেশবাদের অনুপ্রবেশ, প্রশাসনিক ও আইন কাঠামো, ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা এবং গ্রামীণ জীবনের উত্তরোত্তর বাণিজ্যিকরণ গ্রামের মহাজনের পক্ষে অনুকূল আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। এই মহাজনরা গ্রামীণ অর্থনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করল, এরা ভূস্বামী

কৃষক, ভোগদখলকারী প্রজা এবং জমিদারদেরও জমি গ্রাস করতে শুরু করেছিল। এর ফলে গ্রামাঞ্চলে চাপা উত্তেজনার পরিস্থিতি দেখা দেয়, যার পরিণতিতে দুটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা লক্ষ্য করা গেল। প্রথমত, বহু অঞ্চলে ক্ষুদ্র ও এমনকি বৃহৎ ভূস্বামীরাও তাদের সাধারণ শত্রু সুদখোর মহাজনের বিরুদ্ধে কৃষকের পাশে এসে দাঁড়াতে শুরু করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, অ-কৃষিজীবী মহাজনদের অনুপ্রবেশের ফলে গ্রামাঞ্চলে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হতে লাগল তার ফলে সামাজিক ও রাজনৈতিক শান্তি প্রায়শই বিঘ্নিত হত এবং সেই কারণে মহাজনরা ঔপনিবেশিক প্রশাসকদেরও ভর্ৎসনার লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু, মহাজনরা ছিল ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত লুণ্ঠন পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এরা রাজস্ব ব্যবস্থা এবং কৃষিসংক্রান্ত অন্যান্য প্রক্রিয়াকে সচল রেখেছিল। এরাই রপ্তানি শস্য উৎপাদন ও তার রপ্তানি সম্ভব করেছিল। কৃষকের পুরুষানুক্রমিক ক্ষেত্রে তাদের জীবন ধারা সহ কৃষি সংক্রান্ত ন্যূনতম কাজকর্ম বজায় রাখার ভূমিকা ছিল প্রধান। গ্রামাঞ্চলে এরাই ছিল সর্বশেষ এবং একমাত্র রক্ষা কবচ। বস্তুত, জমিদার বা আগেকার রাজস্বভোগীদের মতই এরা ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও কৃষকের মাঝখানে শ্রেণী। সুতরাং ঔপনিবেশিক প্রশাসকরা এদের অশুভ শক্তি বলে কটূক্তি করলেও, এই অশুভ শক্তিকে প্রয়োজনীয় বলে ঘোষণাও করেছিল।[৪]

মহাজনরা যেমন ভূস্বামী হয়েছিল ঠিক তেমনি অনেক ভূস্বামী ও উঁচু শ্রেণীর রায়ত,—ধনী ও মাঝারি কৃষক—পরিণত হয়েছিল মহাজনে। বিশেষ করে তারা ঋণ দিত ক্ষুদ্র প্রজা, ভাগচাষী ও কৃষি শ্রমিকদের, যাদের গচ্ছিত রাখার মত কিছু ছিল না এবং সেজন্য তারা নিয়মিত মহাজনদের খাতক হতে পারত না। উপরন্তু ভূস্বামী ও উঁচু শ্রেণীর রায়তরা পাওনা আদায়ের জন্য তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা, বর্ণ মর্যাদা ও আত্মীয়তার সম্পর্ককে কাজে লাগাতে পারত। ১৯৫১-৫২ সালে যেখানে মোট গ্রামীণ ঋণের ৪৪.৮ শতাংশ সরবরাহ করেছে পেশাদার মহাজন,[৫] প্রায় ২৫ শতাংশ এসেছে কৃষি-মহাজনদের কাছ থেকে। এইভাবে ভূস্বামী ও ধনী কৃষকরা মহাজনদের প্রতিযোগী হয়ে উঠেছিল এবং পুরোন মহাজনদের সঙ্গে এই সাম্প্রদায়িক বিরোধিতার সেটা একটা কারণ। এর জন্যই পূর্বোক্তরা এক ভেজাল র‍্যাডিক্যালিজম সৃষ্টি করেছিল, যা ছিল মহাজন বিরোধী, কিন্তু মহাজনী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তা অর্থপূর্ণ বিরোধিতা করেনি।

এই উপ-বিভাগের উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, ঔপনিবেশিক যুগে কৃষি সম্পর্কের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল তা ভূস্বামী, ব্যবসায়ী ও মহাজনদের তুলনামূলক শক্তি বৃদ্ধি। কৃষির কিছুটা বাণিজ্যকরণের ফলে যে আয় বেড়েছিল তার অধিকাংশই গিয়েছে এদের ভাগে।

(খ) প্রকৃত চাষী উত্তরোত্তর পরিণত হয়েছে দুর্বহ ভাবে পীড়িত 'উঠবন্দী' প্রজা কি ভাগচাষীতে, যাদের উপর আরোপিত শর্তাবলী ক্রমশই খারাপ

হচ্ছিল। ১৯৫১ সালে গ্রামীণ কৃষিনির্ভর পরিবারের ২৭.৮ শতাংশ কৃষক ছিল জমির মালিক আর বাকি পরিবারগুলি ছিল প্রজা ও কৃষি শ্রমিক।[10] ঔপনিবেশিক পর্বের শেষাশেষি কৃষকদের ওপর খাজনা ও সুদের বোঝার পরিমাণ হয়েছিল বছরে ১৪০০ কোটি টাকা বা প্রায় ৫০০০ মিলিয়ন ডলার।[11]

সাম্প্রতিক ঔপনিবেশিক যুগে কৃষির শ্রেণী কাঠামোর এক প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কৃষকদের মধ্যেও বহুবিধ স্তরের উপস্থিতি।

উচ্চতম স্তরে আবির্ভূত হল ধনী কৃষকের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি শ্রেণী। মালিক কৃষক এবং নিরাপত্তা-প্রাপ্ত প্রজা উভয়েই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা কৃষির বাণিজ্যিকরণের ফলে সুবিধা আদায় করতে পেরেছিল। তার কারণ, জমির ওপর এদের নিয়ন্ত্রণ ছিল, প্রজাস্বত্ব আইনে ভোগদখলকারী রায়তদের নিরাপত্তা বিধান এবং অ-কৃষিজীবীদের কাছে জমি হস্তান্তর রহিত করেছিল, এবং ভূমিচ্যুত কৃষকদের তাদের জমি কেনার সুযোগ ও মহাজনী কারবার ও ব্যবসার সুযোগ দিয়েছিল। কোন কোন অঞ্চলে এইসব ধনী কৃষক অর্থাৎ মালিক ও ভোগদখলকারী রায়তদের অনেকেই, চড়া খাজনা পাওয়ার সুযোগের ফলে, কার্যত নিজেদের কৃষক ভূমিকা বজায় রেখেও কার্যতঃ ভূস্বামী হয়ে উঠেছিল। অন্যান্য অঞ্চলে এরাই পুঁজিবাদী বা আধা-পুঁজিবাদী চাষ প্রবর্তনের আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল।

গ্রামে এই শ্রেণীভেদের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ধনী কৃষক মহাজনের উদ্ভব। ১৯৫১-৫২ সালে গ্রামীণ ঋণের প্রায় ২৫ শতাংশ জুগিয়ে ছিল কৃষক মহাজন। শুধু তাই নয়, আরও ১৪.৪ শতাংশ এসেছিল খাতকদের আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে।[12]

ধনী কৃষক খাজনা ও করদাতা হিসেবে সাম্রাজ্যবাদ ও জমিদার-বিরোধী হত। কিন্তু বিত্তবান এবং শ্রমিক নিয়োগ কর্তা হিসেবে তার পক্ষে সামাজিক-অর্থনৈতিক বিষয়ে কোন ভাবেই র‍্যাডিকাল হওয়া সম্ভব ছিল না। তদুপরি প্রকৃত মধ্যস্বত্ব ভোগী হিসেবে,—আইনের দিক দিয়ে যে তখনও মালিক কৃষক বা ভোগদখলকারী রায়ত,—কিংবা সম্ভাব্য মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে, তার ভূমি-সংক্রান্ত ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল গভীরভাবে রক্ষণশীল। ধনী কৃষকের এই রক্ষণশীল চরিত্র জাতীয় কংগ্রেসের কৃষি কর্মসূচির রক্ষণশীলতার প্রধান কারণ। র‍্যাডিকাল ও বামপন্থী জাতীয়তাবাদীরাও যে কয়েকটি ক্ষেত্রে কাগজে কলমে প্রস্তাব নেওয়া ছাড়া সহজে উচ্ছেদযোগ্য প্রজা, ভাগচাষী এবং কৃষি শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছিলেন, তার জন্যও ধনী কৃষকদের এই চরিত্র দায়ী।

ধনী কৃষকের পরেই নিচেই ছিল মাঝারি কৃষক শ্রেণী। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় মালিকানা-চ্যুতি ও শ্রেণীগত বিলুপ্তির প্রক্রিয়া থেকে এরা কোনক্রমে রক্ষা পেয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানে এবং রাজনৈতিক ও ভূমি সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে এরা ছিল ধনী কৃষকের সমগোত্রীয়।

অন্যদিকে বিশাল কৃষক সম্প্রদায় ক্রমশ ভূমিহীন খেতমজুর এবং ছোট চাষীতে পরিণত হচ্ছিল। সুরেন্দ্র জে. প্যাটেল এদের বর্ণনা করেছেন খুদে জমির মজুর বলে। এদের কেউ কেউ ছিল খুব সামান্য জমির মালিক, আর বাকিরা 'উঠবন্দী' প্রজা ও ভাগচাষী। এদের জমিতে স্বত্ব ছিল না, নয়তো স্বত্ব ছিল ঋণে নিমজ্জিত।[১৪] এই খুদে মালিকদের সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল, এদের শ্রেণী অবস্থান পরিবর্তিত হচ্ছিলঃ এরা ছিল কৃষক, পরিণত হচ্ছিল প্রলেতারিয়েতে। চরিত্রগত দিক থেকে এদের ক্ষুদ্র কৃষক বলে অভিহিত করা যেতে পারে, কারণ এদের দৃষ্টিভঙ্গি, আশা-আকাংখা ভয়-ভাবনা সবই ছিল কৃষকের মতন। অন্যদিকে এদের আধা-প্রলেতারিয়েত বলেও বর্ণনা করা যায়, কেননা এদের সামাজিক স্বার্থ ইতিমধ্যেই ভূমিহীনদের সমধর্মী হয়ে পড়েছিল। উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতের কৃষি শ্রেণী কাঠামো সম্পর্কিত পরিচ্ছেদে এবিষয়ে আরো আলোচনা করার আছে।

ভূমিহীন খেতমজুরদের সংখ্যা বৃদ্ধি করল অধিকারচ্যুত কৃষক, বিধ্বস্ত কারিগর এবং আধুনিক শিল্প ও চাকরির ক্ষেত্রে স্থান না পাওয়া ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা। লক্ষণীয় যে, খেতমজুররা হ'ল এক নূতন সামাজিক শ্রেণী, গ্রামীণ প্রলেতারিয়েত, জমির মালিক কৃষকদের থেকে শ্রেণী হিসেবে যারা উত্তরোত্তর স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছিল। গ্রামীণ জনসংখ্যার অর্ধেকই ছিল এইসব খুদে মালিক এবং ভূমিহীন শ্রমিক। তারা যে শুধু সবচেয়ে দরিদ্র ও সবচেয়ে শোষিত ছিল তাই নয়, বস্তুত ভূমি সম্পর্কের মামুলী সংস্কার করে এদের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, প্রচলিত কৃষি কাঠামোতে এদের সমস্যার সমাধান ছিল একেবারেই অসম্ভব।

কৃষিনির্ভর জনসাধারণকে বিভিন্ন গ্রামীণ শ্রেণীতে সংখ্যাগতভাবে বিভক্ত করা কঠিন কাজ, এবং সে চেষ্টা পুরোপুরি হয়ওনি। এ কাজ করতে গেলে সব রকম অর্থনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিরুদ্ধ যুক্তি সত্ত্বেও, শেষপর্যন্ত ভূমির মালিকানা ব্যবহারিক স্বত্ব সংক্রান্ত তথ্যের উপরেই নির্ভর করতে হয়, কারণ একমাত্র ঐ বিষয়েই পরিসংখ্যান পাওয়া যায় এবং সেগুলিকে কাজেও লাগানো যায়। অবশ্য এক্ষেত্রেও কিছুটা ইচ্ছামত ভেদ-রেখা টানতে হয়। যেমন, সুরেন্দ্র জে. প্যাটেল মনে করেন, ৫ একরের কম জমি ভোগদখল বা চাষ করে (মালিকানা নয়। প্রকৃত চাষে মালিকানা পুরোপুরি প্রতিফলিত নাও হতে পারে, কারণ ভূস্বামীরা অনেক প্রজার কাছে তাদের জমি খাজনায় বিলি করে দিত। কাজেই মালিকানাধীন বা প্রজাস্বত্বাধীন যাই হোক না কেন, জোত-এর পরিমাণ দিয়েই কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে গ্রামীণ শ্রেণী কাঠামো ও স্তরবিন্যাস সম্পর্কে স্পষ্টতর ধারণা পাওয়া যায়) এমন ব্যক্তিদের খুদে মালিক ও ভূমিহীন খেতমজুর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। তাঁর মতে, ১৯১৩ সালে কৃষিতে নিযুক্ত মোট জনসংখ্যার ৭১.৯ শতাংশ ছিল এই শ্রেণীর, এর মধ্যে ভূমিহীন খেত-

মজুর ছিল ৩৭.৮ শতাংশ।[14] **আমার মনে হয় সাধারণভাবে ২.৫ একরের কম জমি** ভোগদখল করে এমন চাষীকে প্রলেতারিয়, আধা-প্রলেতারিয় বা খুদে মালিক শ্রেণী হিসেবে অবশ্যই চিহ্নিত করা যায়। যাই হোক না কেন, এটা স্পষ্ট যে **ঔপনিবেশিক যুগের শেষ পর্বে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেণীভেদ খুবই অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল।** ১৯৫১ সালের এগ্রিকালচারাল লেবার ইনকোয়্যারির প্রতিবেদন অনুসারে শতকরা ১৯ ভাগ গ্রামীণ পরিবারে কোন জমি ছিল না।[15] যাদের জমি ছিল তাদেরও ৩৮.১ শতাংশের জমির পরিমাণ ছিল ২.৫ একরের নিচে এবং মোট জমির ৫.৬ শতাংশ (১৬.৮ শতাংশের জমি ছিল ১ একরের নিচে এবং ২১.৩ শতাংশের জমি ছিল ১ একর থেকে ২.৫ একরের মধ্যে)। এদের আধা-প্রলেতারিয় বা খুদে মালিক বলা যেতে পারে। ২১ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারের জমি ছিল পরিবার প্রতি ২.৫ একর থেকে ৫ একরের মধ্যে এবং মোট জমির ৯.৯ শতাংশ। এদের বলা যায় ক্ষুদ্র চাষী। ১৯.১ শতাংশ পরিবার ছিল ৫ থেকে ১০ একর জমির মালিক এবং এই রকম জমির পরিমাণ ছিল মোট জমির ১৭.৬ শতাংশ। এরাই ছিল ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষী। ১৬.২ শতাংশ পরিবারের ছিল ১০ থেকে ২৫ একর জমি যা মোট জমির ৩২.৫ শতাংশ। এদের বলা যায় মাঝারি ও ধনী চাষী। ৩.২ শতাংশ পরিবারের জমি ছিল ২৫ থেকে ৫০ একরের মধ্যে যা মোট জমির ১৯ শতাংশ। এরা স্পষ্টতই ধনী চাষী। আর ১.৪ শতাংশ পরিবারের দখলে ছিল পরিবার প্রতি ৫০ একর বা তারও বেশি, মোট জমির ১৫.৪ শতাংশ। এরা বৃহৎ ভূস্বামী। বৃহৎ ভূস্বামীরা ছিল জমিদার শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।[16]

কৃষক সমাজের মধ্যে এই শ্রেণীভেদ ঘটছিল সারা দেশ জুড়েই। উদাহরণ স্বরূপ, পঞ্জাবে ১৯৩৯ সালে ভূসম্পত্তির মোট সংখ্যার ৪৮.৮ শতাংশ ছিল ৩ একরের মধ্যে, এবং মোট কর্ষণযোগ্য জমির ৬ শতাংশ। অন্যদিকে ২৫ একরের বেশি ভূসম্পত্তির পরিমাণ ছিল মোট ভূসম্পত্তির ৬.৩ শতাংশ, মোট জমির ৫২.৮ শতাংশ।[17] ১৯৪৬ সালে যুক্ত প্রদেশে মোট জমির ৫৫.৮ শতাংশ ছিল ২ একরের কম এবং এইরকম জমি ছিল মোট জমির ১৪.১ শতাংশ। অন্যদিকে, ২৫ একরের বেশি জমির মোট ভূসম্পত্তির ০.৯ শতাংশ অধিকার করেছিল মোট জমির ১২.৯ শতাংশ।[18] মাদ্রাজের রায়তী এলাকায় ২২.৮ শতাংশ ভূস্বামীর জমি ছিল ১ একরের কম এবং মোট জমির ৩.৪ শতাংশ। আর অন্যদিকে, ০.৮ শতাংশ ভূস্বামীর জমি ছিল ১৮ একরের বেশি এবং মোট জমির ১৩.১ শতাংশ।[19]

ঔপনিবেশিকোত্তর যুগের কৃষি শ্রেণী কাঠামো

স্বাধীনতার জন্মলগ্নে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব কৃষি কাঠামোর পরিবর্তন সাধনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। এজন্য এঁরা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এক

নতুন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যা ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশের প্রয়োজন মেটাতে পারে। শুরু থেকেই তাঁরা কয়েকটি সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন: (১) শিল্পায়ন যতই দ্রুত হোক না কেন তাতে গ্রামাঞ্চলের বিপুল সংখ্যক বেকার ও আধা বেকারের কাজ পাওয়া সম্ভব হবে না। সুতরাং তাদের গ্রামেই থাকতে হবে এবং জমির উপর নির্ভরশীল হয়েই বাঁচতে হবে। ধনতান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থা এই শ্রম শক্তিকে নিয়োগ করতে পারেনি; এর বিপরীত ঘটনাই বরং দেখা গেছে। ( ) কৃষি উৎপাদন অবশ্যই বাড়াতে হবে এবং কৃষিজাত উদ্বৃত্তকে শহরের দিকে পরিচালিত করতে হবে; কিন্তু ক্ষুদ্র কৃষক উৎপাদকের দ্বারা একাজ সম্ভব নয়। একমাত্র ধনী কৃষকরাই তা পারে। (৩) ভারতের মত তুলনামূলকভাবে জনাকীর্ণ দেশে কৃষক ভূস্বামীদের ভূমিচ্যুত করার সুযোগ ধনী কৃষককে দেওয়া যায় না কারণ তাহলে বিপুলসংখ্যক প্রকৃত বেকার প্রলেতারিয়েত বিরাট সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপদ ডেকে আনবে। এরজন্য প্রয়োজন ছিল এক নতুন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যা না হবে সামন্ততান্ত্রিক বা আধা-সামন্ততান্ত্রিক না পুরোপুরি ধনতান্ত্রিক এবং যা একদিকে কৃষিতে বিপণন যোগ্য উদ্বৃত্ত উৎপাদন করবে, অন্যদিকে ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র মালিকদের নিরাপত্তা বিধান করে গ্রামাঞ্চলের বিপুল সংখ্যাক মানুষকে কৃষিতে নিয়োজিত রাখবে, যতদিন না তারা, কয়েক দশক শিল্পায়নের পর, অ-কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে নিযুক্ত হতে পারে। এই কাঠামোর একেবারে নিচে থাকার কথা ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র কৃষকের ভূসম্পত্তি এবং সর্বোচ্চ স্তরে ধনী কৃষক তথা ধনতান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থা। বস্তুত, উনিশ শতকের উপান্তে বিচারপতি রানাডে এই নতুন কৃষি কাঠামোর প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। তাঁর ভাবনা-চিন্তার অনেকটাই ভারতীয় পরিকল্পনাকারীদের কাছে পৌঁছেছিল রাজনৈতিক ও বুদ্ধিগত ঐতিহ্যের মাধ্যমে।[২০] আধা-সামন্ততান্ত্রিক আখ্যা দিয়ে জমিদারী ব্যবস্থাকে সমালোচনা করে রানাডে প্রকৃত কৃষককে জমি দেওয়ার এবং পুরনো জমিদারদের পুঁজিবাদী কৃষকে রূপান্তারত করার কর্মসূচী গ্রহণ করতে বলেছিলেন। তিনি লিখলেন: "যারা প্রকৃত চাষ করে তাদের ভূমিহীন করে রাখা জাতীয় ক্ষতি, কিন্তু দেশ জুড়ে ছোট চাষীর নিয়ন্ত্রণে বদ্ধ গতিহীন কৃষিও কম ক্ষতিকর নয়। বড় চাষী ও ছোট চাষী…গ্রামীণ সমাজের এই মিশ্র গঠন দেশের স্থায়িত্ব ও প্রগতির জন্য প্রয়োজন।"[২১] কৃষক সম্প্রদায় যাতে ভূমিহীন প্রলেতারিয়েতে রূপান্তরিত এবং বিভক্ত না হয়ে পড়ে সেজন্য ক্ষুদ্র অত্যাবশ্যক শস্য-উৎপাদক তথা কৃষিপণ্য উৎপাদককে অক্ষত রেখে জমিদারতন্ত্রের জায়গায় ধনী ও মাঝারি কৃষকদের স্থাপিত করার এই নীতি ১৯৪৭ সালের পর কংগ্রেস দল ও ভারত সরকার গ্রহণ করেছিল।[২২] কখনো এই নীতিকে আক্রমণ করেছে দক্ষিণপন্থীরা, তাদের দাবী পুঁজিবাদী কৃষকের জন্য আরো বেশি আনুকূল্য। আবার কখনো একে আক্রমণ করেছে বামপন্থীরা, তারা জমির আরো সুষম বণ্টন দাবী করেছে। দক্ষিণপন্থীদের আক্রমণের মোকাবিলা সহজেই করা গেল, কারণ কৃষিতে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের

সম্ভাবনা ছিল স্পষ্ট এবং একই সাথে জমির অবাধ কেন্দ্রীভবনের বিপদও ছিল চোখের সামনে। বিপুল সংখ্যক ক্ষুদ্র চাষী অর্থনৈতিক দিক দিয়ে টিকে থাকতে অক্ষম, প্রযুক্তিবিদসুলভ এই সমালোচনার জবাব দেওয়ার চেষ্টা হ'ল দু ভাবে। ১৯৫০-এর দশকে কৃষি সমবায় গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া হল। কিন্তু দুটি বাস্তব বাধার সম্মুখীন হয়ে এই কর্মসূচী পঙ্গু হয়ে পড়ল—প্রথমত সঙ্গতিহীন ও ভূমিহীন কৃষকদের একত্রিত করলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে টিকে থাকা অসম্ভব, আর দ্বিতীয়ত দেশের বর্তমান শ্রেণীগত ও রাজনৈতিক কাঠামো নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ধনী ও মাঝারি কৃষকের জমি সমবায়বদ্ধ করা যায় না। অন্য উত্তরটি হল, ক্ষুদ্র কৃষককে টিকে থাকার যোগ্য করে তোলার জন্য রাষ্ট্রীয় সহায়তা-প্রাপ্ত ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা ও বিপণন কাঠামো গড়ে তোলা এবং আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ।

শাসকদলের কৃষি কর্মসূচী সম্পর্কে বামপন্থী সমালোচনাও অকার্যকর হয়ে পড়েছিল। কারণ তা বহুলাংশে অলীক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রথমত এঁরা শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার অভিযোগ আনলেন। আসলে শাসকদল কৃষি কাঠামোয় পরিবর্তন আনছিল, তবে তা ভূমিহীন কৃষককে ভূমি দিয়ে নয়, ভূস্বামীদের ক্রমশ ধনী কৃষক ও পুঁজিবাদী কৃষকে রূপান্তরিত করে এবং মাঝারি ও বৃহৎ প্রজাদের জমির মালিক করে। বামপন্থীরা জমির উধর্বসীমা বেঁধে দেওয়ার দাবী জানালেন, কিন্তু বৃহৎ ভূস্বামীরা আত্মীয় স্বজন ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে জমি ভাগ করে দিয়ে সহজেই ফাঁকি দিল। ফলে জমির উধর্বসীমা নির্ধারণের দ্বারা বণ্টনযোগ্য জমি সৃষ্টি হল না, সৃষ্টি হল বহুসংখ্যক ধনী কৃষকের জোতদারি। এবার বামপন্থীরা জমির উর্ধ্বসীমা নামিয়ে আনার দাবী জানাল কিন্তু একমাত্র ধনী কৃষককে ভূমিচ্যুত করতে পারলে তবেই এর দ্বারা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বণ্টনযোগ্য জমি উদ্ধার সম্ভব হতে পারত। যে সরকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে ধনী ও মাঝারি কৃষকের ওপর নির্ভরশীল তার পক্ষে রাজনৈতিক কারণেই এটা করা অসম্ভব। বস্তুত, বামপন্থীরাও ধনী কৃষককে আক্রমণ করার সাহস দেখায়নি। হয় তারা কল্পিত শত্রু সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে লড়াই করেছে নয়তো ধনী কৃষককে আধা-সামন্ততান্ত্রিক জমিদার বানিয়ে আক্রমণ করতে চেয়েছে। প্রকৃত পক্ষে, ভারতবর্ষের কৃষি শ্রেণী কাঠামো আজ এমন স্পষ্টভাবে স্তরায়িত হয়েছে যে বর্তমানে ধনী কৃষক প্রলেতারিয়েত ও আধা-প্রলেতারিয়েত শক্তির মুখোমুখি। মাঝারি, এমনকি ক্ষুদ্র কৃষকেরও সমর্থন তার পক্ষে।

ভূমি সংস্কার ও অন্যান্য কর্মসূচীর প্রভাব কৃষি শ্রেণী কাঠামোর ওপর কীভাবে পড়েছে? (১) জমিদাররা ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক কৃষি কাঠামো অদৃশ্য হয়ে গেছে বা হচ্ছে। কিন্তু বড় বড় মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলুপ্তির ফলে

ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টনযোগ্য জমি সামান্যই পাওয়া গেছে। বরং প্রথম দিকে কিছু সংখ্যক জমি-ভোগদখলকারী প্রজাই ভূস্বামীদের দ্বারা জমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছিল, যেখানে তারা ধনী কৃষকে রূপান্তরিত হয়ে জমিতে নিজে চাষ বা পুঁজিতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষের সুযোগ পেয়েছিল। তবে প্রাক্তন প্রজাদের অনেকেও মালিক কৃষকে পরিণত হয়েছে। (২) ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা জমিদারদের পক্ষেই গিয়েছিল, এই অর্থে যে তাদেরই কৃষিশ্রেণী কাঠামোর শীর্ষে থাকার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, যদিও নিজেদের শ্রেণীগত অবস্থান পরিবর্তন করতে তারা ক্রমশ বাধ্য হয়েছে। (৩) মালিকানা-কৃষি বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিপত্তি ধনী কৃষকের হাতে চলে গেছে ও যাচ্ছে। বহু কৃষি কর্মসূচী যেমন ভূমি-সীমা সংক্রান্ত—যেগুলিকে বামপন্থীরা প্রতিক্রিয়াশীল এবং সামন্ততন্ত্র ও জমিদারদের সাহায্যকারী বর্ণনা করেছে সেগুলি আসলে ধনী কৃষক স্বার্থ বা তার চিন্তাধারার প্রতি আনুগত্যের ফল। (৪) ভূমি-সীমা নিয়ন্ত্রণ কমাতে পেরেছিল বৃহৎ ভূসম্পত্তির পরিমাণ, কিন্তু ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করার মত কোন জমির ব্যবস্থা করতে পারেনি। এর ফলে ধনী কৃষক জমি কেনার উৎসাহ হারিয়েছে এবং সে এখন তার আর্থিক উদ্বৃত্ত ব্যবহার করে জমি কেনার জন্য নয়, যে জমি আছে তার উন্নতিসাধনের জন্য (বড় জোর জমি ইজারা নেয়, প্রায়শই ছোট মালিকদের কাছ থেকে)। এইভাবে ক্ষুদ্র কৃষককে উৎখাত না করে এবং জমি আর কেন্দ্রীভূত হতে না দিয়ে কৃষিতে পুঁজিতন্ত্রের শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছে। বড় জোর বলা যায়, জমিদারদের স্বার্থে আঘাত হেনে ধনী, মাঝারি ও ক্ষুদ্র কৃষকরা উন্নতিলাভ করেছে। অন্যদিকে, পুঁজিতন্ত্রের বিস্তৃতির ফলে ব্যাপকতর কর্মনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। (৫) পুঁজিবাদের ক্রমবিকাশ যে রূপ নিচ্ছে তা হল ধনী-কৃষক চাষ-এর উন্নতির। (৬) প্রজাস্বত্ব অত্যন্ত হ্রাস পেয়েছে। যদিও বর্তমানে প্রজাস্বত্ব কী পরিমাণে আছে তা আগের মত স্পষ্ট নয়। সেই কারণেই প্রজাস্বত্ব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করাও কঠিন হয়ে পড়েছে। তাছাড়া অনগ্রসর এলাকার সামনে যা ভবিষ্যতের দর্পণ সেই কৃষিতে উন্নয়নশীল অঞ্চলে আধা-সামন্ততান্ত্রিক প্রজাস্বত্ব কার্যত আর নেই। (৭) এরই সঙ্গে শ্রমিকদের সংখ্যা ও অনুপাতও নিয়মিতভাবে বেড়ে চলেছে; এবং তার ফলে বর্তমানে এরাই গ্রামাঞ্চলের বৃহত্তম সামাজিক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই বৃদ্ধি আসলে যেরকম ভাবা হয়ে থাকে সেভাবে ক্ষুদ্র কৃষক সম্প্রদায়কে ভূমিহীন করে দেওয়ার ফলে ঘটেনি। কেননা, ১৯০৫ এর দশকে প্রাথমিক উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার পর প্রকৃত পক্ষে উল্লেখযোগ্য ভাবে ক্ষুদ্র কৃষক উৎসাদন ঘটেছে বলে মনে হয় না।[২৪]

ভূমি সংস্কার ও কৃষির ক্ষেত্রে অন্যান্য পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত নতুন গ্রামীণ শ্রেণী কাঠামোর দিকে একবার তাকান যাক। ১নং সারণীতে[২৫] আমরা

পাচ্ছি বিভিন্ন আয়তনের প্রকৃত ভূসম্পত্তিতে জনসংখ্যার শতকরা হার এবং প্রতিটি আয়তনের ভূসম্পত্তির নিয়ন্ত্রণাধীন জমির পরিমাণ। ২নং সারণী তৈরি করা হয়েছে ১৯৭১-৭২ সালে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইনডিয়ার সমীক্ষা থেকে। এতে অবশ্য শুধু আয়তনের ভূসম্পত্তিতে পরিবারের শতকরা হার পাওয়া যাবে। কেবলমাত্র তুলনামূলক বিচারের উদ্দেশ্যেই এটি এখানে দেওয়া হল।

সারণী 1

ভূসম্পত্তির আয়তন বা জোতের পরিমাণ (একর)	জনসংখ্যার শতকরা হার	মোট জমির শতকরা হার
0 — 2.5	48.23	6.71
2.5— 5.0	17.43	12.17
5.0—10.0	16.59	19.95
10.0—15.0	7.29	13.85
15.0—20.0	3.46	9.42
20 0—25.0	2.09	7 20
25.0—30.0	1.37	5.53
30.0—50.0	2.35	12.99
50.0 এবং তদূর্ধ্ব	1.18	12.19

সারণী 2

ব্যবহৃত জমি (একর)	পরিবারের শতকরা হার		
0.0	27 750	42.192	60.854
0.01— 0.50	7.553		
0.50 — 1.00	6 889		
1 00— 1.25	4.342	18.662	
1.25— 2.50	14.320		
2 50 - 5.00	16.330		
5.00— 7.50	8.614		
7.50—10.00	4 239		
10.00—15 00	4.626		
15 00—20.00	2.062		
20.00—25 00	1.239		
25.00—30.00	.688		
30.00—50.00	1.043		
50.00 এবং তদূর্ধ্ব	.384		

১নং ও ২নং সারণীর মধ্যে পুরোপুরি তুলনা করা চলে না, কারণ কোন একটি পরিবারের জনসংখ্যা ব্যবহৃত জমির আয়তনের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। এই কারণে আমরা আমরা শুধু ১নং সারণীর ওপর নির্ভর করেই আলোচনা করেছি।

দেখা যাচ্ছে যে, সমস্ত গ্রামীণ জনসাধারণকে যদি কৃষক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ধরে নেওয়া হয় তাহলে ভূমি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অত্যন্ত বৈষম্যপূর্ণ। কিন্তু যদি এর থেকে আমরা শতকরা ৪৮ জনকে বাদ দিই যারা বস্তুত ক্ষুদ্র কৃষক নয়, লেনিনের ভাষায় যারা প্রলেতারিয় বা আধা-প্রলেতারিয় (অনুরূপভাবে. ধনী কৃষকদের গ্রামীণ বুর্জোয়া এবং মাঝারি কৃষকদের গ্রামীণ পেটি বুর্জোয়া বলে বর্ণনা করা যায়। ধনী, মাঝারি ও ক্ষুদ্র এই তিন ভাগে কৃষক সম্প্রদায়কে ভাগ করার অর্থ, তারা একই শ্রেণীর অংশ বলে ধরে নেওয়া), তাহলে আমরা পাব (৩নং সারণীতে[২৬] যেমন দেখান হয়েছে) টিকে থাকতে সক্ষম এমন জমির মালিক শ্রেণীগুলির একটি চিত্র। মালিকানাধীন জমির আয়তনের দিক দিয়ে না হলেও বৈষম্য ও বিভেদের দিক দিয়ে এই শ্রেণীর সাদৃশ্য রয়েছে আধুনিক কালে ইতালি, ফ্রান্স ও জার্মানি সহ অন্যান্য ইউরোপীয় কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে।[২৭]

সারণী 3

ভূ-সম্পত্তির আয়তন বা জোতের পরিমাণ (একর)	ভূমি মালিক জনসংখ্যার শতকরা হার (যা মোট গ্রামীণ জনসংখ্যার ৫১ ৭৭ শতাংশ)	ভূমি মালিকবর্গ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত জমির শতকরা হার (মোট ব্যবহৃত জমির ৯৬.২৯ শতাংশ যারা নিয়ন্ত্রণ করে)
2.5— 5.0	33.67	13.05
5,0—10.0	32.04	21.38
10 0—15 0	14.08	14.85
15.0—20.0	6.68	10 10
20 0—25.0	4.04	7.72
25.0—30.0	2.65	5.93
30.0—50.0	4.54	13,92
50.0 এবং তদূর্ধ্ব	2.30	13.07

ভূমি-মালিকদের মধ্যে বৈষম্য খুব বেশি বিসদৃশ নয়। ৫ একরের বেশি জমির মালিকদের ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। শাসক গোষ্ঠীগুলি আইন প্রণয়ন ও আর্থিক কর্মসূচীর মাধ্যমে এইসব মালিকদের সুস্থিত ও সুপ্রতিষ্ঠ করার জন্য সব রকমের চেষ্টা করেছে এবং করছে। উপরন্তু, এই সব গোষ্ঠীই আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে এবং সেই কারণে নিজ স্বার্থ রক্ষার ক্ষমতা এদের আছে। জমির সীমা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত

যে কোন নীতিকে যদি ফলপ্রসূ করে তুলতে হয় তাহলে পরিবারকে একক ধরে পরিবার প্রতি জমির পরিমাণ বেঁধে দেওয়ার চূড়ান্ত সমতাবাদী নীতি গ্রহণ করতে হবে। রাজনৈতিকভাবে, এই ব্যবস্থা যৌথ মালিকানার প্রস্তাবের তুলনায় কম প্রগতিশীল নয়। 'প্রকৃত' কৃষকদের মধ্যে তুলনামূলক ক্ষমতা ও সেহেতু সংহতি থাকায় এটা বিশেষ ভাবে সত্য।

শাসক শ্রেণীগুলির সামনে মূল সমস্যা হল ওই ৪৮ শতাংশ মানুষকে নিয়ে। এদের কোন জমি নেই বা প্রকৃতপক্ষে কোন জমি নেই, এদের জন্য যথেষ্ট কর্মসংস্থান বা প্রয়োজনীয় জীবনযাত্রার মানের ব্যবস্থা করা যায় না, এবং এদের আর কখনো 'কৃষক সম্প্রদায়ের' মধ্যে অন্তর্ভুক্তও করে নেওয়া যাবে না। পরন্তু যদি এরা এদের পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে তাহলে এদের রাজনীতি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই যাবে। কাজেই সেই শ্রেণী চেতনার উদ্ভব হতে না দেওয়া, বর্তমান সামাজিক কাঠামো প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম হলেও এর মধ্যেই তাদের সন্তুষ্ট করে রাখা—এটাই হল রাজনীতি ও মতাদর্শের কাজ। তারা কৃষক সম্প্রদায়ের অংশ কিছুটা এই ধারণা সৃষ্টি করে এই কাজ করা হয়। আর এই বিভ্রম বজায় রাখার জন্য ভূমি বণ্টনের খোয়াব সৃষ্টি করা হয় এদের সামনে। অতি ক্ষুদ্র জমির মালিক চাষীর মনে সম্পন্ন কৃষক হওয়ার স্বপ্ন ও আশা জাগিয়ে রাখার জন্য যতটুকু না হলে নয় ততটুকুই জমি দেওয়া হয়। তাছাড়া এর ফলে যারা সত্যিই ঐতিহাসিকভাবে চিরকাল ভূমিহীন তাদের মধ্যে ঐক্যও গড়ে উঠতে পারে না। বাকি কাজ করা হয় সামাজিক উন্নতি ও জাতীয় সংহতির ধারণার সাহায্যে, বাস্তব জীবনে যার একটা বড় রকমের ভিত্তি রয়েছে। এখানে প্রশ্ন হল: এই ৪৮ শতাংশ প্রলেতারীয় ও আধা-প্রলেতারীয় এবং ৩৪ শতাংশ ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক বা গ্রামীণ পেটি বুর্জোয়া কি জাতি বা ন্যেশান নয়, নাকি যতদিন পর্যন্ত পুঁজিবাদ তাদের আবার ন্যেশনের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার মত পরিণত হয়ে না ওঠেছে, ততদিন তাদের, জাতীয় সংহতির নামে, সমাজের চৌহদ্দির বাইরে দশকের পর দশক অপেক্ষা করতে হবে?

৩

১৯৪৭-এর আগে কৃষক সম্প্রদায় ও জাতীয় সংহতি

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তির আঘাত হানার ক্ষমতা জোরদার করার জন্য কৃষক সম্প্রদায়কে জাতি ও জাতীয় আন্দোলনে শামিল করতে চেয়েছিলেন। অল্পকিছু শিক্ষিত মানুষ অর্থাৎ বাবুরা 'অতি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর' প্রতিনিধি আখ্যা পেয়ে এবং ঔপনিবেশিক

কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিদ্রূপ বিদ্ধ এবং মোটের ওপর উপেক্ষিত হওয়ার ফলে ক্রমবর্ধমান দাবি পূরণের জন্য ঔপনিবেশিক শাসকদের ওপর আরো বেশি চাপ সৃষ্টির ক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে তারা কৃষক সম্প্রদায় সহ অন্যান্যদের টেনে এনে আন্দোলনকে সামাজিক ব্যাপ্তি দিতে সচেষ্ট হয়েছিল। ভারতে কৃষকের জীবনে উপনিবেশবাদের চরম পরিণাম যখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এবং তার ফলে কৃষকদের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ তাকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল, ঠিক সেই সময় জাতীয়তাবাদী নীতিতে এই পরিবর্তন দেখা গেল।

(ক) কৃষক সমাজকে জাতীয় আন্দোলনে শামিল করার জন্য জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব দুটি একীকরণ সূত্র তুলে ধরলেন। প্রথমটি কৃষক সমাজ বা কিষাণ দৃঢ়সম্বন্ধ একটি সামাজিক গোষ্ঠী বা সুখী পরিবার এই ধারণা। এর একটি উদ্দেশ্য ছিল, কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ণ, সম্প্রদায় বা আঞ্চলিক বিভেদ কাটিয়ে তোলা। কিষাণ বা কৃষক সমাজের ধারণার মধ্যেই ছিল শ্রেণী সম্বন্ধতা এবং এমনকি শ্রেণী চেতনার কিছু উপাদান, পরবর্তী কালে র‍্যাডিক্যাল কৃষক নেতৃত্ব এইগুলিকেই তুলে ধরেছেন এবং ব্যবহার করেছেন। কিন্তু জমিদার ও ভূস্বামীর বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামকে সাহায্য করা বা তীব্র করে তোলার জন্য জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব এই ধারণাটি উপস্থিত করেনি, বরং, যেসব অভ্যন্তরীণ বিভেদপ্রবণতা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐক্যবদ্ধ জাতীয় সংগ্রামকে হীনবল করে তুলছিল তাঁরা সেগুলিকে দূর করার হাতিয়ার হিসেবেই একে দেখে ছিলেন। ফলে একটি ঐক্যবদ্ধ কৃষক সমাজ বা কিষাণ সম্পর্কে 'ধারণা'-র ব্যাপক প্রচার সত্ত্বেও কৃষকদের মধ্যে 'শ্রেণী' চেতনা মোটের ওপর খুব নিচু স্তরেই থেকে গিয়েছিল, দেশের বহু অংশে বস্তুত তার অস্তিত্বই ছিল না। কৃষকের চেতনার জাগরণ ঘটেছিল খুব ধীরে, এবং জমিদার ও জোতদাররা যখন ক্রমশ রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল তখনই।

একটি সামাজিক গোষ্ঠী হিসেবে কৃষক সমাজকে চিহ্নিত-করা এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত ক্রমবর্ধমান বিভেদের ফাটল মেরামতের কাজেও ব্যবহার করা হয়েছিল। বস্তুত ক্ষুদ্র ও ধ্বংসপ্রাপ্ত ভূস্বামীদেরও কৃষক সম্প্রদায়ের অঙ্গীভূত করার জন্য একে ব্যবহার করা হয়েছিল।

দ্বিতীয় একীকরণ সূত্রের লক্ষ্য ছিল, কৃষক সম্প্রদায়কে অনুভব করান যে তারাও জাতির অংশ। একে রূপায়িত করার জন্য জাতীয় আন্দোলনে কৃষক স্বার্থেরই প্রাধান্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল, শুধু তাই নয়, অধিকন্তু একথাও জোর দিয়ে বলা যে কৃষক সম্প্রদায়ই হল জাতি বা অন্তত তার মূল উপাদান। এই কারণেই সর্বোচ্চ কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রভাবশালী অংশ কিষাণদের পৃথক সংগঠনকে ভাল চোখে দেখেননি। ১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনের একটি প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয়েছিল: "কংগ্রেস ইতিমধ্যেই কিষাণদের কৃষক ইউনিয়নে সংগঠিত হওয়ার অধিকার পুরোপুরি স্বীকার করে

নিয়েছে। তবে একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে **কংগ্রেস নিজেই হল প্রধানত একটি কিষাণ সংগঠন**।[২৪] (গুরুত্ব সংযোজিত হয়েছে—বি. চ.)

(খ) ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব যে কৃষক সম্প্রদায়কে সংহত করে এবং জাতির অন্যান্য অংশের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন তার একটি বাস্তব কারণ, এই সময় কৃষক সম্প্রদায়ের প্রাথমিক দ্বন্দ্ব ছিল সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে (বিষয়টি সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে আর. পাম দত্ত এবং এ. আর. দেশাইয়ের রচনায়)। কাজেই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে কৃষকদের গণশক্তিকে শুধুমাত্র 'ব্যবহার' করা হয়নি বা তাদের স্বার্থকে বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে তুলে দেওয়া হয়নি, উপনিবেশবাদ-সমর্থক ভেজাল 'র‍্যাডিক্যাল' আন্দোলন হলে যা হতে পারত, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কিছুটা পরিমাণে কৃষকের উপনিবেশবাদ-বিরোধী স্বার্থকে সে রকম রূপও দিয়েছিল। দাদাভাই নওরোজি ও বিচারপতি রানাডে থেকে শুরু করে মহাত্মা গান্ধী ও জওহরলাল নেহরু পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ উপনিবেশবাদের পটভূমিকায় ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে গ্রামের দারিদ্রকে উপলব্ধি করার এবং ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ ও সাম্রাজ্যবাদী লেখকরা যে ভাবে এই দারিদ্রকে ঔপনিবেশিক কাঠামোর সঙ্গে সম্পর্ক রহিত করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন তার তুলনায় অথবা এমনকি উনিশ শতকের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামী কৃষক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের উপলব্ধির তুলনায় তা নিঃসন্দেহে অনেক উন্নত ছিল।

দ্বিতীয়ত, উনিশ ও বিশ শতকে ভারতের কৃষি সহ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঐক্য ও অখণ্ডতা সাধনের ফলে কৃষকদের পক্ষেও সর্ব-ভারতীয় স্তরে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য চিন্তা ও কাজ করতে শেখা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। এই কারণে তাদের অনুভব করা ও জানা আবশ্যক ছিল যে তারা বৃহত্তর জাতীয় সত্তার অংশ। ১৯৩০ ও ১৯৪০ এর দশকে কৃষক আন্দোলন যখন স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করেছিল সেই সময় এই দুটি বিষয়ই স্পষ্ট স্বীকৃতি লাভ করে। কৃষক সম্প্রদায়ের সামাজিক উন্নতি এবং এই সংগ্রামে তার নিজের ভূমিকার জন্য সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের গুরুত্ব কৃষক আন্দোলন তুলে ধরেছিল। বস্তুত, ১৯৩৬ সালের পরে জাতীয় সংগ্রামে এবং তার নেতৃত্বে আরো বেশি গুরুত্ব লাভের জন্য তা অবিরাম লড়াই চালিয়ে গিয়েছিল।

জাতীয় নেতৃত্ব কৃষকের আন্দোলনকে 'নিজের সুবিধার জন্য ব্যবহার' করেনি বা জাতীয়তাবাদের বেদীমূলে উৎসর্গও করেনি। মজার ব্যাপার পরবর্তীকালে কিছু রক্ষণশীল 'কৃষক দরদী' সারা দুনিয়ার সমস্ত বামপন্থী, সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এই অভিযোগই এনেছিল।[২৫] জাতীয়তাবাদ কৃষকদের সম্প্রদায়কে তার প্রয়োজন, তার দাবি দাওয়া এবং সর্বোপরি সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতিতে তার সম্ভাব্য সক্রিয় ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করেছে। জাতীয়তাবাদই কৃষক আন্দোলনকে ১৯২০ ও ১৯৩০ এর দশকে

'স্বাবলম্বী' হতে, বিকাশ লাভ করতে এবং সুদৃঢ় হতে সাহায্য করেছিল। জাতীয়তাবাদ কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল, তাদের মধ্যে এনেছিল সংহতির চেতনা এবং শিখিয়েছিল আধুনিক সংগঠনের মৌলিক তত্ত্ব। যার ফলে কৃষক আন্দোলন উনিশ শতকের অসম্বদ্ধতা ও আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। সে সময় ব্যাপকতর আন্দোলনগুলিতে সংহতি রক্ষা করত ধর্ম বা শীর্ষস্থানীয় জমিদাররা, এমন কি পরবর্তী কালেও, ১৯৩০ এর ও ১৯৪০ এর দশকে, কিষাণ সভা নেতৃত্ব রাজনৈতিক সংকীর্ণতার জন্য জাতীয় নেতৃত্ব থেকে দূরে সরে যাওয়ার ফলে কোন যথার্থ সর্বভারতীয় কৃষক আন্দোলন বা দেশব্যাপী গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। বস্তুত, কৃষক আন্দোলন এবং সেই সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে কৃষকদের স্বার্থ উপস্থাপিত না করে, বরং জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে কৃষক সম্প্রদায়কে আরো ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করে, প্রবলতর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার মাধ্যমে এবং আন্দোলনে স্বতন্ত্র ধরণের শ্রেণী-নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের দ্বারা জাতীয় নেতৃত্ব ও তার জাতীয় সংহতিগঠন পদ্ধতির দুর্বলতাগুলি কাটিয়ে উঠতে পারত।

জাতীয় ও কৃষক আন্দোলনের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন সাম্প্রতিক কালের দুজন গবেষক মজিদ সিদ্দিকি এবং কে. এন. পানিক্কর। ১৯২০ থেকে ১৯২২ সালে যুক্ত প্রদেশের কৃষক আন্দোলনগুলিকে পর্যালোচনা করে সিদ্দিকি উপসংহারে বলেছেন: "জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে কিষাণদের সংযুক্তি কৃষক আন্দোলন এবং রাজনৈতিক আন্দোলন উভয়কেই সাহায্য করেছিল, কারণ বিভিন্ন পর্যায়ে তারা একে অপরকে জুগিয়েছিল শক্তি ও সাহায্য।...রাজনীতিলব্ধ সংহতি নিচ থেকে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে প্রথম নাড়া দিয়েছিল।"[৪০] একই ভাবে কে. এন. পানিক্কর তাঁর উনিশ ও বিশ শতকে মালাবারের কৃষক বিদ্রোহ বিষয়ক গবেষণাপত্রের উপসংহারে ১৯২১ সালে কৃষক আন্দোলন ও জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে সংহতির উল্লেখ করে বলেছিলেন: "এই মৈত্রী কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বোধ জাগ্রত করেছিল। এর ফলে তাদের এক শক্তিশালী সংগঠনও গড়ে ওঠে।"[৪১]

(গ) জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে কৃষক সম্প্রদায়কে যুক্ত করার জাতীয়তাবাদী পদ্ধতির নেতিবাচক দিকটি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রূপ পেয়েছিল:

(১) ঔপনিবেশিক কৃষি কাঠামোর মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে উপেক্ষা করে জাতীয় নেতৃত্ব সাধারণভাবে ভূস্বামী-বিরোধী সংগ্রামে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন। নেতৃত্বের প্রভাবশালী অংশ ভূস্বামী-বিরোধী চিন্তাধারা, কর্মসূচী ও আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। অহিংসার নামে এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের ঐক্যের নামে তাঁরা কৃষকদের ভূস্বামী-বিরোধী সব রকম ক্রিয়াকলাপের বিরোধিতা করতেন। বলা হত, কৃষকদের পৃথক শ্রেণী সংগঠন জাতীয়

আন্দোলনকে বিভক্ত ও দুর্বল করে দেবে। কৃষকদের স্বাধীন আন্দোলনের বিরোধিতা করে তাঁরা কৃষক আন্দোলনকে একমাত্র তখনই সমর্থন করেছেন যখন তা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপকতর জাতীয় আন্দোলনের অংশ হয়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ, গান্ধী ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে যুক্ত প্রদেশের আন্দোলনকারী কৃষকদের পরামর্শ দিয়েছিলেন ঃ "জমিদাররা যদি আপনাদের ওপর নিপীড়ন করে আপনাদের তা একটু সহ্য করতে হবে। আমরা জমিদারদের সঙ্গে লড়াই করতে চাই না।...জমিদাররাও গোলাম, আমরা তাদের অসুবিধের মধ্যে ফেলতে চাই না।"[৪২] ১৯২১ সালের মে মাসে তিনি আবার লিখলেন ঃ[৪৩]

> ...অসহযোগের কোন পর্যায়েই জমিদারদের খাজনা থেকে বঞ্চিত করার অভিপ্রায় আমাদের নেই। কিষাণ আন্দোলনকে কিষাণদের অবস্থার এবং জমিদার ও তাদের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টার মধ্যে অবশ্যই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। কিষাণদের পরামর্শ দিতে হবে তাঁরা যেন জমিদারদের সঙ্গে তাঁদের চুক্তির শর্ত যথাযথভাবে মেনে চলেন, তা সেই চুক্তি লিখিতই হোক বা প্রথাগতই হোক।

একইভাবে, ১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত করে যে প্রস্তাব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি নিয়েছিল তার দশটি অনুচ্ছেদের দুটিতে মূল কথা ছিল জমিদারদের 'আইনগত' অধিকার রক্ষা।[৪৪] ১৯৩০ এর দশকের গোড়ায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি জমিদারদের একাধিকবার অভয় দিয়ে বলেছিল যে কমিটি জমিদার বিরোধী নয়, এবং তারা 'সম্পত্তি অধিগ্রহণ' ও 'শ্রেণী যুদ্ধের' বিরোধী।[৪৫] এমনকি যে যুক্ত প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব ভূমিসংক্রান্ত প্রশ্নে বামঘেঁষা ছিল, যারা চড়া খাজনার বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন সংগঠিত ও সমর্থন করছিল তারাও সর্বভারতীয় নেতৃত্বকে আশ্বস্ত করার জন্য একথা প্রকাশ্যে বলার প্রয়োজন মনে করেছিল যে তারা "জমিদার ও প্রজার মধ্যে সমন্বয় সাধনের" জন্য সচেষ্ট এবং শ্রেণী যুদ্ধের কথা প্রচার করছে না।[৪৬]

১৯২০-২২ এবং ১৯৩০-৩২ সালে একমাত্র যুক্ত প্রদেশ ছাড়া সর্বত্র কংগ্রেস নেতৃত্ব ভূমি রাজস্ব এবং লবণ করের মত অন্যান্য করের দুর্বহ বোঝা কমানোর দাবীতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে কৃষকদের শামিল করতে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়েছিল। কৃষকদের মধ্যে গান্ধীর প্রচার অভিযানের প্রায় একমাত্র বিষয় ছিল বৃটিশ প্রশাসন বা শুধু একটি ক্ষেত্রে ব্রিটিশ প্ল্যানটারদের বিরোধিতা। ১৯৩০ সালের গান্ধীর বিখ্যাত এগারো দফা দাবিতে কৃষকদের দুটি দাবি ছিল ঃ ভূমি রাজস্বের ৫০ শতাংশ হ্রাস এবং লবণ কর বিলোপ।[৪৭] বিশ্ব মন্দার চূড়ান্ত পর্যায়ে যখন ভারতের কৃষকরা খাজনা, সুদ ও ভূমি রাজস্বের চাপে তলিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময় তিনি লবণ করের প্রশ্নে কৃষকদের আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন, কারণ

একমাত্র এর মাধ্যমেই জমিদারদের ক্ষতিগ্রস্ত না করে রায়তী ও জমিদারী এলাকার কৃষকদের সংঘবদ্ধ করা সম্ভব ছিল।

প্রসঙ্গত, বলা যেতে পারে, এক্ষেত্রে মূল সমালোচনা এই নয় যে, জাতীয় নেতৃত্ব 'কৃষকের হাতে জমি চাই' এই স্লোগান তুলে সামন্তবাদ-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে সাহায্য করেন নি। তা করা হলে ছোট বড় সব ভূস্বামীই 'আশ্রয়' নিত সাম্রাজ্যবাদের কোলে। কোন সর্বশ্রেণী ভিত্তিক জাতীয়তাবাদী ফ্রণ্টের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না, শুধু তাই নয়, ১৯৩৯ এর আগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শক্তির পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভবত সেটা হ'ত একটা অর্থহীন স্বল্পকালীন কৌশল, অতএব রাজনৈতিক দিক দিয়ে অদূরদর্শী, কেননা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলাই কার্যকর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের লক্ষ্য। দেশের বিপুল সংখ্যক ক্ষুদ্র ও মাঝারি ভূস্বামীকে মিত্র হিসেবে সাম্রাজ্যবাদের হাতে তুলে দেওয়া আবশ্যক ছিল না। বিভিন্ন স্বার্থসম্পন্ন গোষ্ঠীকে, বিভিন্ন শ্রেণী ও সামাজিক স্তরকে এক প্রশস্ত জাতীয় ফ্রণ্টে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করা এবং যাদের এভাবে সংঘবদ্ধ করা যায়নি তাদের নিষ্ক্রিয় করার প্রয়োজন থেকে হয়ত দেখা দিয়েছিল অভ্যন্তরীণভাবে পরস্পরবিরোধী শ্রেণীর মধ্যে আপস, তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের লঘুকরণ এবং পরস্পরবিরোধী স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার নীতি।

পরস্পরবিরোধী স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার অর্থই হল, উভয়পক্ষকে ছাড়তে এবং মানিয়ে নিতে হয়। যদি কোন শ্রেণীগত আপস করতে হয়, কি শর্তে তা হবে? এই আপসের ফলে কার স্বার্থসিদ্ধি হবে? আপস কি যথার্থই আপস ছিল, নাকি কোন শ্রেণী বা গোষ্ঠীর আত্মসমর্পণের মুখোস? যদি মেনেও নেওয়া যায় যে, জমিদারী বিলোপের দাবি করা উচিত ছিল না, তাহলেও প্রশ্ন করতে হয়, করের দুর্বহ বোঝা, উচ্ছেদ, বাধ্যতামূলক শ্রম, বেআইনী অর্থ আদায় ও ঋণের বোঝার বিরুদ্ধে এবং ভোগ দখলের নিরাপত্তা ও উপযুক্ত মজুরীর জন্য বা কৃষকদের অন্যান্য দাবির পক্ষে কী লড়াই করা হয়েছে এবং সেই সব দাবির কতটাই বা পূরণ হয়েছে? এমনকি কৃষক সংগঠন-গুলিও তাদের দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী দাবির মধ্যে পার্থক্য করে যথেষ্ট পরিমাণে রাজনৈতিক বাস্তব জ্ঞানের প্রমাণ দিয়েছিল।[৪৪] কমিউনিস্টদের মত হওয়া যদি সম্ভব নাও হয়, অন্তত জওহরলাল নেহরু হওয়া যাবে না কেন? ১৯৩০-৩২ সালেও নেহরু ও অন্যান্য বামপন্থী কংগ্রেসী লড়াই করেছিলেন, খাজনা বিলোপের জন্য নয়, ন্যায্য ও যথাযথ খাজনার জন্য।[৪৫] নিঃসন্দেহে, যে কোন যথার্থ সামাজিক আপসেও কৃষকদের অধিকাংশ তাৎক্ষণিক দাবি পূরণ করতে পাবার কথা।

কিন্তু, ঠিক এটাই করা হয়নি। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় সংহতির নামে কৃষকের শ্রেণীস্বার্থ প্রায় পুরোপুরি বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল। জাতীয় সংহতি গড়ে তোলার চেষ্টা হল কৃষকের একতরফা ক্ষতির বিনিময়ে।

বহু বছর ধরে জাতীয় কংগ্রেস কোন ব্যাপক কর্মসূচি গড়ে তুলতে পারেনি। ১৯২০, ১৯৩০ ও ১৯২৪ সালের গান্ধী পরিচালিত তিনটি বড় আন্দোলনই, এ ধরণের কোন কর্মসূচি ছাড়াই শুরু হয়েছিল। গান্ধী ও জাতীয় নেতৃবর্গ কৃষকদের জন্য বড় জোর গঠনমূলক কর্মসূচির নামে কিছু "সামান্য উন্নতি-সাধক, 'স্বাবলম্বনমূলক' ব্যবস্থা"র কথা বলেছিলেন। তাঁরা প্রায় জোরটাই দিয়েছিলেন স্বরাজের উপর এবং কৃষিসংস্কার সংক্রান্ত অস্পষ্ট কথাবার্তায়। অর্থাৎ **জমিদারদের জাতীয় আন্দোলনে ধরে রাখতে হবে তাদের মৌল শ্রেণী স্বার্থের নিরাপত্তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে জাতীয়তাবাদী আদর্শের মাধ্যমে।**

১৯৩০ এর দশকে কৃষকদের কয়েকটি জমিদার বিরোধী দাবি গ্রহণ করা হয়েছিল। একটি ক্ষেত্রে, ১৯৩০-৩২ সালে যুক্ত প্রদেশে, জমিদার ও প্রজার মধ্যে একটি যথার্থ আপস-মীমাংসার প্রস্তাব করা হয়েছিল। ১৯৩০ সালে যুক্ত প্রদেশ কংগ্রেস ও গান্ধী ভোগদখলকারী প্রজাদের জন্য ৫০ শতাংশ এবং ভোগদখল করেনা এমন রায়তদের জন্য ৬০ শতাংশ খাজনা ছাড় দাবি করে-ছিলেন। পরবর্তীকালে, ১৯৩১-এ, গান্ধী সেটা কমিয়ে যথাক্রমে ২৫ ও ৫০ শতাংশ ত্রাণ হিসাবে দাবি করলেন। কিন্তু কৃষকরা এ বিষয়ে সংগ্রামী মনোভাব দেখালেও গান্ধী ও সর্ব-ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ এই দাবির জন্য চাপ সৃষ্টি করেন নি।[40] এস. গোপাল বলেছেন, গান্ধী অবশেষে "জমিদারদের ওপর চাপ সৃষ্টির, খাজনা বন্ধের জন্য প্রত্যক্ষ আবেদন, গড়পড়তা ৫০ শতাংশ খাজনা কমানর প্রস্তাব এবং যা ব্যক্তির সামর্থ্যের মধ্যে তার চেয়ে বেশী খাজনা দিতে অসম্মতি—ইত্যাদির স্পষ্ট নিন্দা করেছিলেন।"[41] এটাও লক্ষণীয় যে, যে বিহারে কংগ্রেস নেতৃত্বের রক্ষণশীল গান্ধীবাদীদের কঠোর নিয়ন্ত্রণ ছিল, সেখানে জাতীয়তাবাদীরা জমিদারদেব বিরুদ্ধে কৃষকদের কোন গুরুত্বপূর্ণ দাবি নিয়েই লড়াই করেনি। শুধু কিষাণদেরই সংযত রাখা নয়, নেতাদের নিজেদেরকেও সংযত রাখতে হয়েছে।[42]

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের প্রস্তুতির সময় কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে যারা বামপন্থী তাদের খুশি করায় এবং তাদের বিরুদ্ধতা সংযত রাখার চেষ্টায় কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রভাবশালী অংশ কিছু কিছু তাৎক্ষণিক দাবি কম বেশি সুষ্ঠুতার সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এইসব দাবির মধ্যে ছিল ভূমিরাজস্ব, খাজনা, জলকর, ও ঋণভার কমান, সব রকমের সামন্ততান্ত্রিক কর ও খাজনা বিলোপ, ঋণ পরিশোধ স্থগিত রাখার আইনসিদ্ধ অধিকার, ইজারা নেওয়া যে ভূ-সম্পত্তির আয় অতি সামান্য তাকে রাজস্ব ও খাজনা থেকে অব্যাহতি দেওয়া, বকেয়া খাজনা মকুব, উচ্ছেদের ওপর নিষেধাজ্ঞা, উত্তরাধিকার সহ ভোগদখলের স্থায়িত্ব, সহজ-লভ্য ঋণের ব্যবস্থা, বেগার প্রথা (বাধ্যতামূলক শ্রম) এবং বেআইনিভাবে অর্থ আদায় বন্ধ করা, কৃষি মজুরদের জন্য সপরিবারে জীবনধারণের উপযুক্ত মজুরি, কৃষি-আয়ের ওপর বৃদ্ধিশীল আয়কর আরোপ, সমবায়-কৃষি গড়ে তোলা এবং

কৃষক ইউনিয়নগুলিকে স্বীকৃতি দান।[43] কিন্তু এসব দাবি নিয়ে কংগ্রেস বলতে গেলে কোন আন্দোলন, সংগ্রাম বা এমনকি শিক্ষামূলক প্রচার অভিযানও সংগঠিত করেনি। এই ব্যাপারে ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলির ভূমিকা খুবই বেদনাদায়ক। তাঁদের ভূমিসংক্রান্ত আইন ছিল দুর্বল, যথেষ্ট নয়। শুধু মহাজনদের হাত থেকে উল্লেখযোগ্য ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[44] তার থেকেও বড় কথা, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিই কৃষক আন্দোলনের প্রতি অনুকূল ছিল না। প্রতি পদক্ষেপে জমিদারদের সঙ্গে পরামর্শ করা হত এবং তাদের সুবিধা দেওয়া হ'ত, অথচ গণ আন্দোলনের মাধ্যমে কৃষক ইউনিয়নগুলির চাপ সৃষ্টির প্রয়াসকে দলীয় ও প্রশাসনিক উভয় স্তরেই নিন্দা করা এবং দমন করা হত।[45] ক্ষুব্ধ নেহরু যুক্ত প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জি. বি. পন্থকে লিখেছিলেন: "...কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি প্রতিবিপ্লবী হয়ে পড়ছে। অবশ্যই এটি সচেতনভাবে হয়নি, তবে যখনই বেছে নেওয়ার প্রশ্ন উঠছে দেখা যাচ্ছে ঝোঁকটা এই দিকেই। তাছাড়া সাধারণভাবে মনোভাবও অপরিবর্তনশীল।"[46]

কৃষি সমস্যার প্রশ্নে গান্ধীর মনোভাব তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে বদলাতে শুরু করেছিল, এরকম কিছু ইঙ্গিত মেলে। ১৯৪২ এর ৯ জুন "কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য আপনার কর্মসূচি কি?" লুই ফিশার এই প্রশ্ন করলে গান্ধী জবাব দিয়েছিলেন, "কৃষকরা জমি দখল করবে। আমাদের পরামর্শ দিতে হবে না। তারা নিজেরাই দখল করবে।" ভূস্বামীরা কি ক্ষতিপূরণ পাবে?" ফিশারের এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, না, আর্থিক কারণে তা অসম্ভব।" দুদিন পরে আরেকটি সাক্ষাৎকারে ফিশার প্রশ্ন করেছিলেন: "আচ্ছা, আপনার আসন্ন আইন অমান্য আন্দোলনকে আপনি ঠিক কিভাবে দেখছেন?" গান্ধী জবাব দিলেন, "গ্রামাঞ্চলে কৃষকরা কর দেওয়া বন্ধ করবে। সরকারি নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তারা লবণ তৈরী করবে।...তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ হবে জমি দখল করা।" "সহিংসভাবে?" ফিশার প্রশ্ন করলেন। "হিংসা ঘটতে পারে, তবে সে ব্যাপারে ভূস্বামীদের সহযোগিতা করতে হবে। ...তারা পালিয়ে গিয়েও সহযোগিতা করতে পারে।" ফিশার বললেন, ভূস্বামীরা "সহিংস প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে"। গান্ধী বললেন, "দিন পনেরর জন্য বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে, তবে আমার মনে হয় আমরা অচিরেই তা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারব।" ফিশারের প্রশ্ন, তার মানে কি "ক্ষতিপূরণ ছাড়াই বাজেয়াপ্ত করার" ঘটনা ঘটবে? গান্ধী জবাব দিলেন, "নিশ্চয়ই। জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া সার্বিক কারণে কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।"[47] একইভাবে কারাগারে তিনি মীরাবেনকে বলেছিলেন যে, স্বাধীনতার পরে জমিদারদের জমি নিয়ে নেবে রাষ্ট্র, হয় জমিদাররা স্বেচ্ছায় দিয়ে দেবে অথবা আইনের মাধ্যমে তা নেওয়া হবে, এবং তারপর সেই জমি বণ্টন করা হবে কৃষকদের মধ্যে।[48] ১৯৪৬ সালে তিনি এও স্বীকার করলেন যে ইতিহাসে

শ্রেণী সংগ্রাম বরাবরই ছিল এবং এর অবসান ঘটতে পারে যদি পুঁজিবাদীরা স্বেচ্ছায় তাদের সামাজিক ভূমিকা ত্যাগ করে শ্রমজীবী হয়। তিনি বলেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে পুঁজি সৃষ্টি করে শ্রমিক, পুঁজিবাদীরা নয়।[50] কিন্তু তাঁর বুদ্ধি ও চিন্তা এই বিকাশ ঘটেছিল এত দেরিতে যে জাতীয় নেতৃত্ব ও ভারতীয় বুর্জোয়া গোষ্ঠীর মধ্যে তা কোন সাড়া জাগাতে পারেনি। তাঁরা ইতিমধ্যে তাঁর সব 'খেয়ালীপনা' সমেত তাঁকে পরিত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। তাছাড়া গান্ধীর নিজের এই উপলব্ধিও ছিল অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং তাঁর সামগ্রিক চিন্তাধারার কাঠামো থেকে এতটাই আলাদা যে তা কোন অর্থবহ রাজনৈতিক সক্রিয়তার দিকে চালিত করতে পারেনি। এটা ছিল মুখ্যত তাঁর সততা ও নিরন্তর সত্যান্বেষার প্রকাশ এবং জীবনের অন্তিম বছরগুলিতে যে গভীর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক দুর্ভাগ্য তাঁকে ঘিরে ধরছিল তারই অভিব্যক্তি। এই মহান ও সৎ মানুষটি বুর্জোয়া রাজনীতির এমন এক কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন এবং নেতৃত্বের এমন এক নিদর্শন তৈরি করেছিলেন যে তাঁর নিজস্ব আন্তরিক অবিশ্বাসেরও কোন স্থান ছিল না, এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক আর কি হতে পারে।

লক্ষণীয় যে ১৯৪৫-৪৬ সালে কংগ্রেস সমস্ত মধ্যস্বত্ব লোপের দাবী মেনে নিয়েছিল।[51] যুদ্ধোত্তর বছরগুলিতেই এই লক্ষ্য বাস্তবে সিদ্ধ হয়েছিল, তবে কৃষক-বিরোধী পন্থায়। যার ফলে, আধা-সামন্ততন্ত্র বা জমিদারী ব্যবস্থাকে আক্রমণ এবং ক্রমশ ও বহুলাংশে তার বিলুপ্তি সাধন করা হলেও, বিপুলসংখ্যক ক্ষুদ্র কৃষকের কোন উপকার হয়নি। এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে, স্বাধীনতার আগে কিংবা পরে জাতীয় কংগ্রেস কখনই সাধারণ উৎখাতযোগ্য প্রজা বা ভাগচাষী বা ক্ষেতমজুরের জীবনে সামান্য উন্নতির জন্যও সচেষ্ট হয়নি। উপরন্তু, তাদের বিভিন্ন আন্দোলনে এইসব শ্রেণী ও গোষ্ঠীর স্বার্থ ও দাবি প্রায় সম্পূর্ণভাবেই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল।

কেন এমন হল? বলা যেতে পারে যে ভূস্বামীদের প্রতি এই দুর্বল ও আপসমূলক নীতি অবলম্বন করার প্রধান কারণ বৃহৎ ভূস্বামীদের (অর্থাৎ জায়গিরদার, তালুকদার এবং বড় জমিদার) স্বার্থ ও ইচ্ছার প্রতি বাধ্যতা নয়। স্বাধীনোত্তর ভূমি সংস্কারের লক্ষ্য ছিল এদের বিরুদ্ধেই মুখ্যত এই নীতি নিম্নোক্ত পাঁচটি সামাজিক স্তরের স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি বশ্যতার ফল:

(ক) উদীয়মান ধনী কৃষক শ্রেণীর বিত্তবানসুলভ রক্ষণশীল মানসিকতা। এরা উত্তরোত্তর জমিদার মহাজন হয়ে উঠছিল, এবং গ্রামাঞ্চলে গণ জাতীয় আন্দোলনের ওপর এবং উদীয়মান কৃষক সংগঠন ও আন্দোলনের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করেছিল। জমিদারি এলাকায় এদের প্রধান স্বার্থ ছিল ভোগদখলের অধিকারের নিরাপত্তা বিধান ও ভোগদখলকারী প্রজাকে জমির মালিকানা হস্তান্তরের সুযোগদান। রায়তী এলাকায় এরা আগ্রহী ছিল

অপেক্ষাকৃত কম হারের ভূমি রাজস্ব এবং একাধারে তাদের নিপীড়নকারী ও প্রতিযোগী সর্বব্যাপী মহাজন-ব্যবসায়ীকে প্রতিহত করায়।

(খ) ছোট ও ধ্বংসপ্রাপ্ত ভূস্বামীরা। ক্রমাবনত অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য এরা ব্যাপকভাবে জাতীয় আন্দোলনে, এমনকি ১৯২০ ও ১৯৩০ এর দশকে কৃষক আন্দোলনেও যোগ দিয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে সুদৃঢ় সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং তুলনামূলকভাবে উন্নততর শিক্ষামান এদের এইসব আন্দোলনের নেতৃত্ব অধিকার করতে সাহায্য করেছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য মজার ঘটনা, ১৯৩৫-৩৬ সালে বিহারের কৃষকনেতা স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী জমিদারী প্রথা বিলোপের কর্মসূচী মেনে নিয়েছিলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও ঘোষণা করেছিলেন যে শুধু বড় জমিদারই জমিদার, ছোট জমিদাররা আসলে কৃষক।[৫২] এরও আগে, বিহার কিষাণ সভার কার্যনির্বাহী কমিটি থেকে তিনি জমিদারী প্রথা বিলোপের দাবি সম্বলিত একটি প্রস্তাব সমাজবাদী সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে গৃহীত হওয়ার প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছিলেন। এই কারণ দেখিয়ে যে, এর ফলে কিষাণ সভার সমর্থক ছোট জমিদার বড় প্রজারা বিরোধী হয়ে যাবে।[৫৪]

(গ) মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা ও অন্যান্যরা। এরা গ্রামাঞ্চলের কাছাকাছি ছোট শহরে বাস করত এবং সেখানে কাজ করত। বহু ক্ষেত্রেই এরা ছোট জমিদার হয়ে উঠেছিল, তাছাড়া মহাজনী কারবারের সঙ্গেও এদের সম্পর্ক ছিল; এবং এইসব আধা-গ্রামাঞ্চলে এরাই ছিল জাতীয় আন্দোলনের মেরুদণ্ড।

(ঘ) ব্যবসায়ী ও মহাজন। ব্যবসা-বাণিজ্য, তেজারতি কারবার ও খাজনার মাধ্যমে কৃষকদের ওপর যে শোষণ চলত তার সঙ্গে এদের ছিল প্রত্যক্ষ যোগ।

(ঙ) বিত্তবান গোষ্ঠী হিসেবে বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের শ্রেণী মানসিকতা। এই মানসিকতা কখনোই র‍্যাডিক্যাল হয় না, বৈপ্লবিক হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের নির্বাচনী রাজনীতির ওপর অত্যধিক নির্ভরতা তাও ওপর তলার ১০ থেকে ১৫ শতাংশ মানুষের সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের ওপর, ঐ আন্দোলনকে এই শ্রেণী ও সামাজিক স্তরের মুখাপেক্ষী করে তুলেছিল। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ভোটদাতাদের অধিকাংশ ধনী কৃষক ও ছোট জমিদার। অন্যদিকে বিপুল সংখ্যক দরিদ্র কৃষক ও ক্ষেতমজুরের ভোটই ছিল না।

(২) জাতীয় আন্দোলনের দ্বিতীয় বড় দুর্বলতা ছিল এই যে, বিশুদ্ধ সরকার-বিরোধী দাবির ক্ষেত্রেও কৃষক আন্দোলনকে প্রসার লাভ করতে দেওয়া হয়নি। নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বিশেষ বিশেষ দাবির মধ্যে আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা হত এবং সাধারণত লক্ষ্য থাকত তাৎক্ষণিক সুবিধা লাভ। যুক্ত প্রদেশের বাইরে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন কৃষক আন্দোলনেও কখনো ব্যাপক ভাবে কৃষকদের সামিল করা হয়নি। যুক্তপ্রদেশেও আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল কৃষক সম্প্রদায়ের যে অংশ মন্দার ফলে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তাদের জন্য

বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করা। চম্পারন ও কয়রা আন্দোলন রাজনৈতিক প্রভাবের দিক দিয়ে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হলেও তাদের কর্মপরিধি ছিল কিছুটা সংকীর্ণ। ১৯২১ সালে গুন্টুরের কর-বিরোধী আন্দোলনকে দ্রুত থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৯২৮ সালের বারদোলি সত্যাগ্রহকে ঐ সত্যাগ্রহের নেতা সর্দার প্যাটেল অ-রাজনৈতিক বলে ঘোষণা করেছিলেন।[৫৪] ১৯৭৩ সালের পরে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি কৃষকদের বিক্ষোভ সমাবেশ সংগঠিত করার প্রচেষ্টার প্রতি এমনকি তা কংগ্রেসের কৃষি কর্মসূচীর সমর্থনে হলেও, বিরূপ মনোভাব দেখিয়েছেন। গান্ধী ও কংগ্রেস যে একটাও সাধারণ কর-বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করেননি, এটা নিছক আকস্মিক নয়।

(৩) তৃতীয়ত, ক্ষেতমজুর ও দরিদ্র কৃষকদের রাজনীতি ও রাজনৈতিক শ্রেণী চেতনাও পুরোপুরি ধনী কৃষক ও জমিদারদের রাজনীতি এবং রাজনৈতিক শ্রেণী চেতনার দ্বারা প্রভাবিত ছিল।

গ্রামের দরিদ্র মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয় সংহতির দুটি দিকই ছিল ত্রুটিপূর্ণ। নেশন সম্পর্কে জাতীয় নেতৃত্বের ধারণা, তাদের স্বার্থ ও রাজনীতিকে শহুরে বুর্জোয়া গোষ্ঠীর স্বার্থ ও রাজনীতির অধীন অন্যদিকে কৃষক সমাজ সম্পর্কে ধারণা, জমিদার ও উদীয়মান গ্রামীণ বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ ও রাজনীতির অধীন করেছিল।

(ঘ) জাতীয়তাবাদের বা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের স্তরে ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জাতীয় সংহতির নমুনায় বড় রকমের দুর্বলতা দেখা গিয়েছিল।

(১) কৃষিজীবী জনগণের শ্রেণীগত দাবিকে গুরুত্ব না দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আবেদনের ওপর প্রায় পুরোপুরি নির্ভর করার ফলে, স্বল্প কালের জন্য অল্প কিছু অঞ্চলে এবং কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন কৃষক আন্দোলনের কিছু কিছু অঞ্চলে ছাড়া অন্যত্র সংগ্রামে কৃষকদের অংশগ্রহণের হার খুব কম ছিল। বিত্তবান কৃষকদের হারানোর মত এত কিছু ছিল যে সরকারের দমন পীড়নের মুখে আন্দোলনকে বজায় রাখার মত ইচ্ছা বা সামথ্য তাদের ছিল না। তার ফলে প্রধানত শহরকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা আন্দোলনের কোনোটিকেই সামান্য দু-এক বছরের বেশী টিকিয়ে রাখা যায় নি।

পরিণামে, কৃষক জনগণের ব্যাপক, কার্যকর অংশ গ্রহণ না ঘটায়, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কোন পর্যায়েই চাপ-আপস-চাপ বা চা-আ-চা কৌশল[৫৫] অতিক্রম করে যেতে পারে নি। অনেক সময় সরকারের ওপর যথেষ্ট চাপ প্রয়োগ করেও এই কৌশলকে কাজে লাগান দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে।

(২) বহু অঞ্চলে কৃষক-ভূস্বামী ও কৃষক-ব্যবসায়ী-মহাজন বিরোধ এবং ধর্মীয় ও জাতিগত বিভেদের সঙ্গে মিলে গেছে। এর ফলে সাম্প্রদায়িক ও জাতিভেদকামী শক্তিগুলি শ্রেণীগত ও আর্থনীতিক আবেদনকে কাজে লাগিয়ে তাদের জোরদার করতে পেরেছে, ঠিক একই ভাবে শ্রেণীগত আবেদন ধর্মীয় বা জাতপাতের আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। এইভাবে পাঞ্জাবে ভূস্বামী ও

ধনী কৃষক কৃষিজীবী সমাজের বিভিন্ন জাতের ধারণাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা জাতপাতের রাজনীতিকে অনেক বছর ধরে ব্যবহার করেছিল। এরাই ১৯৩৭ সালের পরে কাজে লাগিয়েছিল মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাকে। অন্যদিকে ব্যবসায়ী মহাজনরা আবার হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে অবলম্বন করে তাদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করেছিল। বাংলায় মুসলমান কৃষক সম্প্রদায় অবশ্য প্রধানত হিন্দু ভূস্বামী ও মহাজনদের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সংগ্রাম করছিল। কিন্তু তারাও শেষ পর্যন্ত মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয়ে পড়ে। বঙ্গীয় কংগ্রেসের ভূস্বামী সমর্থক বা অতি দুর্বল ভূস্বামী-বিরোধী জাতীয়তাবাদী চরিত্র এবং জাতীয় নেতৃত্বের অধিকাংশের হিন্দুয়ানি তাদের সাম্প্রদায়িকতার পথে ঠেলে দিয়েছিল। কেরলেও ১৯২০-২১ সালের প্রজাদের সংগ্রামী আন্দোলনেও শেষ পর্যায়ে সাম্প্রদায়িক আবেগের উপাদান প্রাধান্য পেয়েছে। মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুতে কৃষক ও ভূস্বামীরা জাতপাতের শ্রেণীবিন্যাসে অনুরূপ বিন্যাস লাভ করেছিল।

এইসব পরিস্থিতিতে শ্রেণী সংগ্রামের পথে না গিয়ে জাতীয়তাবাদীদের কৃষক সংহতি ও জাতীয় ধারণার রূপায়ণ সম্ভব ছিল না। সর্বোচ্চ জাতীয় নেতৃত্ব শ্রেণী সংগ্রামের পথে যেতে রাজী ছিলেন না, ফলে পাঞ্জাব ও বাংলায় জাতীয় ঐক্য প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। শেষ পর্যন্ত এই দুই প্রদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তিই প্রবল হয়ে উঠেছিল। উলটো ব্যাপার ঘটেছিল কেরল, অন্ধ্র, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং কিছুটা যুক্ত প্রদেশে। এই প্রদেশগুলিতে কৃষক আন্দোলনে র‍্যাডিক্যালিজমের ওপর প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদ মোটামুটিভাবে সাম্প্রদায়িকতা ও জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিল। পাঞ্জাব ও বাংলায় এই ব্যর্থতা দেশ বিভাগের পরিণতির একটা বড় কারণ।

এইসব ঘটনা থেকে এটা স্পষ্ট যে জাতীয় সংহতি আসতে পারত একমাত্র শ্রেণী চেতনার ফলেই। প্রভাবশালী জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব অন্যরকম মনে করলেও বাস্তবে কৃষকদের 'শ্রেণী' চেতনা সাম্রাজ্যবাদের মুখোমুখি হয়ে ভারতীয় সমাজকে ভেঙ্গে ফেলেনি, এবং শুধু তাই নয়, এই শ্রেণী চেতনাই বস্তুগতভাবে সাম্রাজ্যবাদের সহায়ক বিভেদকামী সাম্প্রদায়িক ও জাতপাতের মানসিকতা ও আন্দোলনকে প্রতিহত করার একমাত্র কার্যকর উপায় হিসাবে দেখা দিয়েছিল। শ্রেণী পার্থক্যকে উপেক্ষা করে নয় বা গ্রামের দরিদ্র মানুষের স্বার্থকে গ্রামের ধনী মানুষের স্বার্থের বেদীমূলে উৎসর্গ করে নয়, বিভিন্ন শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করার সচেতন রাজনৈতিক কর্মসূচীর ভিত্তিতেই কেবল জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠিত করা যেত। ভাসা-ভাসা শ্রেণী নিরপেক্ষ ঐক্যসাধনের কর্মসূচীই ভারতবর্ষে তথাকথিত ঐতিহ্য, সাবেকী মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠাননির্ভর নানারকমের আধুনিক ভ্রান্ত চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত অলীক সংহতির বিকাশ রোধ করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

(ঙ) এটা অনস্বীকার্য যে, কৃষক সম্প্রদায় এবং কৃষক আন্দোলন ও কৃষক সমাজও জাতির ঐক্যসাধনের জন্য অপেক্ষাকৃত ভাল কোন সূত্র উপস্থিত করতে পারেনি। কৃষক সম্প্রদায় নিজস্ব তাত্ত্বিক নেতা, শ্রেণীগত-ভাবে যুক্ত বুদ্ধিজীবী বা শ্রেণীগত ধ্যানধারণা এবং এমনকি নিজস্ব শ্রেণী ভিত্তিক সংগঠকও তৈরি করতে পারেনি। এটাও লক্ষ্য করার বিষয় যে, দেশের কোনো অংশেই কৃষকের পার্টির উদ্ভব হয় নি। রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারের পর কৃষকদের রাজনীতি বামপন্থী জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা চালিত হওয়ার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। এই বামপন্থী জাতীয়তাবাদীরা 'কৃষক' শব্দটির যে মনোহারিত্ব রয়েছে তাকে ব্যবহার করেছিলেন শহরের র‍্যাডিক্যাল যুবসম্প্রদায় ও ছোট শহরের বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীকে জাতীয় আন্দোলনে শামিল করার জন্য। এদের কর্মসূচী ছিল ভাসা ভাসা ভাবে কৃষক সমর্থক এবং কিছু কিছু সংস্কারের দাবি এবং সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

(চ) কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থী গোষ্ঠী কৃষকদের সামন্তবাদ বিরোধী দাবি সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত বেশি সচেতনতার প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্তু জাতীয় নেতৃত্ব যে দুটি দিকে ব্যর্থ হয়েছিল তারাও মোটের ওপর সেই দুটি দিকেই ব্যর্থ হয়েছিলেন। এটা কিছুটা পরিমাণে সত্য যে, বামপন্থীরা কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক কাজকর্মের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়নি। ফলে তারা কৃষকদের মধ্যে সামন্তবাদবিরোধী চেতনা জাগাতে এবং নিজস্ব শ্রেণীগত অবস্থান সম্পর্কে কৃষকদের সচেতন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তারা কৃষক সমাজে প্রকাশমান শ্রেণীগত বিভাজন ও বিভেদ সম্পর্কে কিছুটা সচেতনতা দেখালেও বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করতে এবং কৃষকদের মধ্যে, বিশেষত অতি ছোট চাষী ও ক্ষেত মজুরদের মধ্যে, সে সম্পর্কে চেতনা জাগাতে পারেনি। যেসব অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন তাদের নেতৃত্বাধীন ছিল সেখানে কৃষকদের মধ্যে জমিদার বিরোধী 'শ্রেণীগত' সংহতি সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে কিছুটা পরিমাণে সফল হলেও, এরা ধনী কৃষক বা এমনকি ছোট জমিদারের প্রভাব থেকে কৃষক আন্দোলনকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ১৯৪৪ সালে, তাঁর সবচেয়ে র‍্যাডিক্যাল পর্বে, স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী স্বীকার করেছিলেন, "বস্তুত মাঝারি ও বৃহৎ কৃষকরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিষাণ সভার সঙ্গে" (যারা ছিল), এবং "নিজেদের সুবিধা ও লাভের জন্য তারা কিষাণ সভাকে ব্যবহার করছে......।" এই সময় স্বামী সম্পূর্ণভাবে ক্ষেতমজুর ও দরিদ্র কৃষকদের নিয়ে কিষাণ সভা সংগঠিত করার পক্ষে জোরালো যুক্তি উপস্থিত করেন।[৪৭]

এমনকি বাংলার তেভাগা আন্দোলনের মত কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে তত্ত্ব ও কর্মসূচীতে যেখানে উঠবন্দী প্রজা, ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুরদের শ্রেণীগত অবস্থান স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, তখনও বাস্তবে তাদের স্বার্থ ও দাবিকে ভিত্তি করে খুব কম আন্দোলন ও সংগ্রাম সংগঠিত হয়েছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, কংগ্রেস নেতৃত্ব যেমন কৃষকের স্বার্থকে জাতীয় ঐক্যের নামে

ভূস্বামীদের স্বার্থের কাছে বলি দিয়েছিল, বামপন্থীরাও ঠিক তেমনই কৃষক ঐক্যের নামে গ্রামীণ প্রলেতারিয় ও আধা-প্রলেতারিয় স্বার্থকে বলি দিয়েছিল গ্রামীণ বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া গোষ্ঠীর কাছে।

বামপন্থীদের একটা বড় ব্যর্থতা হ'ল, জাতীয় আন্দোলনের কাঠামোর বাইরে স্বনির্ভর শ্রেণীগত কৃষক আন্দোলনের ওপর জোর দিলেও তারা কৃষকদের সামন্তবাদ-বিরোধী ও 'অর্থনৈতিক' চেতনার এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার মধ্যে দৃঢ় সংযোগ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। কৃষকদের মধ্যে বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক দাবির ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়ার প্রবণতার ফলে তাদের রাজনৈতিক ভূমিকা খর্বিত হয়েছিল; ব্যাপ্তি ও গভীরতার দিক থেকেও কৃষক আন্দোলনের বিকাশ হয়েছিল দুর্বলতর। অথচ একই সঙ্গে কৃষকদের শ্রেণীগত দাবিগুলিকে তুলে ধরে তাদের আরো বেশি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জঙ্গী করে তোলা ছিল ঐতিহাসিক কর্তব্য। সমকালীন ও পরবর্তী কালের অনেক বামপন্থী লেখক সমালোচনা করেছেন যে জাতীয় আন্দোলন কৃষকের দাবিকে জাতীয়তাবাদের তুলনায় কম গুরুত্ব দিয়েছিল। কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়। আরো পুরোদস্তুর ও প্রবলভাবে সামন্তবাদ-বিরোধী হওয়ার নীতিতে বিশ্বাসী বামপন্থীরা যেখানে দুয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা গিয়েছিল সেই কেরলে এবং কিছুটা পরিমাণে অন্ধ্রে ছাড়া অন্য কোথাও কৃষকদের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে কেন পারেনি এর দ্বারা তা স্পষ্ট হয় না। কৃষক আন্দোলনকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ধারা থেকে দূরে রাখার যে-কোন প্রয়াস বাস্তবে কৃষক আন্দোলনকেই দুর্বল করে দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ ১৯২১ সালে যুক্ত প্রদেশে উদারপন্থী-প্রভাবাধীন যুক্ত প্রদেশ কিষাণ সভার জাতীয়তাবাদী অসহযোগ-আন্দোলন থেকে কৃষক আন্দোলনকে আলাদা রাখার প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল, এবং এর ফলে কংগ্রেসপন্থী কিষাণ সভার তুলনায় অনেক বেশি জোরাল দাবি উপস্থিত করা সত্ত্বেও এই কিষাণ সভাই ভেঙ্গে গিয়েছিল।[৫৪] একই ভাবে বিহার কিষাণ সভা ও তার জনপ্রিয় নেতা সহজানন্দ সরস্বতী ১৯৪২ সালে যখন জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করলেন বিহারের কৃষকদের মধ্যে তাঁদের প্রভাব তখন খুব কমে গিয়েছিল।[৫৫] সমসাময়িক জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হওয়ায় কমিউনিস্টরাও ১৯৩০-৩৪ সালে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিল। ঘটনা হল এই যে, জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব যেমন কৃষকদের শ্রেণীগত দাবি উপেক্ষা করার ফলে কৃষক সম্প্রদায়কে আন্দোলনে শামিল করতে ব্যর্থ হয়েছিল, কৃষকদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আবেগের সঙ্গে সঠিক সংযোগ স্থাপন করতে না পারায় বামপন্থীরাও একইভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। স্পষ্টত, উভয় দিকে ভারসাম্য রক্ষা করে চলাই এক্ষেত্রে সঠিক নীতি হতে পারত।

৪

১৯৪৭ সালের পরে কৃষক সম্প্রদায় ও জাতীয় সংহতি

১৯৪৭ সালের পরে এল এক বিরাট পরিবর্তন। দেশ অর্জন করল রাজনৈতিক স্বাধীনতা, জাতীয় সংহতিনাশক শক্তিগুলিকে জোরদার করতে যারা আগ্রহী ছিল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আর সেই ভিনদেশী শাসকের হাতে রইল না। কিন্তু সমগ্র জাতির সঙ্গে কৃষক সম্প্রদায়ের সংহতির প্রক্রিয়া তখনও শেষ হয়নি। তা চলতে লাগল। এর মধ্যে জাতীয় সংহতিনাশক শক্তিগুলি বারবার আবির্ভূত হয়েছে, কখনো কখনো কৃষক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অংশকেও জড়িয়ে ফেলেছে। বস্তুগতভাবেও কৃষি উত্তরোত্তর জাতীয় চরিত্র নিচ্ছে এবং সর্বোচ্চ রাজনৈতিক নেতৃবর্গ জাতীয় পুঁজিবাদী বিকাশের কর্মসূচীতে কৃষক সম্প্রদায়কে সক্রিয় করে তোলার চেষ্টা করে আসছেন; কারণ, সংহতি সাধনের যে ভূমিকা আগে পালন করত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা, তা এখন গ্রহণ করেছে এই কর্মসূচী। বর্তমানে বিভিন্ন সর্বভারতীয় দল, নির্বাচন প্রক্রিয়া, শিক্ষার প্রসার, আধুনিক গণমাধ্যম, ও কিছুটা পরিমাণে সর্ব-ভারতীয় কৃষক সংগঠনগুলি এবং জাতীয় সেনাবাহিনী জাতীয় সংহতির গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হয়ে উঠেছে।

(ক) তথাপি আজও জাতীয় সংহতিসাধনের কিছু ইতিবাচক ও অসমাপ্ত দিক আছে এবং অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন ভারতীয় সেগুলি সম্পাদনের প্রয়োজন সমর্থন করে ঃ

(১) ভারতবর্ষকে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার জন্য এবং নয়া-উপনিবেশবাদের বিপদের বিরুদ্ধে নিয়ত লড়াই করতে হয়েছিল। জাতীয় ঐক্য বর্তমানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা ও তার ক্রমোন্নতির একটি মৌলিক শর্ত।

(২) জাতীয় ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্ভব একমাত্র জাতীয় স্তরে। ভারতীয় সমাজ উন্নয়নের ধারণা জনমানসকে গভীরভাবে আকৃষ্ট আগেও করত, এখনও করে।

(৩) ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সাংবিধানিক ঐক্যসাধনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল ও ব্যবহার শেষ পর্যন্ত একমাত্র জাতীয় স্তরেই সম্ভব।

(৪) আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, ভূমি সংস্কারে গ্রামীণ জনগণের স্বার্থ, উচ্চতর মজুরি, শিল্পজাত পণ্যের মূল্যের পাশাপাশি কৃষিপণ্যের মূল্য, রাষ্ট্রীয় অর্থ বণ্টন, এবং এমনকি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ—যেমন উত্তরাধিকার আইন, নারীর সামাজিক মর্যাদা, শিক্ষা, রেডিয়ো, চলচ্চিত্র প্রভৃতির জন্য সবচেয়ে ভালভাবে এবং সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করা যায় একমাত্র জাতীয় স্তরেই।

(৫) জাতপাত, সাম্প্রদায়িকতা ও ভাষাগত বিরোধের মত যেসব বিভেদ সৃষ্টিকারী শক্তি জাতীয় সংহতির ক্ষতিসাধন করছিল সেগুলি গ্রামীণ জনগণের বিভিন্ন অংশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম অর্থাৎ শ্রেণী সংগ্রামকে আঘাত হেনে চুরমার করে দিয়েছিল। গ্রামীণ জনগণ সহ ভারতের মানুষের ওপর এইসব শক্তির প্রভাব আজও প্রবল। এদের প্রতিহত করার কাজ অসমাপ্ত ছিল। যেমন, একই জাতের অন্তর্ভুক্ত মাঝারি ও ছোট চাষীদের নিজেদের দলে টেনে রাখা এবং নিম্নতর শ্রেণীগুলিকে দমন করার উদ্দেশ্যে গ্রামের প্রভাবশালী সামাজিক শ্রেণীগুলি জাতপাতের ব্যাপারকে আগে কাজে লাগিয়েছিল এবং এখনও লাগাচ্ছে; শুধু আগে এ সব শ্রেণীর প্রধান ছিল জমিদাররা, বর্তমানে প্রধানত ধনী কৃষকরা। এইসব বিভেদকামী শক্তি এখনও যথেষ্ট শক্তিশালী থেকে গেছে। এর অন্যতম কারণ, ১৯৪৭ সালের আগে বা পরে কৃষকদের মধ্যে আধুনিক ধ্যানধারণা প্রসারের এবং পুরোন অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন ধ্যানধারণা ও সংস্কৃতিকে সক্রিয়ভাবে উৎপাটিত করার চেষ্টা বিশেষ করা হয়নি।

(খ) এই ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে জাতীয় ঐক্য ও উন্নয়নের লক্ষ্য নিশ্চিতভাবে ইতিবাচক হলেও পুরোন পন্থায় সেই লক্ষ্যে পৌঁছন সম্ভব ছিল না। ১৯৪৭ সালের পরে কৃষক সম্প্রদায়ের জাতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠার চিরাচরিত প্যাটার্নের নেতিবাচক দিকগুলি উত্তরোত্তর অধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। এক জাতি ও এক শ্রেণীহীন কৃষক সম্প্রদায়ের শ্লোগান তুলে জাতিকে আরো সংহতিবদ্ধ করা অসম্ভব ছিল, কারণ আর কোন সাধারণ বিদেশী শত্রুর অস্তিত্ব ছিল না। সে কাজ করা যেত কেবলমাত্র জাতি ও গ্রাম দুয়ের মধ্যেই নূতন জাতীয়. কিন্তু এক বা একাধিক অভ্যন্তরীণ শত্রুকে চিহ্নিত করে। সুতরাং জাতীয় সংহতির জন্য বর্তমানে গণতন্ত্র, শ্রেণী সংগ্রাম, সুদূরপ্রসারী সামাজিক অর্থনৈতিক রূপান্তর এবং সমাজতন্ত্রের পথে চলা উচিত ছিল।

(১) একথা এখন সর্বজন স্বীকৃত যে ১৯৫১ সালের পর থেকে কৃষির উন্নতির সুফল লাভ করেছে প্রধানত ধনী ও মাঝারি কৃষক। শ্রেণীগত আপেক্ষিক অবস্থানকে বাদ দিলে, এর একটা বড় কারণ এক সমধর্মী কৃষক শ্রেণী, "অখন্ড গ্রামীণ সমাজ", এবং একক গ্রাম বা গ্রামীণ জনগোষ্ঠী প্রভৃতি ধারণার প্রসার।[60] এজন্যই ভারতের পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার সূচনা করা হয়েছিল "গ্রামীণ ক্ষেত্রের" জন্য "সমাজ-উন্নয়নের" শ্লোগান তুলে। একই "একীভূত শ্রেণীর" ধারণার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে তোলা হয়েছে গ্রামীণ সমবায় ও পঞ্চায়েতী রাজ।[61] গ্রামাঞ্চলের শ্রেণী বিভেদ ও শ্রেণী-সংগ্রামের ধারণার বিকল্প হিসেবে গ্রামীণ সমাজের ধারণাকে সচেতনভাবে উপস্থিত ও বিকশিত করা হয়েছে। ধনী কৃষক ও ভূস্বামী থেকে যারা জোতদারে পরিণত হয়েছিল সমাজ-উন্নয়ন কর্মসূচি, পঞ্চায়েতী রাজ এবং গ্রামীণ সমবায় ইত্যাদি তাদের সমৃদ্ধির হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ফলে এরা রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

(২) সর্বোপরি, এক অখণ্ড কৃষক সম্প্রদায়ের মতাদর্শগত ধারণা গ্রামাঞ্চলে শ্রেণী সংগ্রামের পূর্ণ বিকাশ ঘটতে দেয়নি।

আগের মতই ১৯৪৭ সালের পরেও এই মতাদর্শ ইতিমধ্যে সুস্পষ্টভাবে বিকাশমান সামাজিক স্তরে বা ক্ষুদ্র, নিঃস্ব কৃষক, অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র ভূমি-মালিক, এবং ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের ওপর ধনী কৃষক ও ছোট ভূস্বামীর আধিপত্য লাভের উপায় হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া অখণ্ড কৃষক সমাজের ধারণা ভারতের গ্রামাঞ্চলে বিকাশমান এমনকি প্রভাবশালী হয়ে ওঠার যে প্রবণতাকে গোপন করে, তা হল, কৃষক সমাজ বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া, আধা-প্রলেতারিয় ও প্রলেতারিয় শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। উপরে দ্বিতীয় অংশে এ নিয়ে সুস্পষ্ট আলোচনা হয়েছে। গ্রামীণ সমাজের উচ্চতর শ্রেণী নিঃসন্দেহে একই উদ্দেশ্যে জাতিভেদ প্রথা ও সাম্প্রদায়িকতার বিভেদমূলক মতাদর্শকে প্রায়শই এবং যুগপৎ কাজে লাগায়।

এই প্রসঙ্গে স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ের সঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য মনে রাখা দরকার। সে সময় বিভিন্ন শ্রেণীর কৃষকের স্বার্থ বিভিন্ন থাকলেও গোটা কৃষক সম্প্রদায় বিষয়গত ভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ছিল। কিন্তু ১৯৪৭-এর পরে বিভিন্ন কৃষি শ্রেণী ও সামাজিক স্তরের মধ্যে সর্বজনীন স্বার্থ বলে বিশেষ কিছু নেই।

ভূমি সংস্কারের গতি কেন এত মন্থর এবং বামপন্থী দলগুলি কেরল ও অন্যান্য কিছু ছোট ছোট অঞ্চলে ছাড়া ক্ষেত মজুর ও অতি ক্ষুদ্র ভূমি মালিকদের সংগঠিত করতে কেন ব্যর্থ হয়েছে গ্রামাঞ্চলে, রাজ্য বিধান সভাগুলিতে, রাজ্য সরকারগুলিতে এবং এমনকি কেন্দ্রেও ধনী কৃষকগোষ্ঠীর প্রবল প্রভাব-প্রতিপত্তির ঘটনা থেকেই তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আর অখণ্ড কৃষক সমাজের ধারণা এই প্রভাব বিস্তারে সহায়ক হয়েছে।

বাহ্যত ধনী, মাঝারি ও দরিদ্র কৃষক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হলেও তারা এক অখণ্ড কৃষক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, এই ধারণা—সি. পি. আই, সি. পি. এম, এবং সি. পি. (এম. এল.) গোষ্ঠীগুলি সহ বামপন্থী গোষ্ঠীগুলির ক্রিয়াকলাপেরও প্রধান ভিত্তি হয়ে উঠেছিল। অন্যান্য অনেক বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও এ বিষয়ে তাদের অভিন্ন মত যে, গ্রামীণ ভারতে (বা এমনকি সারা ভারতেও) প্রধান রাজনৈতিক কাজ হল সামন্ততন্ত্র-বিরোধী বিপ্লব ঘটান এবং তা সম্পূর্ণ করা। এর ফলে, সমস্ত শ্রেণীকে নিয়ে (শুধু প্রায় পৌরাণিক সামন্ত প্রভুদের ছাড়া) কৃষকদের সংগঠিত করার প্রচেষ্টায় গ্রামীণ প্রলেতারিয় ও আধা-প্রলেতারিয়দের সংগঠিত করার বিষয়টি সম্পূর্ণ বাতিল করা না হলেও উপেক্ষা করা হয়েছিল।

এর অন্যতম রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিণাম হল, ক্ষেত মজুরদের ওপর রক্ষণশীল শক্তিগুলির অব্যাহত আধিপত্য।

বামপন্থীদের পাল্টা হিসাবে, কৃষক র‍্যাডিক্যালরা গ্রামীণ শ্রেণী কাঠামোর পরিবর্তনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়ে শ্রেণী সংগ্রাম এবং সমাজ রূপান্তরের পরিবর্তে সাম্যের দাবি উত্থাপন করেছে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতৃবর্গও ক্রমশ এই সমতার লক্ষ্যকে গ্রহণ করেছে কেননা এইভাবেই র‍্যাডিক্যালিজমকে কৃষকের দৃষ্টিভঙ্গির চৌহদ্দির মধ্যে আটকে রাখা যায়। ছোট ও মাঝারি কৃষক, নিম্নবর্ণের ক্ষেতমজুর এমন কি ধনী কৃষকের কাছেও এই শ্লোগানের আবেদন জোরালো। এমনকি, ধনী কৃষকও বিষয়টিকে দেখে তার নিজের জীবনযাপনের ধরন এবং শহুরে বুর্জোয়া বা এমনকি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাপনের ধরনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্যের পটভূমিতে।

(৩) কৃষক সমাজকে একটি অখন্ড শ্রেণী মনে করার ফলে বামপন্থীরা গ্রামের নিচু জাতের গরিব মানুষের ঐতিহাসিকভাবে সুনির্দিষ্ট সমস্যাগুলিকেও অবহেলা করেছে। এইসব মানুষের জাতপাতকে তাদের দমন করে রাখার লক্ষ্যে ব্যবহার করা হয়েছে ও আজও হচ্ছে। আজ আর একে 'সামন্ততন্ত্রে'র অবশেষ মনে করা যায় না। আসলে এটা হল এক সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পদ্ধতি যার মাধ্যমে ধনী কৃষক ও ছোট ভূস্বামী ক্ষেত মজুর, সামান্য পাট্টা জমির অধিকারী ভাগচাষী ও 'উঠবন্দী' প্রজাকে দমন করে রাখে। এই অবহেলার জন্যই এইসব নিম্নবর্ণের অন্তর্ভুক্ত বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়ারা গ্রামের দরিদ্র মানুষকে নিজেদের রাজনীতি ও শ্রেণী স্বার্থের সমর্থনে টেনে আনতে পেরেছে। আগেই বলা হয়েছে, উচ্চবর্ণের মানুষেরা অবশ্য ছোট ও মাঝারি কৃষকদের নিজেদের দলে রাখার জন্য জাতপাতকে ব্যবহার করে। এই উভয় রকমের কৃত্রিম ঐক্যের অবসানের জন্য জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রয়োজন।

(৪) কৃষক সম্প্রদায় অখন্ড জাতির অংশ এবং এক অখন্ড শ্রেণী এই ধারণা গ্রামের শোষিত দরিদ্র মানুষের সঙ্গে শহরের শোষিত মানুষ ও র‍্যাডিক্যাল বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর ঐক্যকে ব্যাহত করেছে। পরিণাম স্বরূপ, ১৯৪৭ সালের আগের মতই কোন কোন দল, নানা রূপে গ্রাম-শহরের মিথ্যা বিভাগ সৃষ্টির চেষ্টায় রত, যেমন ভারতীয় লোক দল (বা বি. এল. ডি.) এবং অকালিরা।

টীকা

1. এস জে. প্যাটেল, 1952, পৃঃ 148.
2, জর্জ ব্লাইন, পৃঃ 102, 119, 122.
3. মণিলাল নানাবতী, পৃঃ 374.
4. ভবানী সেন, পৃঃ 103.

5. যুক্তপ্রদেশের জমিদারী বিলোপ কমিটির প্রতিবেদন, পৃঃ 343.

6. ই. স্টোক্স, পৃঃ 114. এছাড়াও পৃঃ 129-32.

7. অশোক সেন, 3নং সারণি.

8. বিপান চন্দ্র, 1972, পৃঃ 96-99.

9. সর্বভারতীয় কৃষি ঋণ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান (অল ইণ্ডিয়া রুর‍্যাল ক্রেডিট সার্ভে), খণ্ড-২, পৃঃ 167.

১০. কৃষি শ্রমিকদের সম্পর্কে অনুসন্ধান লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে এই হিসাব করা হয়েছে: 'রুর‍্যাল ম্যান পাওয়ার এণ্ড অকুপেশনাল স্ট্রাকচার', পৃঃ 9.

11. এস. জে. প্যাটেল, 1956, পৃঃ 7.

12. "অল ইণ্ডিয়া রুর‍্যাল ক্রেডিট সার্ভে", খণ্ড-2, পৃঃ 167.

13. এস. জে. প্যাটেল, 1952, পৃঃ 148.

14. তদেব।

15. এগ্রিকালচারাল লেবার এনকোয়ারী, খণ্ড-1, পরিশিষ্ট-VII, সারণি-1.

16. তদেব, সারণি-2.

17. জি. কোতোভস্কি, পৃঃ 12.

18. এইচ. ডি. মালব্য, পৃঃ 107.

19. তদেব, পৃঃ 179.

20. এম. জি. রাণাডে ; দশম, একাদশ ও দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। আরো দ্রষ্টব্য, বিপান চন্দ্র, 1966, পৃঃ 486 ও অনুবর্তী।

21. এম. জি. রাণাডে, পৃঃ 287.

22. দ্রঃ তার্লোক সিং, পৃঃ 300 ও পরবর্তী পৃষ্ঠা ; ভবানী সেন, অষ্টম পরিচ্ছেদ।

23. দ্রষ্টব্য তালিব ও মজিদ ; বি. এন. গাঙ্গুলী ; ভি এস. ব্যাস এবং শীলা ভাল্লা।

24. উৎস পটনায়ক, 1975, সারণি-1.

25. 'অল ইণ্ডিয়া ডেট্ এ্যাণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট সার্ভে', 1971-72 থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে এই হিসাব করা হয়েছে—খণ্ড-1, সারণি-2, পৃঃ 17.

26. এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত প্রথম সারণি থেকে বের করা হয়েছে।

27. উদাহরণস্বরূপ নীচের সারণিগুলি দ্রষ্টব্য :

সারণি-1. 1945 সালে ইতালিতে ভূমিস্বত্ব :

জমির পরিমাণ একর-এর হিসাবে	মোট জোতের সংখ্যার শতকরা অংশ	মোট জমির শতকরা অংশ
5 একর পর্যন্ত	83.3	17.4
5 থেকে 25 একর	13.6	24.2
25 থেকে 125 একর	2.6	23.3
125 থেকে 250 একর	0.3	9.1
250 থেকে 1250 একর	0.1	17.3
1250 একরের উর্ধ্বে	0.07	8.7

সারণি-2. 1908 সালে ফ্রান্সে ভূমিস্বত্ব :

জমির পরিমাণ হেক্টরের হিসাবে	জোতের সংখ্যা	শতকরা হিসাবে মোট জোত
ছোট জোত, 1 থেকে 10 হেঃ	2,523,713	73.84
মাঝারি জোত, 10 থেকে 40 হেঃ	745,862	21.82
বড় জোত, 40 থেকে 100 হেঃ	118,497	3.47
খুব বড় জোত, 100 হেঃ-এর উর্ধ্বে	29,541	0.86

সারণি-3. 1873 সালে ইংল্যান্ডে ভূমিস্বত্ব :

জোতের আয়তন একরের হিসাবে	মোট জোতের শতকরা অংশ	মোট জমির শতকরা অংশ
খুব ছোট মালিক, 1 থেকে 100	85.07	12.53
অপেক্ষাকৃত ছোট কৃষক, 101 থেকে 300	9.55	13.19
ধনী কৃষক, 301 থেকে 1000	3.74	15.27
ছোট জমিদার, 1001 থেকে 3000	0.98	13.74
বড় জমিদার, 3001 এর উর্ধ্বে	0.50	27 03
সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী (পিয়ার্স)	0.16	18.24

সারণি-4. 1907 সালে জার্মানিতে ভূমিস্বত্ব :

জোতের আয়তন	মোট জমির শতকরা অংশ	
হেঃ-এর হিসাবে	এলবে-র পূর্ব দিকে	এলবে-র পশ্চিম দিকে
12.5 পর্যন্ত	8.5	22.0
12.5 থেকে 50	22.7	40.0
50 থেকে 250	28.5	30.0
250-এর উর্ধ্বে	40 3	8.0

এস. বি. ক্লাফ থেকে সংগৃহীত---পৃঃ যথাক্রমে 326, 322, 319 এবং 323.

28. এই প্রস্তাবে আরও বলা হ'ল : "কৃষকদের নিজস্ব কিষাণ সভা সংগঠিত করার অধিকার স্বীকার করলেও কংগ্রেসের পক্ষে তার মূল নীতি ও আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন কোন সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়া সম্ভব নয়। এবং যে সব কংগ্রেসী কিষাণ সভার সদস্য হিসাবে কংগ্রেসের আদর্শ ও কর্মসূচীর বিরোধী পরিবেশ সৃষ্টি করছেন, কংগ্রেস তাদের প্রতি কোন আনুকূল্য প্রদর্শন করতে পারে না। সেজন্য প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিগুলিকে জানানো হচ্ছে যে, তারা যেখানে যেখানে প্রয়োজন এই কথা মনে রেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।" 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস', 1938-39, পৃঃ 16-17.

29. একজন র‍্যাডিকাল সমাজতাত্ত্বিকের এই সমালোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ডি. এন. ধানাগ্রে, ''দ্য পলিটিকস্ অব সার্ভাইভাল'', পৃঃ 49.

30. এম. এইচ. সিদ্দিক, পৃঃ 216-17.

31. কে. এন. পানিকর, পৃঃ 627.

32. এই অংশ উদ্ধৃত হয়েছে 'স্বরাষ্ট্র, রাজনৈতিক', সংগৃহীত ফাইল নং 87, 1921 থেকে। উদ্ধৃতিটি পাওয়া যাবে এম. এইচ. সিদ্দিক, পৃঃ 180 তে। এই বক্তৃতায় পাঠ ভেদের জন্য দ্রষ্টব্য গান্ধী, 'সমগ্র রচনাবলী', খণ্ড-19, পৃঃ 352.

33. গান্ধী, 'সমগ্র রচনাবলী', খণ্ড 20, পৃঃ 106.

34 এই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল ঃ ''রায়ত-রা জমিদারদের খাজনা দিচ্ছে না, এই মর্মে একটি অভিযোগ ওয়ার্কিং কমিটির নজরে আসায় কমিটি সমস্ত কংগ্রেস কর্মী ও সংগঠনকে নির্দেশ দিচ্ছে তাঁরা যেন রায়তদের একথা বোঝান যে খাজনা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের প্রস্তাব-বিরোধী ও দেশের স্বার্থে ক্ষতিকর। ওয়ার্কিং কমিটি জমিদারদের এই ভরসা দিচ্ছে যে, কংগ্রেসী আন্দোলন তাদের আইনানুগ অধিকারে কখনোই হস্তক্ষেপ করতে চায় না। যেসব ক্ষেত্রে রায়তদের অভিযোগ আছে সে সব ক্ষেত্রেও ঐ সব অভিযোগের নিরসন পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা এবং প্রচলিত পদ্ধতিতে সালিশীর মাধ্যমে হওয়া উচিত বলে ওয়ার্কিং কমিটি মনে করে।'' 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস', 1920-23, পৃঃ 178.

35. 1931 এর 29 ডিসেম্বর, 1932 এর 1 জানুয়ারি এবং 1934 এর 17 ও 18 জুন-এর সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলী। ''ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, 1930-34'', পৃঃ 138 এবং 184-85.

36. আর ক্লেইন, পৃঃ 59 ; এবং এস. গোপাল, পৃঃ 164

37. পি. সিতারামাইয়া, পৃঃ 619-20.

38. দ্রঃ আর. ক্লেইন, পৃঃ 86-88 ; ডবলিউ. হাউসার, পৃঃ 95-96, 107.

39. নেহরু, ''আত্মজীবনী'', পৃঃ 312 এবং 232.

40. দ্রঃ এস. গোপাল, পৃঃ 155-57 ; আর ক্লেইন, পৃঃ 59-60. এই প্রসঙ্গে আরও দ্রষ্টব্য, এমার্সন-কে লেখা গান্ধীর চিঠি, 23শে মার্চ 1931. চিঠিটি গান্ধী, ''সমগ্র রচনাবলী'', খণ্ড 45, পৃঃ 335-এ পাওয়া যাবে।

41. দ্রষ্টব্য, এস. গোপাল, পৃঃ 157.

42. তদেব, পৃঃ 159.

43 1936 সালে কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব—''ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস 1934-36'', পৃঃ 79-80 ; 1936-এ কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার এবং ঐ বছরই ফৈজপুর অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব—'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস 1936-37', পৃঃ 5 এবং 96-97. এই প্রসঙ্গে আরো দ্রঃ এস. গোপাল, পৃঃ 214.

44. এস. গোপাল, পৃঃ 229 ; এইচ ডি. মালব্য, পৃঃ 66-9 ; আর. ক্লেইন, পৃঃ 102-50 ; ডবলিউ, হাউসার, পৃঃ 127.

45 আর. ক্লেইন পৃঃ 102-08 ; ডবলিউ, হাউসার, পৃঃ 110-11.

46 নেহরু, 'নির্বাচিত সংকলন', খণ্ড 8, পৃঃ 365.

47. এল. ফিশার, পৃঃ 42-43

48. তদেব, পৃঃ 72-73.

49. 'হরিজন', 29শে ডিসেম্বর 1951—এইচ. ডি. মালব্য, পৃঃ 72-73-এ উদ্ধৃত।

50. এইচ. ডি. মালব্য, পৃঃ 76. গান্ধী শ্রমিকদের সাফল্যের জন্য দুটি শর্তের উল্লেখ

করেছিলেন। 'শ্রমিকদের নিজ শক্তি সম্পর্কে সচেতন করতে হবে" এবং "তাদের সত্য ও অহিংসার নীতি দ্বটিকে গ্রহণ করাতে হবে।" উদ্ধৃতি—তদেব।

51. তদেব, প্ঃ 75.

52. ডবলিউ, হাউসার—প্ঃ 100-101.

53. তদেব—প্ঃ 99-100.

54. মহাদেব দেশাই, প্ঃ 42, 102-03 ; পি. সিতারামাইয়া, প্ঃ 549.

55. দ্রঃ পাদটীকা, 45. বিশেষ করে ক্রেইন প্ঃ 104-07.

56. দ্রষ্টব্য বিপান চন্দ্র, 1979.

57. ডবলিউ, হাউসার, প্ঃ 118-19-এ উদ্ধৃতি। আরো দ্রঃ ধানাগ্রে "দ্য পলিটিকস অব সাভাইভাল", প্ঃ 42.

58. সিদ্দীক, প্ঃ xiii, 127, 186-87.

59. ডবলিউ, হাউসার, প্ঃ 35, 151, 156.

60. আলোক সিং, প্ঃ 310 এবং 306. আরো দ্রঃ পি. সি. জোশি, 1960 এ উল্লিখিত সরকারী নথি।

61. আলোক সিং, প্ঃ 309.

62. তদেব, প্ঃ 308-09.

গ্রন্থপঞ্জি

১. প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের গ্রন্থপঞ্জি

(কৃষি কাঠামো)

১. 'এগ্রিকালচারাল লেবার এনকোয়ারি', (ক) 'লেবার, এমপ্লয়মেণ্ট, আণ্ডার ডেভেলপমেণ্ট অ্যাণ্ড লেভেলস্ অব লিভিং', খণ্ড. I, নয়াদিল্লি 1954. (খ) 'র্রাল ম্যান-পাওয়ার অ্যাণ্ড অকুপেশনাল স্ট্রাকচার', নয়াদিল্লি 1969.

২. 'অল ইণ্ডিয়া ডেট অ্যাণ্ড ইনভেস্টমেন্ট সার্ভে', 1971-72, খণ্ড I, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, 1975.

৩. 'অল ইণ্ডিয়া র্রাল ক্রেডিট সার্ভে", খণ্ড II, বোম্বাই 1964.

৪. পি. এস. আপ্প্, (ক) 'নোট অন ল্যাণ্ড পলিসি অ্যাণ্ড নোট অন সিলিং অন এগ্রিকালচারাল হোল্ডিংস্', যোজনা কমিশন, ভারত সরকার, 1972, মিমিওগ্রাফ কপি।

(খ) 'টেন্যান্সি রিফর্ম ইন ইণ্ডিয়া', 'ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি', বিশেষ সংখ্যা, আগস্ট 1975, সংখ্যা 33-35.

৫. অমিয় কুমার বাগচী, 'রিফ্লেকশনস্ অন প্যাটার্ন অব রিজিওনাল গ্রোথ ইন ইণ্ডিয়া ডিউরিং দা পিরিয়ড অব ব্রিটিশ র্ল', সেণ্টার ফর স্টাডিজ ইন সোস্যাল সায়েন্সেস, কলিকাতা, মিমিওগ্রাফ কপি, 1975.

৬. জি. এস. ভাল্লা, 'চেঞ্জিং স্ট্রাকচার অব এগ্রিকালচার ইন হরিয়ানা', চণ্ডীগড়, 1975.

৭. শীলা ভাল্লা, নিউ রিলেশন্‌স্‌ অব প্রোডাকশন ইন হরিয়ানা এগ্রিকালচার', 'ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি', 27 মার্চ 1979, খণ্ড XI, নং 13.

৮. এস. বি. ক্লাফ, 'ইওরোপীয়ান ইকনমিক হিস্ট্রি', নিউ ইয়র্ক. 1968.

৯. কৃষ্ণ ভরদ্বাজ, 'প্রোডাকশন কণ্ডিশন্‌স্‌ ইন ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচার', কেম্ব্রিজ, 1974.

১০. জি. ব্লাইন, 'এগ্রিকালচারাল ট্রেণ্ড্‌স্‌ ইন ইণ্ডিয়া, 1891-1947', ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়া প্রেস, 1966.

১১. ভি. এম. দাণ্ডেকার, 'ইকনমিক থিওরি অ্যান্ড অ্যাগ্রেরিয়ান রিফর্ম', নিচে বর্ণিত এ. এম. খুসরো-তে অন্তর্ভুক্ত।

১২. এম. এল. দাঁতওয়ালা, 'স্মল ফার্মস', নট স্মল ফার্ম্‌স্‌' নিচে বর্ণিত এ এম খুসরো-তে অন্তর্ভুক্ত।

১৩. এ. আর. দেশাই, (ক) 'সোস্যাল ব্যাকগ্রাউণ্ড অব ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজ্‌ম্‌'। বোম্বাই 1959.

(খ) 'রিসেণ্ট ট্রেণ্ড্‌স্‌ ইন ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজ্‌ম্‌', বোম্বাই।

(গ) 'রুরাল সোসিওলজি ইন ইণ্ডিয়া', বোম্বাই, 1969.

১৪. আর. পাম দত্ত, 'ইণ্ডিয়া টুডে', বোম্বাই, 1949.

১৫. ফ্রান্সিন আর. ফ্রাংকেল, 'ইণ্ডিয়াস্‌ গ্রীন রেভোলিউশন', প্রিন্সটন নিউ জার্সি 1971.

১৬. বি. এন. গাঙ্গুলি, 'দ্য ইণ্ডিয়ান পেজ্যাণ্ট অ্যাজ অ্যান অ্যানালাইটিক্যাল ক্যাটেগরি', 'সোসিওলজিক্যাল বুলেটিন', সেপ্টেম্বর 1974, খণ্ড 23, নং 2.

১৭. 'দ্য ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারি কমিটি রিপোর্ট', ভারত সরকার, 1971.

১৮. পি. সি. যোশী, (ক) কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট প্রোগ্রাম, এ রিঅ্যাপ্রেইজাল', 'এনকোয়ারি', নং 3, 1960, দিল্লি। নিচে বর্ণিত এ. এম. খুসরো-তেও অন্তর্ভুক্ত।

(খ) 'অ্যাগ্রেরিয়ান সোস্যাল স্ট্রাকচার অ্যান্ড সোস্যাল চেঞ্জ', 'সংখ্যা: দ্য ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব স্ট্যাটিস্টিক্স', শ্রেণী খ, খণ্ড XXXI, ভাগ 3 এবং 4, 1969.

(গ) 'ল্যান্ড রিফর্ম্‌স্‌ ইন ইণ্ডিয়া', দিল্লি, 1975.

১৯. এ. এম. খুসরো, সম্পাদক, 'রিডিংস ইন এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেণ্ট', বোম্বাই 1968.

২০. জি. কোতোভস্কি, 'অ্যাগ্রেরিয়ান রিফর্ম্‌স্‌ ইন ইণ্ডিয়া', নয়াদিল্লি, 1964.

২১. উল্‌ফ্‌ লাদেজিনস্কি, 'টেনিওরিয়াল কণ্ডিশন্‌স্‌ অ্যান্ড দ্য প্যাকেজ প্রোগ্রাম, উপরে বর্ণিত এ. এম. খুসরো-তে অন্তর্ভুক্ত।

২২. ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদ, 'ইকনমিকস্ অ্যান্ড পলিটিক্স্ অব ইণ্ডিয়াস্ সোস্যালিস্ট প্যাটার্ন', নয়াদিল্লি, 1966.

২৩. মনিলাল বি. নানাবতী, 'মিনিট অব ডিসেন্ট', 'দ্য ফেমিন ইনকোয়ারি কমিশন, ফাইন্যাল রিপোর্ট', মাদ্রাজ, 1945.

২৪. নানাবতী ও আঞ্জারিয়া, 'দ্য ইণ্ডিয়ান রুরাল প্রব্লেম', বোম্বাই।

২৫. এস. জে. প্যাটেল, (ক) 'এগ্রিকালচারাল লেবারারস ইন মডার্ন ইণ্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান', বোম্বাই, 1952.

(খ) 'ডিস্ট্রিবিউশন অব দা ন্যাশনাল ইনকাম অব ইণ্ডিয়া', 'ইণ্ডিয়ান ইকনমিক রিভিউ', খণ্ড III, নং I, 1956.

২৬. উৎসা পটনায়ক, (ক) 'ক্যাপিটালিজম ইন এগ্রিকালচার', 'সোস্যাল সায়েণ্টিস্ট', নং 2 এবং 3, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর 1972. (খ) 'কণ্ট্রিবিউশন টু দা আউটপুট অ্যান্ড মার্কেটেবল্ সারপ্লাস অব এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্ট্স্ বাই কাল্টিভেটিং গ্রুপ্স্ ইন ইণ্ডিয়া, 1960-61, 'ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি', 27 ডিসেম্বর 1975, খণ্ড X, নং 52.

২৭. কে. এন. রাজ, 'ওনারশিপ অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অব ল্যান্ড', 'ইণ্ডিয়ান ইকনমিক রিভিউ', এপ্রিল 1970, খণ্ড V (নতুন শ্রেণী), নং 1.

২৮. সি. এইচ. হনুমন্ত রাও, 'সোসিও-পলিটিক্যাল ফ্যাক্টরস ইন এগ্রিকালচারাল পলিসিস্', 'ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি' বিশেষ সংখ্যা, আগস্ট 1974, খণ্ড IX, নং 32-34.

২৯. 'রিপোর্ট' অব দা ইউনাইটেড প্রভিন্সেস জমিন্দারি অ্যাবলিশন কমিটি', এলাহবাদ, 1948.

৩০. অশোক সেন, 'প্রপার্টি', লেবার অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজ ইন বেঙ্গল্'স্ এগ্রিকালচার' (1800-1900), সিনপসিস, নেহেরু মেমোরিয়াল মিউজিয়ম অ্যান্ড লাইব্রেরি, মিমিওগ্রাফ কপি।

৩১. ভবানী সেন, 'ইভলিউশন অব অ্যাগ্রেরিয়ান রিলেশন্স্ ইন ইণ্ডিয়া', নয়াদিল্লি, 1969.

৩২. এরিক স্টোক্স্, 'দ্য ইণ্ডিয়ান ইকনমিক অ্যান্ড সোস্যাল হিস্ট্রি রিভিউ', এপ্রিল-জুন 1975, খণ্ড XII, নং 2.

৩৩. তালিব ও মজিদ, 'দ্য স্মল ফার্মার্স অব পাঞ্জাব', 'ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি', 26 জুন 1976, খণ্ড XI, নং 26.

৩৪. ভি. এস. ব্যাস, 'স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ ইন এগ্রিকালচার অ্যান্ড দা স্মল ফার্ম সেক্টর', 'ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি', 10 জানুয়ারি 1976, খণ্ড XI, নং 1 ও 2.

২. তৃতীয় ও চতুর্থ অংশের গ্রন্থপঞ্জি

(কৃষক সমাজ ও জাতীয় সংহতি)

৩৪. হামজা আলাভি, 'পেজ্যাণ্ট্স্ অ্যান্ড রেভলিউশন', 'সোস্যালিস্ট রেজিস্টার 1965', রাল্ফ্ মিলিব্যান্ড এবং জন সেভিল সম্পাদিত, লণ্ডন 1965.

৩৬. বালাবুশেভিচ ও ডায়াকভ, 'এ কনটেমপোরারি হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া', নয়াদিল্লি, 1964.

৩৭. বিপান চন্দ্র, (ক) 'দ্য রাইজ অ্যাণ্ড গ্রোথ অব ইকনমিক ন্যাশনালিজম্ ইন ইণ্ডিয়া', নয়াদিল্লি, 1966.

(খ) 'ব্রিটিশ অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান আইডিয়াস অন ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট, 1858-1905', বর্তমান গ্রন্থ। 'স্টাডিস ইন মর্ডান ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি', সংখ্যা এক, সম্পাদক-বি. আর. নন্দ ও ভি. সি. যোশী, নয়াদিল্লি, 1972 -এরও অন্তর্ভুক্ত। (গ) 'এলিমেণ্ট্স্ অব কণ্টিনিউয়িটি অ্যাণ্ড চেঞ্জ ইন দা আর্লি ন্যাশনালিস্ট অ্যাক্টিভিটি', বর্তমান গ্রন্থ। 'স্টাডিজ্ ইন হিস্ট্রি, খণ্ড I, নং ১, 1979-এরও অন্তর্ভুক্ত।

৩৮. রবার্ট ক্রেন, 'দ্য ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, অ্যাণ্ড দ্য ইণ্ডিয়ান অ্যাগ্রেরিয়ান প্রব্লেম, 1919-1939, এ হিস্টরিক্যাল স্টাডি', অপ্রকাশিত পি-এইচ. ডি. থিসিস, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়, 1951, মাইক্রোফিল্ম্।

৩৯. মহাদেব দেশাই, 'দ্য স্টোরি অব বারদোলি', আহ্মেদাবাদ, 1957.

৪০. ডি. এন. ধানাগ্রে, (ক) 'দ্য পলিটিক্স্ অব সারভাইভাল—পেজ্যাণ্ট অর্গ্যানাইজেশান্স্ অ্যাণ্ড দ্য লেফ্ট্-উইং ইন ইণ্ডিয়া, 1925-46', 'সোসিওলজিক্যাল বুলেটিন', খণ্ড 24, নং I, মার্চ 1975.

(খ) 'অ্যাগ্রেরিয়ান মুভমেণ্ট্স্ অ্যান্ড গান্ধীয়ান পলিটিক্স্', ইন্স্টিটিউট অব সোস্যাল স্টাডিজ, আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়, আগ্রা 1975.

৪১. এম. কে. গান্ধী, 'কালেক্টেড ওয়ার্ক্স', আহ্মেদাবাদ।

৪২. এস. গোপাল, 'জওহরলাল নেহরু, এ বায়োগ্রাফি', খণ্ড I, লণ্ডন, 1975.

৪৩. ওয়াল্টার হাউসার, 'দ্য বিহার প্রভিন্সিয়াল কিষাণ সভা, 1929 1942' অপ্রকাশিত পি-এইচ. ডি. থিসিস', শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়, 1961, মাইক্রো-ফিল্ম্।

৪৪. 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস: রেজোলিউশন্স্ অন ইকনমিক পলিসি, প্রোগ্রাম অ্যাণ্ড অ্যালায়েড ম্যাটার্স্ 1924-1969', নয়াদিল্লি, 1969.

৪৫. 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস: রেজোলিউশন্স্ পাস্ড্ বাই দা কংগ্রেস, দা অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি অ্যাণ্ড দা ওয়াকিং কমিটি' ডিউরিং 1920-23, 1930-34, 1934-36, 1936-38, 1938-39, এলাহাবাদ।

৪৬. কে. বি. কৃষ্ণ, 'প্রব্লেম অব মাইনরিটিস,' লণ্ডন, 1939.

৪৭. এইচ. ডি. মালব্য, 'ল্যাণ্ড রিফর্ম্'স্ ইন ইণ্ডিয়া', নয়াদিল্লি 1954.

৪৮. ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদ, 'দ্য ন্যাশনাল কোশ্চেন ইন কেরালা', বোম্বাই, 1952.

৪৯. জওহরলাল নেহরু, (ক) 'অ্যান অটোবায়োগ্রাফি', বোম্বাই 1962. (খ) 'সিলেক্টেড ওয়ার্ক্'স্', সম্পা. এস. গোপাল।

৫০. এস. এম. পাণ্ডে, 'দ্য এমার্জেন্স অব পেজ্যাণ্ট মুভমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া : অ্যান এরিয়া স্টাডি', **ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশান্স্'**, খণ্ড 7, নং 1, জুলাই 1971.

৫১. কে. এন. পানিক্কর, 'পেজ্যাণ্ট রিভোল্টস্ ইন মালাবার ইন দা নাইন্-টিনথ্ অ্যাণ্ড টোয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরিস, এ. আর. দেশাই সম্পাদিত 'পেজ্যাণ্ট স্ট্রাগল্স্ ইন ইণ্ডিয়া', দিল্লি 1979-এর অন্তর্ভুক্ত।

৫২. টি. রামকৃষ্ণ, 'কিষাণ মুভমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া', নেহরু মিউজিয়াম অ্যাণ্ড লাইব্রেরি, নয়াদিল্লি মিমিওগ্রাফ।

৫৩. এম. জি. রানাডে, 'এসেস ইন ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্স্', বোম্বাই 1898.

৫৪. এম. এ. রসুল, 'এ হিস্ট্রি অব দা অল-ইণ্ডিয়া কিষাণ সভা', কলকাতা, 1974.

৫৫. মজিদ হায়াৎ সিদ্দিকি, 'অ্যাগ্রেরিয়ান আনরেস্ট ইন নর্থ ইণ্ডিয়া', নয়াদিল্লি 1978.

৫৬. তার্লোক সিং, 'ইণ্ডিয়াস্ রুরাল ইকনমি অ্যাণ্ড ইট্স্ ইনস্টিটিউশনাল ফ্রেমওয়ার্ক : এ রি-এগজামিনেশন', জে. পি. ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'স্টাডিজ ইন ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল ইকনমিক্স্', বোম্বাই, 1968-এর অন্তর্ভুক্ত।

৫৭. পট্টভি সীতারামাইয়া, 'হিস্ট্রি অব দ্য ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস', খণ্ড I, এলাহাবাদ 1936.

তিলক

কোন জনপ্রিয় নেতার জীবনী লেখা সবসময়ই কঠিন। কেননা, সহজেই 'অযথা মহিমান্বিত করার অথবা মিথ্যা খ্যাতিচ্যুত করার প্রবণতা এসে যায়। লোকমান্য তিলকের মত একজন মহান দেশপ্রেমী সম্পর্কে তথ্যসমৃদ্ধ লেখা তো আরও শ্রমসাধ্য কাজ। মহারাষ্ট্রের দুই তরুণ ইংরেজীর অধ্যাপকের লেখা আলোচ্য গ্রন্থটি* এমন একজন মানুষের জীবন সম্পর্কে যাঁকে যথার্থই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এটি তথ্যভিত্তিক ও উদ্যমী কিন্তু আংশিকভাবে সফল আলোচনার এক প্রশংসনীয় উদাহরণ।

এ পর্যন্ত প্রকাশিত তিলকের জীবনীর মধ্যে সম্ভবত এটি সর্বাপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ। একমাত্র জনগণের রাজনৈতিক সক্রিয়তাই ভারতের ওপর ইংরেজের মুষ্টি শিথিল করতে পারবে, ভারতের জাতীয় আন্দোলনে তিলকের মহত্তম ও স্থায়ী এই অবদানকে লেখকরা এই গ্রন্থে সাফল্যের সঙ্গে সুস্পষ্ট ও বিশদভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন, "তিনি বিশ্বাস করতেন যে আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু হল জনগণের সংগঠিত শক্তি যা ভারতবর্ষের আমলাতন্ত্রের প্রতিটি অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আত্মপ্রকাশ করে।" জননেতা হিসেবে ১৮৯০ এর দশকের গোড়ায় রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে তিলকের লক্ষ্য ছিল জনগণকে জাগিয়ে তোলা। তিনি চেয়েছিলেন জনসাধারণের সমসাময়িক সমস্যা নিয়ে ব্যাপক আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের ভারতীয় রাজনীতির আবর্তের মধ্যে টেনে আনতে। দিনের পর দিন **কেশরী** ও **মাহ্‌রাট্টা** পত্রিকাতে সম্পাদকীয় নিবন্ধের মাধ্যমে তিনি কংগ্রেসের বাণী জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলেছিলেন। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অভিজ্ঞতার পর তিনি লিখেছিলেন: "জনগণকে অবশ্যই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রামের শিক্ষা দিতে হবে, এবং তার একমাত্র পথ হল তাদের সংগ্রামে সামিল করা।"

জনগণ ও তাদের রাজনৈতিক সক্রিয়তার ওপর তিলকের আস্থা ছিল অসীম। তাদের রাজনৈতিক ভাবনা-চিন্তা ও ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে পথ দেখাতে গিয়ে তিনি কখনো বিচারকের আসনে বসেননি। এই দিক দিয়ে, তাঁর জাতীয়তাবাদ ছিল অরবিন্দ ঘোষের অস্পষ্ট অতীন্দ্রীয় জাতীয়তাবাদ থেকে স্বতন্ত্র। তাঁর জাতীয়তাবাদ ছিল ভারতের মানুষের প্রতি ভালবাসায় এবং তাদের শক্তির উপর বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত যুক্তিনির্ভর গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ। এবং এই কারণেই সাময়িক বাধা-বিপত্তির ফলে তিনি হতাশ হয়ে পড়েননি, প্রতিটি বাধাকেই তিনি জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষা বলে মনে করেছেন।

'এনকোয়ারি,, সংখ্যা ২, ১৯৫৯

* জি. পি. প্রধান এবং এ. কে. ভগবৎ: 'লোকমান্য তিলক—এ. বাইওগ্রাফি', বম্বে, ১৯৫৯

ঠিক এখানেই ছিল তিলকের সঙ্গে নরমপন্থীদের পার্থক্য। জনসাধারণ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রেই ছিল তাঁর সঙ্গে নরমপন্থীদের বিরোধ। তিলক ও নরমপন্থীদের মধ্যে মৌল পার্থক্য রাজনৈতিক ক্রিয়া কলাপের পদ্ধতি ও লক্ষ্যের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ছিল না। বার বার তিলক নিজেই বলেছিলেন, তাঁদের লক্ষ্য অভিন্ন। এবং তিনিও মুখ্যত সাংবিধানিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। ত্যাগে ও সাহসে জি. কে. গোখলে কোন অংশে তিলকের তুলনায় খাটো ছিলেন না। কিন্তু গোখলের জনগণের ওপর আস্থা ছিল না, তিনি ভয় পেতেন, যে-কোন রকম গণ আন্দোলন হলে তা ব্রিটিশ সরকারের ক্রোধের আগুন জ্বালিয়ে তুলবে এবং ফলে যে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে। অন্যদিকে, তিলকের অগাধ আস্থা ছিল জনগণের সংগ্রামী শক্তির ওপর। তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল কোন গণ-আন্দোলনকে অযৌক্তিকভাবে দমন করা হলে তার অনিবার্য পরিণামে জনগণ আরো জেগে উঠবে এবং রাজনৈতিক সংগ্রাম হয়ে উঠবে তীব্রতর। সুতরাং নরমপন্থীরা আন্দোলন করেছিলেন বিদেশী সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য, এবং তিলক আন্দোলন করেছিলেন জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য, তাদের জাগিয়ে তোলার জন্য। আলোচ্য গ্রন্থের লেখকদের ভাষায়, "তিলক নির্ভর করেছিলেন জনগণের ওপর, অন্যদিকে নরমপন্থীরা আশঙ্কিত ছিলেন গণজাগরণের ফলে লাগামহীন শক্তি জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনায়। এই কারণে যে ভাবে প্রথাগত আলোচনায় প্রধান ও ভগবত তিলকের কাজকর্মের নৈতিকতা নিয়ে আলোচনা করেছেন বা তিলক ও মহাত্মা গান্ধীর নীতিবোধের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন, তা ভ্রান্ত না হলেও সত্যিই অবান্তর। তিলকের কাছে কোনো পথ বা উপায় পদ্ধতি হিসাবে নৈতিক বা অনৈতিক কোনোটাই নয়। আসল প্রশ্ন হল তা অভিপ্রেত নৈতিক লক্ষ্যের অর্থাৎ জনগণকে অনুপ্রাণিত করার উপযুক্ত কিনা। "নূতন শক্তিগুলির শ্বাসরোধ করতে পারে এবং নূতন স্ফুলিঙ্গকে নিভিয়ে দিতে পারে" এমন সব পদ্ধতিকেই তিনি খারাপ মনে করেছেন।

একই সঙ্গে একথা বলতে হয় সমকালীন প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে অগ্রসর হলেও জনগণ সম্পর্কে তিলকের ধারণা যে অসম্পূর্ণ ছিল এই বিষয়টি প্রধান ও ভগবত তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। তিলক জনগণ সম্পর্কে এক সাধারণীকৃত সংজ্ঞায় বিশ্বাস করতেন। তাঁর কাছে জনসাধারণের অর্থ হল এক অখন্ড জনসমষ্টি। এবং যেহেতু সেই সময় ভারতীয় জনগণের একমাত্র যে গোষ্ঠীকে রাজনীতিতে টেনে আনা গিয়েছিল তারা ছিল শহরের পেটি বুর্জোয়া, ওপরের স্তরের কৃষক এবং ছোট জমিদারের একটি অংশ, তিলক তাই তাদেরই জনগণ মনে করেছেন। তাছাড়া, জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন সম্পর্কে বেশী সচেতন হওয়ায়, অথচ কিভাবে ভারতীয় জনগণকে বিভক্ত না করে উৎপীড়িত শ্রেণীগুলির দাবিকে রূপদান করা যায় তা বুঝতে না পারায়, তিলক জনগণের

প্রতি তাঁর সব আবেদনকে অবিমিশ্র জাতীয় ও সাংস্কৃতিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর ভুলটি সহজেই করেছিলেন। তিনি অবশ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতীয় জাতির অধিকাংশ অর্থনৈতিক দাবিকে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু তিনি একথা বুঝতে পারেননি যে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কৃষক সম্প্রদায়ের উপর বিদেশী জোয়ালের ভার চেপেছিল প্রাথমিকভাবে ভূস্বামী ও মহাজনদের মারফৎ। এজন্যই গোড়ার বছরগুলিতে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বোধ যখন পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি এবং তিনিও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারছিলেন না, সেই সময় 'এজ অব কনসেন্ট' বিলের বিরোধিতা এবং গণপতি ও শিবাজী উৎসবের মাধ্যমে এক ব্যাপক জাতীয় চেতনা গড়ে তোলার জন্য নির্ভর করেছিলেন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুভূতির ওপর।

তিলকের এই পর্বের কাজকর্ম এবং সমাজ সংস্কার সংক্রান্ত সামগ্রিক সমস্যার প্রতি তাঁর মনোভাব সম্পর্কে লেখকরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। সমকালীন সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে তিলকের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠা বা যেকোন ভাবে তাকে ব্যাখ্যা করার জন্য সচরাচর যা বলা হয় তা হল তিলক বিকাশমান রাজনৈতিক আন্দোলনে ভাঙ্গন সৃষ্টি করতে কিংবা সমাজের রক্ষণশীল অংশকে বিরোধী করে তুলতে চাননি। লেখকরা মেনে নিয়েছেন যে এর মধ্যে কিছুটা সত্য আছে। তাঁরা দেখিয়েছেন, তিলক নিজেই **কেশরী** পত্রিকার ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫ সংখ্যায় লিখেছিলেন যে অবিলম্বে সমাজ সংস্কারের চেষ্টা সমাজে ভাঙ্গন সৃষ্টি এবং পরিণামে রাজনৈতিক সংগ্রামকে দুর্বল করে দিতে পারে। তাঁর ভাষায় "দাসত্বের ফলে আমাদের এমন অধঃপতন ঘটেছে যে জনগণের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি যতদিন না ঘটবে ততদিন সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা যাবে না, এবং সেই কারণে রাজনৈতিক সংস্কার বাদ দিয়ে সমাজ সংস্কারের ওপর মনোযোগ দিতে বললে তা হবে আত্মঘাতী।" তাছাড়া, প্রধান ও ভগবত দেখাতে চেয়েছেন, তিলক জনশিক্ষার মাধ্যমে সমাজ সংস্কারে বিশ্বাসী ছিলেন, বিদেশী সরকার প্রণীত আইনের সাহায্যে নয়। তিনি মনে করতেন, জনসাধারণের ওপর জোর করে সংস্কার চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হলে তা পরিণামে নেতৃবৃন্দ ও জনগণের মধ্যে বিচ্ছেদ আনবে। এজন্যই ১৮৮৭ সালের ৩১শে মে তিনি **কেশরী**-তে লিখেছিলেন: "**কেশরী** সর্বদাই আমাদের সমাজের ক্ষতিকর প্রবণতা ও কুপ্রথার নিন্দা ও সমালোচনা করেছে। **কেশরী** সবসময়ই বলে এসেছে যে এগুলিকে ধীরে ধীরে দূর করতে হবে। কিন্তু এই দৃষ্টির সঙ্গে শ্রী মোদকের দৃষ্টিভঙ্গির একটা পার্থক্য আছে। তাঁর মতে একমাত্র প্রতিবিধান হল আইন প্রণয়ন, আমাদের মতে জনমতকে শিক্ষিত করা।" আবার ১৮৯০ সালের ১লা নভেম্বর এক প্রকাশ্য জনসভায় তিনি বলেছিলেন: "সমাজ সংস্কার নিয়ে অনেক কথা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের সংস্কার করতে হবে

জনগণকে, তাদের কাছ থেকে যদি আমরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলি তাহলে সে কাজ করা অসম্ভব হবে।"

এ-সবই সত্য। কিন্তু তবুও সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে তিলকের দৃষ্টিভঙ্গির এ ব্যাখ্যা যথেষ্ট নয়। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল "এজ অব কনসেণ্ট" বিলের বিরোধিতায়। সেই সময় প্রবন্ধে বক্তৃতায়, তিনি হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত বাল্য বিবাহের প্রথা সরাসরি এমনকি জোরালো ভাবে সমর্থন করেছিলেন। তাঁর আগের বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তিনি ভারতবর্ষের সামাজিক প্রথায় বিদেশী সরকারের নাক গলানর চেষ্টা বলে বিলটিকে সমর্থন না জানাতে বা বিরোধিতা করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে, তিনি প্রচলিত প্রথাগুলি ধর্মীয় দিক দিয়ে সঠিক ও প্রয়োজনীয় এটা প্রমাণ করার জন্য হিন্দু শাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর নিখুঁত জ্ঞানকে কাজে লাগালেন। এইভাবে বাস্তবে তিলক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গোঁড়া মনোভাবের প্রতি সমর্থন জুগিয়েছেন। এবিষয়ে তিলকের যোগ্য জীবনীকারদের বক্তব্য অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। তাঁরা দেখিয়েছেন, তিলক নিজেকে সমাজ সংস্কারকদের থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে রাজনৈতিক র‍্যাডিক্যালিজম্ অর্থাৎ জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী করতে চাইলেও কার্যত "প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেছিলেন।" এর যে কোন প্রয়োজন ছিল না যুগপৎ রাজনৈতিক র‍্যাডিক্যাল ও সমাজবিপ্লবীকে দেখলে তা বোঝা যায়।

এই প্রসঙ্গে আলোচ্য গ্রন্থের যে কয়েকটি পৃষ্ঠায় তিলক ও তাঁর প্রথম জীবনের বন্ধু ও সহকর্মী আগারকরের মধ্যে যে তুলনা ও বৈষম্য দেখান হয়েছে তা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। আমাদের কাছে যে তথ্য উদ্ঘাটিত হোল তাতে, তরুণ বয়সে তিলক ছিলেন অজ্ঞাবাদী আর আগারকর ছিলেন নাস্তিক। সম্ভবত এই তথ্যের সাহায্যে আগারকরের আদ্যন্ত দার্শনিক র‍্যাডিক্যালিজম এবং তিলকের পরবর্তীকালের ধর্মীয় রক্ষণশীলতায় প্রত্যাবর্তন ব্যাখ্যা করা যায়। এই গ্রন্থে আগারকর সম্পর্কে যেটুকু বলা হয়েছে তা আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে আরো অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা আশা করব এই মারাঠী লেখক, শিক্ষক, সাংবাদিক, নেতা ও দার্শনিক—যিনি মহারাষ্ট্রের বাইরে আরো ভালভাবে পরিচিত হওয়ার দাবি রাখেন—তাঁর জীবনী অবিলম্বে ইংরেজীতে প্রকাশিত হবে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রধান ও ভগবত এও স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, তিলক পুনরুজ্জীবনবাদী বা সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। একথা ঠিক যে ১৮৯০-এর দশকে তিনি পুনরভ্যুদয়বাদকে "বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষকে জাগানোর জন্য একটা কার্যকর ও প্রবল শক্তি হিসেবে" দেখেছিলেন এবং তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত করার কাজে লাগিয়েছিলেন। ১৯০২ সালে তিনি লিখেছিলেন: "আমরা আমাদের গৌরব, আমাদের স্বাধীনতা সব হারিয়েছি। একমাত্র যে সম্পদ আমাদের আছে তা হল ধর্ম, একে যদি আমরা পরিত্যাগ করি তাহলে

আমাদের অবস্থা হবে ঈসপের গল্পের সেই বোকা মোরগের মত যে একটি মূল্যবান রত্ন ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। আজকের দুনিয়ায় আমাদের যা-কিছু আছে তা সবচেয়ে সুবিধাজনকভাবে দেখাতে এবং প্রচার করতে হবে।" কিন্তু যাকে ভৃত্য হবে বলে মনে করা হয়েছিল তিলকের হাতে তা অচিরেই অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রভু হয়ে উঠল। ১৮৯৫ সালে তিলক লিখেছিলেন: "যদি আমরা আমাদের ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারগুলিকে আঁকড়ে ধরে রাখি এবং আমাদের মানসলোকে কল্যাণকর জ্ঞানকে প্রবেশ করতে না দিই, তাহলে আমরা কোনও দিন বড় হতে পারব না। সবরকম আপস বিরোধী মানসিকতা অগ্রাহ্য করে যদি যেখানেই সম্ভব জ্ঞান আহরণের জন্য সতর্কভাবে এগিয়ে যাই, তাহলেই আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে শিখব...।" প্রকৃতপক্ষে, ভারতবর্ষে গণজাগরণের জন্য সামাজিক ও ধর্মীয় পুনরভ্যুদয়ের তুলনায় উন্নততর পদ্ধতি হাতের কাছেই ছিল এবং একথা আগেই বোঝা উচিত ছিল যে পুনরভ্যুদয়বাদের মধ্যে প্রভু হয়ে ওঠার স্পষ্ট প্রবণতা আছে। আমাদের সাম্প্রতিক ইতিহাসের অন্যতম দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হল, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের গড়ে ওঠার বছরগুলিতে—১৮৮৫ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত—রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের সঙ্গী ছিল সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং সমাজ সংস্কারের সঙ্গী হয়েছে রাজনৈতিক রক্ষণশীলতা। এর জন্য রাজনৈতিক দিক থেকে তৎকালীন সমাজের র‍্যাডিক্যাল শক্তি পেটি বুর্জোয়া গোষ্ঠীর আধা-সামন্ততান্ত্রিক উৎস অর্থাৎ ছোট ভূস্বামী ও মহাজন শ্রেণী যে দায়ী ছিল, সেই সময়ের বিশদ অর্থনৈতিক-সামাজিক নিরীক্ষার সাহায্যেই কেবল তা জানা যেতে পারে।

আরেকটি ক্ষেত্রে লেখকরা পূর্বতন জীবনীকারদের রীতি থেকে সুবিধাজনকভাবে সরে গেছেন, যেমন, সরকার বিরোধী ক্রিয়াকলাপের জন্য তিলকের দুবার শাস্তি ও কারাদণ্ডের বিষয়ে। এই গ্রন্থে আমরা তিলককে এই অপরাধের অভিযোগ থেকে 'মুক্তি' দেওয়ার চেষ্টা দেখতে পাই না। ১৮৯৭ সালে বিচারপতি স্ট্রেচি প্রচলিত সরকার বিরোধী ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত আইনের যে আইন বহির্ভূত ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তার সমালোচনা করেও লেখকরা স্বীকার করেছেন, বলা যায় ঘোষণা করেছেন যে কোন নির্দিষ্ট সরকার বিরোধী কাজের জন্য দোষী না হলেও তিলক নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আনুগত্যহীনতা প্রচার করার জন্য অপরাধী ছিলেন। কোন পর্যায়েই তিনি ভারতে ইংরেজদের 'ঐশ্বরিক ব্রতে' বিশ্বাস করেননি। রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ব্রিটিশ ভারতবর্ষ শাসন করছে তার স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য, শোষণ করার জন্য, এবং সেই কারণ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে ভারতের মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। সর্বদা তিনি এই সত্যকে সামনে রেখেছেন যে, ভারতবর্ষে প্রধান বিরোধ ছিল বিদেশী শাসক ও ভারতীয় জনগণের মধ্যে। এমনকি যখন তিনি ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশকে তাড়ানোর কথা ভাবেনওনি বা সেরকম কোন চিন্তা প্রকাশ করেন নি

তখনও তাঁর সব কাজকর্মের লক্ষ্য ছিল সেই দিকেই। ফলে তিলকের বিরুদ্ধে মামলা তাঁর প্রতি অবিচার বলে নিন্দনীয় নয়, সেগুলি ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃত, দমনমূলক চরিত্রের প্রত্যক্ষ প্রকাশ বলেই নিন্দনীয়।

গ্রন্থটির প্রধান যে ত্রুটির জন্য এর প্রকৃত মূল্য খর্ব হয়েছে, সেটি হল তিলকের জীবন নিয়ে এখানে মূলত অনৈতিহাসিক ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ঐতিহাসিক বিবরণ অবশ্য আছে, কিন্তু ঐতিহাসিক পটভূমিকার সঙ্গে তা যুক্ত করা হয়নি। এমন একটা সময়ে তিলক ভারতের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিলেন যখন ভারতের অর্থনৈতিক ও শ্রেণীগত কাঠামোতে, ভারতের মানুষের চেতনায় এবং ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যে দ্রুত রূপান্তর ঘটছিল। এই বিষয়টি লেখকদ্বয় কম বেশি উপেক্ষা করেছেন। তার ফলে তাঁদের সমালোচনা বহুলাংশে 'তদর্থক', যুক্তিসম্মত ও 'নীতিসম্মত' হয়েছে, কিন্তু ইতিহাস সম্মত হয়নি। তিলকের কাজকর্মকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিচার করা হয়েছে—প্রশংসা কিংবা সমালোচনা করা হয়েছে 'নৈতিক' দৃষ্টিকোণ থেকে। উদাহরণস্বরূপ, তাঁরা লিখেছেন, "তিলক সব সময় বলতেন যে ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রামের একটা নৈতিক ভিত্তি আছে, এবং ভারতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত গর্বিত ছিলেন, নৈতিক চরিত্রকে এখানে ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি বলে মান্য করা হয়।" যা বোঝা যায়নি তা হল, এই সংগ্রাম ছিল নৈতিক কারণ ঐতিহাসিকভাবেই তা ছিল নৈতিক, কোন বিমূর্ত নৈতিকসূত্র বা ঐতিহ্যের জন্য নয়। সামগ্রিকভাবে ভারতীয়রা যখন ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে এক উঁচু পর্যায়ের নৈতিক সংগ্রাম করছিল, নিজেদের সামাজিক জীবনে ঠিক তখনই তারা অত্যন্ত অনৈতিক কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিল। যেমন, অস্পৃশ্যতা। এই অনৈতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে লেখকরা শেষ পর্যন্ত তিলকের রাজনৈতিক দর্শন ও ক্রিয়াকলাপের 'নৈতিকতার' ব্যাপারে, বিশেষত গান্ধীজীর পরবর্তী সময়ের দর্শন ও কাজকর্মের সঙ্গে তুলনার ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ কৈফিয়তের সুর অবলম্বন করেছেন। বাস্তবে তিলক ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে অবিচল বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। ঐতিহাসিক বিচারে তাঁর জীবন ও কর্ম যে-কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা রাখে, তা গান্ধীবাদীই হোক বা অন্য কিছু হোক।

একনায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সামাজিক উৎস

ডঃ মুরের* বইটিতে তুলনামূলক ইতিহাসের সাহায্যে সামগ্রিক ঐতিহাসিক পরিস্থিতি, বিশেষত ভূসম্পত্তির অধিকারী উচ্চবিত্ত শ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের ভূমিকা, বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে, কারণ রাজনৈতিক গণতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ ও কমিউনিজমের উদ্ভবের মূলে ছিল এই ভূমিকাই। তাঁর এই গবেষণায় শুধু ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, চীন ও ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাক্রম বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হলেও, জার্মানি, রাশিয়া ও ইতালি সহ সমগ্র বিশ্বের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাও স্থান পেয়েছে। তিনি গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র নিয়ে সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক গবেষণাকে সংশ্লেষিত করতে চেয়েছেন। গ্রন্থটি সেদিক দিয়ে মার্ক্স, ওয়েবার, টনি, ডব, বা সি· রাইট মিলসের মনীষার পদাঙ্ক অনুসারী। দুর্ভাগ্যবশত, এই সাদৃশ্য প্রয়াসের পর্যায়েই থেকে গেছে, কারণ শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়িয়েছে তা পাঁচমিশেলি। যদিও বহু মূল্যবান এবং কখনো কখনো উজ্জ্বল অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় ছড়িয়ে আছে সারা গ্রন্থে, বহু অর্থবহ প্রশ্নও উত্থাপিত হয়েছে।

অন্যদিকে, যেসব সাধারণীকরণ করা হয়েছে, অন্তত আধুনিক ইতিহাসের যে-কোন পরিণত ছাত্রের পক্ষে, তা প্রায়শই গতানুগতিক অথবা ব্যাখ্যা বা ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির থেকে একেবারেই অপর্যাপ্ত। মার্কিন মুষ্টিযুদ্ধের পরিভাষায়, ডঃ মুর তৎপরতার সঙ্গে আঘাত করার ভঙ্গি করতে পারেন, কিন্তু আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে কিছুটা দুর্বল। তদুপরি তাঁর সবল ও দুর্বল দিকগুলি বহুলাংশে আঞ্চলিক ভাবে বিকীর্ণ। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কিয়দংশে জাপানের রাজনৈতিক বিবর্তন সম্পর্কে তাঁর আলোচনা যথাযথ ও মূল্যবান, অথচ ভারত ও চীন সম্পর্কিত অধ্যায়ে যেসব মন্তব্য করা হয়েছে তাতে কিছুটা হতাশ হতে হয়। এই দুটি দেশ সম্পর্কে যে ধরণের ঐতিহাসিক গবেষণা বর্তমানে লভ্য সম্ভবত তাই দিয়েই দুর্বলতার আংশিক ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যাই হোক না কেন, গ্রন্থ সমালোচকের কাজটা কঠিন হয়ে পড়ে। ভারত ও চীন বিষয়ে অসংখ্য অন্তর্দৃষ্টির দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে এবং একই সঙ্গে অসংখ্য তথ্যগত ও বিশ্লেষণগত ভ্রান্তির উল্লেখ করতে হলে অনেকটা জায়গার দরকার। যেমন দরকার বাস্তব ঐতিহাসিক পরিস্থিতির পটভূমিতে তাঁর প্রধান প্রকল্পগুলির অপর্যাপ্ততা প্রমাণের জন্যও।

ডঃ মুরের প্রধান অনুমানটি অনেকটা এই রকম : কৃষির ক্ষেত্রে, গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ পুঁজিবাদী সামাজিক বিবর্তনের (আধুনিকীকরণ হিসেবেও বর্ণিত)

সেমিনার, সংখ্যা ১৪০, এপ্রিল ১৯৭১-এ প্রকাশিত।

* ব্যারিংটন মুর, জুনিয়র. 'দ্য সোশ্যাল অরিজিনস অব ডিকটেটরশিপ অ্যান্ড ডিমক্র্যাসি', বস্টন, ১৯৬৬।

প্রতি ভূসম্পত্তির অধিকারী উচ্চবিত্ত শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি ও এর পরিণামে কৃষক সম্প্রদায়ের জীবনে যা ঘটে তার দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় রাজতন্ত্র, কৃষির বাণিজ্যিকরণ, কৃষক সম্প্রদায় ও শহুরে বুর্জোয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে পুরুষানুক্রমিক ভূসম্পত্তির অধিকারী উচ্চবিত্ত শ্রেণীর প্রতিক্রিয়া বাধ্যতামূলকভাবে ঘটে। ইংল্যান্ডে তারা রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংঘাতে অবতীর্ণ হয়েছিল, নিজেরাই বাণিজ্যিক কৃষি অবলম্বন করে নিজেদের ক্রমশ বুর্জোয়ায় পরিণত করেছিল, কৃষককে ধ্বংস করে তার জায়গায় পুঁজিবাদী কৃষক ও কৃষি শ্রমিকের জন্ম দিয়েছিল, এবং তারপর এক দিকে শহুরে বুর্জোয়াদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল, অন্য দিকে শ্রমজীবী শ্রেণীর আনুকূল্য লাভের জন্য উনিশ শতকে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেছিল।

ফ্রান্সে ভূসম্পত্তির অধিকারী উচ্চবিত্ত শ্রেণীগুলি রাজতন্ত্রের সঙ্গে বিরোধিতা না করে ভিন্ন পথে বাণিজ্যিক কৃষির অনুসরণ করেছিল—দমিত অবস্থায় হলেও কৃষক সম্প্রদায়কে তারা জমিতেই বাঁচিয়ে রাখল এবং উৎপন্ন ফসলের একাংশ ছাড়তে বাধ্য করল, সেই অংশটা এই উচ্চবিত্ত কৃষকেরা বাজারে বিক্রি করত। এর ফলেই কৃষক সম্প্রদায় ১৭৮৯ সালের বিপ্লবকে সমর্থন করেছিল এবং বুর্জোয়া গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজতন্ত্র ও ভূসম্পত্তির অধিকারী অভিজাত শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমেছিল এবং অবশেষে, রাজতন্ত্র ও অভিজাত শ্রেণীর উৎসাদন করে গণতন্ত্রের সামাজিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই ঘটনাক্রমের ফলেই কৃষক সম্প্রদায় বেঁচে থেকেছে এবং ফলত ফ্রান্সে গণতন্ত্রের জোয়ার-ভাঁটা বারবার দেখা গেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঐতিহাসিক কারণেই কৃষক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল না। তদুপরি গৃহযুদ্ধ দাসপ্রথার ওপর প্রতিষ্ঠিত ভূসম্পত্তিবান উচ্চবিত্ত শ্রেণীকে কাবু করে ফেলেছিল অর্থাৎ কৃষির ক্ষেত্রে তাদের দমনমূলক রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ দুর্বল করে দিয়েছিল। এই তিনটি দেশেই আধুনিকীকরণের পথ অবারিত হয়েছিল হিংসাত্মক বিপ্লবের মাধ্যমে। উপরন্তু, 'উচ্চবিত্ত শ্রেণীর... ব্যাপক হিংসার' ফলে কৃষক সম্প্রদায় হয় সামাজিক স্তর হিসেবে সম্পত্তিচ্যুত হয়েছিল নয়তো বুর্জোয়াদের স্বার্থসিদ্ধির প্রক্রিয়ায় তাদের জুতে দেওয়া হয়েছিল।

জাপানে, কিংবা জার্মানিতে, উচ্চবিত্ত ভূম্যধিকারী শ্রেণী সার্বভৌম রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেনি। তারা বাজারের জন্য উৎপাদন অর্থাৎ বাণিজ্যিক কৃষির প্রয়োজনে সাড়া দিয়েছিল কৃষকদের ওপর দমনমূলক সামাজিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। কৃষকদের প্রাথমিক পুরুষানুক্রমিক পরিচয়টুকু শুধু ধরে রাখতে দেওয়া হয়েছিল। তার ফলে, ভূস্বামী ও প্রজাকে নিয়ে গঠিত এক কৃষি কাঠামোর উদ্ভব হ'ল এবং তা স্থায়িত্ব পেল। একই সময়ে ভূসম্পত্তিবান উচ্চবিত্ত শ্রেণী এমন এক বুর্জোয়া গোষ্ঠীর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করতে পেরেছিল যে গোষ্ঠী যথেষ্ট উন্নত হলেও বিত্তবান

ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার মত শক্তিশালী ছিল না। এই দুপক্ষ মিলে ওপর থেকে চাপানো এক প্রতিক্রিয়াশীল আধুনিকীকরণের জন্য কাজ করেছে। অথচ অতীতের সঙ্গে সহিংস রাজনৈতিক বিচ্ছেদ ঘটানো হয়নি। শিল্পসংক্রান্ত প্রচেষ্টা দুর্বল থেকে যাওয়ার ফলে কৃষক সম্প্রদায়ের বোঝাও কমেনি। আর পরিণামে দেখা দিয়েছিল, বিসমার্কীয় জার্মানি এবং মেইজি জাপান।

উভয় দেশেই স্বৈরতন্ত্র আবির্ভাবের আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল: শহর ও গ্রামের উচ্চ শ্রেণীর স্বার্থগত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শ্রমিক ও কৃষকের বিরুদ্ধে এবং শৃংখলা ও স্থায়িত্ব বজায় রাখার নামে এই দুই শক্তি রাজনৈতিকভাবে হাত মিলিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে যখন বিপুল মন্দার কারণে শৃংখলা ও স্থায়িত্ব অনিশ্চিত হয়েছে দুই দেশই তখন আশ্রয় নিল ফ্যাসিবাদের কোলে, যার ভিত্তি ছিল ভূস্বামী ও ধনী কৃষকদের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল আবেদন এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সশস্ত্র বাহিনী ও আমলাতন্ত্রের মধ্যে ভূসম্পত্তিবান উচ্চ শ্রেণীর বিরাট অংশের সদ্ব্যবহার।

সফল সাম্রাজ্যবাদী ও আগ্রাসী বৈদেশিক নীতি কৃষক সম্প্রদায় ও শহুরে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সমবেত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। ডঃ মুর দেখিয়েছেন এইভাবে বুর্জোয়া বিপ্লব এড়িয়ে আসার ফলে যে সামাজিক মূল্য অপরিশোধিত থেকে গিয়েছিল, পরবর্তী কালে তার থেকে আরো বহু গুণ বেশি শোধ দিতে হ'ল জার্মানি ও জাপানের জনগণকে, এবং বাকি দুনিয়াকেও। এমনও মনে করা যেতে পারে যে, আজকের দুনিয়ায় ফ্যাসিবাদকে এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটা ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য হল, বর্তমানে অন্য দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গৌরবময় সাফল্যের আবেদন অনেক কম। এর একটা দৃষ্টান্ত, ভিয়েতনামে সামরিক ব্যর্থতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উগ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারেনি। আরেকটি দৃষ্টান্ত হল, ১৯৬৫ সালের পাক ভারত যুদ্ধের অচলাবস্থার বিলম্বিত প্রতিক্রিয়া হিসেবে আয়ুব সরকারের পতনের ঘটনা। ভারতের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অসাফল্য ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক শক্তিগুলিকে সতর্ক করে দেওয়ার কাজে কিছুটা ভূমিকা নিয়েছিল।

এই ভাবে ডঃ মুর পুঁজিবাদী সমাজে অনুসৃত রাজনীতিতে কৃষি সমস্যার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সমাধানগুলির প্রকৃতিগত ভূমিকা অত্যন্ত জোরালভাবে তুলে ধরেছেন। স্পষ্টতই, যদি সেই রাজনৈতিক গণতন্ত্রের অর্থ এই হয় (এবং সেটাই অনিবার্য) যে এর ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রজারা ভূস্বামীর খাজনা আদায়ের এবং জমির ওপর নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিকেই আঘাত করার জন্য প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার, সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার ইত্যাদি কাজে লাগাবে তাহলে কোন উৎপীড়ক খাজনা-আদায়কারী ভূস্বামী শ্রেণীই রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে পুরোপুরি বিকাশ লাভের সুযোগ দিতে পারে না। অনুরূপভাবে তিনি সঠিক ভাবেই দেখিয়েছেন যে কৃষির পুঁজিবাদী রূপান্তর এবং তার পরিণামে নিপীড়নকারী ভূস্বামী প্রথার অবসান না হওয়া পর্যন্ত, বুর্জোয়া শ্রেণী এবং

ভূস্বামীদের মধ্যে মৈত্রীবন্ধনের ফলে কর্তৃত্ববাদ বা স্বৈরতন্ত্রের (authoritarian-ism) সম্ভাবনা থেকেই যায়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল ভূস্বামীরা অর্থনৈতিক বিষয়াদি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও গ্রামের ওপর প্রভুত্ব করে কিনা অথবা কৃষকেরা সাফল্যের সঙ্গে এই প্রভুত্বকে দমিত করতে পেরেছে কিনা। বিষয়টিকে ডঃ মুর যেখানে ছেড়ে দিয়েছেন সেখানে ছেড়ে দেওয়া যায় না। বিশ শতকের মধ্যভাগে ভারতবর্ষের পরিস্থিতিতে যখন শহরের শিল্পের পক্ষে গ্রামীণ শ্রমিকের কর্মসংস্থানের ক্ষমতা সীমিত, তখন গ্রামের পুঁজিপতি শ্রেণী ব্রিটিশ পুঁজিপতি কৃষকের মত রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে সমর্থন করবে এ সম্ভাবনা কম। বরং তারা উৎপীড়ক ভূস্বামীদের মতই কৃষি শ্রমিক ও দরিদ্র কৃষকের সংগঠন করার এবং ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকার পাওয়ায় আশংকাগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে। অন্যভাবে বললে, আজকের ভারতবর্ষে কৃষিতে পুঁজিবাদী বিকাশের ফলে রাজনৈতিক গণতন্ত্র শক্তিশালী হবে কিনা সেটা সন্দেহের বিষয়, যদি না শহরের পুঁজিপতিও গ্রামের দরিদ্র মানুষের মধ্যে এক দীর্ঘ মেয়াদী রাজনৈতিক বন্ধনের অস্তিত্ব মেনে নেওয়া হয়।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, ডঃ মুর গত দুশ বছরে পুঁজিবাদের বিবর্তনকে ছোট করে দেখে কিংবা বলা যায় বিকৃত করে ফ্যাসিবাদের কৃষি কাঠামোর ভূমিকাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন! জার্মানি ও জাপানে ফ্যাসিবাদ প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া সামন্ততন্ত্রের অবশিষ্টাংশের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ততটা দেখা দেয়নি, যতটা দেখা গিয়েছিল মৃতপ্রায় একচেটিয়া পুঁজিবাদের হাতিয়ার হিসাবে, যদিও এই ফ্যাসিবাদ নিঃসন্দেহে কিছুটা জনসমর্থন লাভ করেছিল এবং কৃষি বিপ্লব বা কৃষির পুঁজিতান্ত্রিক রূপান্তর না-হওয়ার ফলে টিকে যাওয়া জমিদার-বর্গের কাছ থেকে আমলাতান্ত্রিক সামরিক সহায়তা পেয়েছিল। ডঃ মুর অবশ্য উল্লেখ করেছেন, পুঁজিবাদ যখন ভালভাবে কাজ করতে বা তার অভ্যন্তরীণ চাপগুলিকে দূর করতে ব্যর্থ হয় একমাত্র তখনই ফ্যাসিবাদের আবির্ভাব ঘটে এবং জার্মানিতে ও জাপানে ফ্যাসীবাদের ফলে একচেটিয়া পুঁজিপতিরাই সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছিল। কিন্তু ফ্যাসিবাদী আন্দোলনের র‍্যাডিক্যাল দক্ষিণ-পন্থী যে অংশ পশ্চাদমুখী কৃষি স্বার্থকে আকর্ষণ করত, ফ্যাশিবাদ বিজয়ী হলে তাদের অবিলম্বে ছেঁটে বাদ দেওয়া হয়েছিল।

অন্য প্রসঙ্গে তিনি বারবার বলেছেন, কোন আন্দোলনের চরিত্র নির্ণয় করতে হবে আন্দোলনের নেতা বা অংশগ্রহণকারীদের দেখে নয়, সেই আন্দোলনের ফলে কারা লাভবান হচ্ছে তা দেখে। তাঁর কথায়ঃ "সংক্ষেপে, কে লড়াই করছে শুধু তাই নয়, কিসের জন্য লড়াই সেটা গুরুত্বপূর্ণ"। এর ভিত্তিতেই তিনি ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপ্লবকে বুর্জোয়া বিপ্লব বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ফ্যাসিবাদের বিশ্লেষণে তিনি এটাকে তাঁর সূচনা বিন্দু করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আমরা যদি মনে রাখি যে তাঁর বিশ্লেষণ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাধারণীকরণ বেরিয়ে আসছে, সেটি হ'ল, পুঁজিবাদ সাফল্যের

সঙ্গে নিম্নতর শ্রেণীর মানুষকে তার সমর্থনে শামিল করতে পারলেই রাজনৈতিক গণতন্ত্রের উদ্ভব হয় এবং টিকে থাকে তাহলে তিনি একচেটিয়া পুঁজিবাদের ভূমিকাকে যে ভাবে ছোট করে দেখেছেন তাতে বিস্মিত হতে হয়।

ডঃ মুরের তৃতীয় বক্তব্য কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে যার দৃষ্টান্ত দেখা গেছে চীনে (এবং রাশিয়াতে)। ভূসম্পত্তির অধিকারী উচ্চবিত্ত শ্রেণী ও কৃষির আমলাতন্ত্র যখন কৃষি ও শিল্পের বাণিজ্যিকীকরণে ইতিবাচক সাড়া দিতে ব্যর্থ হয় এবং একই সঙ্গে ব্যর্থ হয় বিপুল সংখ্যক কৃষক জনগণের প্রচলিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করতে, যখন তারা গোটা কৃষক সম্প্রদায়কে আরো তীব্রভাবে শোষণ করতে শুরু করে এবং তার ফলে ঐ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সমস্ত অংশকে ঐক্যবদ্ধ করে দেয়, যখন দেশী বুর্জোয়া গোষ্ঠী এতই দুর্বল যে কোন বিপ্লব ঘটিয়ে কিংবা ওপর থেকে চাপানো প্রতিক্রিয়াশীল পন্থায় আধুনিকীকরণের সূচনা করতে পারে না, যখন ভূসম্পত্তির অধিকারী উচ্চতর শ্রেণীগুলি বুর্জোয়া গোষ্ঠীর ওপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে, দেশে আধুনিকীকরণ হয় না, তখনই কৃষকেরা বিদ্রোহ করে।

ফ্রান্সে কৃষক বিদ্রোহ বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। আর তারপরই বুর্জোয়ারা কৃষকদের আক্রমণ করেছিল। কিন্তু চীনে (এবং রাশিয়াতে) কমিউনিস্ট পার্টিই এই সুবিধাটি লাভ করে এবং তারপর আক্রমণ চালায় কৃষক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। এখানে ডঃ মুর অন্য কিছুর মধ্যে দুটি মারাত্মক ভুল করেছেন। প্রথমত, শ্রমজীবী শ্রেণীর ভূমিকা মূলত শূন্যে পর্যবসিত হয়েছে (এই ভুল তিনি ফ্যাসিজমের ক্ষেত্রেও করেছেন)। তাছাড়া চীনের (অধিকন্তু রাশিয়ার) কমিউনিস্ট বিপ্লবকে প্রাথমিকভাবে এক কৃষক বিপ্লব হিসেবে দেখা অতিরঞ্জন করার থেকেও বেশী ত্রুটিপূর্ণ। এবং ঐতিহাসিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে গুরুতর ত্রুটির নমুনা।

গ্রন্থের প্রথম অংশে ফরাসী বিপ্লবে প্রত্যক্ষ ও রাজনৈতিক লড়াইতে কৃষক সম্প্রদায় ও 'শহুরে **স্যাঁ-কুলোৎ**' অর্থাৎ ছিন্নবস্ত্র দরিদ্ররা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল ডঃ মুর নিজেই তা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। সেখানে সামান্য পরোক্ষ ইঙ্গিতও দেননি যে সে লড়াই প্রাথমিক ভাবে কৃষক বিদ্রোহ বা শহরের গরিবদের বিপ্লব হয়ে উঠেছিল। নিঃসন্দেহে কৃষক সম্প্রদায় রুশ বিপ্লবে এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি এবং চীনা বিপ্লবের প্রধান শক্তি ছিল। কিন্তু এসব বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণীর চূড়ান্ত ভূমিকাকে দেখতে না পাওয়া এমন এক ভ্রান্তি যার কারণ বোঝা দুঃসাধ্য।

সম্ভবত এই ভুলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে পরিভাষা ব্যবহার সংক্রান্ত আরো দুটি ভুল। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর তীক্ষ্ণ ও গভীর বিশ্লেষণের পুরোটা জুড়ে তিনি রাজনৈতিক ঘটনাক্রমের বিশ্লেষণ করেছেন সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে অর্থাৎ সেগুলিকে সামাজিক শ্রেণী, সামাজিক স্তর ও গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে। একবারও আমরা এমন কোন রাজনৈতিক

গোষ্ঠীকে খ‍ুঁজে পাই না যাকে বিমূর্ত অস্তিত্ব হিসেবে ধরে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে কিংবা যাকে এক অনন্য সাপেক্ষ সত্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে অর্থাৎ কোন সামাজিক গোষ্ঠীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব বা তার প্রতীক এই বিষয়টি বাদ দিয়ে বিচার করা হয়েছে। যেমন, ভূসম্পত্তির অধিকারী উচ্চবিত্ত শ্রেণীর বিভিন্ন গোষ্ঠী বা শহুরে বুর্জোয়া গোষ্ঠী বা অন্যান্য সামাজিক স্তর ইত্যাদি কৃষকের বিরোধিতা করেছে, তাকে সমর্থন করেছে, তার নেতৃত্ব দিয়েছে, তাকে ব্যবহার করেছে, কিংবা তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। অথচ, রুশ ও চীনা বিপ্লবের ক্ষেত্রে কৃষক সম্প্রদায়কে যুক্ত করা হয়েছে এক বিমূর্ত ও বিশুদ্ধ রাজনৈতিক সত্তার, কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যার শ্রেণীগত বা সামাজিক ভিত্তি বা চরিত্রের কথা কোথাও বলা হয়নি।

দ্বিতীয়ত, এটাও লক্ষণীয় যে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের বিপ্লব বা ঐতিহাসিক ঘটনাক্রমের বাস্তব ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে সমাজতত্ত্বে প্রচলিত সর্বার্থসাধক 'এলিট' শব্দটি সঙ্গতভাবেই ব্যবহার করা হয়নি, কারণ শব্দটি ব্যবহারের ফলে স্পষ্টতার চাইতে অস্পষ্টতাই বাড়ে। বিশুদ্ধ 'এলিটীয়' বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্য নিলে ফরাসী বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায়ের পর্যালোচনার অবস্থা কি হতে পারে সেটা আমরা অনুমান করতে পারি। অথচ ভারত চীনের রাজনৈতিক ঘটনাক্রম সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত ভাসা ভাসা বিশ্লেষণে ডঃ মুর এই শব্দটিকেই ব্যবহার করেছেন।

সবচেয়ে গুরুতর যে ভুলটি ডঃ মুর করেছেন তা হল, আধুনিক চীন ও ভারতে সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকাকে উপেক্ষা। কার্যত চীনা বিপ্লব যতটা কৃষক বিপ্লব ছিল ঠিক ততটাই যে ছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লব, এই তথ্যটি উপেক্ষিত হয়েছে। ১৯২৭ ও ১৯৪৫ সালের পরবর্তী সময়ের কুওমিনটাং প্রতিক্রিয়াশীলকে (এবং আরো আগের ওয়ার লর্ডিজমকে) এক বিশুদ্ধ, অমিশ্র ভূস্বামীভিত্তিক প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে দেখা হয়েছে। বলা হয়েছে, ১৯২৭-পরবর্তী কুওমিনটাং-এর সামাজিক ভিত্তি ছিল ভূস্বামী, দুর্বৃত্ত ও ছদ্ম-কনফুসীয়বাদ। ডঃ মুরের মতে, প্রধানত দেশী কৃষি স্বার্থ চীনের শিল্প প্রচেষ্টাকে দমন করেছিল। তিনি মনে করেন, মার্ক্সবাদী ও জাতীয়তাবাদীরা 'একের দোষ সুবিধাজনকভাবে অন্যের ঘাড়ে চাপানর জন্য' সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনা করে।

উদাহরণ আর বাড়ানর প্রয়োজন নেই। এটুকুই বলা যথেষ্ট যে সাম্রাজ্যবাদকে বস্তুত বাদ দেওয়ার ফলে আধুনিক চীন ও ভারতের ঐতিহাসিক সত্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি বাদ পড়ে গেছে। ফলে, তিনি পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা নিঃসৃত এক ঐতিহাসিক মডেল ব্যবহার করেছেন, অবাস্তব, অসার ও যান্ত্রিকভাবে এবং ভারত ও চীন সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ হয়ে পড়েছে বন্ধ্যা। যেমন, তিনি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে ভারত ও চীনের পুঁজিবাদী শ্রেণী বিভিন্ন অংশে বিভক্ত ছিল বা গোষ্ঠীগতভাবে ও কালগতভাবে বিচিত্র ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল। একইভাবে কুওমিনটাং চীনে একনায়ক-

তন্ত্রের শিকড় শুধু জমিদারদের সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণীর মিত্রতা বা জমিদারের বশ্যতা স্বীকারেই নিহিত ছিল না, নিহিত ছিল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের প্রতি উভয়ের বশ্যতা স্বীকারের মধ্যেও।

বস্তুত, সাম্প্রতিক সময়ে পূর্বতন-ঔপনিবেশিক দুনিয়ার এই শেষোক্ত ঘটনাটিই দক্ষিণপন্থী একনায়কতন্ত্রের অনিবার্য উপাদান হিসেবে দেখা গেছে। লাতিন আমেরিকা, পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল এর দৃষ্টান্ত। অন্য দিকে, ভারতবর্ষে রাজনৈতিক গণতন্ত্র টিকে থাকার প্রাথমিক কারণ হল বিদেশী নিয়ন্ত্রণ থেকে তা তুলনামূলক-ভাবে বেশি মুক্ত। ভারত ও চীনের ভূখণ্ড সম্পর্কে তাঁর পরিচয়ের অভাবের ফলে এ দুটি দেশের ঘটনাক্রম সম্পর্কে তাঁর আলোচনা অন্যদিকে এই চিন্তা-উদ্দীপক গ্রন্থটিতে সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা সম্পর্কে এক অসম্পূর্ণ অধ্যায় হয়ে থেকে গেছে।

পাশাপাশি, ভারতীয় পাঠকরা ডঃ মুরের আলোচনার মধ্যে ইউরোপ ও জাপানের অংশে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ও চিন্তার পক্ষে বহু মূল্যবান দিক নির্দেশ পাবেন। বিশেষত, অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশ বা সামাজিক ন্যায়-বিচারের প্রতিবন্ধক হিসেবেই শুধু নয়, রাজনৈতিক গণতন্ত্রের পক্ষে এক গভীর ও অনিবার্য বিপদাশঙ্কা হিসেবে ভূস্বামী প্রথার বিপদের ওপর তিনি যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা সময়োচিত। তাঁর গ্রন্থ নিঃসন্দেহে ভারতীয় ঐতিহাসিকদের এবং আরো বেশি করে সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মনোযোগ ভারতবর্ষের কৃষি কাঠামো সম্পর্কে গবেষণার প্রতি আকর্ষণ করবে। এ কাজটি এতদিন পর্যন্ত কৃষি-অর্থনীতিবিদরাই করেছেন। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রাম এমন এক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামো রেখে গেছে যা কৃষি ব্যবস্থা থেকে কর্তৃত্ববাদের (authoritarianism) জড় উৎপাটন না হওয়া পর্যন্ত এবং সদ্য উদীয়মান শহুরে একনায়কতন্ত্রী শক্তিগুলির সঙ্গে গ্রামের ধনী সম্প্রদায়ের মৈত্রীবন্ধন ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত, শক্ত জমির ওপর দাঁড়াতে পারবে না। ডঃ মুরের এই বিশ্লেষণ যে সময়োচিত তা স্পষ্ট হয় যখন দেখি ফ্যাসিবাদের ভারতীয় ভক্তরা সাম্প্রতিককালে উত্তর ভারতের গ্রামীণ উচ্চবিত্ত শ্রেণী এবং উচ্চবর্ণের মধ্যে উর্বর জমির সন্ধান পেয়েছে।

ডঃ মুরের গ্রন্থটি হল নিয়মের কঠিন নিগড় থেকে এবং অনুপুঙ্খ বিবরণের অবসাদ থেকে সমাজবিজ্ঞানকে উদ্ধার করার এক সাহসী প্রচেষ্টা। যেসব বিষয় নিছক সুড়সুড়ি দেয়না বা ক্ষণস্থায়ী পাণ্ডিত্যের খ্যাতি এনে দেয় না এমন সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তিনি বিস্তৃত পরিধিতে আলোচনা করেছেন। এমন ধরনের গবেষণা ক্রমশই কমে আসছে। সংস্কৃতিগত ব্যাখ্যাকে কম গুরুত্ব দিয়ে তিনি ঠিকই করেছেন। তাছাড়া সামাজিক শ্রেণী ও স্তরের ভূমিকার ওপর তিনি সঠিকভাবেই জোর দিয়েছেন। সামাজিক পরিবর্তনকে তিনি কোন ব্যতিক্রম ঘটনা হিসাবে দেখতে রাজী নন। তিনি

চান সমাজবিজ্ঞানীরাও অচলাবস্থা ও স্থায়িত্ব এবং যেসব সামাজিক শক্তি এই অবস্থাকে টিকিয়ে রাখে ও তার সুযোগ নেয় সে সবের ব্যাখ্যা করুন।

সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যানধারণা অতীতেরই ভগ্নাবশেষ এই বক্তব্য তিনি মেনে নেননি। তিনি চেয়েছেন সাম্প্রতিক অতীত ও বর্তমান সময়েও সেগুলির সামাজিক ভিত্তি বিশ্লেষণ করে দেখতে। বৈপ্লবিক হিংসার ঐতিহাসিক ভূমিকাকে তিনি ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখছেন, এবং কোন অন্যায্য সমাজ ব্যবস্থার দৈনন্দিন জীবনে যে হিংসা প্রকট হয়ে ওঠে তার গভীরতা ও ব্যাপ্তি ছাড়াও, নরমপন্থার জন্যও যে ঐতিহাসিক মূল্য দিতে হয় তার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।

কিন্তু যেসব ধারণা আগের থেকেই বদ্ধমূল সেগুলিকে সহজে ত্যাগ করা যায় না, বিশেষ করে সেগুলি যখন কারও সমাজের মৌল সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং সেগুলির সঙ্গে যখন দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত বিশেষ তত্ত্বগত ঐতিহ্য জড়িত। বৈপ্লবিক ছেদ আনা সবসময়ই কঠিন এবং সবচেয়ে বেশি কঠিন তাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে। তবে, ডঃ মুরের কথাতেই বলা যায়, বিপ্লব না করার মূল্য খুবই বেশী এমনকি বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রেও। সুতরাং সেই লক্ষ্যে যে যাত্রা শুরু তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতেই হবে।

নির্দেশিকা